বাংলার পুরনারী

দীনেশচন্দ্র সেন

অরুণা প্রকাশন
২, কালিদাস সিংহ লেন, কোলকাতা ৭০০০০৯

নবসংস্করণের ভূমিকা

দীনেশচন্দ্র সেনের 'বাংলার পুরনারী' একটি অনবদ্য সাহিত্য-সৃষ্টি। পূর্ব বাংলার গ্রাম্য কবিদের কাব্যগাথায় বাংলার নারী যেভাবে প্রতিভাত হয়েছে তারই অসমান্য কাব্যমিশ্রিত গদ্যরূপ এই পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে। ইংরাজি ভাষায় যাকে বলে romanticized perception of women, এই গদ্যরূপে ধরা কাব্যগুলির সারাংশ তাই। নারীর আত্মত্যাগ, তার তিতিক্ষা, তার সহিষ্ণুতা, তার ক্ষমা, তার প্রেম, তার সন্তান-বাৎসল্য, তার পতিভক্তি, তার স্বামী সোহাগিনী থাকার বাসনা, তার সতীত্ব—এই সকল সামাজিক গুণকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে এই গল্পগুলিতে। বিপদে পড়ে নারীর উপস্থিত বুদ্ধি, তার সাহস, সততা, দৃঢ়তা, পরপুরুষের লোভাতুর আসক্তি থেকে নিজেকে মুক্ত করার ক্ষমতা এ সবই এক ঘনীভূত আতিশয্যের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করা হয়েছে এ সমস্ত কাব্যগীতে। এ সমস্ত গল্পকাহিনীতে কোন সমাজ বিপ্লবের কথা নেই— থাকার কথাও নয়। কারণ গ্রাম জীবনের আত্মমগ্নতায়, কৃষি-অর্থনীতির অন্তর্বদ্ধতায় সেখানে কোন বৃহত্তর উৎক্ষেপন সম্ভব ছিল না। গতিশীল জীবনচর্যার প্রবণতাগুলি যা শিল্পায়িত সমাজে দেখা যায় তা গ্রামজীবনে অনুপস্থিত ছিল। নারী সেখানে জীবনের একমাত্র সুষমা—পুরুষ তার রূপ ও শক্তি, তার বল ও ঐশ্বর্য নিয়ে আসে নিজেকে চরিতার্থ করার জন্য নয়, নারীকে ব্যঞ্জনাময় করার জন্যে। প্রতিটি উপাখ্যানের শেষে দীনেশচন্দ্র নারী চরিত্রকেই বিশ্লেষণ করেছেন, পুরুষকে নয়। কারণ গ্রাম্য কবিরা নারীকেই তাঁদের কাব্যরসের প্রেরণা হিসাবে ধরে নিয়েছিলেন। এটি ভারতীয় কবিদের আদি চেতনা। কালিদাস নারীকে 'সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতু' — সৃষ্টির আদি ধাতু বলে বর্ণনা করেছেন। সৃষ্টির এই আদি ধাতুই এই গ্রন্থের নানা গল্পে নানা রূপে পরিবেশিত হয়েছে। গল্পের নারী চরিত্রগুলি সবই স্বতন্ত্র;প্রত্যেকেই আপন মহিমায় উদ্ভাসিত। কেউ কারও পরিপূরক নয়। দীনেশচন্দ্র লিখলেন ঃ "এদেশে যে সকল কবি প্রাচীন কালে মহিলা-চরিত্র আঁকিতে গিয়াছেন, তাহার সমস্ত স্থানেই সে সকল চরিত্র সীতা-সাবিত্রীর ছাঁচে ঢালাই করা হইয়াছে; কিন্তু বাঙ্গালার এই পল্লীর ঐশ্বর্য্য কি বিরাট!" (কাজলরেখা, পৃ. ৫৭)। একই চরিত্রের পৌনঃপুনিকতা এই গল্পগুলির মধ্যে নেই। এক বিস্ময়কর বৈচিত্র্যের মাঝে নানা সাজে, নানা রূপে তাদের উপস্থাপনা। সব চরিত্র যে বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা নয় — রোমান্টিকৃত নারীর রূপ— যাকে ইংরাজিতে বলা হয় the romanticized image of women —তাতে কখনো তা হয় না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন

"আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে, তাহে ভালোবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানসী-প্রতিমা"
(মানসী, উপহার)

কাব্যের নারী কবির মানস-প্রতিমা। ধ্যানের পুলকে চিত্রিত হয় তার ব্যঞ্জনা। কল্পনার আবেশ তাকে মোহময় করে। ট্র্যাজেডির নারী প্রায়ই মোহময়ী হয়। যেমন ধরা যাক 'রাণী কমলা' গল্পের নায়িকা স্বয়ং রাণী। তিনি স্বামীর পূর্বপুরুষদের উদ্ধারের জন্য দীঘির জলে আত্মবিসর্জন দিয়েছিলেন। তাতেই তিনি পেলেন দেবীমাহাত্ম্য। দীনেশচন্দ্র লিখলেন "....আমি এই সাধারণের পরিকল্পিত দেবীমূর্তিখানির পাদপদ্মে শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ণ পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি।" (পৃ. ১৭)

এইভাবেই তৈরী হয়েছিল একটি বিশ্বাস যে সমাজের উন্নতি প্রকল্পে নারীই হবে আহুতির উপাদান—এমন এক বিশ্বাস যা কালান্তরের পরিচর্যায় একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। এই বিশ্বাসের পাদপীঠে আছে নারীর সতীত্বের ধারণা— সতীত্ব সেই জিনিস যা জলে ক্লেদাক্ত হয় না, যাকে বায়ু শোষণ করতে পারে না, যাকে শস্ত্র ছিন্ন করতে পারে না। এই কারণেই রামচন্দ্র সীতাকে আপন সতীত্বের প্রমাণ হিসাবে অগ্নিপরীক্ষা দিতে বলেছিলেন — সীতা সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে পাতাল প্রবেশ করে নারীত্বের লজ্জা আর অপমানকে প্রতিহত করেছিলেন। গ্রাম্য লেখায় নারীর সতীত্ব নন্দিত। সতীত্ববোধকে দৃঢ়বদ্ধ করার আয়োজনে অসংখ্য দর্শনার্থী ও শ্রোতার সম্মুখে জলাশয়ের শুষ্ক তলদেশে দন্ডায়মানা নারীকে দিয়ে বলানো হয়েছে ঃ "কায়মনোবাক্যে আমি যদি ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া থাকি, তবে পুকুরে জল ভর্ত্তি হউক, আমার স্বামীর পিতৃকুল রক্ষা পাউন.. যেন আমার প্রভুর মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হয়।" (পৃ. ৬)

লক্ষণীয় যে সামন্ততান্ত্রিক সমাজে স্বামী 'প্রভু' এবং প্রভুর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার জন্যই — তারই অনুরোধে বা ইংগিতে নারীর আত্ম বলিদান। এ বলিদান যে স্বেচ্ছা প্রণোদিত নয় তা বোঝা যায় যখন দেখি সংসার-সম্ভোগের অতৃপ্তি নারীর বিদেহী অস্তিত্বকে বেদনাহত করছে, তিনি বলছেন ঃ "নারীর স্বামীপুত্র ছাড়া আর কোন্ সম্পদ আছে— সেই স্বামীপুত্রহারা হইয়া আমি যে ভাবে আছি তাহা তোমাকে কেমন করিয়া বুঝাইব?" (পৃ ১১) বিদেহী আত্মার মননে যে হাহাকার কবি এবং লেখক বর্ণনা করেছেন তা প্রেমের কোন মর্মবাণীকে প্রকাশ করে? হতাশায় বিদীর্ণ সত্তার প্রকাশ রয়েছে রাজাকে রাণীর এই সম্ভাষণে ঃ "তোমাকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিতেছি না, আমার মন দিন-রাত্রি হুহু করিয়া কাঁদিতেছে;...আমার ছেলের শোকে বুক বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, আমার কত জন্মের তপস্যার ফল ঐ শিশু"। (পৃ. ১১)

শরীরী মানুষের কাছে অশরীরীর এই আকুতিকে অনির্বাপিত প্রেমের প্রকাশ ধরে নিয়ে নারী বন্দনার আয়োজন হয়েছে এ গল্পে। এই অনির্বাপিত প্রেমই যুগ যুগ ধরে সতীদাহের মূল লজিক রূপে কাজ করেছে। ধরে নেওয়া হয়েছে যে স্বামী মৃত হলেও দাম্পত্য প্রেমের বন্ধন ছিন্ন হয় না তাই 'প্রাণপতি'র সঙ্গে পত্নীর কন্ঠলগ্নতা জনম-মরণের এক অবিভাজ্য প্রতিমা। অগ্নিসাক্ষে যে বন্ধন সূচিত হয় অগ্নিতেই তার লয়। এই রকম একটি বোধ সদাই সতীদাহ প্রথার অন্তরালের শক্তি হয়ে কাজ করেছে। সতীনিধনের ঘটনা লৌকিক মহিমায় ভূষিত হয়ে কতখানি রোমান্টিকৃত সমাজবোধ রূপে গড়ে উঠতে পারে তার নিদর্শন দীনেশচন্দ্রের এই নিবেদন ঃ

"এইরূপ আত্মদান আমাদের দেশে প্রাচীনকালে দুর্লভ ছিল না। যাঁহারা স্বামীর চিতানলে স্বামীর শবের পার্শ্বে শুইয়া সিন্দুর রঞ্জিত ললাটে, ও অগ্নিপাটের শাড়ী পরিয়া — শঙ্খ বলয় হস্তে

— ভালবাসার চরম আদর্শ দেখাইতেন, অগ্নি-জ্বালা যাহাদের অঙ্গে কোন ব্যথা দিতে পারে নাই— বঙ্গদেশের সেই শত শত সহমরণ যাত্রী সতীবৃন্দের পার্শ্বে রাণী কমলার জন্যও একটি স্থান আছে। এই গল্পটি অপর দেশীয়দের জন্য লিখিত হয় নাই। ইহা তাহাদের জন্যই লিখিত হইয়াছে, যাঁহারা আত্মবলি দিয়া প্রেমের মাহাত্ম্য দেখাইয়া গিয়াছেন— তাঁহাদেরই বংশধর।" (পৃ. ১৭)

সমাজের যূথবদ্ধ শক্তির কাছে নারীর অনিচ্ছাকৃত আত্মবলিদান মধ্যযুগীয় সাহিত্যে নন্দিত হতে পারে কিন্তু তাকে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার (colonial modernity) প্রেক্ষিতে দীনেশচন্দ্র যেভাবে ধরে রাখার চেষ্টা করলেন তা কোন প্রগতিশীল দৃষ্টিকোণের পরিচয় বহন করে না। প্রথার রোমান্টিকরণ ছিল একটি যুগপ্রবণতা। রবীন্দ্রনাথও এই প্রবণতার শিকার হয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন

"দাম্পত্যলীলার অবসান দিনে সংসারের কার্যক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া সহজে বধূবেশে সীমন্তে মঙ্গল-সিন্দুর পরিয়া পতির চিতায় আরোহন করিয়াছ। মৃত্যুকে তুমি সুন্দর করিয়াছ। শুভ করিয়াছ, পবিত্র করিয়াছ, চিতাকে তুমি বিবাহ শয্যার ন্যায় আনন্দময় কল্যাণময় করিয়াছ।"

[ডঃ রঞ্জিত সেন, "নারীবাদীদের রবীন্দ্র চিন্তা ও রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনা," অধ্যাপক গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত **পৃথিবীর কবি ঃ রবীন্দ্র সার্ধশতবার্ষিকী সঙ্কলন গ্রন্থ.**

রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের উপর মন্তব্য কবতে গিয়ে বিশিষ্ট নারীবাদী সমাজতত্ত্ববিদ অধ্যাপিকা বেলা দত্তগুপ্ত লিখলেন ঃ "This kind of eloquence in favour of Sati was simply unexpected from the poet of the stature and fame like Rabindranath. This only shows how tradition and customs had their super-building power and influence on men, ignorant and enlightened alike" *[Journal of the Asiatic Society, L I No. 32009, pp 4-5, The Asiatic Society, I Park Street, Kolkata-700016]*

সতীদাহের যে প্রথা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের উচ্ছ্বাস ও রোমান্টিকতার দ্বারা আবিষ্ট হল তার পেছনে শাস্ত্রের সমর্থন আছে। সমর্থন এই রকম:

"স্বামী মরিলে পর যে স্ত্রী পতির জ্বলন্ত চিতায় আরোহন করে সে বশিষ্ঠের পত্নী অরুন্ধতীর সমান হইয়া স্বর্গে যায়। আর যে স্ত্রী ভর্তার সহিত পরলোক গমন করে সে মনুষ্যের দেহে যত লোম আছে তাহার সংখ্যার সাড়ে তিন কোটি তত বৎসর স্বর্গে বাস করে। সে পিতৃকুল, মাতৃকুল এবং স্বামীকুল এই তিন কুলকে পবিত্র করে।"

(তদেব)

দীনেশচন্দ্র সেনের 'রাণী কমলা' গল্পে একটি বোধকে ফিরে ফিরে এনেছেন লেখক। তা হল পাতিব্রত্য একটি জীবনমরণের ধর্ম— যে স্ত্রী জীবনে পতিব্রতা মরণেও তিনি পতিপ্রাণা। এই বোধ আমাদের শাস্ত্রের বোধ। কবি কালিদাস 'রঘুবংশ' মহাকাব্য রচনা করতে গিয়ে লিখলেন যে শব্দ এবং অর্থের মত নিত্যসম্বন্ধী যে হরপার্বতী যাঁরা জগতের পিতামাতা [জগতঃ পিতরৌ] তাঁদের আমি বন্দনা করছি। অর্থকে অন্তঃকরণে ধারণ না করলে শব্দ যেমন প্রাণিত হয় না এবং শব্দের অবয়ব না পেলে অর্থ যেমন ব্যর্থ,— ঠিক সেইরকমভাবেই হরপার্বতীর অবস্থান। একের অস্তিত্ব

অন্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, নিজস্ব কোন স্বার্থে নয়। বিশ্লেষহীন এই সংযোগ হিন্দুভারতের আবহমানের ধর্ম। মনে রাখতে হবে এই ধর্মের গূঢ় ব্যঞ্জনাকে দীনেশচন্দ্র তাঁর লেখায় ধরে রাখতে চেয়েছেন। রাণী কমলা কোন এক ব্যক্তি নন — দুই ব্যক্তি — শরীরী কমলা ও অশরীরী কমলা — প্রথমজন পতিব্রতা যিনি স্বামীর কুলকে উদ্ধারের জন্য ব্রত গ্রহণ করেন—দ্বিতীয়জন পতিপ্রাণা যার কোন ব্রত উদযাপনের বালাই নেই, আছে শুধু অতৃপ্ত প্রেমবাসনার নির্বাণহীন তাড়না। প্রথমজন স্পর্শগ্রাহ্য, দ্বিতীয়জন নয়। ধরণীর চলমান নারী সত্তা যখন চকিতে অধরা হয় তখন তাকে আপন আলিঙ্গনে ফিরে পাওয়ার যে উন্মাদনা পুরুষকে মথিত করে জানকীনাথ মল্লিক কমলার বিরহে তারই প্রকাশকে দেখিয়েছিলেন, আপন বিধানে বহন করেছিলেন তারই অস্থিরতা। জাগতিক প্রেমের নিয়মই তাই। রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণের নায়ক যেমন আবিষ্ট চেতনায় এক নির্বাক সুন্দরীর সাথে অভিসারে বসতেন এও অনেকটা তাই, স্ত্রীর বিরহে ব্যথাতুর রাজা সমস্ত অঙ্গে স্ত্রীর স্পর্শ পান, বিবিক্ত মুহূর্তে তাঁর কথা:

"শরীরের মধ্যে পাইতেছি রে
রাণীর অঙ্গের পরশন।"

রাজা তাঁকে ধরতে যান। তখনি শূন্যে বিলীন হন তাঁর স্বপ্নের নারী, "হস্তেতে ছিড়িয়া রইল অগ্নিপাটের শাড়ী।" এখানেই গল্পের শেষ নয়। এর পরেও রাজার সাথে রাণীর স্বপ্ন মিলন ঘটেছিল। রাজা রাণীকে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন, পারেন নি। রাণী ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন জলে, যে জলে তিনি প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন আগেই। রাজাও তাঁর সঙ্গ নিলেন। রাণীকে পেলেন না কারণ বৈদেহী নারীর কায়াহীন অস্তিত্ব অধরা। কিন্তু জলে রাজার ভাসমান নিষ্প্রাণ দেহ যখন তোলা হল তখন দেখা গেল রাজার মুষ্টিবদ্ধ হয়ে আছে 'রাণীর অগ্নিপাট শাড়ীর অঞ্চলের একটি অংশ"। গল্পের রোমান্স ঘনীভূত হয়েছে এইখানেই। দীনেশচন্দ্র লিখলেন:

সকলে বলিল, "এ শাড়ীর অংশ রাজা কিরূপে পাইলেন?" হয় তাঁহার মনের একাগ্রতা ও ভালবাসার আবেষ্টনীর মধ্যে রাণীর স্মৃতির এই অংশটুকু রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। এই বস্ত্রাংশ কোন তাঁতি বা জোলা তৈরী করে নাই। উহা তাহার মনের সৃষ্টি— প্রেম যে অমর তাহারই নিদর্শন। (পৃ. ২১)

রাণী কমলা গল্পটি পল্লীবাংলার কাব্যমননের অনবদ্য সৃষ্টি। এই গল্পের প্রথমাংশ যেখানে রাণী কমলা ও রাজা জানকীনাথের প্রেম উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে সেটি একটি পরিপূর্ণ ট্র্যাজেডি মাত্র। তারপরের অংশ যেখানে শিশু রঘুনাথ, ঈশা খাঁ এবং গারোদের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে সেখানে ট্র্যাজেডি নিষ্ক্রান্ত। ট্র্যাজেডির একটি বৈশিষ্ট্য হল তা রোমান্সের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলে। অ্যারিস্টট্‌ল্ তাঁর 'পয়েটিকস্' (Poetics) গ্রন্থে লিখেছিলেন যে ট্র্যাজেডির মূল কথা হল ভাগ্যবিপর্যয়— সৌভাগ্যের বিপরীত দশা *(reversal of fortune)* বা পতন *(downfall)*। ভাগ্যবিপর্যয় যখন ব্যক্তিবিশেষকে সাধারণ মানুষের সহনশীলতার বাইরে এক অতল বেদনার মাঝে তলিয়ে দেয়, পরিপার্শ্বে রেখে যায় শুধু এক বিধুর অনুভূতির কাতরতা, শুধু একটা করুণা (pity) আর ভয় (fear) তখন ট্র্যাজেডি তার পূর্ণতা পায়। দ্রষ্টারা স্রষ্টার নির্মমতায় আচ্ছন্ন থাকে। ট্র্যাজেডির সংজ্ঞায়

বলা নেই, কিন্তু পাঠকমাত্রই অনুভব করবেন যে মানব-মানবীর ক্রিয়াশীল আতিশয্যের অন্তরালে থাকে এক নৈর্ব্যক্তিক শক্তি যা জাগতিক অস্তিত্বে প্রবণতার সৃষ্টি করে, মানুষের আকুতিকে এক অন্ধ পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। ইতিহাসে এ ঘটনার অভাব নেই। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এর সবচেয়ে বড় মানবিক রূপ দিয়েছিলেন ভারত সম্রাট ঔরংজেব। যদুনাথ সরকার লিখলেন যে ঔরংজেবের সমস্ত জীবন এক দীর্ঘ ট্র্যাজেডি—এটি এমন এক মানুষের উপাখ্যান যিনি এক অমোঘ, অদৃশ্য নিয়তির বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন—এমন একটি গল্প এটি যেখানে সবচেয়ে শক্তিশালী মানবিক উদ্যোগ যুগশক্তির দ্বারা পরাভূত হয়ে যায়।

[The life of Aurangzib was one long tragedy,–a story of man baffling in vain against an inivisible but inexorable Fate, a tale of how the strangest human endeavour was baffled by the forces of the age" – *History of Aurangzib,* Val. V, M.C. Sarkar & Sons Ltd. P. I] ,

মানবিক প্রেমও অনুরূপভাবে ব্যর্থ হয়ে যায় ভাগ্যবিপর্যয়ে—ঐহিকের অনির্ণেয় শক্তির তাড়নায়। মনে রাখতে হবে যে অ্যারিস্টট্‌ল ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা নির্ণয় করার সময়ে ঐহিকের কোন অনির্দেশ্য পরিচালিকা শক্তির কথা বলেন নি। তিনি বলেছেন মানবিক ভ্রান্তিই, তার কোন একটি নিজস্ব পছন্দ, বা অপছন্দের সারি তাকে ভ্রান্ত পথে নিয়ে যায়। চরিত্রের এই বেদনার্ত ভ্রান্তি (tragic flaw) সেই পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যেখানে জন্ম নেয় ট্র্যাজেডি—মানুষের আপন কর্মফল — জীবনের ভ্রান্তিবিধুর বিপন্নতা। মানুষের মোহ, তার অহংকার, তার ঔদ্ধত্য, তার অনমনীয়তা, তার আনুগত্যহীনতা, অবাধ্যতা (disobedience), তার ধর্মীয় বা অন্য কোন উগ্রতা (fanatisms) , তার আত্মিক বন্ধ্যাত্ব (spiritual sterility) এবং মনোলোচনের অন্ধত্ব (mental blindness) —এ সবই তৈরী করে পাপ। এ সবই স্বেচ্ছাকৃত তাই তা পাপ— তা স্থান-কাল-পাত্র এই তিন মাত্রার সম্মিলিত আয়োজনে অধিষ্ঠিত থাকে ঘটনার কেন্দ্রে। তাকে প্রভাবিত করে, পরিচালিত করে, তাকে নিয়ে যায় এক অদৃশ্য খাদের দিকে যেখানে পতন অনিবার্য।

দীনেশচন্দ্র সেন বা তাঁর উল্লিখিত পল্লী কবিরা কেউ পাপের কথা বলেননি। দীনেশচন্দ্রের কাছে প্রেমের জন্য আত্মবিসর্জন, প্রেমের জন্য প্রাপ্য ও প্রাপ্তের সকল অধিকারকে ত্যাগ করা, ভোগের সম্ভাব্য সমস্ত আয়োজনকে অস্বীকার করা— এ হল এক উদ্বোধন যা জীবনের সময়লীন উপভোগের আনন্দকে নিয়ে যায় সময়ের পরপারে কোন শাশ্বত তৃপ্তির উল্লাসে—যাকে ইংরাজি ভাষায় বলা হয় from ephemerel joy to timeless ecstacy । এখন প্রশ্ন হল যে ট্র্যাজেডির নায়ক নায়িকা কি শুধুই নিজের দোষে নিপাতিত হয়? তবে 'মলুয়া' গল্পের নায়িকা মলুয়ার মৃত্যুর হল কার অপরাধে? নিঃসন্দেহে বাইরের কোন শক্তি যার বিরুদ্ধে মলুয়া লড়াই করতে পারে নি— স্বামীর অকর্মণ্যতা ও সুবিধাবাদিতা, পুরুষের (এ ক্ষেত্রে কাজি ও জমিদার) লোভ ও ষড়যন্ত্র, সমাজের কুটিলতা ও কুসংস্কার—এসবের বিরুদ্ধে একাকিনী নারী লড়বে কি করে? মানুষকে স্তিমিত করে দারিদ্র। দারিদ্রের দ্বারা পরাভূত হয় মানুষের তেজ, তার আত্মশক্তি। কাজির মুখোমুখী যে মলুয়া সে আত্মমর্যাদায়

উদ্দীপ্ত নারী— সাহস ও স্পর্ধায় বীরাঙ্গনা। সমাজের মুখোমুখী যে নারী সে অসহায়, দুর্বল—অনেকটা রামায়ণের সীতার মত। আর সপত্নীর মুখোমুখী যে মলুয়া? তাকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ সহিষ্ণু করে দেখিয়েছে। মধ্যযুগের বাংলার সামন্ততান্ত্রিক সমাজে নারীর শেষ মুক্তি মৃত্যুতে তা রাণী কমলাই হোক আর মলুয়াই হোক। মৃত্যুর মাঝে নিমজ্জমান মলুয়া সমাজকে উদ্দেশ্য করে বলে "কোন দোষের দোষী নয় আমার সোয়ামী"— "আপনারা আমার স্বামীকে কষ্ট দিবেন না।" তারপর সপত্নীর উদ্দেশ্যে বলে — "সুখে কর গৃহ বাস স্বামীকে লইয়া।" স্বামীকে বলা তার কথা:

"ঘরে আছে সুন্দরী নারী তার মুখ চাইয়া।
সুখে কর গৃহবাস তাহারে লইয়া।"

সংসার থেকে নারীর এই স্বেচ্ছাপসারণকে গল্পকার 'আত্মদান' বলে বর্ণনা করেছেন। এই আত্মদানের অন্তরালে কোন ভর্ৎসনা নেই। বাঙালি নারী ভর্ৎসনা জানে না। প্রেমহীন গার অবরোধে নারীর কোন রোদন-মথিত মুহূর্তের কথা এই রকম:

মিছে তর্ক — থাক্ তবে থাক্
কেন কাঁদি বুঝিতে পার না?
তর্কেতে বুঝিবে তা কি? এই মুছিলাম আঁখি,
এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভর্ৎসনা।।
[রবীন্দ্রনাথ, মানসী : নারীর উক্তি]

মলুয়া নিজেকে 'অভাগী' বলেছেন — 'অভাগীরে রাইখা তুমি আপন ঘরে যাও'। মলুয়ার স্রষ্টা চন্দ্রাবতীও নিজেকে 'অভাগিনী' বলেছেন—

বাড়াতে দরিদ্র-জ্বালা কষ্টের কাহিনী।
তার ঘরে জন্ম নিলা চন্দ্রা অভাগিনী।।

কি বাস্তবে কি গল্পে বাঙালি নারী বড়ই অভাগিনী—হয় সে ভালোবাসার শিকলে বাঁধা পড়ে পতিগৃহ ছাড়তে পারে না মলুয়ার মত, না হয়ত আবেগতাড়িত উচ্ছ্বাসে পতিগৃহ ছাড়ে 'আঁধা বঁধু'র রাজকন্যার মত। কিন্তু কোথাও তৃপ্তি নেই। প্রেমাস্পদের সঙ্গে স্থায়ী মিলনের সম্ভাবনা নেই, উপভোগের উল্লাস নেই, প্রাপ্তির সান্ত্বনা নেই। সংসারের ঘটমানতার ধারা জীবনসায়রের উজানি স্রোত হয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায় নারীকে—সংসার দাঁড়িয়ে থাকে পাড়ে, মলুয়ার মত সে ভেসে যায় অপ্রত্যাবর্তনীয় কোন এক অনির্দেশ্যের অগম গভীরে—কিংবা হয়ত রাজকন্যার মত স্রোতের অপসৃয়মান ধারায় ঝাঁপিয়ে পড়ে, হাওয়ায় ভাসে কালান্তরে অমোঘ আর্তি— "পরাণবন্ধু" লইয়া যাও মোরে'।

বর্তমান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে নারীর দুর্ভাগ্য ও লাঞ্ছনার জন্য সমাজকে, পুরুষের সৃষ্ট ব্যবস্থাকে অর্থাৎ পুরুষতন্ত্রকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় নি। সর্বত্রই দায়ী করা হয়েছে দৈবকে— মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা-কর্মকৃতি ও তার ফলাফলকে নয়। কাজলরেখা গল্পে শুকের কথায় সদাগর তার অপাপবিদ্ধ, নির্দোষ কন্যাকে বনের

নির্জনে একটি শবের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হলেন। পথি নারী বিবর্জিতা। সত্যি কি নির্মম সত্য এ প্রবচন। নিজের পাপস্খালনে সদাগরের আত্মভাষণ এ ক্ষেত্রে কি ভয়ঙ্কর আত্মপ্রবঞ্চনাময়— "আমি ভাল বরে বিয়া দিতে চাহিয়াছিলাম, দৈব প্রতিবাদী হইয়াছেন। এখন ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া এই মৃত কুমারের সঙ্গে আমি তোমার বিবাহ দিয়া গেলাম।" "এই মৃত কুমারই তোমার স্বামী... কপালে সিন্দুর রাখিও এবং হাতের শাখা ভাঙ্গিও না" (পৃ. ৩৩)। মৃতের সাথে বিবাহ হয়েও হাতে শাখা, কপালে সিন্দুর — দ্বাদশবর্ষীয়া, জীবনবসন্তের সমাগমে স্ফুটনোন্মুখ, অনভিজ্ঞা কিশোরীকে নিয়ে জীবন দেবতার এ কি পরিহাস! কন্যা কাঁদে, পিতার সামনেই বিলাপ করে, পিতাকেই উদ্দেশ্য করে বলে

বনের যত তরুলতায় দেখহ জিজ্ঞাসি।
বাপ হৈয়া কন্যাকে কে করেছে বনবাসী।।
চা'র যুগের সাক্ষী ঐ চন্দ্র-সূর্য-তারা।
ধর্ম্মের প্রধান খুটি ধর্ম্মের পাহারা।।
জিজ্ঞাসা করহ বাবা ইহাদের স্থানে।
বাপ হৈয়া কন্যাকে কে দিয়াছে গো বনে।।

নিষ্ফল এ কান্না, দৈবের নির্দয় শাসনে বলি প্রদত্ত নারীর বেদনা কোন মানবিক ব্যঞ্জনায় ধ্বনিত হয় না, শুধু এক অ-মানবিক পরাক্রমের পায়ে দলিত মানুষের অশ্রুত বিলাপ হয়ে বাজতে থাকে। কি না সহ্য করেছেন এ কাজলরেখা— প্রবঞ্চনা, শত্রুতা, তিরস্কার, মর্যাদার অবনমন, সমাজ- কলঙ্ক, নির্বাসন, প্রলুব্ধ পুরুষের কামনা, আরও কত কি — সবকিছুর মধ্য দিয়ে গিয়েও কাজলরেখা সতী-সাধ্বী, নিষ্কলঙ্ক, স্থির—বঙ্গনারীর আর্দশ মডেল— লেখকের ভাষায়— "বঙ্গনারীর চরিত্রে যে কী মাধুরী. কি ধৈর্য্য, কি আত্মবিলোপী পরার্থপরতা ও সর্ব্বংসহা ক্ষমা বিদ্যমান — তাহা এই চিত্রে একাধারে বিরাজিত।" (পৃ. ৪৮) শেষ পর্যন্ত কাজলরেখা কি সুখ পেলেন, তার পতিপ্রেম কি সার্থক মিলনের মধ্য দিয়ে আপন চরিতার্থতাকে খুঁজে পেল? এ প্রশ্নের উত্তর নেই। আমরা কাজলরেখাকে দেখি ভ্রাতৃ-আলয়ে আর তার স্বামী সূঁচ রাজা সম্বন্ধে লেখক বলেন— "সূঁচ রাজা তাহার হারানো ধন পাইয়া পরম হৃষ্টচিত্তে গৃহে ফিরিলেন" (পৃ. ৫৭)। গল্পের পরিণতি প্রেমে নয়, ধন প্রাপ্তিতে— স্ত্রীধন প্রাপ্তির হৃষ্টতায়। মানবীরূপে নারীর সার্বভৌমত্ব এখানে কোথায়? এ গল্পের উদ্দেশ্য দুটি— এক, দৈবের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা এবং দুই, বাঙালি নারীর শাঁখা-সিঁদুরে 'অভিমান'কে এক চিরস্থায়ী বন্দনায় অভিষিক্ত করা— লেখকের ভাষায় "...অনুকূল গ্রহের বিধানে হয়ত আমাদের রমণী সমাজে আবার সেইরূপ শাঁখা সিন্দুরের অভিমান ফিরিবে..." (পৃ.৬২)

এই গ্রন্থের গল্পগুলিতে প্রেম ও ভালোবাসার নাম করে এমন অনেক মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হয়েছে যা প্রগতিশীল সমাজ প্রকল্পে গ্রাহ্য নয়। গার্হস্থ্যের অবস্থানে নারীর একনিষ্ঠতাকে রোমান্টিক মাল্য চন্দনের অর্ঘ্য দিয়ে সেবা করলেই নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় না। তার জন্য প্রয়োজন নারীর শৃঙ্খল ছেদন— সমাজব্যবস্থায় নারীর পূজনীয়

ও নিন্দনীয় এই দুই কল্প অবস্থানের বাইরে তার মানবীরূপের সংস্থাপন। এইখানে উপস্থাপিত গল্পগুলির বহুস্থানেই নারী নিজেকে 'দাসী' রূপে চিহ্নিত করেছে। এর বিপরীতে গল্পকার তাঁর সমস্ত আলোচনায় নারীকে দেবীরূপে সংস্থাপিত করার চেষ্টা করেছেন। মধ্যযুগে, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় নারীর যে রূপ প্রচলিত ছিল তা অন্তর্বদ্ধ অর্থনীতির অনুষঙ্গে অর্থবহ, ও গ্রাহ্য বলে প্রতীয়মান হত। আজকের দিনে তার অন্তর্লীন অনুভূতিকে আরও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বুঝতে হবে। এখানে অনেক নারী চরিত্র আছে যা জীবনের নোঙরহীন ভেসে বেড়ানোর চরিত্র— কাজলরেখার মত — স্মরণীয় তার সেই কথা:

"আসমানের মেঘ যেন ভাসিয়া বেড়াই"।। (পৃ. ৩৮)

কাজলরেখা, চাকলাদারের কন্যা কমলা, ধোপার কন্যা কাঞ্চনমালা এরা সবাই এই আসমানের মেঘ, দৈব তাদের তাড়িয়ে বেড়ায় দিগ্বিদিকের সীমাহীন শূন্যতায়। নারী যদি আপন অন্বেষণে স্থির থাকেন, যদি প্রেমের মগ্নগভীরে সত্যসুন্দরের উদ্বোধনকে দেখতে চায়, যদি নিজের বঞ্চিত, ব্যথিত, বিড়ম্বিত জীবনের মধ্যেও কোন গভীরতর সাধনায় একান্তে বাঁচিয়ে রাখে নিজের প্রেমকে তবে কি দৈব থেকে অব্যাহতি পায় তার ভাগ্য? চন্দ্রাবতীর সামনে কিভাবে উদযাপিত হল তার জীবনের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত মুহূর্তটি? প্রেম এল — নারীর শ্রবণে গেল না তার পদধ্বনি। রুদ্ধকপাটে পড়ল আঘাত — অনুতপ্ত পুরুষের করধ্বনি। চন্দ্রাবতী জানলেন না। কাল বৈগুণ্যে বিলম্বিত হল তার বাইরে আসা। দৈবের অর্ন্তঘাতের মধ্য দিয়ে রচিত হল ট্যাজেডির পরিণতি ঃ

"সহসা দেখিলেন, নদী-তরঙ্গ উজানের দিকে বহিতেছে, সেখানে জনমানব নাই ঃ—
একেলা জলের ঘাটে সঙ্গে নাই কেহ।
জলের উপরে ভাসে জয়চন্দ্রের দেহ।।
দেখিতে সুন্দর কুমার চাঁদের সমান।
ঢেউএর উপর ভাসে পৌর্ণ মাসীচাঁদ।।
আঁখিতে পলক নাই। মুখে নাই বাণী।
পারেতে দাঁড়াইয়া দেখে উন্মত্তা রমণী"।।

'উন্মত্তা' শব্দটি এখানে গুরুত্বপূর্ণ। কবি নয়নচাঁদের কথা থেকে গ্রহণ করে গল্পকার জানিয়েছেন যে যোগাসনে বসে চন্দ্রাবতীর মনস্তত্ত্বে রূপান্তর ঘটেছিল। গল্পকার লিখলেন:

"যোগাসনে বসিয়া চন্দ্রা ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিলেন, মনের দ্বার রোধ করিলেন, তাহার চোখের জল শুকাইয়া গেল। ধীরে ধীরে সংসারের সমস্ত ব্যাপার হইতে মন সরাইয়া লইয়া তিনি যে রাজ্যে প্রবেশ করিলেন, তাহা অবিচলিত শান্তির রাজ্য, তাহার অন্তরের সমস্ত তোলপার থামিয়া গেল। শৈশবের কথা মন হইতে মুছিয়া গেল, এমন কি জয়চন্দ্রকেও তিনি ভুলিয়া গেলেন ঃ-" (পৃ. ১৩৪)

এমন নির্বিকার মগ্নযোগিনী 'উন্মত্তা রমনী'তে পরিণত হলেন। প্রেমের দ্বান্দ্বিকতার প্রকাশ এইখানেই। লোকায়তের প্রেম লোকোত্তরের সাধনাকে ছাপিয়ে গেল। 'হিন্দুর

অধ্যাত্মিকত্ব' যাকে গল্পকার এ গল্পের বৈশিষ্ট্য বলেছেন তা ম্লান হয়ে যায় লোকায়তের উজ্জীবনে। মন্দির কপাটে রক্তাক্ষরে চিহ্নিত প্রেমের ইস্তাহার স্মৃতির বারুদে জুগিয়েছিল স্ফুলিঙ্গ, প্রেমের অগ্নি-উদ্দীপনায় চঞ্চল হয়েছিল সুপ্ত ধমনীর রুধিরধারা, যোগিনী হয়েছিলেন পাগলিনী। কিন্তু এ প্রেম মিলনে চরিতার্থ হওয়ার নয়। নারীকে তাই ধরে রাখে পারের অবনী, দয়িতের দেহ ভাসিয়ে নেয় উর্মিমুখর স্রোতস্বিনী। এটি একটি পারফেক্ট ট্র্যাজেডি (perfect tragedy) — যার পরিণতিতে আছে বিপর্যয়—disaster — আর disaster হল সেই পরিণামের ঘটনা যেখানে বিরহের রস ঘনীভূত হয়ে অন্তিমের করুণাকে অনপনেয় করে তোলে। চন্দ্রাবতী নিজেতে নিজেই মগ্ন ছিলেন—ইন্দ্রিয়াতীত ধ্যানে যেখানে চৈতন্যের বিলোপ ঘটে সেখানে প্রেম ধরা দেবে কি করে? দয়িতের শেষ সম্ভাষণে প্রেমের যে নিগূঢ় ডাক ছিল, বর্ষা বিস্ফারিত নদীর যে বেগবান ধারা নিয়ে তা রুদ্ধ কপাটে করাঘাত করেছিল, তার উচ্ছ্বাস, তার আতিশয্য, তার উতরোল আবেগ সবই ব্যর্থ হল। চন্দ্রাবতীর সাড়া পাওয়া গেল না। অপটু আঙ্গুলে একতাল পলি যেমন ব্যর্থ শ্রুতিরুদ্ধ কানেও সে রকম প্রেমের আহবান ব্যর্থ। অনুতপ্ত জয়চন্দ্র চন্দ্রাবতীকে যা লিখেছিলেন তা বাংলা সাহিত্যে অনাস্বাদিত প্রেমের রত্নখণি হয়ে আছে। তিনি লিখেছিলেন:

> "একবার দেখিব তোমায় জন্মের শোধ দেখা।
> একবার দেখিব তোমার নয়ন ভঙ্গী বাঁকা।।
> একবার শুনিব তোমার মধুরস বাণী।
> নয়ন জলে ভিজাইব রাঙ্গা পা দুখানি।।
>
> (পৃ. ১৩২)

মনের রঙে রাঙানো দয়িতার 'পা দুখানি'—এ যেন সাঁঝের বেলায় কুঞ্জলতার আড়ালে রাধিকাকে বলা কৃষ্ণের কথা— 'মম শিরসি মন্ডনম্। দেহি পদপল্লবমুদারম্" (গীতগোবিন্দ) — তোমার উদার পদপল্লবের একটু স্পর্শ আমায় দাও তা আমার শিরের ভূষণ হয়ে থাকবে। জয়চন্দ্র বল্লেন:

> না ছুঁইব, না ধরিব দূরে থেকে দেখব।
> পুণ্যমুখ দেখি আমি অন্তর জুড়াব।।
> শিশু কালের সঙ্গী তুমি যৌবন কালের মালা।
> তোমারে দেখিতে মন হইয়াছে উতলা।।

'রাণী কমলা' উপাখ্যানে রাজা জানকীনাথ তাঁর বিদেহী স্ত্রীর স্পর্শ চেয়েছিলেন— চেয়েছিলেন তাঁকে ছুঁতে। চন্দ্রাবতী উপাখ্যানে জয়চন্দ্র চন্দ্রাবতীকে ছুঁতে চাননি — যৌবনের স্মৃতি সিক্ত অধরা প্রেমের মালাকে গলায় ধারণ করে বিবাগী মনের বাসনাকে মেটাতে চেয়েছিলেন— এ যেন সেই আর্তি 'চরণ ধরিতে দিয়োগো আমারে নিয়ো না, নিয়ো না সরায়ে,— জয়চন্দ্রের কথা ঃ 'জন্মের মতন হইলাম বিদায় ধরিয়া চরণে'। (পৃ ১৩২) দয়িতার চরণস্পর্শে আর্তিমোচনের এমন কথা বাংলা সাহিত্যে বড় বেশি নেই। নারী এখানে

যতখানি পুরুষের আকাঙ্ক্ষার বিষয় তার থেকে অনেক বেশী তার আরাধনার পাত্রী— আরাধনার সেই রাধা যে রাধার চরণতলে বসে পড়া কৃষ্ণ তাঁর উদার পদপল্লবের স্পর্শ চেয়েছিলেন। কৃষ্ণ-রাধার মিলনের শিহরণ এখানে নেই — আছে শুধু অনুতাপ-জর্জর পুরুষের বিরহে ধ্বনিত প্রেমের রোদনসঙ্গীত।

কথা হচ্ছে এই যে প্রেম তা ব্যর্থ হয়ে গেল কেন? চন্দ্রাবতীকে নিজের মন অর্গলবদ্ধ করতে শিখিয়েছিলেন তার পিতা বংশীদাস— কন্যাকে তিনিই বলেছিলেন— "সমস্তই দৈবের বিধান বলিয়া জানিবে।" (পৃ. ১৩৩) দৈবের এই বিধানই কি গল্পের পরিণতি? জয়চন্দ্র যাকে যৌবনের মালা বলেছিলেন সে ত বরণের মালা হয়ে ফিরল না। ফিরতেই পারত, কারণ জয়চন্দ্রের চিঠি পড়ে চন্দ্রাবতীর 'নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত অবিচলিত সংযম ও ধৈর্য্য টুটিয়া গেল।' (পৃ. ১৩৩) কবি লিখলেন:

"পত্র পড়ি চন্দ্রাবতী চোখের জলে ভাসে" (পৃ ১৩২)

এই অশ্রুসর্বস্বতায় প্রেমের ভেলা ভাসে— দৈব কথা বলে মানুষের মুখে — এক্ষেত্রে বংশীদাস, অন্যক্ষেত্রে কাজলরেখা উপাখ্যানে সন্ন্যাসী যিনি বলেছিলেন ঃ "জানিও কপালের দুঃখ জোর করিয়া কেহ খন্ডাইতে পারে না," অতএব "জোর করিয়া কপালের দুঃখ খন্ডাইতে যাইও না"। (পৃ. ৩৪-৩৫) 'রূপবতী'র উপাখ্যানে

"মদন রূপবতীকে শোকার্ত দেখিয়া বিনীতভাবে বলিল—

তুমি কেঁদ না লক্ষ্মী— দৈবের অভিশাপে তুমি আমার হাতে পড়িয়াছ। তুমি ত যজ্ঞের ঘৃত, এই কুকুরের হাতে সমর্পিত হইয়াছ। আমি চন্ডাল অপেক্ষাও নিচু, তুমি গঙ্গাজল হইতেও পবিত্র। 'না ধরিব, না ছুঁইব তোমার চরণখানি"। (পৃ. ১৫১)

জয়চন্দ্রের 'না ছুঁইব, না ধরিব' এবং মদনের 'না ধরিব, না ছুঁইব'— একই রকম জবানবন্দী, অসহায় পুরুষের আত্মলোপী অঙ্গীকার। ললনার লাঞ্ছনা দৈবের অভিপ্রায়, কোন পুরুষকার জয় করতে পারে না দৈবকে — পুরুষের দুর্নিবার বন্ধন-অসহিষ্ণু প্রেম দৈবের কবল থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে না নারীকে— পুরুষের দ্বারা অ-বিজিত নারী তাই থেকে যায় দৈবলাঞ্ছিত — সে শরীরের সম্ভ্রম রক্ষা করে ছলে ও কৌশলে, অস্তিত্বের সার্বভৌমত্ব কোন দিনও তার অভিজ্ঞতায় ধরা দেয় না। তাই তার চূড়ান্ত মর্যাদার রূপ পরিণতি পায় এই বাক্যে যে সে যজ্ঞের ঘৃত, অগ্নি প্রজ্বলনের ইন্ধন। অপ্রাপ্তির মুহূর্তে আকুতির আগুন হোমানলে পরিণত হয়, আর তখনই সংসার-বহ্নির ধূমরাশির আবিলতা থেকে মুক্ত নারীর মুখ অভ্যর্থনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, রূপসীর রাঙা পা কমলাসনার রাতুল চরণে পরিণত হয়। বঞ্চিত নারীর কথা সাহিত্যে যত গভীরতা, যত দরদ, যত রোমান্টিকতার মধুরসে সিঞ্চিত করে দেখা হয়, বঞ্চিত পুরুষের কথা ততটা আবেগের সঙ্গে স্থান পায় না। গ্রাম্য কবিদের কেউ কেউ এর অন্যথা করেছেন। এইখানেই তারা অভিবাদনযোগ্য।

পূর্বরাগের ব্যঞ্জনায় কখনো কখনো কবিরা ক্ষণস্থায়ী বিরহের তাড়নাকে বিধুর অথচ মদির করে আঁকেন। 'চাকলাদারের কন্যা'য় কবির এরকম ব্যঞ্জনা ভাষা পেল এই এইভাবে:

"এইরূপে কুমার যে প্রতিদিন আসে।
বিফল হইয়া ফিরে আপনার বাসে।।
অন্তর গোপন কলি নাহি ফুটে মুখ।
ভৃঙ্গ যেমন উড়ি যায় পাইয়া মন দুঃখ।।
(পৃ. ৮২)

কবির কথাকে ছাপিয়ে গেছে গদ্যকারের বর্ণনা ঃ

"ভ্রমর উষাকালে একবার কুঁড়ির কানে কানে প্রেমের কথা গুঞ্জন করে, কিন্তু কুঁড়ি ফোটে না, পুনরায় ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে এবং সেইরূপ চেষ্টা করে — কিন্তু কুঁড়ি বাতাসে মাথা হেলাইয়া — তাহাকে বিদায় করিয়া দেয় — সে ফোটে না। কুমারের সেই অবস্থা।" (পৃ. ৮২)

বিরহ শুধু মানুষের জন্য মানুষের হয় তা নয়। বস্তুর জন্যও বিরহ আসে, আসে প্রকৃতির জন্য। বস্তু হতে বিচ্ছিন্ন মন, প্রকৃতি হতে নির্বাসিত মানুষ — এ সবই বিরহের উপাদান যোগায়। উদাহরণ 'কাঞ্চন' গল্পের এই কবিতা:

"রাত্রি না পোহালে দেখব খুয়া নদীর ঘাট।
রাত্রি না পোহালে দেখব শালী ধানের মাঠ।।
রাত্রি না পোহালে দেখব তোমার আমার বাড়ী।
রাত্রি না পোহালে দেখব পাড়ার নর নারী।।
রাত্রি না পোহালে শুনব অইনা পাখীর গান।
রাত্রি না পোহালে দেখব ভোরের আসমান।।
রাত্রি না পোহালে দেখব সেই না বাগের ফুল।
জন্মের মত ছাড়ি আইলাম মা বাপের কুল।। (পৃ. ১০৬)

বস্তু, প্রকৃতি কোন কিছুর জন্য বিরহ মর্মলোকের অতলান্তকে ছুঁতে পারে না, যা পারে মানুষের জন্য মানুষের বিরহ। নিরুদ্দেশে উধাও রাজকুমারের জন্য কাঞ্চনের যে বেদনা তার তল কোথায়, কোথায় তার সান্ত্বনা, কোথায় সেই যোজন যোজন ব্যাপী ধ্বনিত রোদনের পরিসমাপ্তি? অবুঝ মন ছলনা বোঝে না, বঞ্চনা বোঝে না, ভাবে "আমার জন্য আমার বঁধু হীরামতির ফুল আনিবেন, আমি অতি দুঃখিনী, আমি কৃতজ্ঞতায় ও স্নেহে গলিয়া যাইব, প্রতিদানে তাঁহাকে কি দিব? আমার কিছু নাই, এই দুঃখিনীর সম্বল দুটি চোখের জল — তাহাই মূল্য স্বরূপ দিব।"

"আমার লাইগা আনবে বঁধু হীরা-মতির ফুল
দুই ফোঁটা চক্ষের জল দিব সে ফুলের মূল।

লক্ষণীয় যে বহু গল্পে প্রেমের মূল আধার দারিদ্র ও রূপ। রাজকুমার, কাজী, সদাগর, কারকুন, জমিদার — কত বিত্তশালী, ক্ষমতাবান মানুষদের আনাগোনা এই সমস্ত গল্পরাজিতে, কিন্তু দরিদ্রের আঙিনাতেই চোখ মেলে প্রেমের ফুল্ল কুসুম, মদির হয়ে ওঠে গল্পের অনেক

সুরভিত মুহূর্ত, সাধারণ নারীও রাঙা রাজকন্যার রূপ নিয়ে আঁচল বিছিয়ে বসে পাঠকের মনে। কিন্তু তার আগে তাকে পরীক্ষা দিতে হয়, তার প্রেমের অগ্নিপরীক্ষা। কবিরা তাকে দাঁড় করিয়ে দেন নীড়ভাঙ্গা ঝড়ের মাঝে, তীরভাঙ্গা ঢেউয়ের মুখে — পুরুষের কামনা, রোষ, মিথ্যাচার, লোভ, ষড়যন্ত্র, প্রলোভন সমস্ত কিছুকে নারী জয় করে তার নিষ্কলুষ সত্তার সংগোপন সাধনা দিয়ে — তার ধৈর্য, ক্ষমা, তিতিক্ষা, ত্যাগ, শিষ্টাচার, শ্রম ও নিষ্ঠা দিয়ে — প্রয়োজনে ছলনা, চাতুর্য, চাটুকারিতা দিয়ে — শেষ পর্যন্ত তার একক প্রেমের তপস্যা দিয়ে — তার অশ্রু আর অপেক্ষা দিয়ে। ঘর-পুরুষের আতিশয্যে পরপুরুষে অনাগ্রহ — প্রেমের এমনতর নিষ্ঠাও নারীর রক্ষাকবচ হয়ে দাঁড়ায়। 'তিলক-বসন্ত' গল্পে রাণীর উক্তি স্মরণীয় ঃ

"রাণী বিপদে পড়িয়া কর্ম্ম-পুরুষের নিকট প্রার্থনা করিলেন — 'এই পুরুষগুলি আমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে, হে দেবতা তুমি কুড়কুষ্ঠ দিয়া আমার রূপ ধ্বংস কর, আর যেন কেহ আমার না ছোঁয়'।" (পৃ ১৭১)

নারীর শারীরিক শুচিতা প্রেমের পবিত্রতা রক্ষা করে। গল্পরসকে মদির করার জন্য তার প্রয়োজন। দেহের শুচিতা ও প্রেমের পবিত্রতা রক্ষায় নারী নিজের রূপকে বিসর্জন দেয়। এ বড় কম কথা নয়। প্রশ্ন জাগে কে 'কি দোষে ভাগ্যহীন, রাজ্যহীন, অভাগীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ হইতে [তাহাকে] বঞ্চিত করিল?', সে কি মানুষ, না কর্ম্মপুরুষ যাকে গল্পের রমণী ' হে দেবধর্ম্ম' বলে সম্বোধন করেছে (পৃ. ১৭১)? এ গ্রন্থে উল্লিখিত কোন গল্পেই কোন পরিণামের জন্যই মানুষকে দায়ী করা হয় নি। কোনও অঘটন যে মানুষের কর্মফল জনিত এমন ইংগিতও দেওয়া হয়নি। অথচ এক অলক্ষ্যচারী শক্তির অপ্রত্যক্ষ উপস্থিতি সর্বত্র বিরাজমান একথা পাঠক উপলব্ধি করতে পারবেন। মানবিক প্রেমের অন্তরালে এক দৈব দ্যোতনা যে বিরতিহীন তাড়নার কাজ করে তা কোন কবিই অস্বীকার করতে পারেন না। তাই 'তিলক বসন্ত' গল্পে নারীর রোদন মথিত প্রার্থনা জানায় 'কর্ম্মপুরুষ'কে, আর সে প্রার্থনা মঞ্জুরও হয় ঃ 'কর্ম্মপুরুষ তাঁহার কথা শুনিলেন, তাঁহার প্রার্থনায় তাঁহাকে কুষ্ঠ রোগ দিলেন। তাঁহার রূপের বনে আগুন লাগিল, তাঁহার হাত পা খসিয়া পড়িতে লাগিল'... (পৃ. ১৭১)। কর্ম্মপুরুষ-ভাগ্যবিধাতা কি এত নির্দয়? হতেই হবে তাঁকে— অথচ নারীর অন্তরে কর্মপুরুষ ভরে দেন সেই আত্মা যার সৌন্দর্য অভ্যন্তরের অনির্বাপিত, দ্যুতি হয়ে বিরাজ করতে থাকে।

কবিদের কথিত গল্পগুচ্ছে নিয়ন্ত্রক হল দৈব এবং নিসর্গ, মানুষ সেখানে ক্রীড়নক। নারী সেখানে সাক্ষী মানে দৈবকে আর নিসর্গকে, মানুষ সেখানে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আহূত হয় না। দৈব দুর্বিপাকে নারীর আশ্রয় আপাতভাবে মানুষ হলেও শেষপর্যন্ত প্রকৃতি কিংবা মানুষের বাইরে অতিপ্রাকৃত অন্য কিছু। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ 'চাকলাদারের কন্যা' গল্পের এই অংশটি ঃ

'রাজসভার এক কোণে দাঁড়াইয়া কমলা তাহার দুঃখের কথা নিবেদন করিতেছে, তাহার

আর্ত কণ্ঠের ধীর ও করুণ সুরে ধর্ম্ম-সভা নিস্তব্ধ হইয়া গেল। 'অভাগিনীর দুঃখের কথা আপনারা শুনুন' এই বলিয়া কমলা চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-উপগ্রহদিগকে সাক্ষী মানিয়া, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গকে সাক্ষী করিয়া বলিল, 'আমার সাক্ষী ইহারা — ইহারাই সকল জানে', অদূরে রক্ষাকালীর মন্দির, — যোড় হস্তে মন্দিরকে প্রণাম করিয়া বলিল, 'মা আমার প্রতি গৃহে প্রতি ঘটে আছেন — সেই জগন্মাতা আমার সাক্ষী।' কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবতাকে কমলা সাক্ষী মান্য করিল। যে অগ্নি মানুষের সর্ব্বকার্য্যের সহায় — যে জল মানুষকে জীবিত রাখিয়াছে — সেই সর্বত্র পূজিত জল ও অগ্নিকে কমলা সাক্ষী মান্য করিয়া বনের অধিষ্ঠাত্রী বন-দেবতাকে প্রণাম করিল।" (পৃ. ৮৪)

এখন পর্যন্ত কমলার বচনে প্রবচনে কোন মানুষের উল্লেখ নেই। আর নেই বলেই সেখানে অশ্রু-সিক্ত মানবতার উদযাপনও হয়নি। তা হল পরে যখন কমলা দৈব ও প্রকৃতির অবলম্বন ছেড়ে মানুষের অভিমুখী হল ঃ

"দেবতাদিগকে ও আকাশ ও পৃথিবীর সকল প্রাণীকে কমলা ধর্ম্মসভায় সাক্ষী মান্য করিয়া পিতা ও মাতাকে সাক্ষী করিল এবং প্রাণের ভাই সুবলকে সাক্ষী মান্য করিবার সময় চোখের জলে ভাসিতে লাগিল।" (পৃ. ৮৪)

প্রাণিত আবেগের উৎস মানুষ — মানুষের সাথে জৈব বন্ধনে উৎসারিত হয় প্রেম রসের প্রস্রবণ। কিন্তু সামন্ত সমাজে মানুষ স্বরাট, সার্বভৌম নয়। তাই মানুষকে ছাড়িয়ে যায় পরিশেষের লক্ষ্যবস্তু — অতিলৌকিক, অতিপ্রাকৃত, অলৌকিক অন্য কিছু — অন্য কোন দূরের শক্তি ঃ

"পরিশেষে সন্ধ্যাতারাকে সাক্ষী করিয়া বলিল ঃ তুমি জগতের সকল বস্তুর দিকে চাহিয়া আছ, আমার সমস্ত কাজ তুমি নির্ব্বাক দৃষ্টিতে দেখিতেছ; হে মৌন দ্রষ্টা, তুমি আমার সাক্ষী। আমার চোখের জল আমি রোধ করিতেছি না, ইহাকেই আমি সাক্ষী মান্য করিতেছি, আমার অন্তরের বেদনা ও অকপটতার ইহা অপেক্ষা বড় সাক্ষী নাই।" (পৃ.পৃ. ৮৪-৮৫)

প্রেমের বন্দনায় প্রকৃতি আবহ সৃষ্টি করে, সমারোহের আয়োজন করে, কিন্তু মানুষকে ছাপিয়ে প্রেমের উপজীব্য হতে পারে না। তাই শেষ পর্যন্ত যা কিছু আছে সব ছেপে, জীবন ঝেপে, ভুবন ব্যেপে দাঁড়িয়ে থাকে মানুষ, নারীর আন্তরিক আকাঙক্ষার অভিমুখ — তাই সে সর্বশেষের সাক্ষী —

"সর্ব্বশেষ সাক্ষী আমার রাজার কুমার।
যাহার কারণে আমি পাইলাম নিস্তার।। (পৃ. ৮৪)

কবির কথার পর গল্পকারের সংযোজন ঃ "ইনি শুধু আমার প্রাণ দাতা নহেন, ইনি আমার প্রাণের দেবতা।" (পৃ. ৮৫) ভারতীয় কাব্যে প্রাণনাথ পুরুষকে নারীর সম্ভাষণ এই রকম ঃ 'তুমিই আমার জীবন, তুমিই আমার ভূষণ, তুমিই আমার ভবজলধিতে রত্নস্বরূপ' (কবি জয়দেব বিরচিত 'গীতগোবিন্দ')

এই গ্রন্থে বর্ণিত গল্পগুলির একটি বৈশিষ্ট্য হল যে এখানে কোন হিংসা ও প্রতিহিংসার

স্থান নেই। পুরুষের দ্বিচারিতা, নারীর বিশ্বাসঘাতকতা, সমাজের প্রবঞ্চনা কোন কিছুই' নারীকে প্রত্যাঘাতের হিংস্রকামনায় উদ্বেল করেনি। 'কাঞ্চন' গল্পে কাঞ্চনমালার পরিণাম কি বিধুর, কি মর্মান্তিক, তবুও পরিশেষে তাতে কোন প্রতিহিংসা নেই।

"একদিন সকলে দেখিল যে সে রাজঅন্তঃপুরে ঢুকিল; পালঙ্কে রুক্মিণী বসিয়াছিল, খানিক স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। বাহিরে আসিয়া দেখিল, রাজকুমার দরবারে আসীন, তাহার রূপ চাঁদের মতন আরো বেশী ঝলমল করিতেছে। সেইখানে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া পাগলী চলিয়া গেল। কোথায় সে গেল, আর কেহ জানে না, তদবধি তাহাকে সে রাজ্যে আর কেউ দেখিতে পাইল না।" (পৃ. ১১৬-১১৭)

রাজকুমারের প্রবঞ্চনা, রাজকুমারী রুক্মিণীর ষড়যন্ত্র কোন কিছুই এক সামান্যা নারীর অসামান্য প্রেমকে প্রতিহিংসার পথে নিতে পারল না। বাঙালি নারীর সার্থকতা এইখানে। আত্মবিলোপের নির্মম পরিণতিকে মেনে নিয়ে সে আত্মাহুতি দেয় নদীর জলে। তার বেদনার্ত, হৃতশ্রী জীবনের শেষ জবানবন্দী সে দিয়ে যায় নদীকে, কোন মানুষকে নয় ঃ

"নদীতীরে বসিয়া কাঞ্চন বলিল, 'নদী! আমি তোমার ক্রোড়ে স্থান পাইতে আসিয়াছি। আমি যে মরিতেছি তাহা যেন কেহ জানে না, তোমার ঢেউগুলি যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে কথা প্রচার না করে। হে টুনটুনি পাখি, নদীর চরার হলদে পাখী, তোমরা আকাশে উড়িয়া আমার মৃত্যুর কথা কাহাকেও বলিও না। হে আকাশব্যাপী বাতাস, জল-স্থলের সকল কথা তুমি জান, আমার কলঙ্কের কথা তুমি সবই জান, কাহারো কানে কানে আমার মৃত্যুর কথা বলিও না, তুমি রাত্রির সাক্ষী, দিনেরও সাক্ষী, সকলই তুমি জান, আমার মৃত্যুর কথা গোপন রাখিও।' (পৃ. ১১৭)

পদাহত প্রেমের লাঞ্ছনা, প্রবঞ্চিত প্রেমের বেদনা গোপন থেকে যায় মানুষের কাছে, শুধু নিসর্গের অন্তর্লোক থেকে উত্থিত পবন মর্মরে, জলের কলধ্বনিতে, পাখীর গুঞ্জনে তা যুগান্তরের ব্যর্থ মানবের নীরব ক্রন্দনের আবহ রচনা করে। এমন আক্রোশহীন ব্যর্থ প্রেমের সন্তাপ নদীর মতই বহতা ধারায় অনন্তের অভিমুখে চলে। 'নদী নীরবে সমুদ্রের দিকে চলিয়াছে' — এ সন্তাপের ধারাও যেন সমুদ্রগামী —সেই অনন্তের দুস্তর পারাবারে মেশে যেখানে সংসারের আনন্দ লহরী আড়াল করে রাখে বেদনার ফল্গুধারা।

দীনেশচন্দ্র সেন একবার লিখেছিলেন ঃ "...পল্লীগ্রামের স্বভাবসিদ্ধ ছায়ায় অনেকগুলি কলকণ্ঠ কবির আবির্ভাব হইল।" (দীনেশচন্দ্র সেন, **বঙ্গভাষা ও সাহিত্য**, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৫৩০) বাংলার স্বভাবসিদ্ধ ছায়ায় কবিকণ্ঠে কোন রূঢ়তা নেই। হিংস্রতা তাই সেখানে অনুপস্থিত। কলকণ্ঠে প্রেম নিনাদিত — ভাবের মাহাত্ম্যে, প্রকাশের বৈচিত্র্যে, কথার ব্যঞ্জনায় সে প্রেম কি অমেয় মাধুরীকে বহন করছে তা কবিদের কাব্যগাথা, গল্পকারের অনবদ্য গদ্য রচনায় বার বার ধরা পড়েছে। বাঙালি কবির কবিত্বশক্তিকে দীনেশচন্দ্র 'কবিত্বখনি' বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর কথা এই রকম ঃ

"বঙ্গদেশে সম্প্রতি যে অপূর্ব কবিত্বখনি পল্লীগাথায় আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে এ দেশ

ভাবজগতে দ্বিতীয় গোলকোণ্ডার স্থান অধিকার করিবে। য়ুরোপের মনীষিবৃন্দ বঙ্গীয় অশিক্ষিত কৃষকের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ এবং কবিত্বের মাদকতায় মুগ্ধ হইয়াছেন। জগতের আর কোন দেশের কৃষক কবি এরূপ উচ্চাঙ্গের কাব্য শিল্পের পরিচয় দিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না।" [বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃ. ৫৯০]

পল্লীকবিদের কথা পল্লীশ্রীর মাধুর্যে ভরা। প্রেমের উপাখ্যানে এই মাধুর্য লোকায়ত অভিজ্ঞতার স্তরে স্তরে অনির্বচনীয় সুধাভাণ্ডের সঞ্চয় করেছে। লৌকিক অনুভূতি নিসর্গের পরিমণ্ডলে, যে ব্যঞ্জনা লাভ করে সেখানে অধ্যাত্মের রসসিক্ত ভাবলীলা নেই। এখানে অভিজ্ঞতাগুলি একান্ত ভাবে লোকায়ত, অভ্যস্ত জীবনের প্রকরণের মধ্যে বিধৃত। দেবপ্রেমের মহিমামণ্ডিত ভাবের উদ্বোধন সেখানে নেই। এই ভাবের মহিমাকীর্তন আমরা বৈষ্ণব কবিদের লেখায় পেয়েছি। দীনেশচন্দ্র লিখলেন ঃ

"কিন্তু পল্লীগীতিকায় বৈষ্ণব প্রভাব আদৌ নাই। তাহাতে চূড়ান্ত প্রেমের কথা আছে — কিন্তু প্রেমের আধ্যাত্মিকতা নাই। দুশ্চর তপস্যা আছে — কিন্তু তুলসী বা বিল্বপত্রের অর্ঘ্য নাই। এককথায় সেখানে পার্থিব প্রেম শতদলের মত মনোলোভা হইয়া বিকাশ পাইয়াছে. কিন্তু তাহা স্বর্গের পারিজাত কুসুম হইয়া ফোটে নাই। পল্লীগীতিকায় প্রেম বিরাট আকাশের নীচে, নীল বনান্ত প্রদেশে, রক্তপুষ্পরঞ্জিত বন্য বীথিতে কংস, ধনু প্রভৃতি প্রবল নদসৈকতে স্বাধীনভাবে বিকশিত হইয়াছে — কিন্তু তাহা মন্দির জুড়িয়া বসে নাই। এই প্রেম নর-নারীর প্রেম, ইহা উপাস্য-উপাসকের সাধনা নহে। তথাপি এই প্রেম স্বর্গের অতি সন্নিহিত — ইহাতে যেটুকু বাকী ছিল, বৈষ্ণবরা তাহা পূরণ করিয়াছেন।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃ. ৫৯০)

কি অভাব ছিল আমাদের গ্রাম্য কবিদের যা বৈষ্ণব কবিরা পূরণ করে দিয়েছেন? একটি ত নিশ্চয় ভাবের অধ্যাত্মবোধ এবং অন্যটি শব্দবন্ধনের ছন্দিত শৈল্পিক দক্ষতা, তার কলা কৌশল ও তার প্রকল্প। দীনেশচন্দ্র কবিতালিখনে বৈষ্ণব কবিদের উৎকর্ষকে এইভাবে মেনে নিয়েছেন ঃ

" বৈষ্ণব কবিতার ললিতছন্দ, অপূর্ব শব্দমাধুর্য্য, শিল্পীর কৌশলযুক্ত গাঁথুনি — প্রভৃতি শিক্ষালব্ধ গুণ নিরক্ষর পল্লীকবি কোথায় পাইবে? পল্লীকবির ভাষা অমার্জিত — কিন্তু অতি সরল, তাহার ছন্দহীন রচনা কবিত্বে ভরপুর। এই সকল নিরক্ষর কবি — অভিমানের পাদপীঠে বসিয়া — আড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতা নিজেদের কথাই — সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা — জগজ্জয়ী কথা — বলিয়া ঘোষণা করে নাই। নিজের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা তাহাদের অণুমাত্র ছিল না। তাহারা যে দৃশ্য আঁকিয়াছেন — তাহাকে তুচ্ছ করিবার কিছুই নাই। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃ. ৫৯০)

দীনেশচন্দ্র মনে করেন যে পল্লী কবিদের রচনা সমূহ 'বাঙালী জাতির গৌরব' — তা এমন এক সম্পদ যা বাংলার হাটে, মাঠে, পথে, ঘাটে ইতস্তত 'পড়িয়া নাই।' 'ইহাতে বাঙ্গলা দেশের যে পরিচয় আছে, সেরূপ পরিচয় আর কিছুত্বেই নাই। (প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯০) যে

সম্পদের কথা দীনেশচন্দ্র লিখলেন তা বাংলার গ্রাম্য সম্পদ। তখনও নগরায়িত সভ্যতার বিকাশ হয় নি। অর্থনীতি মুদ্রায়িত হয় নি। (ইংরাজিতে যাকে বলি economy was not monetized)। ফলে লোভ, শঠতা, আকাঙ্ক্ষা, ক্রূরতা ইত্যাদি তাদের নাগরিক রূপটি পরিগ্রহ করে নি। সরল জীবনের প্রেম সহজে আসে সেখানে—একটি কথার দ্বিধা থরো থরো আবেশে আসে — একটি মুহূর্তের অচিন্তিত আতিশয্যে, এক লহমার মুগ্ধতায়, ক্ষণিকের দেখা না দেখার অভিজ্ঞতায় প্রেম আসে — সে স্বপনে আসে, গোপনে আসে, কখনো বা আসে সরাসরি আত্মনিবেদনের আয়োজনহীন আবেদনে। এইটিই গ্রাম্য প্রেম যার ছলা-কলা নেই, আছে শুধু আত্মসমর্পণের মিলনমধুর, বিরহবিধুর দিনযাপনের অভিজ্ঞতা। এমন প্রেমের আদর্শই গ্রাম্য কবিদের লেখায় পরিস্ফুট হয়েছে। এই প্রেমের ভাষ্য দীনেশচন্দ্রের লেখায় ফুটে উঠেছে এইভাবে —

"পল্লীগাথার প্রেমের আদর্শটা কি বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে বঙ্গের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রেমের জন্য অসাধ্য সাধন হইতেছিল — চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন 'সহজ সহজ সবাই বলয়ে' — অর্থাৎ তাঁহার সময়ে নরনারীতে অবাধ প্রেম সর্বত্র প্রচারিত ছিল। পল্লীগানে যে স্বার্থশূন্য, পাপলেশ বিরহিত, অতুল্য, জীবন-পণ ভালবাসার কথা লিখিত হইয়াছে — তাহা ক্রমে ধর্ম্মতত্ত্ব স্বরূপ সহজিয়ারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে এই প্রেমের বিচিত্র লীলা জ্ঞাপক কোমল ভাষা বঙ্গদেশে বিশেষরূপে পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। পল্লীপ্রকৃতির বেল জুথি জাতি যেরূপ একটা বিশিষ্ট সম্পদ, পল্লীগাথার কোমল শব্দগুলিও সেইরূপ আর একটি সম্পদ।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃ. ৫৯২)

এই সম্পদে ভরপুর হয়ে আছে বর্তমান গ্রন্থে উল্লিখিত গল্পগুলি, তাদের অন্তর্ভুক্ত কবিতার খণ্ডাংশগুলি, আর তাদের পদের প্রভাবে রচিত গদ্যের পর্বগুলি। প্রেম, প্রেমের পদ, তার আলাপচারিতা, তার সমস্ত আলাপন ও সম্ভাষণ পল্লীর প্রতিনিয়তের দিনযাপনের অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত — এ যেন জীবনের অনায়সলব্ধ ফসল। দীনেশচন্দ্র এই বোধটিকে তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন।

দীনেশচন্দ্রের পল্লী প্রেম ছিল, দেশের সহজ-সরল গ্রাম্য ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষণ ছিল, আর এ সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে তাঁর দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধ প্রকট হয়ে উঠত। প্রেম-পদাবলীর বিশ্লেষণে তাই তাঁর লেখনী এত সরস। এই সরসতার একটি অভিজ্ঞান এই রকমঃ—

'দাম্পত্য গৃহের নিভৃত নিকেতনে, জনকজননীকৃত শিশুদের আদর আপ্যায়নে, অভিসারিকার মৃদু প্রেম আলাপনে, খণ্ডিতার অভিমানজাত ক্ষুব্ধ আহত প্রেমের উচ্ছ্বাসে — শত শত প্রকারে এই কোমল কান্ত পদাবলী বঙ্গদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই পদাবলী রমণীরা কথায় কথায় আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন, — এবং ইহার অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে পল্লীকবি ও পদকর্তা উভয়েই তাঁহাদের কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলেন, তজ্জন্যই এই আশ্চর্য্য ঐক্য। বঙ্গদেশে প্রেম সাধনা যে কিরূপ ব্যাপ্ত ও প্রসার লাভ করিয়াছিল

— তাহা এই পল্লীগাথাগুলি বিশেষভাবে প্রমাণ করিবে। সেই তপস্যাজাত নিঃস্বার্থ আত্মসমর্পণের প্রচেষ্টা হইতে শত শত কথা — বায়ুতাড়িত শত শত কুসুমের ন্যায় — বঙ্গের গৃহে গৃহে, কুঞ্জে কুঞ্জে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পল্লীগীতিরচক ও বৈষ্ণব কবি সেই স্বদেশী উপাদান হইতে তাঁহাদের কাব্যকথা আহরণ করিয়াছিলেন। এই জন্যই তাহাদের রচনায় এই ঐক্য — ইঁহারা কেহ কাহারও নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।' **(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃ ৫৯২)**

বাঙালির কথার মধ্যে প্রেমের পরাগ কত সহজে মিশে ফুল্লকুসুমিত কুঞ্জবিতান রচনা করে দীনেশচন্দ্র সেনের এ লেখাই তার প্রমাণ। নীলনবঘনে বাংলার মনোগগনে ভাবের বাষ্প তৈরি করে তার নিজস্ব মেঘ। সেই মেঘ দেখে বাংলার কবিত্বের ময়ূর এমনি নাচে। তার জন্য নীলনদের তীর থেকে বিদেশী মেঘকে ভেসে আসতে হয় না। দীনেশচন্দ্রে-র 'বাংলার পুরনারী' গ্রন্থটি এই রকম বাঙালি ভাবের গ্রন্থ — বাঙালি নারীর রূপ ও কথা বাংলার নিজস্ব ধ্যানে কল্পিত হয়েছে। নারীকে এখানে অন্তঃপুরিকা বলে দেখানো হয়নি। কোন অবরোধের মধ্যে তাকে ঢেকে ফেলা হয়নি। নারীকে মুক্তছন্দে নভশ্চারী বিহঙ্গের মত পাখা মেলার সুযোগ দেওয়া হয়েছে পল্লীবাংলার কাব্যগাথায়। এ মুক্তি কতখানি প্রকৃত মুক্তি. কতখানিই বা সমাজ-শৈথিল্যের দান তা বলা যাবে না। তবে স্পষ্টত দেখা গেছে যে নারী চরিত্রগুলির মধ্যে কোন জটিলতা নেই। গ্রাম ক্ষুদ্র, স্বল্প তার সম্ভার, জীবন-জীবিকা সেখানে সীমিত — অবারিত শুধু প্রকৃতি, তার প্রান্তরছাওয়া মুক্তি যার আভাস বহন করে বাতাস, নদীর কলোচ্ছ্বাস, বনবিতানের পুষ্প-সুবাস। এ সব নিয়ে মথিত নারী — স্মরণীয় কালের বরণীয় নারী — 'বাংলার পুরনারী'। এরাই ইতিহাসের রাঙা রাজকন্যা যারা তাদের রূপ নিয়ে চলে গেছে দূরে। স্মৃতিতে ফিরে আসে তারা বিবর্তনের মাঝ দিয়ে। ফিরে আসে আমাদের অভিজ্ঞতায় — ছেয়ে থাকে আমাদের জীবনের সব লেনদেন — ইতিহাসের অনামা কত সেই বনলতা সেন।

রঞ্জিত সেন

বাংলার পুরনারী
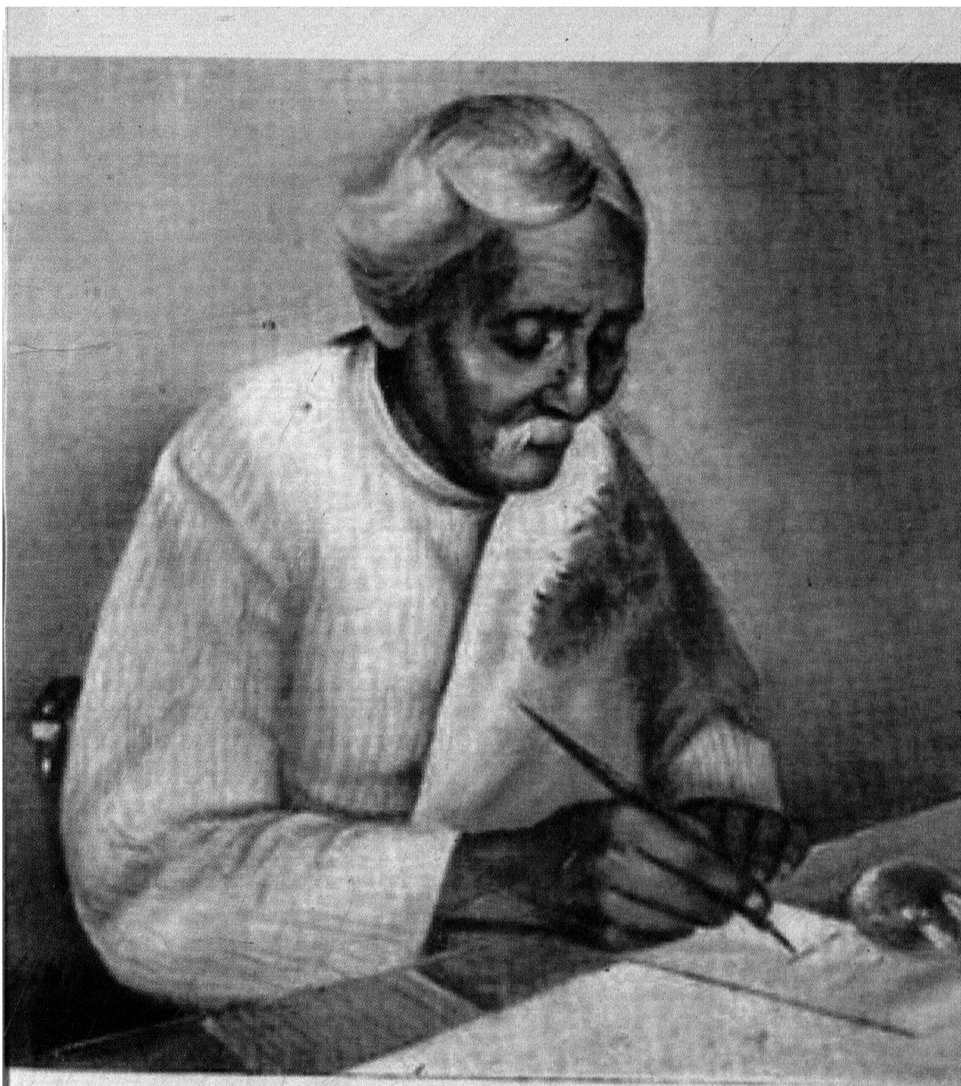
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

বাংলার পুরনারী
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন
দি
ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোং
কলিকাতা

উৎসর্গ

গ্রন্থকারের অন্তিম ইচ্ছা অনুসারে
বাংলার পুরনারী
প্রকাশকগণ কর্ত্তৃক
বিশ্ববরেণ্য কবি পরম শ্রদ্ধাস্পদ
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
মহাশয়ের করকমলে
অর্পিত হইল।

নিবেদন

স্বনামধন্য সাহিত্যিক রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের শেষ গ্রন্থ "বাংলার পুরনারী" প্রকাশ করিয়া আমরা একই সঙ্গে গৌরব ও বেদনা অনুভব করিতেছি। গৌরব এই জন্য যে, ইহা বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের সর্ব্বশেষ এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, এই গ্রন্থের সঙ্গে দীনেশচন্দ্রের জীবনের স্মৃতি বিশেষভাবে জড়িত এবং ইহার মধ্যে গ্রন্থকারের এক উৎকৃষ্ট প্রামাণ্য জীবনী সংযুক্ত করিবার সুযোগ পাইয়াছি; একাধিক দিক হইতে "বাংলার পুরনারী" বাংলা সাহিত্যের একখানি স্মরণীয় গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য মনে করি। দুঃখ এই জন্য যে, গ্রন্থকার এই গ্রন্থের প্রায় সমস্ত কার্য্য সমাপন করিয়া গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ-আকারে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই আমাদের ছাড়িয়া গেলেন। তবে এক বিষয়ে তাঁহাকে আমরা নিশ্চিন্ত ও আশ্বস্ত করিতে পারিয়াছিলাম,—এই গ্রন্থ প্রকাশের কার্য্যে তাঁহার মর্য্যাদা যে আমরা পরিপূর্ণভাবে রক্ষা করিতে সক্ষম হইব সে বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ ছিল না। বস্তুত পক্ষে এই গ্রন্থের সকল কাজ তাঁহার অনুমোদন অনুসারে সম্পাদিত হইয়াছে।

দীনেশচন্দ্রের যে জীবন-কথা ইহার মধ্যে গ্রথিত করা হইল, তাহার সমস্ত উপকরণ গ্রন্থকার স্বয়ং আমাদের দিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ইহার যাথার্থ্য সম্বন্ধে কাহারো সংশয়ান্বিত হইবার কোন কারণ নাই। এই অংশের প্রুফগুলি দীনেশচন্দ্রের পুত্রগণ দেখিয়া দিয়া আমাদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

আমরা একান্তভাবে আশা করি "বাংলার পুরনারী" বাঙালির কাছে সমাদর লাভ করিবে। ইতি—

দি ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোম্পানী
২৫শে ডিসেম্বর ১৯৩৯

লেখ-সূচী

চিত্র সূচী

গ্রন্থকারের হস্তলিপি

আচার্য্য দীনেশচন্দ্র সেনের
জীবন-কথা

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন ঢাকা জেলার বগজুরি গ্রামে ১৮৬৬ ইং সনের ৬ই নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। বগজুরী গ্রাম তাঁহার মাতুলালয়।

ইঁহারা বৈদ্য কুলীনদের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র খুলনা জেলায় পয়োগ্রামের অধিবাসী এবং মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের বন্ধু ও সামন্ত-রাজ ধোয়ীর বংশধর। ভরত মল্লিকের চন্দ্রপ্রভায় ইনি ধোয়ী, ধূহি এবং দুহি এইভাবেই কথিত হইয়াছেন। জয়দেবের প্রাচীন গীতগোবিন্দের পুঁথিতেও ধোয়ীকে স্থানে স্থানে টীকায় দুহি নামে উল্লিখিত হইতে দেখা যায়।

পবন-দূত নামক কাব্য রচনার পর লক্ষ্মণ সেন ইঁহাকে স্বর্ণ ছত্র, চামর ও হস্তী প্রভৃতি উপহার দিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। জয়দেব ইঁহাকে 'কবিক্ষ্মাপতি' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন,—এই উপাধি দ্বারা 'কবিশ্রেষ্ঠ'— ইঁহাকে যেরূপ বুঝায়, তেমনই আবার তিনি যে কোন খণ্ড রাজ্যের অধিপতি ছিলেন তাহারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। চন্দ্রপ্রভায় উল্লিখিত আছে, ধোয়ী বৈদ্য সমাজের শক্ত্রি গোত্রীয় অন্যতম বীজপুরুষ ছিলেন; কিন্তু ইনি কবিত্ব, পাণ্ডিত্য এবং বিদ্যা-বুদ্ধি-প্রতিষ্ঠায় এরূপ উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন যে শক্ত্রি-গোত্রের অন্য কয়েকজন বীজপুরুষ থাকিলেও ইনিই সমস্ত শক্ত্রি-গোত্রের বীজপুরুষ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন।

ধোয়ী সেনের কাশী ও কুশলী নামে দুই প্রখ্যাত-নামা পুত্র ছিলেন। তন্মধ্যে কাশী রাঢ়ে প্রতিষ্ঠিত হন, এবং কুশলী বঙ্গদেশে আসিয়া বাস স্থাপন করেন। ধোয়ীর বংশধরগণ পাণ্ডিত্য ও ধর্ম্মপরায়ণতার জন্য বৈদ্য-কুলের উজ্জ্বল প্রদীপ স্বরূপ ছিলেন; ইঁহারা এখন পর্য্যন্ত পূর্ব্বপুরুষদের গৌরব রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন; এই বংশেই

মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন, মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন, মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেন, বৈদ্যরত্ন যোগেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ রাজেন্দ্রনাথ সেন, ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

দীনেশচন্দ্রের পিতা ঈশ্বরচন্দ্র সেন ১৮২০ খৃঃ অব্দে ঢাকা জেলার সুয়াপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রঘুনাথ সেন ৭ বৎসর বয়স হইতে তাঁহার সুয়াপুর গ্রামে মাতামহ ভবানীপ্রসাদ দাসের বাড়ীতে লালিত পালিত হন এবং তদবধি ঢাকা জেলায় বাস স্থাপন করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র, ইংরেজী, বাংলা ও ফার্সীতে সুপণ্ডিত ছিলেন। দীনেশচন্দ্রের জন্মের পূর্ব্বেই তিনি বাংলাতে 'সত্য ধর্ম্মোদ্দীপক নাটক', 'ব্রহ্মসঙ্গীত রত্নাবলী' এবং 'দিনাজপুরের ইতিহাস' রচনা করেন। শেষোক্ত বইখানির পাণ্ডুলিপি হারাইয়া গিয়াছে এবং অপর দুইখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়-সঙ্কলিত ব্রহ্মসঙ্গীত সংগ্রহের প্রথম সংস্করণে 'ব্রহ্মসঙ্গীত রত্নাবলী' হইতে কয়েকটি গান উদ্ধৃত হইয়াছিল। 'সত্য ধর্ম্মোদ্দীপক নাটক' হইতে কতকগুলি অংশ 'ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য' নামক পুস্তকের পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি তাৎকালিক ইংরেজী প্রধান পত্রিকা ইংলিশম্যানে সর্ব্বদা প্রবন্ধাদি লিখিতেন, এবং ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজের বেদী হইতে আচার্য্য স্বরূপ যে সকল বক্তৃতা করেন, তাহার অনেকগুলি সেই সময়ের ঢাকা হইতে প্রকাশিত কয়েকখানি বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ১২৭২ বাং সনে তিনি এইভাবে সাহিত্য চর্চ্চা করিয়া শিক্ষিত সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মমত আদিসমাজের অনুকূল ছিল। তাঁহার সহধর্ম্মিণী রূপলতা দেবীর প্রতিবাদ ও প্রতিবন্ধকতায় তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে পারেন নাই; কিন্তু তিনি চিরকাল একনিষ্ঠ ব্রাহ্ম মত অবলম্বন করিয়াছিলেন,—মৃত্যুকালে জনৈক আত্মীয়া তাঁহার কর্ণে কালীনাম আবৃত্তি করিতে গেলে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

যৌবনে তিনি দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। তাঁহার এক ছাত্র কলিকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক চন্দ্রশেখর কালী তাঁহার একখানি সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছাত্র ষ্ট্যাটুটারী সিভিলিয়ান বিখ্যাত জজ অম্বিকা চরণ সেন কয়েক বৎসর হয় পরলোক গমন করিয়াছেন। পাটনার প্রধান উকীল ব্রজেন্দ্রনাথ বসাক, গৌহাটীর প্রধান উকীল দীননাথ সেন প্রভৃতি আরও অনেক ছাত্র তাঁহার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ও শ্রদ্ধা বহন করিতেন। পাটনার ব্রজেন্দ্র বাবু তাঁহার

প্রৌঢ় বয়সে সমস্ত বিষয় ও সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করেন এবং তিনি ও সেন মহাশয়ের অন্য এক ছাত্র হরিমোহন চক্রবর্ত্তী বৃন্দাবনে যাইয়া আশ্রম স্থাপন করেন; শেষোক্ত সন্ন্যাসী তদঞ্চলে "গোলক বাবাজি" নামে পরিচিত।

দীনেশচন্দ্রের একটি জীবন-চরিত লণ্ডনের এসিয়াটিক রিভিউ পত্রিকার ১৯১৩ সনের এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত হয়—— তাহা প্রায় এক ফর্ম্মা ব্যাপক। লেখক অধ্যাপক জে, ডি, এণ্ডারসন একস্থানে এইভাবে লিখিয়াছিলেন ঃ-

"Mr Sen's maternal grandfather was a typical Bengali country gentleman, lavish in expenditure on the musical plays called *Yatras* and other such amusements, which being performed before the family temple are held to give pleasure to gods as well as to mortals. All such dissipations were uncongenial to Mr. Sen's father who thought them at once frivolous and irreligious. He was something of an authority on the doctrines of Samaj and wrote books on the subject. He also composed hymns and spiritual songs, one of which is roughly translated to the following effect,—My mind, if you would enjoy the sight of beautiful dancing, what need is there to frequent gaudily dressed dancing girls? What is more entrancing than the dance of the peacock! What *Baijder's* dance can compare with his spendid attire? And if you love the brilliant midnight, illumination of royal palaces, what can compare with the glorious firmament when the moon holds his court among his minister stars! In costly entertainments a petty question of precedence may cause jealousy and heart-burning. But here the entertainment is open to all, king and cowherd alike.

দীনেশচন্দ্রের মাতামহ গোকুলকৃষ্ণ মুন্সী বগজুরীতে প্রাসাদোপম গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সে অঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে রাজ-যোগ্য সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে

"গণি মিঞার ঘড়ি,
নীলাম্বরের বড়ি,
গোকুল মুন্সীর গোঁপে তা,

গল্প শুনবি তো মৃত্যুঞ্জয় মুন্সীর কাছে যা।"—

এই ছড়া না জানিত, পূর্ব্ববঙ্গে এরূপ লোক ছিল না। গোকুল মুন্সীর সুকৃষ্ণ লীলায়িত গোঁপ দুটির তোয়াজের জন্য দুইটি ভৃত্য নিযুক্ত ছিল, তাহারা মোমজমা প্রভৃতি উপচারে সেই গোঁপ জোড়ার সকালে বিকালে সেবা ও সৌষ্ঠব সাধন করিত। ৪০ বৎসর বয়সেও তিনি যে জড়োয়া সাঁচ্চা পাথর সংযুক্ত চটী জুতা ব্যবহার করিতেন, তাহার দাম ছিল ৪০/৪২ টাকা। তিনি ঢাকার সর্ব্বপ্রধান উকীল ছিলেন এবং তাঁহার যে আয় ও প্রতিষ্ঠা ছিল, পরবর্ত্তী কোন উকীলই সে বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষতা অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। জজ লুই জ্যাকসান বলিতেন, "মুন্সী গোকুল কিষণ হীরাকো টুকুরা"। ঢাকার নবাব গণি মিঞা তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র এই মুন্সী মহাশয়ের কন্যা রূপলতা দেবীকে বিবাহ করেন। রূপলতা দেবী সম্বন্ধে ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী লিখিয়াছেন—

"তাঁহার (ঈশ্বরচন্দ্রের) পত্নী পরমাসুন্দরী, গৌরবর্ণা এবং ক্ষীণাঙ্গী ছিলেন। ...তাঁহার নাম ছিল রূপলতা। তিনি রূপে, গুণে ও স্নেহে দেবী ও জননী বিশেষ ছিলেন।"

দীনেশচন্দ্রের মাতা রূপলতা দেবী হিন্দুধর্ম্মে নিষ্ঠাবতী ছিলেন, সুতরাং ধর্ম্ম লইয়া স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সর্ব্বদাই মতান্তর হইত। কিন্তু এই দাম্পত্য কলহ পরস্পরের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি করিয়াছিল মাত্র, একদিনের জন্য তাঁহারা একে অন্যকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। মুন্সী মহাশয়ের বাড়ীতে যে দুর্গোৎসব হইত, তাহার প্রতিমার মত এত বড় মূর্ত্তি বঙ্গদেশের আর কোথাও হইত কিনা, সন্দেহ। হিন্দু ও মুসলমান প্রজাদের মধ্যে কোন কোন দল নূপুর পায়ে দেবীর আঙ্গিনায় নাচিয়া গাইত—"আমরা দেইখা আইলাম গোকুল মুন্সীর বাড়ী। বাড়ীটা সাজাইছে যেন রাবণের পুরী।"

যাত্রা, কবি, কথকতা, কীর্ত্তন, তরজার লড়াই, টপ্পা, বিদ্যাসুন্দর নাট্য, বাই ও খেমটা প্রভৃতি সঙ্গীত চর্চ্চার সে অঞ্চলে যতগুলি দল ছিল, তাহারা মুন্সী মহাশয়ের বাড়ীতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে অন্যত্র প্রতিষ্ঠা পাইত।

ঈশ্বরচন্দ্র অনেক সময় শ্বশুরালয়ে থাকিয়াও এই উৎসবে যোগ দিতেন না। তিনি স্বীয় কক্ষে অর্গল বন্ধ করিয়া ব্রহ্মোপাসনায় নিযুক্ত থাকিতেন, এবং এই সকল বৃথা বিলাস-উৎসব ও আমোদ-প্রমোদের প্রতি অবজ্ঞা দেখাইয়া প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিতেন।

দীনেশচন্দ্রের পূর্ব্বে এগারটি ভগিনী হইয়াছিল; শেষ কালে যখন পুত্র লাভের আশা একরূপ তিরোহিত হইয়াছিল, তখন সহসা দীনেশচন্দ্র তাঁহার আর একটি যমজ

ভগিনীকে সঙ্গে লইয়া মাতুলালয়ের সূতিকাগৃহে আবির্ভূত হইলেন।

তাঁহার যখন সাত বৎসর বয়স তখন পিতা ঈশ্বরচন্দ্র বহুমূত্র-রোগাক্রান্ত হইয়া কয়েক বৎসরের জন্য দৃষ্টিহারা হ'ন। এই সময়ে কতকটা আর্থিক কষ্ট উপস্থিত হয়। তথাপি জীবনের প্রথম দিকটায় দীনেশচন্দ্র অতিশয় যত্নে ও বহু ব্যয়ে পালিত হন। তাঁহার আদরের সীমা ছিল না। এতগুলি কন্যার মধ্যে একটি পুত্র, তাঁহার সেবার জন্য দুই তিনটি ভৃত্য সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিত। তাঁহার সমস্ত আবদার ও অত্যাচার তাহাদিগকে অম্লান বদনে সহ্য করিতে হইত।

দীনেশবাবুর পিতামহ রঘুনাথ সেন তাঁহাদের সুয়াপুরের বাগান-বাটীটি একটি দর্শনীয় স্থানের মত অতি যত্নে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বোম্বাই, ফজলী, সিন্দুরে, কিষণ ভোগ প্রভৃতি ৪০০ শত আমগাছ, অতি বৃহৎ গোলাপজাম, লিচু, কালোজাম, কাঁটাল, নারিকেল, এমন কি কমলা লেবু প্রভৃতি বৃক্ষমণ্ডলীতে সুসজ্জিত হইয়া বাগান-বাটীটি প্রকৃতির একটি প্রিয় ছবির মত শোভা পাইত। সন্ধ্যাকালে নীল, লাল, কালো প্রভৃতি বিবিধ বর্ণের শত শত পক্ষী দূর-দূরান্তর হইতে কলরব করিতে করিতে আসিয়া ঝাঁক বাঁধিয়া সেই বাগানের ডালে বসিত এবং প্রহরে প্রহরে মিষ্ট কোলাহল করিয়া সুপ্ত ও অর্দ্ধ-জাগ্রত গৃহবাসীদের কর্ণে সুধা ঢালিয়া দিত। এই বাড়ী রঘুনাথ সেনের আদরের জিনিষ ছিল। এমন কোন ফুল-ফলের বৃক্ষ ছিল না, যাহা তিনি দূর দূরান্তর হইতে আনিয়া সেই বাগান অলঙ্কৃত করেন নাই। ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী লিখিয়াছেন ঃ—

"ঈশ্বর বাবু অনেকদিন সপরিবারে ধামরাই রামগতি কর্ম্মকারের বাড়ীতে বাসা করিয়াছিলেন। একবার তাঁহার সুয়াপুরের বাড়ীর বাগানের লিচুফল আমাদিগকে খাইতে দিলেন। ইতঃপূর্ব্বে আমরা কখনও লিচুফল দেখি নাই। আমাদের গ্রামে তখনও লিচুফলের গাছ ছিল না।" ১৯১৯ সনের ঝড়ে এই সুদৃশ্য বাগানের ১০/১২ বিঘা ব্যাপক ফলের বৃক্ষগুলি উড়াইয়া লইয়া গিয়া যেন রাজ-রাণীকে কাঙ্গালিনীর নিরাভরণ বেশে পরিণত করিয়াছে। কোথায় গেল সে সবুজ রঙ্গের সমারোহ এবং দীর্ঘাকৃতি শিখ-প্রহরীর মত উন্নত দেবদারুর পংক্তি! ফলগাছগুলির সমস্তই ঝড়ে গ্রাস করিয়াছে।

১৮৮৬ সনে দীনেশচন্দ্রের শান্ত পরিবারবর্গের উপর যেন আকস্মিক বজ্রাঘাত হইল। ঐ সনের ভাদ্র মাসে ঈশ্বরচন্দ্র এবং পাঁচ মাস পরে শীত ঋতুতে তাঁহার সহধর্ম্মিণী এবং পর পর কয়েকটি প্রাপ্তবয়স্কা কন্যা পরলোক গমন করেন। অকস্মাৎ যেন 'কুসুমিত নাট্যশালা সম' পুরীর সমস্ত আনন্দ কলরব থামিয়া গেল এবং তাহা

শ্মশানের মত স্তব্ধ ও জনবিরল হইয়া পড়িল।

দীনেশবাবু এই সময় ঢাকা কলেজে বি.এ. ক্লাসে পড়িতেছিলেন। তিনি ইংরেজী সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন এবং পাঠ্য পুস্তক ত্যাগ করিয়া অপাঠ্য পুস্তকের প্রতি বেশী মনোযোগী হইয়াছিলেন। বাড়ীতে তাঁহার বিধবা ভগিনী দিগ্‌বসনী দেবীর কৃপায় তিনি তাঁহার তিন বৎসর বয়স হইতেই বর্ণ পরিচয়ের পূর্ব্বেই কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতের অনেকাংশ মুখে মুখে আবৃত্তি করিতে শিখিয়াছিলেন। দিগ্‌বসনীর বিবাহ হইয়াছিল বৈষ্ণব পরিবারে এবং তিনি বৈষ্ণব সাহিত্যের একজন ভক্ত ও অনুরাগী পাঠিকা ছিলেন। যে সময়ে দীনেশবাবুর সহপাঠিগণ কেবলই ইংরেজীর অনুশীলন করিতেন সেই সময় তিনি ইংরেজীর সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী হইয়াছিলেন।

যে ক্লাসেই তিনি পড়িতেন তাহাতেই তিনি পরীক্ষায় ইংরেজীতে খুব উচ্চ নম্বর পাইতেন কিন্তু গণিত ও অপরাপর বিষয়ে তাঁহার ফল অতীব শোচনীয় হইত। সে সকল বিষয়ে তিনি অমনোযোগী ছিলেন। ছাত্রসভায় সেক্সপীয়র ও মিল্টন প্রভৃতি ইংরেজী নাট্যকার ও কবিদের সম্বন্ধে তাঁহার পাণ্ডিত্য দেখিয়া সহ-পাঠিরা চমৎকৃত হইতেন। ছোটকাল হইতেই তাঁহার একখানি ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস লিখিবার কল্পনা ছিল। ভারতীয় দৃষ্টি-ভঙ্গী লইয়া তিনি সংস্কৃত ও গ্রীক আলঙ্কারিকদিগের রীতির আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেক্সপীয়র ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য তিনি শুধু হলিনসেডের ক্রনিক্‌লের মূল পাঠ করেন নাই, এলিজাবেথের ও তৎপরবর্ত্তী যুগের জন অয়েবষ্টার, ফোর্ড, মার্লো, বোমন্ট ফ্লেচার প্রভৃতি নাট্যকারদের লেখা তিনি ভাল করিয়া পড়িয়াছিলেন। টেনিসনের রাউণ্ড টেবলের গল্পগুলি মূল পাঠের সহিত মিলাইয়া পাঠ করিয়াছিলেন, মিল্টনের প্যারাডাইস লস্টের কতকগুলি অঙ্কের অনেকাংশ তিনি মুখস্থ করিয়া আবৃত্তি করিতে পারিতেন। লেক কবিগণের তিনি অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন এবং স্কটের লেডী অব দি লেক, লে অব দি লাষ্ট মিনিস্ট্রেল প্রভৃতি কাব্যের সঙ্গে স্কট-দেশে প্রচলিত পল্লী-গাথার তুলনা-মূলক সমালোচনা করিতেন। চেটারটনের "ডেথ্ অব চার্লস বডয়ুইন" এবং কিট্‌সের হাই পেরিয়েনের অনেকাংশ তিনি স্মৃতি হইতে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। লেডি অব দি লেকের প্রায় সমস্তটা তিনি অনুরূপ বাংলা ছন্দে অনুবাদ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স ১৭ বৎসর মাত্র। তিনি টেনিসনের কবিতা পড়িয়া

গ্রন্থকারের প্রুফ-সংশোধন প্রনালীয় নমুনা

কখনও ক্লান্তি বোধ করেন নাই, এবং যেদিন সেই বিখ্যাত কবি পরলোক গমন করেন, সেই সংবাদ তার যোগে ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছিলে সমস্ত দিনটা তিনি উপবাস করিয়াছিলেন।

ঢাকা কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে উঠিয়া তিনি বাত রোগে শয্যাশায়ী হইয়ছিলেন। সে বৎসর আর পরীক্ষা দেওয়া হইল না। ইহার দুই বৎসর পরে ১৮৮৯ সনে তিনি শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ স্কুলে মাষ্টারী করিয়া বি.এ. পরীক্ষা দেন। পাঠ্য-পুস্তকের সঙ্গে তাঁহার কোন কালেই সম্বন্ধ ছিল না। এবারও বি, এর কতকগুলি বই যথা আর্লের 'ফাইললজি', তিনি একেবারে স্পর্শ করেন নাই, তথাপি বি.এ. পরীক্ষায় ইংরেজীতে অনার্স সহ উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

এই সময় তিনি ইংরেজী সাহিত্য, ফরাসী, জার্ম্মান ও রাসিয়ান সাহিত্যের ইংরাজী অনুবাদগুলি খুব মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন। ভিকটর হিওগোর লে মিজারেবল্, হাঞ্চ্ ব্যাক্ অফ্ নটার ডেম, বাই কিংস কমাণ্ড্, ইউজন সু-র ওয়াণ্ডারিং জু, গেটের ফষ্ট প্রভৃতি গ্রন্থের চরিত্র বিশ্লেষণ দ্বারা তিনি সতীর্থবর্গকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্য ও শিক্ষার আর একটা দিক্ ছিল, যে বিষয়ে সেই কালে তাঁহার সহকর্ম্মীদের মধ্যে আর কেহই তাঁহার সমকক্ষতা করিতে পারিতেন না।

আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী দিগ্‌বসনী দেবীর কৃপায় তিনি আশৈশব বাংলা প্রাচীন সাহিত্যে ঘনিষ্টভাবে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন। দিদির মুখে পদাবলীর আবৃত্তি শুনিয়া তিনি তন্ময় হইয়া যাইতেন। বাংলা রামায়ণ, মহাভারত, কবিকঙ্কণের চণ্ডীর অনেকাংশ এবং চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস এবং গোবিন্দদাসের অনেক পদ তিনি সাত বৎসর বয়সে মুখে মুখে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। ১৮৭৮ কিংবা ইহার নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে ঢাকা মত্তগ্রামবাসী সুপণ্ডিত উমাচরণ দাস মহাশয়ের সাহায্যে কুমিল্লা গভর্ণমেন্ট হাই স্কুলের হেড মাষ্টার জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলীর একটি সংস্করণ প্রকাশিত করেন। বৈষ্ণব বাবাজীর ঝুলি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এই দুই অমর কবি এই সূত্রে সর্ব্বপ্রথম বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় মেঘনাদ-বধ কাব্যের ব্যঙ্গ-কাব্য 'ছুছুন্দরী বধ কাব্য' প্রণয়ন করিয়া সেই সময়ে যশস্বী হইয়াছিলেন। উত্তরকালে ' গৌরপদ তরঙ্গিণী' সঙ্কলন করিয়া ইনি বৈষ্ণব সমাজে বিশেষরূপে পরিচিত হন।

দীনেশবাবু তখন হবিগঞ্জ স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। কিন্তু ইংরেজী ভাষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেই সময়েই বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদমাধুর্য্যের রসাস্বাদন করিতে কখনই বিরত হন নাই।

"কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।"
"কাহারে কহিব মনেরই মরম কেবা যাবে পরতীত",
"এ কথা কহিবে সই এ কথা কহিবে"
"যথা তথা যাই আমি যতদূর যাই।
চাঁদ মুখের মধুর হাসে তিলেকে জুড়াই।"
"পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে,
মঙ্গল আচার করব নিজ দেহে।"

প্রভৃতি পদ ব্রাহ্মণের গায়ত্রীর মত তিনি ত্রিসন্ধ্যা জপ করিতেন। সে সময়ে ব্রহ্ম-সঙ্গীত শিক্ষিতদের কণ্ঠে কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হইত এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লম্পট শঠ বংশীধারীর কুৎসা প্রতিনিয়ত প্রচারিত হইত। তখনও এ সকল পদের রস-বোদ্ধা শিক্ষিত সমাজে একরূপ ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দীনেশবাবু নিজের মনে মনে এই সকল গীতি গুণ গুণ করিয়া আবৃত্তি করিতেন এবং তাহাতেই পরিতৃপ্ত হইতেন। পাখী যেরূপ কাহাকেও শুনাইবার জন্য গান করে না, তাহার মিষ্ট-স্বরের পুলকে স্বয়ং পুলকিত হয়, কোন দরদী শ্রোতার প্রতীক্ষা করে না—দীনেশবাবুর পক্ষে বাংলা প্রাচীন সাহিত্যের সাধনা ছিল সেইরূপ গূঢ় সাধনা অপরের অগোচরে। ইহা যে কোন কালে কোন কাজে লাগিবে তাহা তিনি ভাবেন নাই।

বি. এ. পাশ করার পর তিনি শম্ভুনাথ ইন্‌স্‌টিটিউসনের প্রধান শিক্ষক হইয়া কুমিল্লা চলিয়া আসেন। এই সময়ে কবি নবীনচন্দ্র সেন ছিলেন ফেনী সবডিভিসনের ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি দীনেশবাবুকে ফেনী হাইস্কুলের হেড মাষ্টারী দিয়া একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, "আপনি যখন ভূস্বর্গ (Earthly Paradise) শ্বশুর-বাড়ীতে কুমিল্লায় আছেন, তখন সেই বন্ধন কাটিয়া যে আপনি ফেনীতে আসিতে পারিবেন, সে বিষয়ে আমার ভরসা অল্প।" বাস্তবিকই তাঁহার ফেনীতে যাওয়া হয় নাই।

কুমিল্লায় তখন (১৮৯০ সনে) দুইটি হাইস্কুল ছিল—একটি গভর্ণমেন্ট স্কুল, অপরটি ভিক্‌টোরিয়া হাইস্কুল। ভিক্‌টোরিয়া স্কুলের কতিপয় বিদ্রোহী ছাত্র সেই স্কুল ত্যাগ করিয়া শম্ভুনাথ স্কুল স্থাপন করে। তাহাদের নেতা হন একটি দৃঢ়চেতা অথচ নিঃস্ব

ভদ্রলোক। সেই ভদ্রলোক (অম্বিকাবাবু) ছাত্রদের সঙ্গে বহু মিনতি করিয়া শম্ভুনাথ নামক এক মাড়োয়ারী ধনীর সম্মতি গ্রহণপূর্ব্বক ইঁহার নামের সঙ্গে স্কুলের নাম যুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। শম্ভুনাথ কয়েক মাসের জন্য তাঁহার একটা বড় তাঁবু স্কুলকে ধার দেন, স্কুলের প্রতিষ্ঠা এই তাঁবুতেই হয়। সম্ভবতঃ শম্ভুনাথ ইহা ছাড়া স্কুলের আর কোন সাহায্য করেন নাই। এই তাঁবুও তিনি কিছুকাল পরে লইয়া যান। তখন স্কুল বসিত কতকগুলি ভাঙ্গা খড়ের চালের ঘরে। কিন্তু ছাত্রদের ছিল ভিক্‌টোরিয়া স্কুলের প্রতি কি বিজাতীয় ক্রোধ! তাহারা বর্ষার বৃষ্টিতে ভাঙ্গা ঘরে ছাতা মাথায় দিয়া সিক্ত শশক ও বন্য মার্জ্জারের মত ভিজিতে থাকিত, তথাপি তাহারা কোন অভাব লইয়া অভিযোগ করিত না।

এই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের শিক্ষা-বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন, স্বর্গীয় দীননাথ সেন। দীনেশবাবুর সঙ্গে তাঁহার একটু আত্মীয়তা ছিল। সেক্রেটারী অম্বিকাবাবু মনে করিয়াছিলেন দীনেশবাবুর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে স্কুলটি এ্যাফিলিয়েশন (affiliation) পাইবে, দীননাথ সেনের হাতেই এইরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শনের ক্ষমতা ছিল। এসম্বন্ধে বহু লেখা-লেখির পরে দীননাথ সেন তাঁহার শেষ সিদ্ধান্ত জানাইলেন।—"শম্ভুনাথ স্কুলের অর্থ ভাণ্ডার শূন্য, স্কুলের স্বীয় ঘর বাড়ী নাই, ভাঙ্গা গোয়াল ঘরের মত একটা ঘরে স্কুল বসে। মাষ্টারগণ রীতিমত বেতন পান না, অনেকে কেবল ভবিষ্যতের আশার উপর নির্ভর করিয়া বায়ু-ভুক অবস্থায় আছেন। তাঁহারা যখন ইচ্ছা স্কুলে আসেন, যখন ইচ্ছা যান, হেড মাষ্টাররের কোন শাসন মান্য করেন না। অবৈতনিক মাষ্টারদের উপর সেক্রেটারী কোন আইন জারি করিতে সাহসী হন না।" তাঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধির দৌড় সত্যই অতি অল্পই ছিল। একদিন দীনেশবাবু দেখিলেন, একটি ছাত্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া কোন মাষ্টার বিকট চীৎকার করিয়া বলিতেছেনঃ—"Stood up on the bench, I say"!

দীননাথবাবু শেষে লিখিলেন, "হউক স্কুলের এই দুরবস্থা। আমি ইহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে affiliation-এর অনুকূলে মত দিতে পারি, যদি একজন দায়িত্বশীল যোগ্য ব্যক্তি স্কুলের ভার গ্রহণ করেন ও ইহার ব্যয় ভার গ্রহণে প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন।" অম্বিকা বাবু বহু চেষ্টা করিয়াও সেরূপ লোক সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। ছাত্রগণ বাল-খিল্ল ঋষিদের মত আশার একটা ক্ষীণ ডালে ঝুলিতেছিল। এইবার বুঝিল, সে আশা দুরাশা।

এদিকে দীনেশবাবুর শিক্ষাপ্রণালী ও প্রতিভা কুমিল্লাবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ভিক্‌টোরিয়া স্কুলের স্বত্বাধিকারী আনন্দ চন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহাকে জানাইলেন যে, তাঁহার স্কুলের রেক্‌টার আশু বাবু সবডিপুটি হইয়া চলিয়া যাইতেছেন। দীনেশবাবু যেদিন ইচ্ছা করিবেন, সেই দিনই তাঁহার পদটি পাইতে পারেন। এই সমস্যার যেভাবে সমাধান হইল তাহা দীনেশবাবুর খুব বিবেক-সঙ্গত বলিয়া মনে হয় নাই। আত্মীয়দের আগ্রহাতিশয্যে ও একান্ত অনুরোধে তিনি শম্ভুনাথ ইনস্‌টিটিউসন ত্যাগ করিয়া ভিক্‌টোরিয়া স্কুলের পদ গ্রহণ করিলেন। সেই দিন জরাজীর্ণ স্কুলটি ছাত্র শূন্য হইল এবং ঘোর নৈরাশ্য ও লজ্জায় শম্ভুনাথের ছাত্রগণ, পরাভূত সৈন্যের আত্ম-সমর্পণের ন্যায় দীনেশবাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুনশ্চ ভিক্‌টোরিয়া স্কুলে প্রবেশ করিল। ভিক্‌টোরিয়া স্কুলের ছাত্রগণ বিজয়গর্ব্বে করতালি দিয়া "ভাঙ্গল রে তাম্বুনাথ" বলিয়া তারস্বরে চীৎকার করিয়া সেই অপমানিত ছাত্রদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। শম্ভুনাথ ইনস্‌টিটিউসন কতক দিন সেই মাড়োয়ারীর তাঁবুতে আশ্রয় পাইয়াছিল, এই জন্য ভিক্‌টোরিয়া স্কুলের ছাত্রগণ বিদ্রূপ করিয়া ঐ স্কুলের নাম দিয়াছিল "তাম্বুনাথ"।

দীনেশবাবু ১৮৯১ সনে ভিক্‌টোরিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন—সেই বৎসরই ঐ স্কুলের ছাত্র ঝাড়ু মিঞা (এস্কেন্দর আলী) চট্টগ্রাম বিভাগের স্কুল সমূহের মধ্যে প্রথম হয়। শুধু তাহাই নহে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দশজনের একজন হইয়া সে ২০৲ টাকা বৃত্তিলাভ করে। সে সংস্কৃত ও গণিতে প্রথম হয়। এতাদৃশ্য সৌভাগ্য চট্টগ্রাম ডিভিসনের কোন ছাত্রের আর হয় নাই। তার পর দুই তিন বৎসর ক্রমাগত ভিক্‌টোরিয়া স্কুল চট্টগ্রাম ডিভিসনের হাই স্কুলসমূহের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে। এই সময় বর্ত্তমান মন্ত্রী নবাব মসরেফ হোসেন বাহাদুর এই স্কুল হইতে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বঙ্গেশ্বর সার চার্‌লস্‌ ইলিয়ট স্কুল পরিদর্শন করিয়া মন্তব্য করেন, "যখন ভিক্‌টোরিয়া স্কুলের মত এমন একটি সুপরিচালিত উৎকৃষ্ট স্কুল এই সহরে বিদ্যমান, তখন গভর্ণমেন্ট স্কুল এখানে রাখার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে করি না।" লাট সাহেব নানাদিক্‌ দিয়া সরকারী ব্যয় হ্রাসের জন্য চেষ্টিত ছিলেন।

এই ভিক্‌টোরিয়া স্কুলে অধ্যাপনা করার সময়ই দীনেশচন্দ্রের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের সূত্রপাত হয়। পিতামাতা ও ভগিনীদের অধিকাংশ এক বৎসরের মধ্যে ঝড়ে পড়া বাগানের মত অন্তর্হিত হইলেন; দীনেশবাবুর পরিবারে এক স্ত্রী ভিন্ন কেহ ছিল না। শ্বশুর বাড়ীর সঙ্গেও তাঁহার নানা কারণে মনোমালিন্য হইয়াছিল। এজন্য তিনি জীবনের

প্রতি একেবারে বীতস্পৃহ হইয়াছিলেন, সর্ব্বদা তাঁহার মনে হইত, কোন এক মহৎব্রতে তিনি জীবন উৎসর্গ করিবেন এবং "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন" এইরূপ কোন একনিষ্ঠ কর্ম্মে তিনি নিজকে নিযুক্ত করিবেন।

অধ্যাপক ডাক্তার তমোনাশ চন্দ্র দাসের পিতা অবিনাশ চন্দ্র দাস তাঁহার স্বগ্রামবাসী আত্মীয় ও বাল্য সুহৃৎ; উভয়েই প্রায় সমবয়স্ক। যখন তাঁহাদের সাত বৎসর বয়স, তখন দীনেশবাবু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আমি ধন মান প্রতিষ্ঠা কিছুই চাহি না। আমি বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি হইব। যদি তাহা হইতে না পারি, তবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক হইব।" মনে মনে কৈশোর ও তরুণ জীবনের এই সঙ্কল্প তিনি পোষণ করিয়াছিলেন। তিনি যে কত কবিতা লিখিয়াছিলেন তাহার সংখ্যা বলা যায় না। তাহা একত্র করিলে ওয়েবষ্টারের অভিধানের মত একখানি সুবৃহৎ পুস্তক হইতে পারিত। কিন্তু কবি-খ্যাতি তাঁহার নিতান্ত অন্তরঙ্গ আত্মীয় ও বন্ধুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সঞ্জীববাবুর সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় "পূজার কুসুম" নামক তাঁহার একটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন দীনেশ বাবুর বয়স ১৫ বৎসর। অধ্যাপক নীলকণ্ঠ মজুমদার পি, আর, এস, ঐ পত্রিকায় লিখিতেন, তিনি একটি বালক ছাত্রের কবিতা বঙ্গদর্শনের মত উচ্চ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তাহার পর অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে তিনি "কুমার ভূপেন্দ্র সিংহ" নামক একখানি কাব্য রচনা করিয়া প্রকাশিত করেন, ঐ পুস্তক প্রকাশের অব্যবহিত পরেই পুস্তকগুলি অগ্নিদাহে নষ্ট হইয়া যায় —ইহার পর তাঁহার কাব্য-প্রতিভা আর বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

১৮৯১ সন হইতেই তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভা বঙ্গীয় পাঠক মণ্ডলীকে আকৃষ্ট করে। ঐ সনে তিনি তিনটি প্রবন্ধ লেখেন—প্রথমটি 'কালিদাস ও সেক্সপীয়র' 'জন্মভূমিতে' প্রকাশিত হয়। সম্পাদক যোগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় এই প্রবন্ধটি পাইয়া আকস্মিক ও অযাচিতভাবে দীনেশবাবুকে আর্থিক পুরস্কার পাঠাইয়া দেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধ "জন্মান্তর-বাদ" 'অনুসন্ধান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাহা পাঠ করিয়া কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সেই প্রবন্ধের অজস্র প্রশংসা করিয়া সম্পাদককে একখানা পত্র লেখেন, তাহাতে লিখিত ছিল, আমি ভবিষ্যৎ বাণী করিতেছি, এই লেখক অচিরে বঙ্গ-সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন।

তৃতীয় প্রবন্ধ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। কলিকাতার এক এসোসিয়েসন উক্ত বিষয়ক প্রবন্ধের জন্য একটি পদক ঘোষণা করে। পরীক্ষক ছিলেন

স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু ও পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত। বহু বিশিষ্ট লেখক এই পদকের জন্য প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে হারাণ চন্দ্র রক্ষিত মহাশয় ছিলেন, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের একজন অজ্ঞাত তরুণ যুবকের প্রবন্ধই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনোনীত হইয়াছিল।

এই প্রবন্ধ লেখার বহু পূর্ব্ব হইতে তিনি প্রাচীন সাহিত্যের যে আলোচনা করিতেছিলেন তাহা এইবার কাজে লাগিল। কয়েকজন বিজ্ঞ শ্রোতা জুটিয়া গেল। দীনেশবাবু যখন প্রাচীন সাহিত্যের গুণ বিশ্লেষণ করিয়া বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদিগের কাব্য-প্রতিভার পরিচয় দিতেন, তখন কুমিল্লার শিক্ষিতমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়া যাইতেন, তাঁহাদের মুদিখানার পাঠ্য কাব্যগুলিতে যে এরূপ অপূর্ব্ব রসের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা তাঁহারা জানিতেন না। দীনেশবাবুর গদগদ কণ্ঠে আবৃত্তি, বৈষ্ণবপদের মহিমা-প্রচার এবং চৈতন্যদেবের জীবনকাহিনী শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ তাঁহাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়াছেন। ঢাকায় একবার ছুটির সময় যাইয়া তিনি "পদাবলীর আলোকে চৈতন্য" এই বিষয়ে অল্প সংখ্যক সুধী-মণ্ডলীর নিকট এক বক্তৃতা করেন—তখন এক বৃদ্ধ বসাক মহাশয় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার আত্মীয় এ্যাটর্ণি প্রসন্নকুমার সেন (অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন ও পুরীবাসী সাহিত্যিক কুমুদবন্ধু সেনের পিতা) ইংরেজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি বহু বিলাতী পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি কোন বৈষয়িক কার্য্য উপলক্ষে কুমিল্লায় যাইয়া দীনেশবাবুর বাসায় প্রায় দুই সপ্তাহকাল ছিলেন। এই সময় দীনেশবাবু কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর বিশ্লেষণ করিয়া শুনান। তিনি এতটা মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, দীনেশবাবুকে বলিয়াছিলেন "কি আশ্চর্য্য! আমাদের দেশী সাহিত্য যে এরূপ রত্নের ভাণ্ডার তাহা আমি জানিতাম না। এবার হইতে আমি ইংরাজী ও সংস্কৃত ছাড়িয়া দিয়া প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য ভাল করিয়া পাঠ করিব।" ইহার একমাস পরে তিনি হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। নতুবা তাঁহার একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবা বঙ্গ সাহিত্যের অনেক কাজে আসিত। এই সময় ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস না লিখিয়া প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখাই দীনেশচন্দ্রের জীবনের প্রধান লক্ষ্য বলিয়া তিনি স্থির করিলেন। কুমিল্লা ভিক্‌টোরিয়া স্কুলের প্রধান পণ্ডিত চন্দ্র কুমার কাব্যতীর্থ এবং অপরাপর সুহৃদ্‌বর্গ এই বিষয়ে তাঁহাকে ক্রমাগত উৎসাহের ইন্ধন জোগাইতেন।

ইহার মধ্যে তাঁহার আর এক আবিষ্কার, শিক্ষিত সম্প্রদায়কে চমৎকৃত করিল। তিনি জানিলেন, ত্রিপুরার আরণ্য-পল্লীগুলিতে বহুসংখ্যক জীর্ণ তালপাতার ও তুলট কাগজের বাংলা পুঁথি আছে। এ পর্য্যন্ত এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল শুধু সংস্কৃত

পুঁথিরই খোঁজ করিতেছিলেন,—কিন্তু বাংলা পুঁথির দুই একখানির নাম হরপ্রসাদ শাস্ত্রী জানিলেও এপর্য্যন্ত তাহা উপেক্ষার বিষয়ই ছিল। পারিবারিক অশান্তি ও শোকে তাপে জীর্ণ দীনেশচন্দ্র তখন জীবনের প্রতি উপেক্ষাশীল ছিলেন, তিনি এইবার তাঁহার ব্রত ঠিক করিলেন। পুঁথির সন্ধানে তিনি আত্মহারা পাগলের ন্যায় রাত্রি দিন পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

ময়নামতীর পাদমূলে ক্ষুদ্র গ্রামগুলিতে তিনি কখনও কখনও ভুল সংবাদ পাইয়া রাত্রিকালে উপস্থিত হইয়াছেন। বহু শ্রম ও কষ্ট স্বীকার এইভাবে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। একদিন কালিকান্ত বর্ম্মন ও দীনেশবাবু রাত্রি বারটার সময় অন্ধকারাচ্ছন্ন পার্ব্বত্য পথে যাইতেছিলেন। সে কি সৃষ্টিসংহারক ঝড় বৃষ্টি! সেই বিরল-বসতি পাহাড়ের দেশ ভীষণ অজগর সর্প ও ব্যাঘ্র সংকুল, কালিকান্তবাবুর মুখ শুকাইয়া গেল, কিন্তু দীনেশবাবু তখন অসমসাহসী তরুণ যুবক, তিনি ভাবিলেন, এভাবে মৃত্যু হইলেই মঙ্গল, তাঁহার পিতামাতার কথা মনে পড়িয়া দুই চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া গেল। "তোমরা কি তোমাদের প্রিয় পুত্রকে তোমাদের কাছে লইয়া যাইবে না?" এই ভাবের চিন্তায় বিভোর হইয়া বর্ষার নিদারুণ জলপ্রপাতের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলেন। এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্পিত হইয়া প্রতি পদে মৃত্যুকে বরণ করিতে সমুৎসুক হইয়া তিনি অকূল সমুদ্রে পতিত একখানি ডিঙ্গা নৌকার ন্যায় ডুবিতে ডুবিতে বাঁচিয়া গেলেন।

কখন কখনও তিলক ফোঁটা কাটিয়া বৈষ্ণবের ছদ্মবেশে তিনি তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া পদ সংগ্রহ করিয়াছেন। উত্তরকালে এসিয়াটিক সোসাইটির নিযুক্ত ভট্টপল্লী বাসী বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ তাঁহার সহচর হইয়াছিলেন। উভয়ে সমবয়স্ক, তাঁহারা শ্যামল শস্যক্ষেত্র, হস্ত দলিত পদ্মবন-সঙ্কুল প্রাচীন দীঘি, গোলার ধান ভর্ত্তি করিতে নিযুক্ত পল্লীযুবক যুবতী, রন্ধনশীলা রমণীর আলুলায়িত কেশ ও ধোঁয়ায় অশ্রুপূর্ণ চক্ষু, অপোগণ্ড শিশুর কান্না, ও বৃদ্ধের কোঁচা ধরিয়া বালকের আবদার, বৃহৎ বৃষের সাহায্যে চাষার ক্ষেত্র চাষ ইত্যাদি পল্লীগ্রামের শত শত দৃশ্য দেখিতে দেখিতে যাইতেন; কোথাও দধি চিঁড়া, কোথাও ফল, কোথাও উপবাস, কোথাও বৃক্ষতলে সমতল ঘাসের প্রান্তরের উপর উপবেশন ও বিশ্রাম—এইভাবে জীবনের সুখ সুবিধা ও স্বাস্থ্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন কত রাত্রি, কত দিন কাটিয়া গিয়াছে! এই অভিযানে কত অপূর্ব্ব আবিষ্কার তাঁহাদিগকে উদ্দীপিত করিয়াছে। পরাগল খাঁয়ের আদেশে রচিত মহাভারত, ছুটি খাঁর অশ্বমেধ

পর্ব্ব, সঞ্জয়ের মহাভারত, চন্দ্রাবতীর মনসাদেবীর ভাসান, আলাওলের পদ্মাবৎ ইত্যাদি অজ্ঞাত-পূর্ব্ব শত শত পুঁথি দীনেশবাবু আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সুরেশ সমাজপতি-সম্পাদিত 'সাহিত্য' এবং অন্যান্য পত্রিকায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। এই সময় দীনেশবাবু বঙ্গের পল্লীর এই বিরাট সম্পদের সংক্ষেপে পরিচয় দিয়া এসিয়াটিক সোসাইটির ডাক্তার হোরণেলের নিকট একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়া হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে এই প্রচেষ্টায় সহায়তা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। দীনেশবাবুর সংগৃহীত প্রায় তিন শত পুঁথি এসিয়াটিক সোসাইটি পণ্ডিত বিনোদবিহারীর মারফৎ ক্রয় করেন। পণ্ডিত মহাশয় পুঁথির মালিকদিগের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেন,— যে পর্য্যন্ত দীনেশবাবুর পুস্তকের জন্য প্রয়োজন হইবে, সে পর্য্যন্ত পুঁথি তাঁহারই নিকট থাকিবে।

পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থানে স্বয়ং পুঁথি সংগ্রহ করা ছাড়াও দীনেশচন্দ্র পত্র দ্বারা বহু পুঁথি সন্ধান করিয়াছিলেন। উদ্ধারণ দত্তের বংশধর হুগলী বদনগঞ্জ নিবাসী হারাধন দত্ত ভক্তিবিনোদ, শ্রীহট্টের অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি প্রভৃতি পণ্ডিতের সঙ্গে পত্রদ্বারা পরিচয় স্থাপন করিয়া দীনেশবাবু অনেক সহায়তা প্রাপ্ত হন। কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণটি হারাধন দত্ত মহাশয় তাঁহার গৃহস্থিত প্রাচীন রামায়ণের পুঁথি হইতে নিজ হস্তে নকল করিয়া দীনেশ বাবুকে পাঠান। তাঁহার পুঁথিশালায় যে এই মূল্যবান ঐতিহাসিক বিবরণটি ছিল, তাহা তিনি নিজেই জানিতেন না। দীনেশবাবু উপর্য্যুপরি পত্রদ্বারা তাঁহাকে খোঁচাইয়া তাঁহার পুঁথিশালা হইতে তাহা বাহির করেন। এই বিবরণটি "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" প্রথম সংস্করণেই উদ্ধৃত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দ দাসের করচার খোঁজও বৈষ্ণব শিরোমণি অচ্যুতবাবুই দীনেশবাবুকে দিয়াছিলেন।

দীনেশবাবুর গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে শুধু কৃত্তিবাসের নাম লোকে জানিত। দীনেশবাবু দ্বিজ মধু কণ্ঠ, রামানন্দ ঘোষ, চন্দ্রাবতী, ষষ্ঠীবর, গঙ্গাদাস, রঘুনন্দন, অদ্ভুতাচার্য্য, রামমোহন, কবিচন্দ্র প্রভৃতি প্রায় ২৫ জন লেখক-লেখিকার রচিত প্রাচীন রামায়ণের পরিচয় বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে প্রদান করেন। ইতিপূর্ব্বে শুধু কাশীদাসের নামই মহাভারতের অনুবাদ-ক্ষেত্রে প্রচলিত ছিল। দীনেশবাবু সঞ্জয়, পরাগলী মহাভারত, ছুটি খাঁর মহাভারত (অশ্বমেধ পর্ব্ব), নিত্যানন্দ ঘোষ, রামেশ্বর নন্দী, রাজেন্দ্র দাস ও শিবরাম সেনের মহাভারত—প্রভৃতি ৩৪খানি প্রাচীন অনুবাদের

ওঁ

মংপু

কল্যাণনিলয়েষু

বিজয়ার আশীর্বাদ

গ্রহণ করবেন।

বাংলা প্রাচীন সাহিত্যে মঙ্গল কাব্য প্রভৃতি কাব্যগুলি ধনীদের ফরমাসে ও খরচে খনন করা পুষ্করিণী, কিন্তু ময়মনসিংহ গীতিকা বাংলা পল্লীহৃদয়ের গভীর স্তর থেকে স্বতঃ উচ্ছ্বসিত উৎস, অকৃত্রিম বেদনার স্বচ্ছ ধারা। বাংলা সাহিত্যে এমন আত্মবিস্মৃত রসসৃষ্টি আর কখনো হয় নি। এই আবিষ্কৃতির জন্যে আপনি ধন্য। ইতি বিজয়াদশমী ১৩৪৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ্রন্থকারের কাছে রবীন্দ্রনাথের পত্র।

বিবরণ তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। দীনেশবাবুর পুস্তকের পূর্ব্বে শুধু কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসা দেবীর গানের কথা জানা ছিল, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থে হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, বংশীদাস, নারায়ণ ও চন্দ্রাবতী, ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাসের মনসা মঙ্গল প্রভৃতি ১৫০টি মনসা দেবীর ভাসান গানের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়। এক ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের নাম জানা ছিল, কিন্তু "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" কঙ্ক, কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ প্রভৃতি বহু বিদ্যাসুন্দর-আখ্যানকারের পরিচয় আছে। আলাওয়ালের পদ্মাবতের নাম কেহই জানিত না, দীনেশবাবুই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার পরিচয় প্রদান করেন। অপরাপর শত শত পুস্তকের কথা দীনেশবাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পাঠ করিলে জানা যায়।

ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে তিনটি নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথমটি কয়েকখানি অল্পসংখ্যক পৃষ্ঠা মাত্র, ইহাতে কোন সংবাদই নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

দ্বিতীয় পুস্তক রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত ইতিহাস। প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার দান অতি অল্প, সেকালে তাহার বেশী কিছু করার সুযোগও ছিল না। তিনি বাঙ্গলা পুঁথির কোন সন্ধানই রাখেন নাই,—ভারতচন্দ্রের সময় হইতে তিনি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে দুই তিনটি গ্রন্থকারের নাম ও অশুদ্ধ পরিচয় তাঁহার পুস্তকে পাওয়া যায়। কৃত্তিবাস যে সাপের ওঝা ছিলেন না, ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইহা প্রমাণ করিতেই তিনি গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার পুত্র তাঁহার নামে যে "রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" বাহির করিয়াছেন, তাহার মধ্যে দীনেশবাবুর সংগৃহীত সমস্ত তত্ত্ব তিনি ঢুকাইয়া দিয়াছে। হুঁকা ও নলচে বদলাইয়াছে। অথচ তাঁহার পিতার নাম বজায় রাখিয়া একখানি বই লিখাইবার জন্য তিনি প্রথমতঃ দীনেশবাবুর শরণাপন্ন হন। দীনেশবাবু তখন রুগ্ন শয্যাশায়ী, তিনি এই কার্য্যে স্বীকৃত হন নাই। স্বর্গীয় রামগতি ন্যায়রত্নের পুত্রের উচিত ছিল, পণ্ডিত মহাশয় যে পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়াছিলেন—তাহারই প্রতিলিপি পুনর্মুদ্রণ করা, এবং যাহা কিছু নূতন আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এই অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল ব্যাপিয়া যে সমস্ত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা সম্পাদকের নামে ভূমিকায় অথবা পাদটীকায় স্বীকার পূর্ব্বক উল্লেখ করা। ইতিহাস পঙ্গুর ন্যায় একস্থানে বসিয়া থাকে না—তাহা গতিশীল। সুতরাং পণ্ডিত মহাশয়ের পুস্তকের পরে যে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস আরও অগ্রগামী হইবে না, এরূপ আশা করা ভুল। কিন্তু তথাপি প্রাচীন জিনিষের একটা মূল্য আছে।

বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসের সুপ্রাচীন নিবন্ধমালার মধ্যে এই পুস্তকখানি অন্যতম। তাঁহার সময়ে এ বিষয়ে কতটা জ্ঞান লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং তিনিই বা কি দান করিয়াছেন, তাহা জানার কৌতূহল অনেকের আছে। কিন্তু সে পথে উক্ত নূতন সংস্করণখানি একবারে ঐরাবতের মত বিঘ্ন উপস্থিত করিয়াছে। এইরূপ পুস্তক সম্পাদন বিজ্ঞানসঙ্গত নহে।

তৃতীয় ইতিহাসখানি ইংরেজীতে লেখা। সুপ্রসিদ্ধ রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ইহার রচয়িতা। যদিও তাঁহার সময়ে অনেক তত্ত্বই অপরিজ্ঞাত ছিল, তথাপি তাঁহার সমালোচনা-রীতি, সাহিত্যে অন্তর্দৃষ্টি, বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধা—পুস্তকখানিকে একটা গুরুত্ব ও গৌরব প্রদান করিয়াছে।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা রাধারমণ প্রেস হইতে দীনেশবাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া মাত্র ইহা যেরূপ আদরের সাহিত গৃহীত হইয়াছিল, এদেশের সাহিত্যে তদ্রূপ দৃষ্টান্ত বিরল। কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথ একখানি ক্ষুদ্র নীল রঙ্গের চিঠির কাগজে যে মন্তব্য লিখিয়া পাঠাইলেন তাহা ক্ষুদ্র হইলেও বিশেষ মূল্য বহন করে। উত্তরকালে কবিবর বিদ্যাসাগর কলেজ গৃহে এই পুস্তকের সুদীর্ঘ সমালোচনা পাঠ করিয়াছিলেন—তাহা তাঁহার গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত হইয়া আছে। কবি ডি. এল. রায় সুরেশ সমাজপতির গৃহে এই বইখানি দেখিয়া তাহার মুখপত্রে নিজ হাতে লিখিয়াছিলেন "দীনেশ চন্দ্র সেন, হবেন আমাদের টেন।" শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও দীনেশবাবুকে তৎসম্পাদিত পত্রিকায় টেনের সঙ্গে তুলনা করিয়া বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই পুস্তকের বহু সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহা সুদীর্ঘ এবং অজস্র প্রশংসাসূচক। জজ বরদা চরণ মিত্র লিখিলেন, "এই পুস্তক সমালোচনার ক্ষেত্রে টেনের মত তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টিশালী এবং উপকরণ সংগ্রহের বিশালতায় মরলের স্কেচের মত একটি রত্ন ভাণ্ডার।" 'সাহিত্য' পত্রিকায় হীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয়ও বইখানির সুদীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ করেন।

জীবন মৃত্যুর প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন অধ্যবসায় ও বহু বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে দীনেশ বাবু নিদারুণ মস্তিষ্ক-পীড়ায় শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। এই সময় তিনি ভিক্টোরিয়া স্কুলকে কলেজে পরিণত করিবার উপযোগী সমস্ত ব্যবস্থাই করিয়াছিলেন। স্কুলের স্বত্ত্বাধিকারী দীনেশবাবুর অকৃত্রিম সুহৃদ্ আনন্দচন্দ্র রায় মহাশয় দীনেশবাবুকেই

কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করার বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রাখেন। এই সময় তাঁহার মস্তিষ্ক-পীড়া এরূপ প্রবল ভাব ধারণ করিয়াছিল যে, আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের প্রধান ডাক্তার ফ্রেঞ্চ সাহেব তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন—"দীনেশবাবু আর কোন কালেই লিখিবার শক্তি ফিরিয়া পাইবেন না।"

এই বিপদের সময় দীনেশবাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু, পূর্ব্ববঙ্গের শিক্ষাবিভাগের ইন্সপেক্টর কুমুদবন্ধু বসু এবং আনন্দচন্দ্র রায় মহাশয়দ্বয় তাঁহাকে যে সাহায্য ও সহানুভূতি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা সুবর্ণ অক্ষরে লিখিত হইবার যোগ্য।

চিকিৎসার্থ দীনেশবাবু শয্যাশায়ী হইয়া কলিকাতায় আনীত হইলেন। ১৮৯৭ সালের এপ্রিল মাসে তিনি কলিকাতায় আসিয়া দেখিলেন, সাহিত্য সমাজে তিনি অল্পদিনের মধ্যে সুপরিচিত হইয়াছেন। নগেন্দ্রনাথ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অক্ষয় কুমার বড়াল, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, জলধর সেন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি বহু শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক দীনেশবাবুর ক্ষুদ্র গৃহে আসিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে দেখিয়া যাইতেন। মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন, বৈদ্যরত্ন যোগেন্দ্রনাথ সেন, ডাঃ নীলরতন সরকার এবং মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেন অযাচিত রূপে এবং সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে শুধু তাঁহার চিকিৎসার ভারই গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার পরিবারবর্গেরও চিকিৎসা করিয়াছেন।

চট্টগ্রাম ডিভিসনের কমিসনার এফ. এইচ. স্ক্রাইন, সুপ্রসিদ্ধ সার জর্জ গ্রীয়ারসন প্রভৃতি অনেক ইংরেজ বন্ধুও এই সময়ে দীনেশবাবুর নানা উপকার করিয়াছেন। সার জন উডবার্ণ, মিঃ স্যাভেজ প্রভৃতি রাজপুরুষদের আনুকূল্যে এই সময় স্টেট সেক্রেটারী দীনেশবাবুকে একটি আজীবন সাহিত্যিক-বৃত্তি প্রদান করেন। ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" প্রকাশের সমগ্র ব্যয় প্রদান করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী রাজা রাধাকিশোর মাণিক্য দীনেশবাবুকে একটি সাহিত্যিক-বৃত্তি প্রদান করেন। মৃত্যু পর্য্যন্ত দীনেশবাবু তাহা পাইয়া আসিতেছিলেন। প্রায় দশ বৎসরকাল শয্যাগত অবস্থায় দীনেশবাবু পড়িয়াছিলেন, এই সময়ে তাঁহার লেখা-পড়ার শক্তি ছিল না, কোন উপার্জ্জনের পন্থা ছিল না। কিন্তু সার জন উডবার্ণ ও বরদাচরণ মিত্র প্রভৃতি হিতৈষিগণের চেষ্টায় দীনেশবাবুর সমস্ত আর্থিক অভিযোগ ও অভাব দূর হইয়া গিয়াছিল। দীঘাপাতিয়ার কুমার শরৎকুমাব রায় তাহাকে বহুকাল আর্থিক সাহায্য করিয়াছেন। ময়ূরভঞ্জের

মহারাজা বাহাদুর, শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর দীনেশবাবুকে নানা প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন। এমন কি তাঁহার বাগবাজারের বাড়ী নির্ম্মাণের প্রথম দিককার ব্যয়ভার তাঁহারা বহন করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ লুপ্ত স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিল এবং দীনেশবাবু ইংরেজী ও বাঙ্গলা পত্রিকাগুলিতে রীতিমত লেখা দিতে লাগিলেন। এইরূপ প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি মাসিক ২০০্—২৫০্ টাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। একসময়ে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদকত্বের কালে দীনেশবাবু বঙ্গদর্শনের গুরুতর সম্পাদকীয় কার্যগুলি কবিবরের উপদেশ অনুসারে সম্পাদন করিতেন। শ্রীযুক্তা সরলা দেবী সম্পাদিত ভারতীরও অনেক কাজ তিনি এইভাবে নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

দীনেশবাবুর স্নায়ুদৌর্ব্বল্য অনেককাল ছিল; এই সময় ফরিদপুরে থাকাকালীন সর্পভয় তাঁহাকে এরূপ পাইয়া বসিয়াছিল যে তাহা একটা উৎকট রোগে পরিণত হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন, তিনি এই সময় মনসাদেবীর স্বপ্নাদেশ পাইয়া তদনুসারে জীবন নিয়ন্ত্রিত করেন এবং অচিরে রোগ হইতে মুক্তি লাভ করেন। মনের অতি নিভৃত কোণে তাঁহার যে কৃতজ্ঞতা ছিল তদ্দারা অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি ক্ষুদ্র "বেহুলা" পুস্তকখানি রচনা করেন—উহা কোনকালেই পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, অথচ এই ক্ষুদ্র বইখানির এত বেশী বিক্রয় হইয়াছিল যে, বোধ হয় দীনেশবাবুর আর কোন পুস্তক বাজারে ইহার সমকক্ষতা অর্জ্জন করিতে পারে নাই।

নিতান্ত দুঃখদায়ক রোগ শয্যায় বাল্মীকির রামায়ণ ও বৈষ্ণবদিগের পদাবলী তাঁহার নিত্য সহচর ছিল। বাল্মীকি-রামায়ণের কয়েকটি কাণ্ড তিনি একবারে মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। রামায়ণের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও বহুবর্ষব্যাপী অনুরাগের ফলে তিনি "রামায়ণী কথা" নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করেন, এই বইখানি সুধী-সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। বেহুলার ন্যায়—সতী, জড়ভরত, ফুল্লরা, ধরাদ্রোণ, কুশধ্বজ, মুক্তাচুরী, রাখালের রাজগী, রাগরঙ্গ, সুবল সখার কাণ্ড ও শ্যামলী খোঁজা প্রভৃতি কতকগুলি পুস্তক তিনি রচনা করেন। ইহারা যেরূপ আদরের সহিত সাহিত্যিক সমাজে গৃহীত হইয়াছিল—তাহা অভূতপূর্ব্ব। এই জনপ্রিয়তার কারণ, দীনেশবাবু কখনই এই সমস্ত উপাখ্যান বাজে গল্প বা রূপকথার ভাবে লেখেন নাই। ইহাদের অলৌকিক বর্ণনার মধ্যেও সর্ব্বত্র লেখকের অন্তরের দরদ ও ভক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। দীনেশবাবু আজীবন কথকতা ও কীর্ত্তন শুনিয়া তাঁহার অন্তরের অন্তরতম দেশে যে গূঢ় ভক্তিরস সঞ্চয়

করিয়াছিলেন, এই বইগুলি তাহারই অভিব্যক্তি। "বেহুলা" দীনেশবাবুর পুত্র কিরণচন্দ্র এবং কাপ্তেন পিটাভেল ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। দীনেশবাবু নিজেই সতীর অনুবাদ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক জে. ডি. এণ্ডারসন আই. সি. এস (কেম্‌ব্রিজে বাংলার অধ্যাপক) এই অনুবাদখানির একটি সুদীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন।

হাইকোর্টের বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেন, "দীনেশবাবুর জড়ভরত পড়িয়া আমি বহু অশ্রুপাত করিয়াছি।" "সতী" আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অতিশয় প্রিয় গ্রন্থ ছিল।

১৯০২ সনে দীনেশবাবুর জীবনে আকস্মিক এক শুভপ্রভাত হইল। ঐ সময়ে তিনি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে পরিচিত হন। ঐ সনে পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্তের মৃত্যু হয়। তখনও বি. এ. পরীক্ষার্থীদের বাংলা ভাষা একটা পরীক্ষার বিষয় ছিল, এবং পণ্ডিত রজনীকান্ত বৎসর বৎসর তাহার পরীক্ষক হইতেন। পণ্ডিতজীর পরলোক-গমনের পর সেই পদটি খালি হইল। এই উপলক্ষ্যে দীনেশবাবু মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের (তদানীন্তন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার) সঙ্গে দেখা করেন। সেই ১৯০২ সন হইতে দীনেশবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইয়া পড়েন। পর বৎসর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রিডার' নিযুক্ত হইয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের একখানি ইতিহাস ইংরেজী ভাষায় লিখিতে নিযুক্ত হইলেন; সর্ত্ত এই হইল যে, ইংরেজী বইখানি যেন সম্পূর্ণরূপে মৌলিক হয়। কেহ যেন উহাকে বাংলা বহির ইংরেজী তর্জ্জমা মনে না করেন। দীনেশবাবু এই বিষয়ে প্রায় বিশটি বক্তৃতা পাঠ করেন। সুপ্রসিদ্ধ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বহু সাহেব ও বাঙ্গালী যথা সতীশ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ বিনয় সরকার, ডাঃ রমেশ মজুমদার প্রভৃতি প্রতিভাশালী অনেক ব্যক্তি এই বক্তৃতাগুলির নিত্য শ্রোতা ছিলেন; ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ও বিনয় সরকার প্রভৃতি মনীষিগণ নোট বুকে দীনেশবাবুর অনেক কথা টুকিয়া লইয়া যাইতেন। ভগিনী নিবেদিতা (Miss Margaret Nobel) এই পুস্তকখানির আদ্যন্ত দেখিয়া দিয়াছিলেন। দীনেশবাবুর যৌবনের অন্তরঙ্গ বন্ধু কুমুদবন্ধু বসুও বইখানি একবার দেখিয়া দিয়াছিলেন। এই পুস্তকের বিলাতে যে সমাদর হইয়াছিল তাহা বোধ হয় সাহিত্য ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন বঙ্গীয় অন্য কোন লেখকের ভাগ্যে ঘটে নাই। ডাঃ ওল্ডেনবার্গ, ডাঃ কারণ, ডাঃ গ্রিয়াসরন, ডাঃ সিলভাঁ লেভি ও ডাঃ ব্লক প্রভৃতি

প্রাচ্য বিদ্যার পণ্ডিতগণ এবং বিলাতের প্রসিদ্ধ পত্রিকা-সম্পাদকেরা তাঁহাদের লিখিত সুদীর্ঘ সমালোচনায় যে সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা শুধু প্রশংসা নহে—স্তাবকের উচ্ছ্বাস। শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যক্ষ হাওএলস্ সাহেব একবার দীনেশবাবুকে তাঁহার কলেজ পরিদর্শনার্থ লইয়া যান, এবং এই উপলক্ষ্যে আহূত সভায় বলেন—"আপনারা এই একান্ত অনাড়ম্বর বাঙালী লেখকের নাম অবশ্যই শুনিয়াছেন, হয়ত আপনারা জানেন ইনি একজন বাংলা ভাষার লেখক, কিন্তু আপনারা নিশ্চয়ই জানেন না যে, ইউরোপের এমন কোন প্রসিদ্ধ শিক্ষা-কেন্দ্র নাই যেখানে ডাঃ সেনের নাম সম্মানের সহিত উচ্চারিত হয় না।"

হাওএলস্ সাহেবের ন্যায় জে. ডি. এণ্ডারসন, আই, সি, এস, দীনেশবাবুকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন, "আপনি তাঁহাদের নাম জানেন না, এরূপ বহু শিক্ষিত লোক জগতের নানা স্থানে আছেন, যাঁহারা আপনার লেখার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা বহন করেন।"

শাসনকর্ত্তাদের মধ্যে সার জন উড্‌বার্ণ, লর্ড হার্ডিঞ্জ, লর্ড রোনালড্‌শে, লর্ড লিটন, সার ষ্টানলী জ্যাক্‌সন প্রভৃতি সকলেই দীনেশবাবুর লেখার অনুরক্ত পাঠক ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উপলক্ষ্যে প্রকাশ্যভাবে তাঁহার সাহিত্যিক মৌলিক অবদানের অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। ডাঃ সিলভাঁ লেভি ফরাসী নানা পত্রিকায় দীনেশবাবুর কৃতিত্বের কথা সুদীর্ঘ প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। একখানি পত্রিকায় তিনি লিখিয়াছিলেন—"বঙ্গদেশকে ইউরোপের সুধী সমাজে ঘনিষ্ঠভাবে চিনাইবার জন্য দীনেশবাবু যাহা করিয়াছেন, অন্য কোন লেখক তাহা করিতে পারেন নাই।"

দীনেশবাবু এই সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য পদে নিযুক্ত হন, এবং বিশ বৎসর কাল এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়ে তিনি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রণয়ন করেন, ঃ—History of Bengali Language & Literature; Typical Selections from old Bengali Literature; Chaitanya and His age; Mediaeval Vaisnab Literature; History of Bengali Prose style; Glimpses of Bengal History; Folk Literature of Bengal; The Bengali Ramayanas, ইত্যাদি। শেষোক্ত পুস্তকের সমালোচনা প্রসঙ্গে সার জর্জ্জ গ্রীয়ারসন

বলেন, "জেকবীর পর রামায়ণ সম্বন্ধে এরূপ উৎকৃষ্ট পুস্তক আর বাহির হয় নাই।" তাঁহার Mediaeval Vaisnab Literature সম্বন্ধে Dr. J. D. Anderson বলেন, "শুধু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নহে, এই পুস্তকখানি অক্সফোর্ড, কেম্‌ব্রিজ, ও লণ্ডনের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য হওয়া উচিত।.......ইহার আকর্ষণী শক্তি এত প্রবল যে, আমাদের এই দুঃসময়ে যখন আমার একটি পুত্র যুদ্ধে হত হইয়াছে—তখন এই পুস্তক পড়িয়া আমি অপূর্ব্ব সান্ত্বনা ও শান্তি পাইয়াছি।"

প্রথমতঃ দীনেশবাবু যখন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ইংরেজীতে লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন সার জর্জ্জ গ্রীয়ারসন তাঁহাকে একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, "বিলাতের টাইমস্ পত্রিকা যদি আপনার পুস্তকের সম্বন্ধে দুইটি ছত্রও লেখেন, তবে তাহা আপনার আশাতীত সাফল্য মনে করিবেন।"—কিন্তু শেষে দেখা গেল সেই পত্রিকায় দীনেশবাবুর গ্রন্থের দুই স্তম্ভ ব্যাপী এক সমালোচনা বাহির হইল, ইহার পর টাইমস্ পত্রিকায় দীনেশ বাবুর পুস্তকগুলির মধ্যে অনেকগুলিরই এক স্তম্ভ কি দুই স্তম্ভ ব্যাপী সমালোচনা বাহির হইয়াছে, এবং বিলাতের Spectator, Athenium, Luzacs' Oriental List প্রভৃতি ইংরেজী পত্রে, Revue Critique প্রভৃতি ফরাসী পত্রিকায় Franfurter Zeiting প্রভৃতি জার্ম্মান পত্রিকায় এবং Deutgotic Rund Schon প্রভৃতি ইটালীয় পত্রিকায় দীনেশবাবুর গ্রন্থাবলীর প্রশংসাসূচক সুদীর্ঘ সমালোচনা বাহির হইয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর সঙ্গে তাঁহার যে সমস্ত আলোচনামূলক পত্র ব্যবহার হইয়াছে—তাহা একটি অনতিক্ষুদ্র সাহিত্যিক-খনি স্বরূপ। টাইমস্ পত্রিকায় দীনেশবাবু সম্বন্ধে একবার লিখিত হইয়াছিল যে,—"এই একখানি পুস্তক (History of Bengali Language and Literature) পড়িয়া পাঠক যে অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন, বিলাতি ৫০ জন ভূপর্য্যটকের (Globe trotters) পুস্তকে বা লেখায় তাহা পাইবেন না। লটির ত্রিবাঙ্কুরের মন্দিরের অনুষ্ঠানগুলির কৌতূহল উদ্রেককারী বর্ণনা ও নিভাবিলনের আড়ম্বরপূর্ণ হিন্দু শাস্ত্রের ব্যাখ্যা এই সহজ ও অনাড়ম্বর বইখানির সঙ্গে তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর বোধ হইত।" আর একবার ঐ পত্রিকায় নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল—

"ভবিষ্যতে বঙ্গবাসীর মানসনেত্রে উপকরণ-সংগ্রহ বিষয়ে দীনেশচন্দ্রের বীরভূমির রক্তবর্ণ ভূমি ও পূর্ব্ববঙ্গের নদ-নদীর উপকূলে ভ্রমণ একটা কল্পনা জগৎ বিচিত্র করিয়া দেখাইবে, যেন আবহমান কাল ধরিয়া এক পর্য্যটক গ্রীষ্ম-ঋতুর সৌরকর মাথায় করিয়া

এবং ঝড় বৃষ্টির পথ দিয়া গঙ্গার নিম্ন উপত্যকাতে স্বীয় দেশের ভাষার সমৃদ্ধির জন্য রত্ন সন্ধান করিতেছেন।"

দীনেশবাবু এ পর্য্যন্ত আশুবাবুকে অনেকবার বাংলায় এম-এ পরীক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু সেই মনীষী তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ বরাবরই উপেক্ষা করিতেন। হঠাৎ ১৯১৯ সনে একদিন তিনি দীনেশবাবুকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, "এম-এ-তে বাংলার পরীক্ষা গৃহীত হইবে ঠিক করিয়াছি, আপনি এ্যাণ্ডারসনকে বিলাতে চিঠি লিখুন, পাঠ্য তালিকা ও অষ্টাহব্যাপী পরীক্ষার বিষয়সূচি প্রস্তুত করিতে। তিনি তাহা পাঠাইলে আমরা তাহা বিবেচনা করিয়া সমস্ত ব্যবস্থা সমাধা করিব।" দীনেশবাবু বলিলেন, "এত দিন ধরিয়া আমার অনুরোধ আপনি অগ্রাহ্য করিয়া আসিয়াছেন, হঠাৎ এই মত পরিবর্ত্তনের কারণ কি? আমার নিকট ইহা বড়ই অদ্ভুত বোধ হইতেছে।" উত্তরে আশুতোষ বলিলেন—"এম. এ. পরীক্ষা শুধু বাংলায় সীমাবদ্ধ থাকিবে না, প্রাদেশিক অন্যান্য ভাষা-ভাষী লোকদের জন্যও দ্বার খোলা রাখিব, অথচ বাংলা ভাষা এখনও জগতে এরূপ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই যে—সকলেই তাহা বুঝিবে। এজন্য ইংরেজী ভাষায় ইহার ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ক বই থাকা চাই, যতদিন যাবত আপনারা এইরূপ অনুরোধ করিয়াছেন, ততদিন প্রধানতঃ আমি আপনার দ্বারা উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক লিখাইয়া লইয়াছি। এখন এই কাজ অনেকটা সম্পূর্ণ হইয়াছে—আমরা এইবার বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করিতে পারি।"

প্রায় ২৩।২৪ বৎসর কাল দীনেশবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং বাংলা বিভাগের কর্ণধার ছিলেন। এই সময় তিনি অধিকাংশ পুস্তকই ইংরেজীতে লিখিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া বাংলা লেখা তিনি ছাড়িয়া দেন নাই। ইহার মধ্যে তিনি 'ওপারের আলো', 'নীলমাণিক,' 'আলো আঁধারে', 'চাকুরীর বিড়ম্বনা', 'তিনবন্ধু' 'সাঁজের ভোগ', 'বৈশাখী' প্রভৃতি কতকগুলি উপন্যাস রচনা করেন।। নীলমাণিক নামক গল্পের বই-এর বিস্তৃত সমালোচনা বিলাতের Times পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। 'গৃহশ্রী'র ১৮শ সংস্করণ চলিতেছে।

দীনেশবাবুর শেষ দিককার সাহিত্যিক প্রচেষ্টাও কম মূল্যবান নহে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া 'বৃহৎ বঙ্গ' নামক অপূর্ব্ব ও বিরাট ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ৪।৫ বৎসরের প্রাণান্ত চেষ্টায় এই বইখানি লিখিত

হয়। বাংলা দেশের সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থ-নীতি ও ধর্ম্ম এবং সুকুমার কলা সম্বন্ধে যাহারা কিছু জানিতে চাহিবেন, এই পুস্তকখানি তাহাদের অপরিহার্য্য সঙ্গী স্বরূপ হইবে। এই একখানি বই পড়িয়া লোকে বঙ্গদেশ সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিবে, স্বয়ং দীর্ঘকাল বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়াও পাঠক সেরূপ তত্ত্বগ্রাহী হইতে পারিবেন না। বঙ্গবাসী এই পুস্তক সাদরে গ্রহণ করিয়াছে, নতুবা অল্প দিনের মধ্যে ৪০০০্ টাকার পুস্তক বিক্রয় হইবে কিরূপে? বিশ্ববিদ্যালয় এই পুস্তক প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

দীনেশবাবুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান, ময়মনসিংহ গীতিকা (নামান্তর পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা)। শ্রীযুক্ত চন্দ্র কুমার দে নামক এক দুঃস্থ ও ভগ্ন-স্বাস্থ্য যুবকের 'কেনারাম' শীর্ষক একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উদ্ধৃত গুটি কতক পংক্তি পাঠ করিয়া তিনি বুঝিতে পারেন যে, বঙ্গীয় পল্লীবাসীদের গল্প বলিবার একটা বিশেষ ভঙ্গী আছে। এই প্রবন্ধটি ময়মনসিংহের 'সৌরভ' নামক একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল ও তাহাতে উক্ত কবিতার মাত্র ৮।১০ টি পংক্তি উদ্ধৃত হইয়াছিল। দীনেশবাবু চন্দ্র কুমার দের খোঁজ করিয়া জানিলেন, তিনি অতি নিঃস্ব, লেখা পড়া সামান্যই জানেন, এবং সম্প্রতি মস্তিষ্ক রোগে আক্রান্ত হইয়া একবারে কাজের বাহির হইয়া গিয়াছেন। ঐ কেনারামের মূল কবিতাটি পাওয়া যায় কিনা, বহু অনুসন্ধান করিয়াও তিনি তাহার সন্ধান পাইলেন না। দুই বৎসর পরে চন্দ্রকুমার কতকটা সুস্থ হইয়া কলিকাতায় আসিয়া দীনেশবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি দীনেশবাবুর অনুরোধে আরও দুই একটি পল্লী গীতি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। দীনেশবাবু বুঝিলেন, এই কবিতা কয়েকটি খাঁটি সোণার খনি হইতে পাওয়া। চন্দ্রকুমারবাবু গ্রাম্য কৃষকদের সঙ্গে মিশিয়া এই গীতিগুলির প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু দীনেশবাবু যখন তাঁহাকে এইগুলি সংগ্রহ করিতে বলিলেন, তখন তিনি ভড়কাইয়া গেলেন এবং বলিলেন, "এগুলি নিরক্ষর কৃষকদের গান, ইহাদের ভাষা পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীর নিতান্ত অমার্জ্জিত ভাষা, শিক্ষিত সমাজ এসব গান পাঠ করিয়া ঠাট্টা করিবে।" কিন্তু দীনেশবাবুর একান্ত আগ্রহ ও আশুবাবুর প্রদত্ত আর্থিক সাহায্য ও উৎসাহ পাইয়া তিনি অবশেষে এই কার্য্যে উৎসাহ দেখাইলেন। দীনেশবাবু এই সকল পালাগানের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলেন। ইউনিভারসিটির আর্থিক অবস্থা তখন অতীব শোচনীয়। গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে আশুবাবুর নানা বিষয়ে মতান্তর হওয়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের

সরকারী দান বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, তথাপি তিনি অবিরত দীনেশবাবুকে উৎসাহ দিলেন এবং প্রথম খণ্ডের ইংরেজী অনুবাদ ও মূল কবিতা এই দুই ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ে প্রকাশিত হইল। মহুয়ার ইংরেজী অনুবাদ পড়িয়া ইউরোপের পণ্ডিত মণ্ডলী বঙ্গীয় নিরক্ষর চাষাদিগের কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইলেন। তৎকালীন বঙ্গের লাট লর্ড রোনাল্ড্‌সে (বর্ত্তমানে লর্ড জেটল্যাণ্ড) প্রথম খণ্ডের একটি ভূমিকা লিখিলেন এবং বিলাতের বহু মণীষী পণ্ডিত এই গীতিকাগুলির বিশেষ প্রশংসা করিয়া নানা বিলাতি পত্রিকায় সমালোচনা করিতে লাগিলেন। এই সময় দীনেশচন্দ্র বঙ্গেশ্বর লিটন সাহেবকে পল্লী-গীতিকাগুলি প্রকাশের ব্যয়ের জন্য আবেদন করিলেন। এবং সেই আবেদনের ফলে কয়েক সহস্র টাকা সরকারের মঞ্জুরী পাওয়া গেল। পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য স্থান হইতে এই পল্লী গাথাগুলি পাওয়া যাইতে লাগিল এবং দ্বিতীয় ভাগে ইহার ময়মনসিংহ গীতিকা নামটি পরিবর্ত্তিত হইয়া "পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা" নাম দেওয়া হইল। কর্ম্মী আরও অনেক আসিয়া জুটিল। দীনেশবাবু বিস্তারিত ভাবে লিখিত উপদেশ দিয়া ইঁহাদিগকে মফঃস্বলে গীতিকা সংগ্রহ করিতে নিযুক্ত করিলেন। সংগ্রাহকদের মধ্যে প্রধান শ্রীযুক্ত চন্দ্র কুমার দে ছাড়াও শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী, বিহারী লাল চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি আরও কয়েকজন উৎকৃষ্ট গীতিকা সংগ্রহ করিয়াছেন। মূল ও বঙ্গানুবাদ সমেত, চারি খণ্ডে (৮ ভাগে) গভর্ণমেণ্টের অর্দ্ধেক আর্থিক সাহায্যে এই গীতিকাগুলি বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এই কয়েক খণ্ডে মোট ৫৮টি গীতিকা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাদের প্রশংসা যে কিরূপ উচ্ছ্বাসপূর্ণ তাহা নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি ছত্রে প্রতিপন্ন হইবে ঃ—

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"বাংলা প্রাচীন সাহিত্যে মঙ্গল কাব্য প্রভৃতি কাব্যগুলি ধনীদের ফরমাসে ও খরচে খনন করা পুষ্করিণী, কিন্তু ময়মনসিং গীতিকা বাংলা পল্লীহৃদয়ের গভীর স্তর থেকে স্বত উচ্ছ্বসিত উৎস, অকৃত্রিম বেদনার স্বচ্ছ ধারা। বাংলা সাহিত্যে এমন আত্মবিস্মৃত রসসৃষ্টি আর কখনো হয়নি। এই আবিষ্কৃতির জন্যে আপনি ধন্য।"

একটি বিখ্যাত ফরাসী চিত্র-সমালোচক লিখিয়াছিলেন—

"এই গীতিকাগুলি জগতের সাহিত্যের প্রথম পংক্তিতে স্থান পাইবে এবং যুগে যুগে ভবিষ্যৎ বংশীয় পাঠকেরা ইহাদের নব নব সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করিবে, নারী

চরিত্রগুলি সেক্ষপীয়র ও রেসনির রমণীর চরিত্রের মত যুরোপের ঘরে ঘরে পাঠ হওয়ার যোগ্য। মেটারলিঙ্কের নাটকে খুঁৎ ধরা যায় কিন্তু এগুলি একবারে নিখুঁৎ।"

বিলাতের সুবিখ্যাত চিত্রশিল্পী ও সমালোচক সার উইলিয়ম রথন্ ষ্টাইন্ লিখিয়াছেন, "অজন্তা, বাগ ও ইলোরা প্রভৃতি স্থানে যাহা চিত্রিত দেখিয়াছিলাম, ভারতনারীর সেই অপরূপ রূপ বঙ্গপল্লী-গীতিকায় জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।"

সিলভাঁ লেভি বলিয়াছেন—"আমাদের শীতার্ত্ত প্রকৃতির ক্রোড়ে বসিয়া মহুয়া পাঠ করিয়া মনে হইল, ভারতের উষ্ণ আবহাওয়ায় শীত ও বসন্ত ঋতুর দৃশ্য উপভোগ করিতেছি—নায়ক-নায়িকার প্রেম-কথা অপূর্ব্ব পরিবেষ্টনীর মধ্যে কি সুন্দরভাবে বিকাশ পাইয়াছে!"

অধ্যাপক ডাঃ ষ্টেলা ক্রেমরিশ লিখিয়াছেন—"মহুয়ার অনুবাদ পড়িয়া বাড়ীতে আসিয়া আমি তিনদিন জ্বরে ভুগিয়াছিলাম। এই তিনদিন স্বপ্নে জাগরণে কাব্যের নদের চাঁদ, মহুয়া, পালঙ্ক সখী ও হোমরা বেদে আমি যেন চক্ষে দেখিয়াছি। সমস্ত ভারতীয় সাহিত্যে আমি মহুয়ার ন্যায় আর একটি গল্প পড়ি নাই।"

বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তা মিঃ ওটেন লিখয়াছেন, "মিলের ধোঁয়া ও ধূলি বালিতে আচ্ছন্ন সহরের মলিন আকাশ দেখিতে অভ্যস্ত চক্ষু যদি সহসা পূর্ব্ববঙ্গের অবাধ নদ নদী ও মুক্ত আকাশ বাতাসের সম্মুখীন হয়, তবে তাহার মনের ভাব যেমন হয়—কৃত্রিম ও পাণ্ডিত্যের আড়ম্বরপূর্ণ সাহিত্য পড়িয়া ক্লান্ত মন এই জীবন্ত পল্লীগীতিকা-পাঠে তেমনই তৃপ্তি লাভ করিবে।"

এ্যামেরিকান সমালোচক এ্যালেন লিখিলেন, "এই গীতিকাগুলি পাঠ করিয়া মনে হইল বাঙ্গালী জাতি যৌবনের স্ফূর্ত্তি কিছুমাত্র হারায় নাই, বহু সহস্র বৎসরের সংস্কৃতির পরে তাহারা আজও পাশ্চাত্য দেশের লোকের মত সক্রিয় ও জীবন্ত আছে, ইহাদের সঙ্গে আমাদের জ্ঞাতিত্ব ও ভাব-সাম্য এই গীতিকাগুলি পড়িয়া আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিলাম। যে পরিমাণে এই প্রাচীন গীতিকাগুলির মর্ম্ম বঙ্গীয় পাঠকেরা গ্রহণ করিতে পারিবে সেই পরিমাণে তাহারা ভাবী উন্নতির পথে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।"

লর্ড রোণাল্ডসে (মারকুইস অব জেটল্যাণ্ড) লিখিলেন, "আমাদের প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তারা এদেশের লোকের চরিত্রের পরিচয় ভাল করিয়া জানিতে চাহিলে তাহাদের প্রত্যেকের এই গীতিকাগুলি ভাল করিয়া পাঠ করা উচিত।"

বহু সুদীর্ঘ সমালোচনা ও মন্তব্য হইতে উপরে অতি সামান্য কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইল।

গত বৎসর সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক রোঁমা রোঁলার বিদুষী ভগিনী দীনেশচন্দ্রের এই পল্লী-গীতিকা হইতে দশটি গীতি ফরাসী ভাষায় অনুবাদিত করেন। প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী মিসেস এ্যাণ্ড্রি পারকল্‌স হগম্যান এই পুস্তকখানি নানা চিত্র পরিশোভিত করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। ফরাসী দেশে এই পুস্তকখানি বিশেষরূপে আদৃত হইয়াছে, এবং এই গীতিকা-গুলির মর্ম্মকথা এবং ইহাদের উচ্চপ্রশংসা রেডিও যোগে ফরাসী দেশের সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইয়াছে। এই দুঃসময়েও গীতিকাগুলির সুইডিস ভাষায় অনুবাদ হইবার কথা চলিতেছে।

দীনেশবাবুর পাণ্ডিত্য ও সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা তাঁহাকে স্বদেশে ও বিদেশে বিদ্বান্. জনমণ্ডলীর মধ্যে বিশিষ্ট স্থান দিয়াছে। ম্যাডেলিন রোঁলা তাঁহাকে Savant অর্থাৎ আচার্য্য বলিয়া উল্লেখ করিয়া সংক্ষেপে তাঁহার জীবনী ও তদ্‌রচিত পুস্তক-তালিকা প্রদান করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহার কীর্ত্তি স্বর্ব্ববাদিস্বীকৃত হইয়াছে। প্রথম যৌবনে যিনি বাংলার লুপ্তপ্রায় শত শত প্রাচীন গ্রন্থ আবিষ্কার করিয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, প্রৌঢ় বয়সে যিনি বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনা করিয়া বাংলা ও ইংরেজীতে বহু সরস প্রবন্ধে চৈতন্যজীবন ও রাধাকৃষ্ণ-লীলা সুললিত ও মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—বার্দ্ধক্যে যিনি বঙ্গদেশের জাতীয় জীবন ও তাহার শিক্ষা সংক্রান্ত, এবং সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্ম্মনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন এবং জীবন সায়াহ্নে যিনি বঙ্গপল্লীর অপূর্ব্ব সম্পদ পল্লী-গীতিগুলি প্রকাশিত করিয়া বঙ্গসাহিত্যের একটা নূতন দিক উদ্ভাসিত করিয়াছেন,— শৈশব হইতে জীবনে যিনি কোনদিন বিশ্রাম প্রার্থী হন নাই, যাঁহার রচনার লালিত্য ও মধুর ভাষা পাঠকের মর্ম্ম স্পর্শ করিয়া শতবার চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত করিয়াছে—তাঁহার প্রতি বাঙালীমাত্রেই কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। লণ্ডনের টাইমস্ পত্রিকা একদা তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিল, "কি বাঙ্গলা, কি ইংরেজী যে ভাষায় দীনেশচন্দ্র লেখেন—তাঁহার রচনার একটা মর্ম্মস্পর্শী শক্তি সকলেই স্বীকার করিবেন।" ডাঃ সিল্‌ভাঁ লেভি লিখিয়াছিলেন, বঙ্গদেশকে পাশ্চাত্য জগতে প্রচারিত করিবার পক্ষে দীনেশবাবুর মত আর কোন লেখক সফল প্রচেষ্টা করেন নাই, এবং টাইমস্ পত্রিকায় পুনরায় লিখিয়াছিলেন, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যকে পাশ্চাত্য জগতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাহা পারেন নাই।

পল্লী-গীতিকাগুলি লইয়া তিনি "পুরাতনী" নামক সম্প্রতি প্রকাশিত পুস্তকে লিখিয়াছেন—ইহাতে বঙ্গীয় প্রাচীন মুসলমান মহিলাদের আদর্শ জীবনী লিখিত হইয়াছে এবং এই পুস্তকে যে সকল হিন্দুরমণীর কথা প্রচারিত হইল তাহা পড়িয়া পাঠকগণ দেশের মেয়েদের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। দীনেশবাবুর আর একখানি সুলিখিত বাংলা পুস্তক "পদাবলী মাধুর্য্য" এবং বহুপূর্ব্বে লিখিত 'রেখা' নামক একখানি গদ্য গ্রন্থ। দীনেশবাবু যে কত প্রবন্ধ সাময়িক, মাসিক ও দৈনিক পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন।

যে বৎসর প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত "ডাক্তার অব লিটারেচার (ডিলিট)" উপাধি গ্রহণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্মানিত করেন, সেই বৎসর লর্ড রোণাল্ডসে, সিলভাঁ লোভ প্রভৃতি ৭।৮ জন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের সঙ্গে তিনজন বাঙালী ডাক্তার অব ফিলজপি ও ডাক্তার অব লিটারেচার উপাধি দ্বারা সম্মানিত হন;—ব্রজেন্দ্র শীল; অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দীনেশচন্দ্র সেন। দীনেশচন্দ্র ভারতমহামণ্ডলী কর্ত্তৃক "পুরাতত্ত্ব বিশারদ" এবং নবদ্বীপ বিদ্বৎমণ্ডলী কর্ত্তৃক "কবিশেখর" এবং গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন।

যাঁহারা দীনেশচন্দ্রের সাহিত্যিকগুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও জীবনের চিরসহায় স্বরূপ হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ষ্টাটুটারী সিভিলিয়ন বরদাচরণ মিত্র, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মারকুইস অফ্ জেটল্যাণ্ড, ডাঃ জে. ডি এণ্ডার্সন, সন্তোষের রাজা প্রমথনাথ রায় চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম সর্ব্বাগ্রগণ্য।

আচার্য্য দীনেশচন্দ্রের কর্ম্ম-শক্তি ছিল অসাধারণ, শেষ বয়সে অতিরিক্ত পরিশ্রমে তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য ও কঙ্কালসার, তথাপি রাতদিন তিনি সাহিত্যের জন্য শ্রম করিয়াছেন, তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ ও পুস্তকে যৌবনোচিত সরসতা, ভাবমাধুর্য্য ও করুণ রস শেষ পর্য্যন্ত উৎসারিত হইয়াছে, জীর্ণ ও শুষ্ক খর্জ্জুর গাছের ন্যায় আসন্ন মৃত্যু সম্মুখে লইয়া প্রতিকূল অবস্থার আঘাত সহ্য করিয়া তিনি অজস্র রসধারা অক্লান্তভাবে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। এই পুস্তকে যে সকল নারীচরিত্র প্রদত্ত হইল, তাহা বঙ্গীয় পল্লীগীতিকা হইতে সঙ্কলিত। মূল গীতিকাগুলি পূর্ব্ববঙ্গের পাড়া-গেঁয়ে ভাষায় লিখিত,—তাহা সকলের সহজবোধ্য নহে। দীনেশবাবুর সহজ ও সরল ভাষায় লিখিত এই উপাখ্যানগুলি সকলেই উপভোগ করিতে পারিবেন, আশা করা যায়।

ব্যক্তিগত জীবনে দীনেশচন্দ্রের মত সদালাপী, নিরহঙ্কার, উদার, স্নেহশীল, ও সরল মানুষ খুব কমই দেখা যায়। এই আত্মভোলা মানুষটির কাছে সাহিত্যই ছিল ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সাহিত্য-বিষয়ক চিন্তায় তাঁহার চিত্ত আচ্ছন্ন ছিল। ১০ নভেম্বর কালীপূজার রাত্রে 'বাংলার পুরনারী' সংক্রান্ত প্রুফ দেখা ও লেখা শেষ করিয়া তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন; ২০শে নভেম্বর জগদ্ধাত্রী পূজার দিন সন্ধ্যা সাতটায় তাঁহার জীবনান্ত হয়। অসুস্থতার মধ্যেও তিনি প্রায়ই আমাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইয়া এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিতেন। জ্ঞান হারাইবার কিছুক্ষণ আগে তিনি আমাদের জানান যে বইখানি তিনি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করিতে ইচ্ছা করেন। মৃত্যুর দুদিন আগে নিজের পরিবারবর্গের ভবিষ্যত-চিন্তায় তিনি বিচলিত হন এবং অতিকষ্টে উঠিয়া বসিয়া একখানি চেক্ সই করেন। এই অসুখের প্রারম্ভ হইতেই তিনি যেন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার এ পৃথিবীর মেয়াদ শেষ হইয়াছে। দীনেশচন্দ্র ফুল বড় ভালবাসিতেন। মৃত্যুর দিন বেলা দুইটার সময় তিনি বলেন, "আমার জন্যে সুবাস দেশী ফুল এনে দাও, সাদা ফুলের গন্ধ ভেসে আসুক আমার ঘরে। দরজা জানালা সব খুলে দাও, আলো আসুক, বাতাস আসুক।" মৃত্যুকে তিনি বরণ করিয়াছিলেন, একান্ত সজ্ঞানে, শান্ত সমাহিত উদ্বেগহীন নির্ব্বিকার চিত্তে।

ভূমিকা

এই পুস্তকে যে কয়টি প্রাচীন যুগের বঙ্গ ললনার আখ্যায়িকা প্রদত্ত হইল তাহাদের মধ্যে রাণী কমলা সম্বন্ধে আমরা দুইটি পল্লীগীতি পাইয়াছি, প্রথমটিতে তাঁহার নামে একটা বৃহৎ দীঘিকা খনন করিতে রাজাকে রাজ্ঞীর অনুরোধ, দীঘি খনিত হইলেও জল না পাওয়া যাওয়ায় শুষ্কোদ্ধারের জন্য রাণীর আত্ম-বিসর্জ্জন এবং বিরহ-বিধুর রাজার পত্নীশোকে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া। দ্বিতীয় গীতিকাটিতে সংক্ষেপে পূর্ব্বোক্ত আখ্যায়িকা বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু উপসংহারে জঙ্গলবাড়ির ভূঞা-রাজা ঈশা খাঁ কর্ত্তৃক শিশু রাজাকে বন্দী করিয়া লইয়া যাওয়ার বৃত্তান্ত এবং সুসুঙ্গের গাড়ো প্রজাদের অসমসাহসিক চেষ্টার ফলে কুমারকে উদ্ধার করার কথাও দেওয়া হইয়াছে।

এই গীতিকাগুলির মধ্যে কাজলরেখা ও রাজা তিলকবসন্তের উপাখ্যান অনেকটা কল্পনামূলক।

কাজলরেখা ধর্ম্মমতি শুকের মুখে উপদেশ শুনিতেছেন এবং সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক সূঁচ অদ্ভুতভাবে জীবনরক্ষা প্রভৃতি ঘটনাবলীর মধ্যে অপ্রাকৃত কথারই প্রাধান্য—বাস্তবতার সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক অল্প। রাজা তিলকবসন্তের অতিথি-বেশী কর্ম্মপুরুষের অভিশাপে বনবাস, সূলা রাণীর স্পর্শ মাত্র আবদ্ধ ডিঙ্গার জলে ভাসা, ইষ্টমন্ত্র স্মরণ করিয়া রাণী নিজ দেহে কুষ্ঠ রোগের আবির্ভাব করা, রাজা তিলকবসন্তের প্রার্থী ব্রাহ্মণকে স্বীয় চক্ষু দান, রাণীর স্পর্শে চক্ষুপ্রাপ্তি ইত্যাদি অলৌকিক ঘটনার ছড়াছড়ি।

এই দুইটি কাহিনীতে নিছক কল্পনার খেলা দেখা যায়। কিন্তু বঙ্গীয় সৃষ্টির মধ্যে একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। বাঙালী যাহা কল্পনা দিয়া আরম্ভ করে ধীরে ধীরে তাহা গুছাইয়া সত্যকার বিষয়ে পরিণত করে। শিশু যেমন ঘরের বাহিরে ছুটিয়া খেলিয়া যখন ক্লান্তি বোধ করে তখন বাড়ীতে আসিয়া মা কি দিদিমাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া প্রকৃত

বাৎসল্য উপভোগ না করা পর্য্যন্ত শান্তি পায় না, বাংলার প্রাচীন লেখকেরাও সেইরূপ অবাস্তব ও অপ্রাকৃত কথা দিয়া যে সকল বিষয়ের অবতারণা করে তাহা অচিরাৎ বাস্তব জগতের কথায় পরিণত করিয়া খাঁটি বাস্তব রস দ্বারা তাহা জীবন্ত করিয়া তোলে।

এই দুইটি কাহিনীতেও এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। আরম্ভে কাজল রেখা কতকগুলি অলৌকিক কথার একটা রহস্যের মত আবির্ভূত হইল। সে নাকি পিতার সংসারে থাকিলে সংসারের সর্ব্বনাশ হইবে, তাহাকে মৃত স্বামীর সহিত বিবাহ দিতে হইবে। এই অসম্ভব অপ্রাকৃত ঘটনার মধ্যে তাহার আবির্ভাবের পরিকল্পনা এবং ইহার ভবিষ্যৎ বাণী করিলেন একটা বনের পাখী। সেই পাখীর কথায় একান্ত নির্ভরপরায়ণ ধনেশ্বর সাধু তাঁহার হৃদয়ের মণি-মাণিক্যের হারের মত দুলালী কন্যাকে নিঃসহায়ভাবে ভীষণ জঙ্গলে একটা শবের পার্শ্বে রাখিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

অলৌকিকতার উপর এইখানেই একরূপ তৎসময়ের জন্য যবনিকা পড়িল এবং তাহার পরে কল্পনার অদৃশ্য সলিল-তল হইতে জন্মিলেন সত্যকার কাজলরেখা। যে সকল কল্পনার আবর্জ্জনার মধ্যে তাঁহার জন্ম এবার তাহার কোন চিহ্ন তাঁহার মধ্যে নাই—তিনি একান্তভাবে রমণীকূল-লাঞ্ছন দেবী মূর্ত্তি, তাঁহার অমলধবল রূপের মধ্যে আবর্জ্জনা বা কর্দ্দমের লেশ নাই—তিনি পুনঃ পুনঃ অতি কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হইতেছেন এবং সোনাকে পুনঃ পুনঃ কষিলে যেরূপ তাহার রূপ আরও ফুটিয়া উঠে, সেইরূপ সেই সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি উজ্জ্বলতর হইয়া দেবী প্রতিমা হইয়া উঠিলেন। কঙ্কণ দাসীর চক্রান্তে, যিনি হইবেন রাজরাণী তিনি দাসী হইলেন। এত বড় বিড়ম্বনা সহ্য করিয়াও তিনি চুপ করিয়া রহিলেন, তিনি বুঝিলেন, তাঁহার প্রতি দৈব বিরুদ্ধ—ইহার প্রতিকূলে দাঁড়াইলে তিনি জয়ী হইতে পারিবেন না। অনেক নির্দ্দোষী লোকে বিচারালয়ে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়া থাকে, এবং খুনী নির্দ্দোষী হইয়া মুক্তি পায়। এইজন্য মহাপুরুষ বলিয়া ছিলেন যখন বুঝিবে, তুমি অদৃষ্টের ফেরে পড়িয়াছ, তখন গায়ের জোরে অদৃষ্টকে ঠেকাইতে যাইও না, resist no evil. কাজল তাঁহার হাতের কঙ্কণ দ্বারা ক্রীতদাসীর হাতে কত লাঞ্ছনা পাইতেছেন, কিন্তু সক্রেটিসের মত হাসি মুখে বিষ গিলিয়া ফেলিতেছেন। যখন অহেতুক অভিযোগে তিনি নির্ব্বাসিত হইলেন এবং তাঁহার পরম হিতৈষী শুক পাখীও তাঁহার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন, তখন তিনি বুঝিলেন, অবস্থা এখন দৈব-নিয়ন্ত্রিত। সকলের জীবনেই এইরূপ দুঃসময় আসে। তখন বন্ধু শত্রু হয়, যাহা দিবালোকের ন্যায় সত্য, তাহা কোয়াসার মত মিথ্যা ও তিমিরাবৃত হয়—এইরূপ

সময়ে পরের উপর রাগ করিলে কি হইবে? তিনি কাহারও উপর কোন রাগ করিলেন না। নির্ব্বাসনের দণ্ডটা তাঁহার প্রাণে বেশী দাগা দিল—এত কষ্টের মধ্যে এইটুকু সুখ তাঁহার ছিল, স্বামীর মুখখানি দেখা। ভগবান তাঁহাকে এই সুখটুকু হইতেও বঞ্চিত করিলেন।

কাজল চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে সকলের নিকট বিদায় নিতেছেন। কতটা উদারতা ও ক্ষমাশীলতা থাকিলে তিনি কঙ্কণ দাসীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে পারেন তাহা অনুমান করুন! এই ক্ষমা চাওয়া সত্যকার ক্ষমা গুণ, পাঠক মনে ভাবিবেন না কাজল এখানে ক্ষমাশীলতার অভিনয় করিতেছেন। সত্যই তিনি দাসীর কাছে ক্ষমা চাহিয়াছিলেন, এখানে তিনি মানবী নহেন—দেবী। তিনি কোটীশ্বরের একমাত্র তরুণ পুত্র প্রদত্ত প্রলোভন এক কথায় উড়াইয়া দিয়াছেন। এই উপেক্ষাশীলার সতীত্ব-ধর্ম্ম বাঙালী অনেক মেয়েরই ছিল, এজন্য এ বিষয়টি লইয়া বেশী কোন মন্তব্য করার প্রয়োজন নাই; যে-দিন তিনি বাপের বাড়ীতে ঢুকিলেন, তখন তাঁহার মাতা পিতার স্নেহ-নিদর্শন প্রতিটি কক্ষ দেখিয়া বাৎসল্যে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া গেল, কোন কক্ষে স্বর্ণ-ঝিনুকে মা তাঁহাকে দুধ খাওয়াইতেন, কোন কক্ষে ঘুম-পাড়ানিয়া গান গাহিয়া তাঁহাকে কোলে করিয়া ঘুম পাড়াইতেন—পর পর এই দৃশ্যগুলি দেখিয়া সেই অনাথা বালিকার হৃদয় মথিত করিয়া যে কয়েক বিন্দু তাঁহার নয়ন কোণে দেখা দিয়াছিল তাহা অশ্রু নহে—মুক্তা।

রত্নেশ্বর তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন, কাজল এই প্রস্তাবে কতকটা রহস্য কতকটা স্নেহের অভিনয়ের মধ্যে যে সভা আমন্ত্রণ করিলেন, সে স্থানটিতে আমরা অনুমান করিতে পারি, শুকের করুণ কণ্ঠের বর্ণনা, এককোণে দাঁড়াইয়া তখন তিনি কিরূপ মর্ম্মবিদারী দুঃখের সহিত তাহা নীরবে শুনিতেছিলেন এবং সভাগৃহের অন্য কোণে অবস্থিত তাঁহার স্বামী সূঁচ রাজার প্রতি কি অসীম প্রেমে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন।

সুতরাং একটা অবাস্তব কথা—জীবনের কতগুলি মহাসত্যকে কিরূপভাবে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছে, তাহা শেষ পর্য্যন্ত পড়িলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন। কাজল-রেখার চিত্রাঙ্কন, রন্ধন-ক্ষমতা, তাঁহার সুডৌল সৌম্য-সুন্দর মূর্ত্তিতে রাজ্ঞী-জনোচিত মহিমা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অপার ক্ষমা, এই সকল স্বর্গীয় গুণরাশির নন্দনবনের ফুল দিয়া কবি আমাদিগকে যে উপহার দিয়াছেন, সেরূপ একখানি চিত্র আধুনিক কেহ দিতে পারিবেন না— যেহেতু সে পুরাতন আবেষ্টনী এখন আর নাই—এখন ক্ষমাগুণ ও সহিষ্ণুতা এ যুগে তাহাদের মূল্য হারাইয়াছে।

তিলকবসন্তের চিত্রে ও রাণী সুলার চিত্রে এইরূপ অবাস্তবের মধ্যে বাস্তব রস উদ্রেকের সুযোগ দিয়াছে। সুলার প্রেম স্বর্গীয় পারিজাত-কুসুম—কাঠুরিয়া ও কাঠুরাণীরা যখন তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিয়া অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেছে—তখন রাণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন, আমার নিজের দেহের সুখ-দুঃখ-বোধ কিছুমাত্র নাই, তোমরা আমার মাংস কাটিয়া ছিঁড়িয়া ফেল তাহাতে আমি দুঃখ বোধ করিব না, কিন্তু যিনি রাজ্যেশ্বর, যাঁহার মাথায় সোনার ছত্র ছিল, শত শত কিঙ্কর যাঁহার সেবায় ব্যস্ত থাকিত, সেই মহারাজ আজ তিন দিন তিন রাত্র ভোলানাথের মত ক্ষুধার জ্বালায় বনে বনে বেড়াইতেছেন, আমি তাঁহাকে খাইবার জন্য একটু কিছু দিতে পারি নাই, এ কষ্ট যে অসহ্য! কি সুন্দর এই গল্পে কাঠুরিয়া কাঠুরাণীদের ছবি! তাহারা কেহ গাছের পাতার টোপায় তাঁহাকে জল দিতেছে; কেহ মধুর চাক ভাঙ্গিয়া রাণীকে রস খাওয়াইতেছে, কেহ ব্যজনী হস্তে বাতাস করিতেছে, কেহ বা হায় হায় করিয়া কাঁদিতেছে। তারপর কাঠুরিয়ারা সকলে মিলিয়া কি আনন্দে রাত্রি দিন জাগিয়া গাছ, ডাল ও পাতায় রাজা ও রাণীর জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিল!

সুতরাং আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি সে কথা প্রমাণ হইতেছে যে অবাস্তব গল্পগুলি বাঙ্গালী-কবিদের হস্তে পড়িয়া এই দেশের অনুরাগনিষ্ঠা ও আদর্শ জীবনের প্রেরণা পাইয়া দেব-দেবীর মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে। এই গীতিগুলির অপ্রাকৃত অংশ শুধু শিশুদের মনোরঞ্জনের উপযোগী হয় নাই, তাহা আপামর সাধারণের উপভোগ্য হিতগর্ভ আখ্যায়িকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বনের ফলমূল দিয়া কবিরা দেবভোগ ও দেবনৈবেদ্য সৃষ্টি করিয়াছেন।

রাণী কমলার গল্পে কিছু অংশ অপ্রাকৃতের সঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ঘটনার ভিত্তি দৃঢ় সত্যকার ইতিহাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। কবি বাস্তব কাহিনীটির চতুর্দ্দিকে একটা কবি-কল্পনার সৌন্দর্য্য-কুহকের পরিবেষ্টনী দিয়াছেন, যাহাতে বাস্তব স্বর্গীয় জ্যোতি লাভ করিয়া সুন্দর হইয়াছে। আঁধা বঁধুর গল্পে অলৌকিক কিছুই নাই—তথাপি বাস্তব জগতে এমন অন্ধ ও এমন প্রণয়িনীর পরিকল্পনার দৃষ্টান্ত সুদুর্লভ, মনে হয় এই কাব্য-কথা যেন বাংলার বাঁশীর একটা সুর। রাজকন্যা পতিকে ছাড়িয়া বাহিরের ডাকে বাহিরে পিছনে যাইতেছেন, অন্ধের মনে যে অনুরাগ জন্মিয়াছে তাহার শক্তি এত বড় যে তিনি প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বাঁশী নদীর জলে ভাসাইয়া দিতেছেন, কবি অঘটন কত ঘটনাই ঘটাইতেছেন, রাজা বাঁশী শুনিয়া অর্দ্ধেক রাজত্ব ভিখারীকে দিয়া ফেলিতেছেন,

সতীকন্যা স্বামীকে ছাড়িয়া অসতীর মত পরপুরুষের পিছনে পিছনে যাইতেছেন, —কিন্তু এই সমস্ত অলৌকিক লীলার কোনও স্থানে এক বিন্দুও মনে আঘাত করে না, সকল দৃশ্যই সুখদ, সুন্দর, স্বপ্নজাল-জড়িত। পড়িতে পড়িতে নৈতিক তাঁহার নীতি কথা ভুলিয়া যান, পণ্ডিত তাঁহার শাস্ত্র ভুলিয়া একাগ্র হইয়া শোনেন। বাঁশীর সুর এমনই মিষ্ট যে পণ্ডিত, নীতিবিৎ, ইতিহাসজ্ঞ ও শাস্ত্রকার সকলে বোকা বনিয়া স্তব্ধ হইয়া এই সুরের মোহে ধরা দেন। রাজকন্যা স্বীয় পতিকে ছাড়িয়া গেলেন কোন শাস্ত্রের নজিরে? এই প্রশ্ন কেহ তুলিতে সাহস পান না।

অন্যান্য গল্পের সকলগুলিই বাস্তব। দুঃখের বিষয় নিতান্ত অশিক্ষিতের হস্তে মাণিকতারা চরিত্রটি যেভাবে ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার সমাধান পাইলাম না। এই রমণী চরিত্রে বাঙ্গালী-নারী শুধু সাধ্বী নহেন—শক্তিস্বরূপিনী, তিনি শুধু স্বামীর কন্ঠলগ্ন হইতে বা তাহার চিতা-সঙ্গিনী হইতে শিখেন নাই, অলৌকিক বীর্য্যবত্ত্বা ও উদ্ভাবনী শক্তিতে তিনি আমাদিগকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছেন। এই গল্পটির মাত্র তিনভাগের একভাগ পাইয়াছি, বঙ্গের পল্লীরসজ্ঞ এমন কেহ কি নাই, ইহার অবশিষ্ট অংশ উদ্ধার করিতে পারেন?—আমি যে এখন পক্ষশূন্য জটায়ু, না আছে দৈহিক শক্তি, না আছে জীবনী-শক্তি।

অন্যান্য আখ্যায়িকা সম্বন্ধে আমি এই পুস্তকের প্রতি গল্পের উপসংহার ভাগে আমার বক্তব্য বলিয়াছি।

বাংলা দেশ এবং বাঙ্গালী জাতি কি উপাদানে গড়া এই গল্পগুলিতে তাহার আভাস পাইবেন। বাঙ্গালী যে সমুদ্রে ও বড় বড় নদ নদীতে ডিঙ্গা পরিচালনা করিতে দক্ষ ছিল—তাহার প্রমাণ এই গল্পগুলিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে। শুধু এই গল্পগুলিতে কেন, প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের অলিগলিতে সে প্রমাণ অজস্র! বাংলার ছোট ছোট মেয়েরা যে সকল ব্রত ও পূজা করিত—তাহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল—তাহাদের সমুদ্র-প্রবাসী স্বগণগণের বিদেশে নিরাপদ-যাত্রার জন্য প্রার্থনা। ভাদুলি প্রভৃতি ব্রতের কথা পড়িলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, ছোট ছোট মেয়েরা তাহাদের কচি কচি হাত জোড় করিয়া দেবতাদিগকে সকাতরে প্রার্থনা জানায় যেন ঝড়-বৃষ্টি থামাইয়া হিংস্র পশুদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া তাঁহারা পিতা ভ্রাতা ও স্বামীদের বাড়ীতে ফিরাইয়া দেন। নদ নদী, বন বাদাড়, বাঘ ভালুক, হাওয়া ঢেউ, ইহারাই এই ক্ষুদ্র শিশুদের দেবতা, তাহাদেরই ছবি আলপনায় আঁকিয়া তাহারা শত শত বার প্রণাম করিয়া জড় ও জীব

জগতের সব কিছুর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতেছে, ইহারাই তাদের চোখে সত্যিকার দেবতা, ইহারা যদি কৃপা করিয়া সেই প্রাণপ্রিয় স্বগণগণের কোন অনিষ্ট না করেন, তবেই তাহারা তাঁহাদের ফিরিয়া পাইয়া তাদের ঘর বাড়ী আনন্দ কলরবে মুখরিত করিতে পারে। দিন রাত্রি তাহারা বাঘ, ভালুক, জল-প্লাবন ঝড় ও উত্তাল তরঙ্গের কথা ভাবিতেছে এবং তাহারাই তাহাদের ইষ্টদেবতা হইয়া ব্রত উপলক্ষ্যে প্রত্যক্ষ দেখা দিতেছে, ইহাদেরই রূপ তাহারা পিঠালী দিয়া আলপনায় আঁকিতেছে, ইহাদেরই নাম করিয়া তাহারা গাঙ্গে স্নান করিয়া প্রার্থনা করিতেছে, কলার কাণ্ডের ডিঙ্গিকে সাজাইয়া জলে ভাসাইয়া আত্মীয়গণের শুভকামনা করিতেছে। বংশীদাসের মনসা দেবীর ভাসানে, বিজয় গুপ্তের মনসা মঙ্গলে, চণ্ডীমঙ্গলগুলির ছত্রে এই সমুদ্র যাত্রার কথা আছে, কিন্তু বিশেষ করিয়া বিস্তারিত ভাবে পল্লী-যাত্রীদের সমুদ্র ও বিশাল নদ নদীতে যাত্রার কথা এই গল্পগুলিতে পাওয়া যায়।

এই গল্পগুলিতে বাংলা-মাটির একটা চিত্তাকর্ষক ঘ্রাণ আছে—তাহাই পাঠককে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিবে,—ভাদ্র মাসে কেয়া, কুন্দ এবং কেলি-কদম্ব, বসন্তকালে মালতী, জবা, নব-মল্লিকা, শরৎকালে কুমুদ, পদ্ম ও জল-কহ্লার প্রভৃতি চিরপরিচিত ফুলের গন্ধে চিনাইয়া দেয় যে কবিগণ বাংলারই কথা বলিতেছেন। বর্ষার বর্ণনা যে কত প্রিয় ও প্রেমিকের হৃদয়ে কিরূপ আবেগ আনয়ন করে তাহা পুনঃপুনঃ কঙ্ক ও লীলার গল্পে চিত্রিত দেখা যায়।

এই গল্পগুলির সর্ব্বত্র বিল খাল, গাঙচিল, কেয়াবন ও নিপ-বৃক্ষ—এ সমস্তই পূর্ব্ববঙ্গের বর্ষাকালীন চিত্রপট মনে জাগাইতেছে,—চাকলাদারের কন্যা কমলার বাল্যকালের স্মৃতিতে বঙ্গদেশ কি মধুর ভাবে জড়িত হইয়া আছে—তাহা পড়িয়া পড়িয়া মনে ক্লান্তি আসে না, প্রত্যেকবারেই নূতন বোধ হয়। বাল্যকালে এই দিনে মাতা তালের পিঠা তৈরী করিতেন, ভাদ্র মাসে এই দিনে মনসা দেবীর পূজায় কত লোক নব বস্ত্র পরিয়া তাহাদের পূজা মণ্ডপে আসিত, এখন সেই মন্দির দেবতাশূন্য, সন্ধ্যায় কেহ সেখানে আর আরতির বাতি জ্বালে না, বাদ্যভাণ্ড থামিয়া গিয়াছে। বর্ষাশেষে কৃষকেরা সোনার ফসল কাটিয়া আনিত, রমণীরা শাঁক বাজাইয়া, প্রদীপ জ্বালাইয়া নবান্নের গান গাহিয়া 'জোকার' দিয়া স্বামী, ভাইদিগকে আগাইয়া ঘরে লইয়া যাইত এবং আঙ্গিনায় ফসল ফেলিয়া মঙ্গলোৎসব করিত। কৃষি-প্রধান বঙ্গদেশ—এই গানগুলির সর্ব্বত্র আমাদের নয়নপথে দেখা দিতেছে।

বস্তুতঃ এই গল্পগুলির যে দিক্ দিয়া যাও, যে পথে হাঁট—সব স্থানেই বাংলার পুণ্য তীর্থের মাটি। বহুকাল হইল আমরা পল্লীর মাটি হারাইয়াছি, আমরা পাথরের বন্দীশালায় আবদ্ধ, শুক পাখীর মত পিঞ্জরের সোনার শলাকাগুলির মূল্য নিরূপণ করিতেছি, কিন্তু কোথায় গেল সেই যুথি জাতি কুন্দ করবী রক্তাশোকের খেলা, কোথায় গেল সেই সন্ধ্যামালতী, নব-মল্লিকা ও চাঁপা কদম্বের সম্ভার, সেই ধারাহত পদ্মলের ঘ্রাণ, কদম্বের শোভা এবং দিগন্তশিহরণজাগ্রতকারি কোকিলের সেই সুমিষ্ট কাকলী ও ভ্রমর গুঞ্জরণ—এই কথা-সাহিত্যের মুকুরে, পুরাতন বঙ্গপল্লী , অধুনাবিলুপ্ত সমাজ ও বঙ্গের চির-নবীন শ্যামল শ্রী আবার দেখা দিয়াছে। এই দৃশ্যগুলি এজন্য আমাদের এত প্রিয় ও এত স্নেহ মাখানো।

গল্পগুলির যে আদর্শ—তাহাও বাঙ্গালী-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক—এমন গিরিকান্তার নদনদীপ্লাবী প্রেমের বন্যা অন্য কোন দেশে কোন কালে আসিয়াছে কিনা জানিনা। বাঙ্গালীর যাহা কাম্য—তাহার জন্য সে না করিতে পারে এমন কিছু নাই। তাহার দেহ মন মাটির পুতুলের মত উৎসর্গ করিয়া সে কাম্য বস্তুর সন্ধানে অতলে ঝাঁপাইয়া পড়ে। এই উদ্দাম গতি—মনের এই প্রাণান্ত চেষ্টা বাংলা দেশের মাটির। বাঙ্গালী অলঙ্কার-শাস্ত্র হাতে লইয়া তাহার ছাঁচে ভালবাসার আদর্শ গড়ে নাই। তাহার প্রেম কোন শাস্ত্রের ধার ধারে না, প্রণয়িনী তাহার স্বামীকে মুখের উপর তাহার প্রণয়ীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে পারে—"তিন সত্য কর তুমি আমাকে ঐ লোককে দিয়া দেবে।" যে দেশের রমণী কুঁড়িফুলের মত, মনের কথা মুখে আনিতে যাহার বাধ বাধ ঠেকে, সেই লাজশীলার এ কি স্বাধীন দুর্ব্বার অভিলাষ! যে পথে বাঙ্গালী চলিবে সে পথের শেষ নাই। পথের বিপদ দেখাইয়া তুমি তাহাকে থামাইতে পারিবে না। সে পর্ব্বত, সমুদ্র ও শত বাধাবিঘ্নের ভয় রাখে না। সে নির্ভীক পথিক—তাহার পথের গণ্ডী নাই, সে গণ্ডী স্বীকার করে না, গণ্ডীর ধর্ম্ম মানে না, সে পুঁথির বুলি বলে না, সে শিখানো কথা আবৃত্তি করে না। সেরূপ বাঙ্গালী যাহারা খাঁটি বাঙ্গালী—তাহাদিগকে যদি দেখিতে ইচ্ছা হয়, তবে এই গল্পগুলিতে পাইবে। কাজলরেখার মত ধৈর্য্য কাহার, মলুয়ার মত আত্মবিসর্জ্জন কাহার, মহুয়ার মত সততউদ্ভাবনশীলা, সব কর্ম্মের কর্ম্মী, প্রেমের জন্য সর্ব্বস্বহারা নায়িকা কোথায়? ইহাদের অশ্রু কি শেষ হইয়াছে? তাহাতে যে শিলা গলিয়া যায়, ঐরাবত ভাসিয়া যায়— সেই সকল শক্তিমতী নারীরা কোথায় গেলেন? তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন বলিয়াই কি আমরা হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছি?

এই পল্লীকাহিনীগুলির ভাষা খাঁটি বাঙ্গালীর ভাষা, তাহা আধ সংস্কৃত আধ ইংরাজীর খিচুড়ী নহে। যে ভাষাকে আমরা মাতৃভাষা বলিয়া জানি, ইহা সেই ভাষা। এই ভাষার বল বুঝাইব কিরূপে? মাতৃস্তন্যের সঙ্গে যে ভাষার শিক্ষা হইয়াছিল, তাহা মাতৃস্নেহের মতই অপূর্ব্ব দান, পাঠক দেখিবেন, মনের সমস্ত কথা এই ভাষায় যেমন বোঝান যায়, সংস্কৃত সমাস ও আভিধানিক শব্দ চয়ণ করিয়া তেমন কিছুতেই বুঝান যায় না, এই ভাষা ধার করা কথার জোর চাহে নাই, নিজের জোরে দাঁড়াইয়া আছে।

মাণিকতারার গল্পে ভাষার কতকগুলি বর্ণবিন্যাস দেখিলাম, যেখানে আমরা 'ও' কার সংযোগে কথা বলিয়া থাকি, সেইখানেই আমরা সংস্কৃত অভিধানের অনুকরণে 'ও' কারটি লেখায় ব্যবহার করিতে ভুলিয়া যাই। এই গানটি পড়িয়া এ কথা বুঝিলাম, —ইহাতে নিম্নলিখিত শব্দগুলি ওকার সংযোগে লেখা হইয়াছে ঃ—

কোম = কম ("বুদ্ধি আছে কোম")
মোতন = মতন
মোন = মন
মোন্দ = মন্দ
পোণ = পণ
জোঙ্গল = জঙ্গল
সোন্তান = সন্তান
মোত = মত
জোন = জন
সোংসার = সংসার
গোণক = গণক
জোল = জল

এই সকল কথার সবগুলিই পূর্ব্ববঙ্গে 'ও' কার সংযোগে কথায় ব্যবহার হয়; পশ্চিমবঙ্গেও কতকগুলি মুখে ও-কার দিয়া কথায় বলা হয়—কিন্তু লিখিবার সময় 'মোন' কে মন, 'মোন্দ' কে 'মন্দ', 'যোম' কে 'যম' লিখিত হয়। নিম্নশ্রেণীর পূর্ব্ববঙ্গের লোকেরা 'হ'-কার প্রায় ব্যবহার করে না। (যথা—অইয়া = হইয়া, এন = হেন, ইন্দু = হিন্দু, হয়ার = ইয়ার,) এবং কোন কোন স্থানে 'স' অনেক সময়ই 'হ'-তে পরিণত হয়। স্ত্রীর ভ্রাতাকে সে দেশে 'শ' কার দিয়া কথা বলে না তৎস্থলে 'হ' কার উচারণ করে। তাহা ছাড়া হাজি = সাজি, হাজ = সাজ, হাত = সাত প্রভৃতির বহুল প্রয়োগ আছে। পূর্ব্ব দেশে বিশেষ মৈমনসিংহ, চট্টগ্রাম প্রভৃতি প্রদেশে 'ও' কারের স্থানে 'উ' কার ব্যবহৃত হয়। যথা, 'ডুল = ডোল, কুণা = কোনা, ভুলা = ভোলা, ওষ (হিস) = উষ, ছোট = ছুট। অনেক স্থলে 'ট' স্থানে 'ড' ব্যবহৃত হয়, যথা ছুডু = ছোট।

অনেক সময় 'ও' কার দেওয়ার জন্য কবিতার চরণের মিল হয় নাই বলিয়া ভ্রম হইতে পারে—কিন্তু বাস্তবিক কবির শ্রুতির কোন ত্রুটির জন্য তাহা হয় নাই। যেমন 'চুল' শব্দের সঙ্গে 'ঢোল' মিল পড়ে না। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের মৈমনসিংহ, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে উচারণ ঢোল নহে, 'ঢুল', সুতরাং লিখিতে যাইয়া আধুনিক রীতিতে ঢোল লিখিলে ও উচ্চারণ কালে 'ঢুল' বলিলে এই বৈষম্য ঘটিয়া থাকে। কথায় কথায় নিরক্ষর কবিরা মিল দিতেন, লেখা জিনিষটা তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত না, তাই যখন 'চুল' এর সঙ্গে 'ঢুলে'র মিল দিয়া যাইতেন, তখন তাহাতে কোন অসঙ্গতি হইত না। এই ভাবে কুণ (কোণ) শব্দের সঙ্গে 'চুন' মিল পড়িত। এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে।

বৈষ্ণব কবিতার সঙ্গে এই পল্লী-গীতিকার অনেক সাদৃশ্য আছে, কিন্তু তাহা সাদৃশ্য মাত্র। যাঁহারা বৈষ্ণব-কবিতা ও পল্লী-গীতিকা খুব সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিবেন, তাঁহারা দেখিবেন ইহারা দুই পৃথক বস্তু। বৈষ্ণব কবিতা বস্তুকে তাহার স্বকীয় গণ্ডী হইতে ঊর্দ্ধে উঠাইয়া তাহাকে আধ্যাত্মিক রাজ্যে পৌঁছিয়া দিয়াছে, কিন্তু পল্লী-গীতিকার মধ্যে সেই আধ্যাত্মিক জগতের ইঙ্গিত নাই। কয়েকটি গীতি যথা "আঁধা বঁধু", "শ্যাম বায়," "কাজল রেখা," "কাঞ্চন-মালা" প্রভৃতির মধ্যে বাস্তবের সুর খুব উচ্চগ্রামে পৌঁছিয়াছে—তাহা প্রায় অধ্যাত্ম-লোকের কাছে গিয়াছে। কিন্তু পল্লীগীতিকা অধ্যাত্ম-জগতের কথা নহে, তাহা বাস্তব-জগতের কথা, বাংলায় সহজিয়ারা যুগ যুগ ধরিয়া প্রেমের তপস্যা করিয়াছিল, সতীরা স্বামীর চিতায় প্রসন্ন চিত্তে পুড়িয়া মরিয়াছে, এই গীতিকাগুলিতেও পাঠক দেখিতে পাইবেন, এদেশের রমণীরা প্রেমের জন্য এমন কোন বিপদ ও ত্যাগ নাই, যাহার সম্মুখীন হন নাই। এইভাবে এদেশে প্রেম এবং কোমলভাব-সম্পদের অনেক কথা মেয়েদের মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছিল, বৈষ্ণব মহাজন ও পল্লী-গীতিকার উভয়ে সেই কথিত ভাষায় মুখে মুখে প্রচলিত অক্ষয় অভিধান হইতে শব্দ চয়ন করিয়াছেন, সেই জন্যই তাহাদের পূর্ব্ব-কথিত সাদৃশ্য—ইহা একের নিকট অপরের ঋণ নহে। সময় সময় চণ্ডীদাসের পদ এবং প্রাচীন পল্লী-কবির পদ প্রায় অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া যায়, যথা বৈষ্ণব কবির "ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী, অবনী বহিয়া যায়" ছত্রের সঙ্গে সোনাই গীতিকার "অঙ্গের লাবণী গো সোনাইর বাইয়া পড়ে ভূমে", এইরূপ সাদৃশ্য অনেকগুলি চক্ষে পড়িবে, মনে হইবে যেন আমরা বাস্তব রাজ্য ছাড়িয়া বৈষ্ণব জগতে আসিয়া পড়িলাম। কিন্তু পল্লী-কবির বাস্তবতা খুব উচ্চস্তর স্পর্শ করিলেও তাহা অধ্যাত্ম-রাজ্যে পৌঁছে নাই। মহাজনেরা ও পল্লী-কবিরা উভয়েই

বাংলার দেশজ শব্দের ভাণ্ডার লুটিয়াছেন, কেহ কাহারও ঋণ গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে কীর্ত্তনের খোল এরূপ জোরে বাজিয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার প্রতিধ্বনি এদেশের সর্ব্বত্র শ্রুত হইতেছিল, শেষের দিকে পল্লী-কবিরা হয়ত তদ্দ্বারা ভাষাক্ষেত্রে কিছু প্রভাবান্বিত হইয়া থাকিবেন; কিন্তু তাঁহাদের আদর্শ মনুষ্য-জগতের প্রেম; বাস্তবকে রূপক স্বরূপ ব্যবহার করিয়া তাঁহারা কোন অধ্যাত্ম-তত্ত্ব প্রচার করেন নাই। শ্যাম রায়, আঁধা বঁধু ও মইষাল বন্ধুর পালায় মধুর ও কোমল কাব্য-পদাবলীর ছড়াছড়ি এবং বাঁশীর সুরের প্রাণোন্মাদকারী ব্যঞ্জনা, কিন্তু তাহারা বৈষ্ণব পদাবলীর মত হইলেও বৈষ্ণব কবিতা-সম্ভবা কবিতা নহে। আঁধা বঁধুর নায়িকার "বেণী-ভাঙ্গা কেশ তার চরণে লুটায়" রাধিকার রূপ বর্ণনার মত শুনায়। "তোমায় বুকে লইয়া আমি শুনব তোমার বাঁশী। মরণে জীবনে বঁধু হইলাম দাসী।" "মুখেতে রাখিয়া মুখ মনের কথা কও", "বুকেতে আঁকিয়া রাখি তোমার মুখের হাসি", "মন যমুনা উজান বহে, ঐ না বাশীর গানে" (আঁধা বঁধু) প্রভৃতি বহু সংখ্যক পদ এই লক্ষণাক্রান্ত, বাহুল্য ভয়ে আর উদ্ধৃত করিলাম না।

বাংলা দেশ যে এককালে জগতের অন্যতম সমৃদ্ধ প্রদেশ ছিল, তাহার প্রমাণ এই গল্পগুলির অনেক স্থানেই পাওয়া যায়। সোনার কলস, সোনার পালঙ্ক, সোনার ঝারির ত কথাই নাই; ধনীর গৃহে পরিবেশনের সময় সোনার থালা এবং সোনার বাটীর ছড়াছড়ি হইত। ধনবান গৃহস্থের ঘরের মেয়েরা বহুসংখ্যক সহচরীর সঙ্গে নদীর ঘাটে স্নান করিতে যাইতেন, তাহাদের কাহারও মাথায় স্বর্ণ কুম্ভ, কাহারও মোথায় সোনার থালায় নীলাম্বরী, অগ্নিপাটের সাড়ী বা মেঘডুম্বর বস্ত্র, কাহারও হাতে নানারূপ গন্ধ তৈল ও প্রসাধনের দ্রব্য। চাকলাদারের কন্যা কমলার স্নানের বর্ণনা, ও রাণী কমলার সোমেশ্বরী নদীতে শেষ স্নানের বর্ণনা পাঠ করুন। চাকলাদারের মেয়ে তখন নূতন বয়সী, সহচরীরা গান গাহিতে গাহিতে ও নৃত্য করিতে করিতে চলিয়াছে। তাহাদের উল্লাসের কলকাকলী নদীর তীর মুখরিত করিতেছে। পাঁচ শত টাকার হাতীর দাঁতের শীতল পাটীর উল্লেখ অনেক গীতিকায়ই পাওয়া যায়; চাকলাদারের কন্যা রাজসভায় তাঁহার বাল্যকালের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে এদেশের পল্লী-চিত্র একটি সোনা-বাঁধা ফ্রেমের ছবির মত ঝলমল করিয়া উঠিতেছে, বার মাস'তের পার্ব্বণে পল্লীগুলি যেন সারা বৎসর নৃত্য করিতে থাকিত। সোনার বাটায় কেয়া খয়ের, চুয়া ও এলাচি দেওয়া পানের খিলি লইয়া তরুণীরা বাসর-গৃহে প্রবেশ করিতেন। গ্রীষ্মকালে নানা রূপ

আসবাবে সজ্জিত জলটুঙ্গী ঘর, দীঘির জলে অবস্থিত থাকিত। দম্পতি নানা রহস্য ও মধুর আলাপে রজনী কাটাইয়া দিতেন, দীঘির জলের প্রস্ফুট পদ্মের সুরভি লইয়া বসন্তানিল মাঝে মাঝে সেই গৃহে ঢুকিয়া তাহা সুবাসিত করিয়া দিত। গজমতির মালা, হীরার হার, সোনার দাঁত খোচানী কাঠি প্রভৃতি অলঙ্কারপত্র ও বিলাসের সামগ্রী যে কত ছিল তাহার ইয়ত্তা নাই, "লক্ষের শাড়ী" ত কথায় কথায় পাওয়া যায়। স্নানের সময় মেয়েরা গলার হীরার হার এবং সোনা ও জহরতের অলঙ্কার খুলিয়া রাখিতেন, পাছে তৈলসিক্ত দেহের স্পর্শে তাহারা মলিন হয়। সাধারণরূপ ধনী গৃহস্থের বাড়ীতে লড়াই করার জন্য আটটা, দশটা ষাঁড় থাকিত "লড়াই করিতে আছে আট গোটা ষাঁড়" (মলুয়া) এবং প্রত্যেক গৃহস্থের ঘাটেই "বাইচ" খেলিবার জন্য দীর্ঘ সুদর্শন ডিঙ্গি বাঁধা থাকিত। এই সকল গীতিকায় ভৌগোলিক বিবরণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। রূপবতী গল্পে রাজা বাড়ী হইতে রওনা হইয়া ফুলেশ্বরী পাড়ি দিয়া নরসুন্দার মুখে পড়িলেন, এবং সেই নদী উত্তীর্ণ হইয়া ঘোড়া-উৎরা ও পরে মেঘনায় আসিয়া পড়িলেন, এইভাবে কত নদ-নদী ও তীর্থস্থানের উল্লেখ পল্লীগীতিকায় পাওয়া যায়। মোট কথা, তখনকার দিনে লোক দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া জাপান বা কামস্কট্‌কা দেখিত না, তাহারা স্বপ্নবিলাসী ছিল না। তাহাদের পল্লী ও গৃহ তাহাদের বড় আদরের সামগ্রী ছিল। এখন আমরা দূরদেশ সম্বন্ধে প্রাজ্ঞ হইয়াছি, কিন্তু নিজ গ্রামের নদীটির নাম পর্য্যন্ত জানি না। এই পল্লীগাথাগুলিতে যে দেশ দেখিতে পাই, তাহাই খাঁটি বঙ্গদেশ। এখন সে দেশ কোথায়—তাহার আনন্দময় শ্যামল রূপ কোথায় গেল, তাহার উৎসবগুলির কি হইল, প্রতিমা, মঠ, মসজিদ, মন্দির নির্ম্মাণোপলক্ষে সে চারুশিল্পকলার চর্চ্চা কোথায় গেল? এদেশে কি আর বসন্ত ঋতু আসে না, এদেশের কোকিল ও বউ-কথা-কও কি আর ডালে বসিয়া ডাকে না, কোথায় গেল সেই সকল সন্ধ্যামালতী ও কেয়া বনের সৌরভ? বর্ষা আসে—কিন্তু প্লাবন লইয়া বন্যা লইয়া তাহা কুটির ভাসাইয়া লইয়া যায়— সে বর্ষার কদম্ববর্ণ ও চাঁপার ঘটা ফুরাইয়া গিয়াছে। এই পল্লীগীতিকার কয়েকখানি প্রাচীন চিত্রপট আছে, তাহারও অনেকগুলি লুপ্ত হইয়াছে। কে তাহাদের উদ্ধার করিবে? আমরা মোটরে করিয়া বিদেশীদের পাছে পাছে ঘুরিতেছি—এই পুচ্ছগ্রাহিতার দিন কবে অবসান হইবে?

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

বাংলার পুরনারী

রাণী কমলা

প্রথম গীতিকা

দীঘি কাটাইবার অনুরোধ

আকবরের সময় ময়মনসিং "সুসুঙ্গ দুর্গাপুরে" জানকীনাথ মল্লিক নামে এক জমিদার ছিলেন; তিনি সোমেশ্বর সিং নামক এক ক্ষত্রিয় সেনাপতির বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সুন্দর পুরীর শ্যাম অঞ্চল চুম্বন করিয়া শুভ্রনীরা সোমাই নদী বহিয়া যাইত, সেই নদীর তরঙ্গের করতালি-শব্দে জাগিয়া উঠিয়া দুইপারের কোকিল কুহুধ্বনি করিয়া উঠিত এবং উষার অলক্তক রাগ আমগাছের মাথায় পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই কাকসকল কলরব করিয়া আকাশ-পথে লোকালয়ে উড়িয়া আসিয়া গৃহস্থের চালের উপর বসিত।

রাজা জানকীনাথ ও তাঁহার স্ত্রী কমলা দেবী উভয়ে নানারূপে অসংলগ্ন ও অর্থহীন কথার আনন্দে "জলটুঙ্গী" ঘরে গ্রীষ্মের রাত্রি কাটাইয়া দিতেন; সারারাত্রি সে কথা ফুরাইত না, সারারাত্রি সে আনন্দের প্রবাহ এক তিলের জন্য থামিত না, সারারাত্রি এক মুহূর্ত্ত তাঁহারা ঘুমাইতেন না, সারারাত্রি স্বর্ণ প্রদীপের সুবাসিত সল্‌তার আলো এক

মুহূর্ত্তের জন্য নিভিত না। সেই "জলটুঙ্গী" ঘরের অবিদিতগতযামা নিশিথিনীর কথা তাঁহারা সারাদিন স্মরণ করিতেন এবং স্বপ্নভোরে মাতোয়ারা হইয়া থাকিতেন।

একদিন কমলাদেবী রাজাকে বলিলেন, "তুমি তো কতবারই বল যে আমাকে তুমি ভালবাস। সত্যই যে ভালবাস তাহা আমি সন্দেহ করি না। কিন্তু তোমার কাছে আমার এই নিবেদন, এই ভালবাসার একটা চিহ্ন দেখাও।" রাজা বলিলেন, "আমাকে কি করিতে হইবে বল।"

রাণী বলিলেন, "আমার একটা খেয়াল হইয়াছে, তাহা তোমায় পূর্ণ করিতে হইবে। আমি সাতদিন সাতরাত্রি কাজ করিয়া এক 'টাকিয়া' সূতা কাটিব। সেই সূতার বেড় দিয়া যতটা জমি ঘেরা যায় ততটা জমিতে তুমি আমার নামে একটা দীঘি কাটিবে, তাহার নাম হইবে "কমলাসাগর"। চিরকাল এই রাজধানীর বক্ষে সেই দীঘি—আমার নাম বহন করিয়া আমার প্রাণপতির ভালবাসার পরিচয় দিবে।" রাজা বলিলেন, "তাহাই হইবে"।

এই সময় জলটুঙ্গী ঘরের পূবদিক হইতে একটা গৃধ্র শাণিত ছুরির মত তীব্র চিৎকারে আকাশ ভেদ করিয়া চলিয়া গেল—ঘরটা যেন মুহূর্ত্তের জন্য কাঁপিয়া উঠিল।

রাণীর অভিযান

শুষ্কোদ্ধার*

দীঘি খনিত হইতে লাগিল, শত শত মজুর রাতদিন কাটিতেছে;—যেন তাহারা পাতালপুরীতে অভিযান করিবে, দীঘির খাদ গভীর হইতে গভীরতর হইতে চলিল, কিন্তু এক ফোঁটা জল উঠিল না।

রাজা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, সভাসদ পণ্ডিতেরা বলিলেন—"কোন দীঘি খনন আরম্ভ করিয়া তাহাতে জল না উঠা পর্য্যন্ত কাজ বন্ধ রাখিলে, দীঘি-স্বামীর চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ হইবেন।"

যাহা দাম্পত্য প্রেমের আনন্দে একটা সখের বশে জানকীনাথ করিতে বসিয়াছিলেন, তাহা এইবার দারুণ দুশ্চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িল। "চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ হইবে"— কি গুরুতর অভিশাপ! এদিকে শত-শত সহস্র-সহস্র মজুর হয়রাণ হইয়া গেল। রাজা

*শুষ্ক দীঘিতে জল সঞ্চার করাকে শুষ্কোদ্ধার বলে।

প্রাণদণ্ডের ভয় দেখাইলেন; জল না উঠা পর্য্যন্ত তাহারা কোদাল ত্যাগ করিতে পারিবে না, তাহারা একদিনের ছুটি পাইবে না। ভয়ে—ঘোর অমাবস্যার অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া তাহাদের অনেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল, এদিকে পাছে রাজার পেয়াদা আসিয়া তাহাদিগকে ধরে—এই ভয়ে তাহারা ছুটিয়া পলায় ও পিছন দিকে মুখ ফিরাইয়া পুনঃ পুনঃ সতর্ক দৃষ্টিপাত করে।

রাজা একদিন দেখিলেন, মজুরের দলের ১/৮ অংশ আছে কিনা সন্দেহ। যাহারা আছে, তাহারা কাঁদিয়া কাটিয়া যোড়হস্তে রাজার নিকট ছুটি চাহিল। তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া রাজা ব্যথিত হইলেন।

সেই রাত্রে রাজা বিমর্যচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন; এ চিন্তার পার নাই, শেষ নাই। মৃত্তিকার তল হইতে তাপ নিঃসৃত হইতেছে। পাহাড়িয়া জায়গা,—ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি কোন প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় হইয়া পুরী ধ্বংস করিবে না তো? এদিকে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা উৎকণ্ঠিত নেত্রে যেন তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন, তাঁহাদের বিশীর্ণ বায়ুভূত নিরাশ্রয় মূর্ত্তি যেন তাঁহাকে শয়নে-উপবেশনে ও জাগরণে দেখা দিতে লাগিল। দারুণ যন্ত্রণায় রাজা স্বর্ণ-পালঙ্কে শুইয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন।

সহসা এক দিন গভীর রাত্রে তিনি এক স্বপ্ন দেখিয়া অভিভূত হইযা পড়িলেন; যেন তিনি প্রবেশ করিয়াছেন এক অলৌকিক রাজ্যে, তাঁহার চতুর্দ্দিক হইতে কোকিলের কুহু কুহু শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে—কিন্তু একটি কোকিলও দেখা যায় না; যেন শত শত কুসুমের গন্ধ লইয়া মলয় সমীর তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিতেছে, অথচ কোন ফুল-বাগান নাই। সেখানে 'কামটুঙ্গী'ঘরে* প্রদীপ জ্বলিতেছে,—তাহার কিরণে চতুর্দ্দিক ঝলমল করিতেছে অথচ সেই ঘরখানি কি বৈকুণ্ঠে, অথবা অলকায় কিম্বা কৈলাসে তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। এই অপূর্ব্ব স্থান হইতে তিনি যাহা শুনিলেন তাহাতে তাহার গণ্ডদ্বয় প্লাবিত করিয়া অজস্র অশ্রু পড়িতে লাগিল।

তিনি সেই রাত্রে পাশের কক্ষে যাইয়া নিদ্রিতা রাণীর শিয়রে বসিলেন; একখানি স্বর্ণ-প্রতিমার ন্যায় রাণী কমলা শুইয়াছিলেন। দেহের নির্ম্মল পবিত্র মাধুরীতে যেন গৃহখানি স্বর্গীয় সুষমায় ভরপূর করিয়া রাখিয়াছে—রাজা তাঁহার স্নেহ-শীতল হস্তে রাণীর অঙ্গ স্পর্শ করিলেন। রাণী জাগিয়া উঠিয়া দেখিলেন, স্বামী তাঁহার শিয়রে বসিয়া কাঁদিতেছেন।

* কামটুঙ্গী—আসবাবপত্র সহ সুসজ্জিত ঘর, সচরাচর ইহা দীঘির পারে নির্ম্মিত হইত।

তাঁহার স্বামী দৃঢ়চেতাঃ, তাঁহার কোন দুর্ব্বলতার চিহ্ন তিনি কখনও দেখেন নাই। অতি করুণ ও শোকার্ত্ত ভাবে তিনি রাজাকে আদর করিয়া তাঁহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজার অশ্রু তখনও থামে নাই। তিনি গদ গদ কণ্ঠে বলিলেন—"আমি বড় একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি, আমি যে এত গভীর করিয়া দীঘি কাটাইলাম, তাহাতে জানি না কোন্ গ্রহের দোষে জল উঠিল না, দীঘি খুব গভীর হইয়াছে, তথাপি তাহা শুষ্ক—জলশূন্য। স্বপ্নে দেখিলাম, তুমি সেই গভীর পুকুরে নামিতেছ, এবং তুমি তলদেশে পদার্পণ করা মাত্র, যেন মেদিনী ভেদ করিয়া জলরাশি ভয়ানক তোড়ে উঠিতে লাগিল—এবং তোমাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। সেই জল যেন পাতাল হইতে উঠিয়া আমার রাজ্য আক্রমণ করিল, জল-স্থল একাকার হইয়া গেল।

"আমার মন বিষম আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল, কোন্ দৈব আমাকে যেন দীঘি কাটাইতে প্রবৃত্ত করিয়া আমার সর্ব্বনাশ সাধনের সঙ্কল্প করিয়াছে। রাণী, আমি রাজ্য চাই না, —ঐশ্বর্য্য, ধনদৌলত কিছুই চাই না, পাতার কুটিরে তোমাকে লইয়া থাকিব। হায়! তোমাকে হারাইয়া আমি জীবন রাখিতে পারিব না, স্থির জানিও।"

কিম্বদন্তী আছে, যদি খনিত দীঘিতে জল না উঠে, তবে দীঘির স্বামী বা গৃহলক্ষ্মী আত্মোৎসর্গ করিলে জল নিশ্চয়ই উঠিবে। রাজা শিয়রে বসিয়া কাঁদিতেছেন, সেই মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ও অফুরন্ত চোখের জলে রাণী কি ইঙ্গিত পাইলেন জানি না, কিন্তু সেই মধ্য রাত্রেই রাণী ধীর পাদক্ষেপে বার-বাঙ্গলা ঘরে তাঁহার পরিচারিকাদের নিকটে চলিয়া গেলেন। রাণী ডাকিয়া বলিলেন "তোরা সব ওঠ,—আমি স্নান করিতে সোমেশ্বরী নদীতে যাইব, —তোরা আমার সঙ্গে আয়।"

দাসীরা ঝাঁক বাঁধিয়া রাণীর সঙ্গে চলিল। কাহারও কক্ষে সোণার কলসী, মণিমণ্ডিত স্বর্ণঝারি, কারও হাতে অতি পরিপাটী কারুখচিত গামছা, তাহা মেচ্ জাতীয় শিল্পীরা তৈরী করিয়াছে, কেহ কেহ সুগন্ধি তৈলের বাটী লইয়া চলিয়াছে,—নানারূপ কেশ-তৈলের সুরভিতে সমস্ত পল্লী যেন সুবাসিত হইয়াছে। কাহারও হস্তে সাদা, লাল, নীল পুষ্পের সাজি, কাহারও হস্তে দেব-পূজার জন্য শ্যাম দুর্ব্বাদল। সেই অন্ধকার রাত্রে বিচিত্রবেশিনী পরিচারিকারা রাণী কমলাকে লইয়া সোমেশ্বরী নদীর কূলে চলিয়াছেন। যিনি অসূর্য্যম্পশ্যা ও দেবনারীর মত দুর্ল্লভ-দর্শন, সেই মহারাণী অন্ধকার রাত্রে রাজপথ দিয়া পদব্রজে চলিয়াছেন! ঘন ঘোর অন্ধকার রাত্রির আকাশে যেন কালো বস্ত্রের আচ্ছাদনের উপর শত শত সোণার চাঁপা ফুটিয়া আছে. ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেই তারাগুলি একটী নীলকৃষ্ণ ফুলের

বৃক্ষের মত দেখা যাইতেছে। সেই আঁধারে সোমাই নদী উজান পথে ছুটিয়াছে। নদীর তীরে আসিয়া দাসীরা সুরঞ্জিত গামছা দ্বারা রাণীর শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জনা করিল, কেহ কেহ গন্ধ তৈল দিয়া রাণীর চুল সুবাসিত করিল। নানারূপ প্রসাধনের পর রাণী জলে নামিয়া স্নান করিলেন, দাসীরা তাঁহার অঙ্গ কোমল গামছা দ্বারা মুছাইয়া দিল, আর্দ্র বস্ত্র ছাড়াইয়া "অগ্নিপাটের শাড়ী" পরাইল। স্নানান্তে দেবীপ্রতিমার মত কমলারাণী পূজায় বসিলেন—তিনি ফুল-দুর্ব্বাদল ও ধান প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য দ্বারা সোমাই নদীকে পূজা করিয়া প্রার্থনা করিলেন, "আমি আজ আমার প্রাণপতির বিপদ উদ্ধারের জন্য আত্মোৎসর্গ করিব,—তুমি নদী সাক্ষী থাকিও,—নদীর তীরে এই শ্যামলশ্রী তরুরাজি তোমরা সাক্ষী থাকিও, আমি স্বামীর জন্য আত্মদান করিব। আমার স্বামীর পূর্ব্বপুরুষেরা যেন উদ্ধার পান, পুকুর যেন জলে ভর্ত্তি হয়। হে আকাশের তারাসমূহ তোমরা সাক্ষী থাকিও, হে দেবধর্ম্ম—তোমরা সাক্ষী থাকিও।" স্বামীর শুভচিন্তায় আত্মহারা রাণী পুষ্প-বিল্বদল সোমাই নদীতে অর্পণ করিলেন। তাঁহার মনে হইল কেহ যেন অভয় দিয়া তাঁহার প্রার্থনা সিদ্ধ হইয়াছে এই আশ্বাস দিলেন।

তখন মণিমাণিক্য-খচিত সোণার কলসী ভরিয়া সোমাই নদীর জল তুলিয়া ধীরপদে তিনি রাজপথে আসিলেন; দেখিলেন পূর্ব্বাকাশ ঝিকিমিকি করিতেছে, ঊষার পায়ের আলতার দাগ যেন মেঘে মেঘে খেলিতেছে। প্রভাতে নবজাগ্রত লোককোলাহল ক্রমেই বাড়িতেছে।

গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাণী নিজের শয্যায় শুইলেন,—শিশুপুত্রটিকে কোলে শোওয়াইয়া আদর করিয়া চুমো দিতে লাগিলেন, "আজ তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা, আর তোমার চাঁদমুখ দেখিতে পাইব না"—অশ্রুপূর্ণ চোখে, ইহাই ভাবিলেন, কিন্তু মুখে কথা নাই। ছয় মাসের শিশু—তাহাকে শেষ দেখার সময় রাণীর যে শোক হইল, তাহা প্রকাশ করিবার কোন ভাষা নাই।

তারপর জানকীনাথের কাছে আসিয়া রাণী বলিলেন, "কি জানি আমার প্রাণ কেমন করিতেছে, যদি আমি মরি,—তবে আমাদের নয়নের মণি খোকাকে সর্ব্বদা তোমার কাছে রাখিও।" রাজা বলিলেন, "তুমি না থাকিলে আমিও থাকিব না।" রাণী দাসীর

দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "সুয়া দাসী, তুমি আমার বাপের বাড়ীর লোক, আমার বুকের ধনকে তোমার হাতে অর্পণ করিয়া যাইতেছি!" শুকশারিকে বলিলেন, "আমার বাপের বাড়ী হইতে তোমাদিগকে আনিয়াছি, তোমরা আমার ছেলেকে "মা" ডাক ডাকিতে শিখাইও। যখন সে "মা" ডাক শিখিয়া ক্ষুধার সময় "মা মা" বলিয়া কাঁদিবে, তখন তোমরা তোমাদের মিষ্টস্বরে শিষ দিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিবে। আমি চলিলাম সুয়া—রাজত্ব ত্যাগ করিয়া যাইতেছি, তাহাতে দুঃখ নাই। কিন্তু প্রাণের পুত্রকে ছাড়িয়া যাইতে বুক বিদীর্ণ হইতেছে।"

রাণী এই বলিয়া শিশুপুত্রকে সুয়া দাসীর হাতে দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কি এক অনিশ্চিত বিপদ আশঙ্কা করিয়া সুয়া আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, অপরাপর দাসদাসীরাও চোখের জল সামলাইতে পারিল না।

রাণীর আত্মোৎসর্গ

রাণী সেই নদীর জলে পূর্ণ স্বর্ণ-কলসী কক্ষে তুলিয়া লইলেন, তখন ছিন্ন ছিন্ন মেঘপংক্তি সিন্দূরের বর্ণে রঞ্জিত, পুকুর-পাড়ের দিকে লোকজনের ভিড় হইল—তাহারা মহারাণীকে পায় হাঁটিয়া নদীর দিকে যাইতে দেখিয়া অব্যক্ত শোকে কাঁদিয়া আকুল হইল। কেউ বলিল, রাজা কি স্বপ্ন দেখিয়াছেন, তাঁহার মস্তিষ্ক কি ঠিক আছে, রাণী এভাবে পদব্রজে পুকুরের দিকে যাইতেছেন কেন? মা—তুমি রাজবাড়ীতে ফিরিয়া এস, তুমি কি করিয়া বসিবে, আমরা ভাবিয়া পাইতেছি না, আমরা বড় কষ্ট পাইতেছি।

"কিসের দীঘি, কিসের স্বপন—
নাই সে উঠুক পানি।
এই গহিন পুকুরে যেন না যাউন মা রাণী।"

রাণী সেই শুকনো পুকুরের তলদেশে নামিলেন, —তথায় ফুল দুর্ব্বাদল ও ধান্য ছিটাইয়া দিলেন এবং এক অঞ্জলি জল সেই দীঘির তলদেশে ছড়াইলেন। অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায় শত শত লোক পাড়ে দাঁড়াইয়া 'হায় হায়' করিতে লাগিল। রাণী মৃদুস্বরে প্রার্থনা করিলেন—"কায়মনোবাক্যে আমি যদি ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া থাকি, তবে পুকুর জলে ভর্ত্তি হউক, আমার স্বামীর পিতৃকুল রক্ষা পাউন। যদি আমি চিরদিন ধর্ম্মের প্রতি

অচলা ভক্তি রাখিয়া থাকি, তবে যেন আমার প্রভুর মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হয়। পুকুর যেন জলে ভর্ত্তি হয়। পাতাল ভেদ করিয়া বন্যা এস—আমাকে ভাসাইয়া লইয়া যাও।" হাত উঁচু করিয়া রাণী কলসী হইতে জল ছিটাইতে লাগিলেন। এ যাদু-কলসীর জল কি ফুরাইবে না? যতই রাণী জল ঢালিতে লাগিলেন,—ততই ভরা কলসী ভরাই রহিল। জল ছড়াইয়া ফেলিতে ফেলিতে অকস্মাৎ আস্তে আস্তে পুকুরের তলা হইতে জল নিঃসৃত হইয়া রাণীর পায়ের দুখানি পাতা ভিজাইয়া ফেলিল। হাত উর্দ্ধে উঠাইয়া রাণী আরও জল ছিটাইতে লাগিলেন, রাণীর হাঁটু পর্য্যন্ত জলমগ্ন হইল;—জল ঢালিতে ঢালিতে রাণীর মৃণাল-শুভ্র গ্রীবাদেশ জলমগ্ন হইয়া গেল—তার পর সেই স্বর্ণমূর্ত্তি একেবারে জলে ডুবিয়া গেল। তখন সেই জলের বেগ ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল,—যেন হুঙ্কার করিয়া জলদেবী পাতালের রুদ্ধ জলপথ ছাড়িয়া দিলেন, রাণীর মাথার সুচিক্কণ বেণী আবর্ত্তের উপর ভাসিতে লাগিল, আর একটু পরে রাণীর আর কিছুই দেখা গেল না, অগ্নিপাটের শাড়ীর অঞ্চল ক্ষণেকের জন্য তরঙ্গের উপর নাচিয়া চলিল—পরক্ষণে আর কিছুই নাই; প্রবল বেগে জল উপরে উঠিয়া পুকুরের পাড় ভাসাইয়া ছুটিল।

রাণীর জন্য শোকার্ত্ত রাজার বিলাপ

রাজা পাগলের মত ছুটিয়া 'হায় রাণী' 'হায় আমার কমলা' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছেন, নগরের লোকেদের কুটির জলের তোড়ে ভাসিয়া যায়, সে দিকে দৃকপাত না করিয়া তাহারা 'হায়! রাণীমা' 'হায়! পুরলক্ষ্মী' বলিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিতেছে, প্রথম পুত্র লাভ করিয়া জননী তাহার দিকে না চাহিয়া 'হায় মা রাণী' বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেছে।

বনের পাখীরা তখন আকাশে উড়িয়া উড়িয়া কলরব করিয়া কাঁদিতেছে, রাজহস্তীর গণ্ড বহিয়া অশ্রু পড়িতেছে, পিঞ্জরের পাখীগুলি যেন কি হারাইয়া ছুটাছুটী করিতেছে ও স্বর্ণ শলাকা গুলিতে মাথা খুঁড়িতেছে। রাজার পাত্র-মিত্র সভাসদ সকলের বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কথা ফুটিতেছে না। রাজার উদ্যানে কলি ফুটিতেছে না, প্রস্ফুট ফুল অকালে ম্লান হইয়া যাইতেছে। প্রজারা দলে দলে সোমাই নদীর তীরে আসিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, "আমাদের রাজ-লক্ষ্মীকে কালা পানির ঢেউ কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল।" সমস্ত

দেশময় যেন বিজয়া দশমীর বিসর্জ্জনের বাদ্য বাজিয়া উঠিল, কে কাহাকে প্রবোধ দিবে তাহার ঠিকানা রহিল না।

রাজ-সিংহাসন শূন্য—রাজা তাহাতে বসেন না। শূন্যে যখন পাখীরা উড়ে, তখন তাহা ভর্ত্তি হইয়া যায়—তাহাই শূন্যের শোভা। আসমানে রবি, চন্দ্র উঠিলে তাহার পূর্ণতা হয়—নতুবা আসমান ধূ ধূ আঁধার, শ্রীশূন্য। বাড়ীতে ফুলের বাগান না থাকিলে, নারীর কপালে সিন্দূর না থাকিলে, গৃহে পুরুষের পার্শ্বে নারী না থাকিলে কে তাহাদের দিকে ফিরিয়া চায়। রাণীকে হারাইয়া রাজা একেবারে বাউল হইলেন; ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাই, চুলগুলি উষ্ক-শুষ্ক, রাজা রাতদিন সেই অলক্ষণা পুকুরের চার পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়ান, একটি বুদ্বুদ দেখিলে স্থির দৃষ্টে চাহিয়া থাকেন, ভাবেন কে যেন আসিতেছে। পাত্র মিত্রগণ রাজাকে কত প্রবোধ দেয়, কিন্তু তাহাদের কথা রাজার কাণে যায় না ঃ—

"পাত্র মিত্রগণ যত রাজারে বুঝায়।
প্রবোধ না মানে রাজা করে হায় হায়।।"

পুষ্প ছিঁড়িয়া ফেলিলে বোঁটাটা যেমন শোভাশূন্য হইয়া গাছের উপর দাঁড়াইয়া থাকে, রাজলক্ষ্মীকে হারাইয়া রাজা তেমনই শ্রীহীন হইলেন।

"রাজ্য-ঐশ্বর্য্য দিয়া আমি কি করিব, আমার সাতরাজার ধন এক মাণিক কোথায় গেল! কার রাজ্য? আমার এত সাধের জলটুঙ্গীঘর, কার জন্য? আমার মলয় বাতাস, চন্দ্রের জ্যোৎস্না, কার জন্য আমার চন্দ্রিকা-ধবল বার-বাঙ্গলার ঘর? কার জন্য আমার আকাশ-ছোঁয়া যোড়-মন্দির।" রাজা বলিলেন—"আমার রাণীকে আনিয়া দাও, নতুবা আমার জীবন যায়।"

পাঁচ কাহন মজুর সেঁচন যন্ত্র দিয়া দীঘির জল তুলিয়া ফেলিতে নিযুক্ত হইল। সমুদ্র মন্থন করিয়া যেরূপ দেবতারা লক্ষ্মীকে তুলিয়াছিলেন,—দীঘির জল সেঁচিয়া ফেলিয়া রাজা তাঁহার অন্তঃপুর লক্ষ্মীকে তুলিবেন—এই সঙ্কল্প। মজুরেরা নয়টি রাত্রি নয়টি দিন সেই দীঘির জল তুলিয়া ফেলিতে লাগিল, কিন্তু যেমন জল— তেমনই রহিল, জল এক চুলও কমিল না;—

"রাত নাই দিন নাই সিঞ্চেন দীঘির পানি।।
সিচনে না কমে জল গো, চুল পরমাণি।"

পরন্তু সেই সেঁচা জল সেমাই নদীর বালুর চর পরিপ্লাবিত করিয়া ফেলিল। প্রলয়কালের শিবের শিঙ্গার মত গর্জ্জন করিয়া সেই বিপুল জলরাশি আকাশে উঠিল, জলস্থল একাকার করিয়া ফেলিল, কুটির ঘর, বাগবাগিচা ডুবিয়া গেল। জল গাছের আগা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া ফেলিল।

"রাজ্যের যতেক লোক ঘুমায় এই মতে।
পাগল হইয়া বাউল রাজা কাঁদে পথে পথে।।"
(পৃষ্ঠা ৭)

"ভাটি ছিল সোমাই নদী উজান বহি যায়।
.পানির ফেনা উঠল গিয়া গাছের ডগায়।।"

রাজার চক্ষে ঘুম নাই—তথাপি এক রাতে বার-বাঙ্গলা ঘরে তিনি চোখ বুজিয়া শুইয়া আছেন—এমন সময় আবার একটা অলৌকিক স্বপ্ন দেখিলেন ঃ—

রাণী আসিয়া শিয়রে বসিয়া তাঁহার দেহে হাত দিলেন, রাজার সর্ব্বাঙ্গ জুড়াইয়া গেল, রাণীর কণ্ঠস্বর শুনিলেন, সেই মিষ্টস্বরে কাণ ভরিয়া গেল।

তখন মেঘরাশি উতলা হইয়া কি হারাইয়া ঘন ঘন গর্জ্জন করিতেছে, রিমি ঝিমি শব্দে বৃষ্টি পড়িতেছে। ভেক কুলের সমবেত সুরে যেন ঘুমের নেশা চোখে আসিতেছে। রাণীর স্পর্শে রাজার কাছে শত শত স্বর্গের দরজা খুলিয়া গেল, তাঁহার শরীরে ঘন ঘন রোমাঞ্চ হইতে লাগিল। রাণী বলিলেন ঃ—

"রাজা—তোমাকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিতেছি না, আমার মন দিন-রাত্রি হু হু করিয়া কাঁদিতেছে; এমন ভোলা মহেশ্বর যাহার স্বামী, সেই হতভাগিনী স্বামীহারা হইয়া কিরূপে থাকিবে? আমার ছেলের শোকে বুক বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, আমার কত জন্মের তপস্যার ফল ঐ শিশু। নারীর স্বামী-পুত্র ছাড়া আর কোন্ সম্পদ আছে—সেই স্বামী-পুত্র হারা হইয়া আমি যেভাবে আছি তাহা তোমাকে কেমন করিয়া বুঝাইব?

"আমার কথায় আর একটী কাজ কর, দীঘিটার পাড়ে একখানি বাঙ্গলা ঘর শীঘ্র তৈরী কর। সন্ধ্যাকালে প্রতিদিন আমার বাপের বাড়ীর সুয়া-দাসীর কোলে ছেলেকে দিয়া সেই ঘরে পাঠাইয়া দিও। আমি দুপুর রাতে সেই ঘরে যাইয়া আমার যাদুকে দুধ খাওয়াইয়া আসিব।

"একথা যেন একটা কীট কি পতঙ্গও জানিতে না পারে, গোপন রাখিও।

"এই এক বছর যদি করে দুগ্ধ পান
তবে তো হইবে ছেলে ইন্দ্রের সমান।"

"এই একটি বছর বুক বাঁধিয়া থাক, শোক ক'র না, এক বছর পরে আমাদের মিলন হইবে।

রাজা দেখিলেন—রাণী ঠিক তেমনই আছেন, নানা বেশ ও আভরণ পরিয়া রাণী কখনও বেশভূষার-দিকে ভ্রুক্ষেপ করিতেন না, এখনও সেই এলোমেলো অসম্বৃত বেশ।

সেই সোণার মত—চাঁপাফুলের মত বর্ণ তেমনই আছে, পরণে সেইরূপ অগ্নিপাটের শাড়ী। পাটেশ্বরীর অঙ্গ পূর্ব্ববৎ নানা জহরতের অলঙ্কারে ঝলমল করিতেছে, সেইরূপ শাড়ীর আঁচল ও কেশ-পাশ বাতাসে উড়িতেছে, আর সেইরূপ স্নেহ-বিগলিত আদরের ডাক—তাহা সর্ব্বাঙ্গে যেন অমৃতের প্রলেপ দিল।

"একেত বাউরা রাজা গো আরো হইল পাগল
স্বপনের দেখা শুনা—না পায় লাগল।"

রাজা পরদিন পাত্রমিত্র সকলকে ডাকাইয়া আনিলেন, তাঁহার চক্ষে জল,—মুখের পরিম্লান মাধুরী যেন করুণরসে ভরপুর। তিনি দীঘির পারে, একদিনের মধ্যে একখানি সুন্দর বাঙ্গলাঘর নির্ম্মাণ করিতে হুকুম দিলেন। বহু কারিগর নিযুক্ত হইল, আদেশ হইল যেন গৃহে কোন রন্ধ্র না থাকে; রৌদ্র, হাওয়া ও জ্যোৎস্না হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিতে হইবে এই গুপ্ত গৃহ।

কারিগরেরা গজারির কাঠ দিয়া থাম নির্ম্মাণ করিল, সেই থাম কত বিচিত্র কারুকার্য্যে খচিত। উলুছনের চাল এমন শক্ত ও সুঠাম হইল যে তাহা সম্পূর্ণ হইলে পর, ওস্তাদ তাহার উপরে স্তূপে স্তূপে খড় রাখিয়া আগুন ধরাইয়া দিলেন,—খড়গুলি পুড়িয়া তাহার ছাই বাতাসে উড়িয়া গেল, কিন্তু চালের কান অংশ পুড়িল না; উলুখড়ের চালের উপর ছেঁচা বাঁশের ঢাকনিতে অগ্নিদেব কিছুকাল থাকিয়া উহা আরও পরিষ্কার করিয়া গেলেন, চালগুলি ঝলমল করিতে লাগিল। শীতলপাটীর নানারূপ ফুল পল্লবের গেরো লইয়া গৃহখানি যেন হাসিয়া উঠিল। সেই বেতের গেরোগুলির মধ্যে কত অপ্সরা কিন্নরীর মুখ, কত হাতীর শুঁড়, কত অশ্বারোহী, কত বিচিত্র ও উদ্ভট, শ্মশ্রু-গুম্ফযুক্ত ভৃত্যের মুখ—এই শীতলপাটি ঘেরা ঘরের বেড়াও নানারূপ আভের সংযোগে ও কারুকার্য্যে দর্শনীয় হইল। সেই সূক্ষ্ম শীতলপাটীতে সুনির্ম্মিত ঘরখানি একবারে নিরন্ধ্র, একটি পিঁপড়ার পথও তাহাতে নাই,—গৃহের মধ্যভাগে শুভ্র দর্পণের ন্যায় একখানি পালঙ্ক রাখা হইল; সিলেটের বহুমূল্য শীতলপাটী তদুপরে সজ্জিত এবং উৎকৃষ্ট মশারি ও রেশমী বালিস ও অপরাপর আসবাবে শয্যাটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করা হইল। সারা রাত্রি একটি ঘৃতের বাতি স্বর্ণপ্রদীপে জ্বলিতে লাগিল। সন্ধ্যাকালে সুয়া-দাসী সুগন্ধি চন্দ্র চুয়া ও বাটাভরা পান সহ—রাজকুমারকে ক্রোড়ে করিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল। সেই ঘরে আর একটি শয্যা, তাহার শুভ্র শোভা দুগ্ধের বর্ণকেও হার মানাইয়াছিল।"

এইভাবে প্রতিদিন প্রদোষে সুয়া-দাসী কুমারকে লইয়া গৃহে প্রবেশ করে এবং রাত্রি শেষ না হইতে হইতেই তথা হইতে চলিয়া আসে। একদিন রাজা সুয়া-দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক বছর তো প্রায় শেষ হইল, তুমি রোজই ত কুমারকে লইয়া ঐ ঘরে রাত্রি-বাস কর; অলৌকিক কিছু কি দেখিতে পাইয়াছ?"

সুয়া বলিল, "প্রতি রাত্রে রাণীমা আসিয়া কুমারকে দুধ খাওয়াইয়া যান ঃ—

"সেই মত হাব ভাব দেখিতে তেমন।
সেই মত দেখি রাণীর সোণার বরণ।।
সেই মত চাচর কেশ বাতাসেতে উড়ে।
সেই মত সর্ব্ব অঙ্গ রতনেতে জুড়ে।।
সেই মত পিন্ধন তার অগ্নিপাটের শাড়ী।
সেই মত দেখি রাজা তোমার সে নারী।।"
রজনী বঞ্চিয়া যায় শিশু লৈয়া কোরে।
রজনী পোহাইয়া গেলে না দেখি যে তারে।।
ঘর বাঁধা দুয়ার বাঁধা—নাই সে দেখা যায়,
কোন্ বা পথে আইসে রাণী কোন বা পথে যায়।।"

রাজা সুয়াকে বলিলেন, "এক বছরের আর একটিমাত্র দিন বাকী আছে, সুয়া, আজ আমি আমার রাণীকে দেখিব, আমি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। তুমি আজ কুমারকে বুকে লইয়া সাঁজের বেলা শীঘ্র শীঘ্র সেই ঘরে প্রবেশ করিও।"

সন্ধ্যায় সুয়া কুমারকে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল;

সোণার বাটায় পান সুপারি-চুয়া-চন্দন লইয়া সুয়া-দাসী ঘরে যাইয়া দরজা আটিয়া বাঁধিল। কুমারকে পালঙ্কে শোয়াইয়া নিজে তাহার পার্শ্বে শুইল।

এদিকে দ্বিপ্রহর রাত্রিতে রাজা তাঁহার বাহির বাঙ্গলাঘর হইতে রাণীকে দেখিতে বাহির হইলেন। তখন পৃথিবী স্তব্ধ—সেই বিশাল পুরীর একটি লোকও জাগিয়া নাই। পুকরের চারি পারে ফুলের গাছ, বাতাস নাই, ফুলগুলি হেলেও না দোলেও না, চিত্রপটের মত স্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান। রাজা সকল পার ঘুরিয়া পাগলের মত, দীঘির যে দিকে পূব-দুয়ারী কুমারের ঘর, সেইদিকে চলিয়া আসিলেন।

তখন প্রায় ভোর হইয়া আসিয়াছে। সুপ্তোত্থিত সোণার কোকিলের কণ্ঠের জড়তা তখনও যায় নাই, তাহার আধ আধ ভাঙ্গা সুর থমকিয়া আকাশের কোণে শোনা যাইতেছে। এই সময় পাগল রাজা যেন বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন।

তখন সূর্য্যোদয় আসন্ন। সে কোন পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের মাণিক! একটি মাত্র মাণিকের প্রভায় চোদ্দভুবন আলোকিত করিতেছে! কোন্ জন একটি ঘরে মাত্র বাতি জ্বালাইলেন, সেই একটি বাতিতে সবগুলি ঘর আলোকিত হইয়া উঠিল।

পূব দিকের সমুদ্রে সূর্য্য স্নান করিলেন, সেইখানে খানিক দাঁড়াইয়া প্রসাধন করিলেন, উষা-কন্যার সহিত মিলিত হইতে যাইবেন। তারপর নিজপুরীর দিকে যাইবার জন্য রথখানি প্রস্তুত করিতে অনুমতি করিলেন, উজ্জ্বল বর্ণ অশ্ব,—দুধের ন্যায় সাদা সমস্ত শরীর, তাহার পাখা দুইটি আগুনের বর্ণ। ক্ষিপ্রতায় সে ঘোড়া বাতাসকে হারাইয়া দেয়—গতির চক্রাকার আবর্ত্তে— সে ঘোড়াকে ঘোড়া বলিয়া চিনিবার উপায় নাই। পূব পাহাড়ের পথে রথ উষার সঙ্গে মিলনের জন্য রওনা হইল।

এই সময় পাগল রাজা আলুথালু বেশে, জাগরণ ক্লান্ত চোখে—উস্ক শুষ্ক মুখে সেই ঘরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"সুয়া দ্বার খোল, আমি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না, একবার রাণীকে দেখাইয়া আমার প্রাণ বাঁচাও।"

তাঁহার পদ-শব্দে চমকিত হইয়া রাণী দ্রুত পদে আসিয়া দ্বার মোচন করিলেন--

"হায় হায় করিয়া রাজা ধরে সাপুটিয়া
রাজার কান্দনে গলে পাষাণের হিয়া।"

রাণী বলিলেন, "আমার প্রাণপতি—আমাকে ছাড়িয়া দাও—আজ আমার শাপ মোচন হইবে, আমি দেবপুরে যাইব।

"এই কথা বলিয়া রাণী শূন্যে গেল উড়ি।
হস্তেতে ছিঁড়িয়া রইল অগ্নিপাটের শাড়ী।।"

এই গীতিকার ঐতিহাসিকতা

দীঘির জলে রাণী আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, "শুষ্কোদ্দার" হইয়াছিল, যে কারণেই হউক দীঘি জলে থৈ থৈ করিয়া পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। এই পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক সত্য।

"হাতেতে ছিঁড়িয়া রৈল রাজার অগ্নিপাটের শাড়ী..." (পৃষ্ঠা ১৪)

তারপর রাণীর শোক সহ্য করিতে না পারিয়া রাজা জানকীনাথ মল্লিক অকালে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহাও ঐতিহাসিক সত্য।

স্বামীর পূর্ব্ব পুরুষদের উদ্ধারের জন্য শুদ্ধা অপাপবিদ্ধ, পতিব্রতা রাণী—সরল বিশ্বাসের হোমাগ্নিতে আত্মদান করিয়াছিলেন। শিক্ষিত লোকেরা এই কুসংস্কারের যতই দোষ বাহির করুন না কেন, এবং এই কার্য্যের বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক টিট্‌কারি দেন না কেন—জন-সাধারণ এই বিশ্বাসপরায়ণার স্বর্ণ ছবি,—নানারূপ অলৌকিক সৌন্দর্য্য ও ঘটনার পরিকল্পনা করিয়া সাজাইয়াছে। বৈজ্ঞানিক খুঁটি নাটি প্রশ্ন না তুলিয়া আমি এই সাধারণের পরিকল্পিত দেবীমূর্ত্তি খানির পাদপদ্মে শ্রদ্ধা ও ভক্তির পুষ্পাঞ্জলী দিতেছি। এইরূপ আত্মদান আমাদের দেশে প্রাচীনকালে দুর্লভ ছিল না। যাঁহারা স্বামীর চিতানলে স্বামীর শবের পার্শ্বে শুইয়া সিন্দূর রঞ্জিত ললাটে, ও অগ্নিপাটের শাড়ী পরিয়া—শঙ্খ বলয় হস্তে—ভালবাসার চরম আদর্শ দেখাইতেন, অগ্নি-জ্বালা যাহাদের অঙ্গে কোন ব্যথা দিতে পারে নাই—বঙ্গ দেশের সেই শত শত সহমরণ যাত্রী সতীবৃন্দের পার্শ্বে রাণী কমলার জন্যও একটি স্থান আছে। এই গল্পটি অপর দেশীয়দের জন্য লিখিত হয় নাই। ইহা তাহাদের জন্যই লিখিত হইয়াছে, যাঁহারা আত্মবলি দিয়া প্রেমের মাহাত্ম্য দেখাইয়া গিয়াছেন—তাঁহাদেরই বংশধর।

এই পল্লী গীতিকাটি অধর চন্দ্র নামক এক পল্লী কবি রচনা করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইহা রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। রাজা জানকীনাথ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে জীবিত ছিলেন।

রাণী কমলা

দ্বিতীয় গীতিকা

কমলারাণী চলিয়া গিয়াছেন, পত্নীবিয়োগ-বিধুর রাজা জানকীনাথ শোকে আহার নিদ্রা ছাড়িয়া দিয়াছেন। এমন যে দুধে আলতার বর্ণ, তাহাতে কালী পড়িয়াছে; তাহার দেহ অর্দ্ধেক হইয়াছে, সর্ব্বদা বার-বাঙ্গলা ঘরে কমলা সায়রের দিকে তাকাইয়া থাকেন এবং চোখের জলে অবিরত মুখমণ্ডল প্লাবিত হয়। "রাণী আমায় ফেলিয়া গিয়াছ। তোমাকে ছাড়া আমি থাকিতে পারিতেছি না, আর দুধের ছেলেকে কার কাছে দিয়া গেলে, আমি তাহাকে কিরূপে পালন করিব!"—সর্ব্বদা এইভাবে বিলাপ করেন। কখনও কখনও, যেমন কোন অন্ধ ঘরময় তাহার লাঠি খুঁজিয়া বেড়ায়, তেমনই রাজা বিছানা হাতড়াইয়া কি খুঁজিতে থাকেন। সেই গৃহে রাণীর নিশ্বাসের সুরভি আছে, এবং শয্যায় সেই স্পর্শ আছে।

একদিন রাজা শয্যায় শুইয়া 'হায় রাণী' 'হায় কমলা'—বলিয়া স্বপ্নঘোরে কাঁদিতেছেন, এমন সময়ে তিনি দেখিলেন, যেন রাণী দীঘির জল হইতে উঠিয়া তাহার শয্যায় বসিলেন; রাণী তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন; সেই আদরে রাজার চক্ষু হইতে টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

রাণী বলিলেন, "দীঘির পারে পূব-দুয়ারী একটি ঘর তৈরি করে রাখ, যখন প্রতিদিন দাসদাসীরা কুমারকে সাঁজের সময় বেড়াইয়া লইয়া ঘুম পাড়াইতে আসিবে, তাহাদিগকে এই আদেশ দিও, খোকা ঘুমাইলে তাহাকে সেই নূতন ঘরে যেন শয্যায় রাখিয়া চলিয়া যায়। আমি তাঁহাকে নিশিরাত্রে যাইয়া স্তন্য পান করাইয়া আসিব। আমার স্তন্য পান করিয়া শিশু অল্প সময়ের মধ্যে বাড়িয়া উঠিবে।"

রাণীর স্বর তখনও রাজার কর্ণে ছিল, তিনি সেই সুকণ্ঠের স্বর শুনিতে শুনিতে যেন স্বর্গের আনন্দে বিভোর ছিলেন, এমন সময় সহসা ঘুম ভাঙিয়া গেল। রাণীর রূপ এমনই স্পষ্ট ও তাহার স্বর এমনই মিষ্ট যে রাজা তাহা স্বপ্ন বলিয়া ভাবিতে পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন, রাণী সত্যসত্যই আসিয়া দেখা দিয়া গিয়াছেন।

"শরীরের মধ্যে পাইতেছি রে
রাণীর অঙ্গের পরশন।"

এই স্পর্শ এই আদর কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। আমার কি কাল নিদ্রাই পাইয়াছিল, হায়! তিনি আসিয়াছিলেন, আমি কেন তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিলাম না।

"তাকে পাইয়া হারাইলাম নিজ কর্ম্ম দোষে
দারুণিয়া ঘুম এসেছিল আমার চক্ষুদুটির পাশে।"

পরদিন দীঘির পারে, পূব-দুয়ারী ঘর তৈরী হইল। তাহাতে কোমল শয্যা প্রস্তুত হইল, ঘুম পাড়ানিয়া দাসীরা কুমারকে সন্ধ্যার সময় বেড়াইয়া লইয়া আসিয়া সেই শয্যায় শোওয়াইয়া চলিয়া গেল।

রাজার মনে হইতে লাগিল, যেন দীঘির জল হইতে এক মহিমাময়ীমূর্ত্তি স্নেহের আবেগে দুই হাত বাড়াইয়া নূতন ঘরে ঢুকিলেন।

এইরূপ প্রতিদিন শিশু কুমার রঘুনাথ একাকী শয্যায় থাকেন, কিন্তু তাঁহার কান্তি দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে, ছয় মাসের মধ্যে শরীর বলিষ্ঠ ও রূপবন্ত হইয়া উঠিল। রাজার মনে নিশ্চয় বিশ্বাস হইল, সত্যই রাণী পুত্র-স্নেহে সেইখানে আসেন এবং তাহাকে স্তন্য দান করেন—না হইলে শিশু ইহার মধ্যে এমন অলৌকিক রূপ ও কান্তি কোথায় পাইবে?

একদিন রাজা মনে স্থির করিলেন, আজ আমি নিশ্চয়ই রাণীকে একবার দেখিব। ঘুমের ঘোরে একদিন তাঁহাকে পাইয়াও হারাইয়া ছিলাম, আজ আর সেইরূপ ভুল হইবে না। আমি যেরূপে পারি, তাঁহাকে ধরিয়া রাখিব।

রাণী প্রতি রাত্রেই আসেন, রাজার আদেশে সেই শয্যার এক কোণে সোনার বাটায় সুগন্ধি পান, ও·চুয়া-চন্দন রাখিয়া দেওয়া হইত। কিন্তু রাণী তাহা স্পর্শও করেন না।

"না ছোঁয় পান, না ছোঁয় গুয়া, রাণী যায় স্তন্য দিয়া
মর্ত্তের মাটী ছাড়িয়া আস্যাছি, তার লাগি কেন মায়া।।"

রাজা ভাবেন, রাণী যদি একটি পান মুখে দেন, একটিবার চুয়া-চন্দনের ঘ্রাণ গ্রহণ করেন—তবে তিনি কৃতার্থ হন। কিন্তু বিদেহী রাণী, রাজার ভালবাসা দেখিয়া মনে মনে দুঃখের সহিত একবার হাসেন; রাণী ভাবেন, "আমি তো সমস্ত সুখই ছাড়িয়া পৃথিবীর মায়াপাশ কাটাইয়া আসিয়াছি, আমাকে সামান্য একটা পানের আদর দেখাইয়া আবার সংসারের দিকে টানিতেছেন কেন? এই ছেলে বংশের একমাত্র প্রদীপ, ইহাকে হারাইলে যে রাজছত্র শূন্য হইবে, ও এই বংশের বাতি নিভিয়া যাইবে, এইজন্য আমার এখানে আসা।"

সেইদিন রাজা চিন্তা করিয়া সন্ধ্যার পর হইতে আরাম-গৃহ ছাড়িয়া দীঘির পারে বেড়াইতে লাগিলেন। রাজা দেখিলেন, কমলা-সায়রে একটি ফুল্লকমল ফুটিয়াছে, তখন "আমার কমলা কোথায়" ভাবিয়া রাজার চক্ষে অশ্রু টল্‌টল্‌ করিতে লাগিল।

রাত্রি এক প্রহর হইল, তখনও রাজপথে জনতা কমে নাই; পথচারীর ডাকাডাকি, দোকানদারগণের হাঁকাহাঁকি ও যান-বাহনের শব্দে রাস্তাঘাট সরগরম। দ্বিতীয় প্রহরেও কৃষকের ভাটিয়াল রাগ—বড় মানুষের জৌলসী বৈঠকে নৃত্য-গীত, টোলের ছাত্রদের ব্যাকরণ আবৃত্তি শোনা যাইতে লাগিল। দ্বিপ্রহর রাত্রে অভিসারিকার মন্থর পাদক্ষেপ ও ঘোমটার অন্তরালে অতিমৃদু প্রেম-আলাপন, ঘুম-ভাঙ্গা শিশুর ক্রন্দন ও দুধের বাটী ও ঝিনুকের ঠুনটুন্‌ শব্দ—এসকলও থামিয়া গেল, এবং তৃতীয় প্রহরে কচ্চিৎ গৃহপালিত পাখীর মিষ্ট কলরবে গুঞ্জরিত বাতাস যেন ঘুমের ঘোর ছড়াইয়া দিল। তখন নিস্তব্ধ আকাশে তারাগুলি নিষ্পন্দ হইয়া চাহিয়া আছে, কমলা-সায়রের কমলটি নিজের রূপের ভরে ঘুমের আবেশে হেলিয়া পড়িয়াছে, এবং সারা জগৎ সুসুপ্তির আবেশে নিশ্চল ভাবে মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

রাজার চোখ দুটি একবারও মুদিত হয় নাই; তাঁহার বিরহ-ক্লান্ত চক্ষু হইতে ঘুম চলিয়া গিয়াছে। রাজা এই নিথর নিস্তব্ধ রজনীতে দেখিলেন, দীঘির একটি কোণ্‌ হইতে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং ক্ষণপরে এক জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি ধীরে ধীরে উঠিয়া দীঘির পারে চলিয়াছেন। রাজা দুটি চক্ষুর সমগ্র দৃষ্টি সেই মূর্ত্তির দিকে নিবদ্ধ করিয়া বুঝিলেন—এ তাঁহারই কমলা রাণী—যাহার জন্য তিনি এই ছয় মাস বিলাপ করিয়া কঙ্কাল-সার হইয়াছেন।

অমনই সেই শীর্ণ শরীরে অসামান্য শক্তির সঞ্চার হইল, তিনি সেই মূর্ত্তির পাছে পাছে উন্মত্তের ন্যায় ছুটিলেন। রাণী নূতন ঘরে প্রবেশ করিয়া শিশুকে স্তন্য পান

করাইলেন এবং তাহার পর শিশুর চোখের উপর তাঁহার কোমল কর বুলাইয়া ঘুম পাড়াইলেন। তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে,—প্রভাতের বায়ু যেন দূর দিঙ্মণ্ডল হইতে মাঝে মাঝে আসিয়া সুপ্তের চোখের ঘুম আরও গাঢ়তর করিয়া দিতেছে।

যখন রাণী বাহির হইয়া আসিতেছিলেন, অমনই রাজা তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন; তাঁহার চক্ষু দুটি কাঁদিয়া জবা ফুলের মত লাল হইয়াছে, "রাণী কমলা, আমাকে ফেলিয়া যাইও না, আমি আর তোমার বিরহ সহ্য করিতে পারিতেছি না; না হয় তুমি যেখানে যাইতেছ, আমাকে সেইখানে লইয়া যাও।" উন্মত্ত বেগে রাণী ছুটিয়াছেন, উন্মত্ত বেগে রাজা পিছু পিছু যাইতেছেন; হঠাৎ রাণী সেই সায়রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, রাজা তাঁহার আঁচল দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া বলিলেন, "এ কাল দীঘিতে যাইও না, রাণী! দোহাই তোমার।" বাকী রাত্রিটুকু রাজা সাঁতরাইয়া দীঘির সেওলা হাতড়াইয়া কাটাইয়া দিলেন। প্রাতে লোকে দেখিল—দীঘির মধ্যে এক রূপবান কৃশ মূর্ত্তি। রাজাকে চিনিতে বিলম্ব হইল না। তাঁহার সমস্ত শরীর পানা সেওলা ও পদ্ম-পুকুরের পদ্মের নালে আচ্ছন্ন; চক্ষু দুটি লাল, কথা বলিবার শক্তি নাই, হস্তে দৃঢ় মুষ্টিতে রাণীর অগ্নিপাট শাড়ীর অঞ্চলের একটি অংশ ধরিয়া আছেন। এই ভাবে রাজার মৃত্যু হইল। সকলে বলিল, "এ শাড়ীর অংশ রাজা কিরূপে পাইলেন?" হয়ত তাঁহার মনের একাগ্রতা ও ভালবাসার আবেষ্টনীর মধ্যে রাণীর স্মৃতির এই অংশটুকু রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছিল! এই বস্ত্রাংশ কোন তাঁতি বা জোলা তৈরী করে নাই, উহা তাহার মনের সৃষ্টি—প্রেম যে অমর তাহারই নিদর্শন।

শোকাহত রাজা জানকীনাথ এই ভাবে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। রাজা অতি ধার্মিক এবং প্রজাবৎসল ছিলেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সমস্ত রাজ্যময় শোকের বন্যা বহিয়া গেল।

ইশা খাঁ

শিশু রঘুনাথকে উজির নাজির ও মন্ত্রীমণ্ডলী প্রাণ-প্রিয় জ্ঞানে পালন করিতে লাগিলেন, তাঁহারা প্রতিনিধি-স্বরূপ রাজ্য শাসন করিলেন। শিশু কুমারের প্রতি

প্রজাদের আন্তরিক দরদবশতঃ তাহারা মুক্ত হস্তে রাজস্ব দিতে লাগিল, ফলে রাজ্যের আয় বাড়িয়া গেল। রঘুনাথের যখন পাঁচ বৎসর বয়স, তখন মন্ত্রীরা তাহাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। তীর্থোদকে স্নান করাইয়া, চন্দন কুঙ্কুমে অঙ্গরাগ করাইয়া, কস্তুরির তিলক কপালে পরাইয়া, কজ্জলে চক্ষু রঞ্জিত করিয়া মন্ত্রীরা তাঁহার মাথায় শ্বেত ছত্র ধরিলেন; কেহ কেহ স্বর্ণ দণ্ড চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন এবং অন্তঃপুরিকারা চোখের জল মুছিয়া জয় জয়কার ও শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন; এদিকে যন্ত্রী-তন্ত্রী ও গায়কেরা চোখের জল মুছিয়া উৎসবে যোগদান করিলেন, "আমাদের কুমারকে স্বর্গগতা রাণী স্তন্য দিয়া যাইতেন এবং এই ছেলে রাজার চোখের তারা ছিল"—এই বিলাপ ধ্বনির সঙ্গে উৎসবের উচ্চ কলরব শোনা যাইতে লাগিল।

দক্ষিণে জঙ্গলবাড়ী নামক নগর তখন একটা প্রসিদ্ধ স্থান ছিল, সেখানে দেওয়ান ইশা খাঁ রাজত্ব করিতেন। ইশা খাঁর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ সকলের বিদিত ছিল। তিনি দিল্লীশ্বর আকবরের সঙ্গে বহুবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ভূঞা রাজাদের মধ্যে তিনি ও প্রতাপাদিত্য ছিলেন সর্ব্বপ্রধান। ইশা খাঁ মস্ত বড় পালোয়ান ছিলেন; তিনি হাতীর শুঁড় ধরিয়া চক্রাকারে তাহাকে আকাশে ঘুরাইতে পারিতেন, তিনি যখন রোষাবিষ্ট হইয়া গর্জ্জন করিতেন, তখন মনে হইত আকাশের মেঘ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে এবং যখন নদী-তটে হাঁটিয়া বেড়াইতেন, তখন তাহার পাদক্ষেপে নদীর পাড় কাঁপিয়া উঠিত।

কিন্তু রাজা জানকীনাথ ছিলেন ইশা খাঁর শত্রু। উভয়ে বহুবার লড়াই করিয়াছেন, কিন্তু কে বড়, কে ছোট, তাহা লোকে বুঝিতে পারিত না।

জঙ্গলবাড়ী হইতে ইশা খাঁ তাঁহার চির বৈরী জানকীনাথের মৃত্যু সংবাদ শুনিলেন। তিনি তাঁহার অজেয় সৈন্য সামন্ত লইয়া সুসুঙ্গ দুর্গাপুরের দিকে রওনা হইয়া আসিলেন।

অকস্মাৎ প্লাবনের মত আসিয়া ইশা খাঁর সৈন্যগণ সুসুঙ্গের দুর্গ অবরোধ করিল। তিন মাস কাল দেওয়ান ইশা খাঁ দুর্গাপুর রাজধানী অবরোধ করিয়া রহিলেন। তিনি ছিলেন অতি ফন্দীবাজ লোক, বিনা সংবাদে এবং এরূপ দ্রুতভাবে ইশা আসিয়া পড়িয়াছিলেন যে দুর্গাপুরের লোক পূর্ব্বে তাঁহার অভিযান টের পাইয়া প্রস্তুত হইতে পারে নাই। তিন মাস কালের মধ্যে রাজধানীর দুর্গের রসদ ফুরাইয়া গেল এবং এক অশুভ মুহূর্ত্তে ইশা খাঁর সৈন্য অনাহার-ক্লিষ্ট রাজসৈন্যদিগকে হটাইয়া দিয়া অতর্কিত ভাবে রাত্রিকালে শিশু রঘুনাথকে হরণ করিয়া লইয়া গেল।

সমস্ত দুর্গাপুর অঞ্চলে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। "আমাদের প্রাণের কুমারকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে, এই পুরীর আর কি রহিল? রাজার ঘরের বাতি নিভাইয়া দিয়াছে" এই বলিয়া কেহ বুক চাপড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল, কেহ নদীতীরে, কেহ রাজপথে ধূলায় লুটিয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিল, কেহ কেহ ক্রুদ্ধনেত্রে দূর দক্ষিণ-মুলুকের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। তাহারা রাজাকে উদ্ধার করিবার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়া বসিল।

ইহার মধ্যে উত্তর পাহাড়ে রাজার গাড়ো প্রজারা এই দুঃসংবাদ শুনিতে পাইল। বারুদে অগ্নি সংযোগ করিলে যেরূপ হয়—তাহারা সংবাদ শুনিয়া তেমনই জ্বলিয়া উঠিল,—ক্ষিপ্তভাবে সমস্ত পাহাড়ময় পাগলের মত কি করিবে, তাহার উপায় স্থির করিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

"মুল্লুক ভাঙ্গিয়া তারা পাগল হইয়া ফেরে।
কেমন হিম্মৎ বেটার রাজারে নিছে ধ'রে।।
তার মুণ্ড কাট্যা ফেলামু সায়রের মাঝে।
তা' নইলে পারাপার নাহি এই কাজে।।
জঙ্গলবাড়ী সহর ভাইঙ্গা করব গুড়া গুড়া।
ইহার শাস্তি দিতে হবে মোদের আচ্ছা কর্যা।।
রাজার লাগিয়া তারা পাগল হৈয়া ফেরে।
কতক গিয়া দাখিল হৈল জঙ্গলবাড়ী স'রে।।"

দশ-ফলকযুক্ত বর্শা, রাম-কাটারি, বল্লম ও ধনুর্ব্বাণ লইয়া ত্রিশ হাজার বাছাই-করা গাড়ো সৈন্য বিদ্যুৎবেগে ছুটিল। পাহাড় হইতে যেন প্রচণ্ড বেগে ঢল নামিয়া আসিল। চামুণ্ডার দলের মত ভীষণ-দর্শন এই ক্ষিপ্ত গাড়ো-সৈন্য জীবনপণে তাহাদের রাজাকে উদ্ধার করিতে ছুটিয়াছে। তাহাদের উদ্দণ্ড-তাণ্ডবে পদভরে ধরিত্রী মুহুর্মুহু কম্পিত হইতে লাগিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দেওয়ান ইশা খাঁ খুব ফন্দীবাজ যোদ্ধা। তিনি তাঁহার রাজধানী জঙ্গলবাড়ী সহর এমন সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিলেন যে কাহার সাধ্য তথায় প্রবেশ করে? সহরের চতুর্দ্দিক ব্যাপিয়া পরিখাটি (গাঙ্গিনা) বিশাল ও অতল-স্পর্শ। গাড়োরা সেই পরিখার উত্তর পারে জঙ্গলে আসিয়া পরিখা দেখিয়া স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইল। পরপারে লক্ষ্য সৈন্য পাহারা দিতেছে, তাহাদের অস্ত্র-শস্ত্রের অবধি নাই। বন্দুকধারী এই

সকল শিক্ষিত সৈন্যের সঙ্গে বর্শা ও বল্লম লইয়া তাহারা কি করিবে? গাড়োরা তাহাদের দেশের বেগবতী পাহাড়িয়া নদী সাঁতড়িয়া পার হইতে পারে, সে হিসাবে এই গাঙিনাটি বিরাট হইলেও দুর্লংঘ্য নহে। কিন্তু গাঙিনার মধ্যে ইশা খাঁ বড় বড় হাঙ্গর-কুমীর রাখিয়া দিয়াছেন, সেই জলে নামিয়া স্নান করিতে বড় বড় যোদ্ধারাও সাহস করে না। একদিকে পরিখা সেই সকল করালদংষ্ট্রা, হিংস্র জন্তুতে পূর্ণ,—অপর পারে ইশা খাঁর দুর্দ্ধর্ষ সৈন্য।

তাহারা সারাটি দিন সেই জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া থাকিয়া নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল, কিন্তু কোনটিই মনঃপুত হইল না। অবশেষে এক বৃদ্ধ গাড়োর পরামর্শ সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। তিন ক্রোশ দূরে "ধনাইর খাল" নামক একটি নদী আছে। সেই বৃদ্ধ গাড়ো বলিল, "যদি রাতারাতি আমরা অন্ধকারে নালা কাটিয়া এই গাঙ্গিনার সহিত নদীর যোগ করিতে পারি, তবে ইশা খাঁর ভাওয়ালিয়াগুলি দিয়াই আমরা জঙ্গলবাড়ীর সহরে পৌঁছিতে পারিব।"

সেই রাত্রি আঁধার ও মেঘপূর্ণ ছিল, নিঃশব্দে দূরে 'ধনাইর খাল' হইতে তাহারা নালা কাটিতে আরম্ভ করিল। ত্রিশ হাজার সবল হস্তে কোদালের আঘাতে রাত্রি এক প্রহরের মধ্যেই নালা কাটা শেষ হইয়া গেল।

কুমার রঘুনাথকে ধরিয়া আনিয়া ইশা খাঁ জঙ্গল-বাড়ীতে বিজয়োৎসব করিতেছিলেন। সেরাত্রে সহরের সমস্ত লোক মদ্যপান করিয়া আনন্দোৎসবে মত্ত হইয়াছিল। এমন সময় যে গাড়োরা এরূপ কাণ্ড কবির, তাহা কে জানিত?

ইশা খাঁর ভাওয়ালিয়াগুলি ঘাটে ঘাটে বাঁধা ছিল, মাঝি মল্লারা নিশ্চিন্তভাবে উৎসব করিতেছিল,—গাড়োরা সেই শত শত রণতরী খুলিয়া লইল এবং বন্যার মত যাইয়া বন্দী-শালার প্রহরীদিগকে মারিয়া রাজকুমারকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসিল। এই ঘটনা যেন চোখের পলকে ঘটিয়া গেল।

"ভাওয়াল্যায় উঠিয়া তবে দাড় মারল টান।
পঙ্খী-উড়া করে যেমন পবন সমান।।
তিন দিনের পথ যায় প্রহরেতে বাইয়া।
ইশা খাঁ নাগাল পাবে কেমন করিয়া।।

মন্তব্য ও আলোচনা

যতই কেন অলৌকিক ঘটনা সম্বলিত হউক না, কমলারাণীর এই দুইটি কাহিনী—ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আছে।

কমলারাণী একটা প্রাচীন সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। নূতন খনিত দীঘিতে জল না উঠিলে লোকে নরবলি দিত। এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে দীঘি কাটাইতে আরম্ভ করিয়া জল না উঠা পর্য্যন্ত কাজ থামাইলে দীঘি-স্বামীর চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হয়। এই সংস্কারটা সামাজিক গুরুগণ জন-হিত কল্পেই লোকের মনে সুদৃঢ় সংস্কারে পরিণত করাইয়া ছিলেন। তখনকার দিনে জলাশয় খনন না করিলে কোন পল্লী বা নগরীই বাসযোগ্য হইত না। অথচ জনসাধারণ ছিল দরিদ্র ও সহায়হীন,—দৈবে কখনও প্রচুর বর্ষণ হইত, কখনও নির্ম্মেঘ আকাশ মাসের পর মাস ভ্রুকুটি করিয়া থাকিত, এক বিন্দু জলও দিত না। রাজা বা ধনী ব্যক্তিরা খাম-খেয়ালি। দীঘি খনন করিতে আরম্ভ করিয়া সহজে জল না উঠিলে হয়ত তাহারা বিরক্ত বা অসহিষ্ণু হইয়া কার্য্য বন্ধ করিতে ইচ্ছুক হইতে পারিতেন,—কিন্তু পূর্ব্ব-পুরুষেরা নরক-বাসী হইবেন—এই অনুশাসনের ফলে দীঘি জল-দানের যোগ্য না হইবার পূর্ব্বে কেহ নিবৃত্ত হইতেন না।

অপর একটা সংস্কার কুসংস্কারে দাঁড়াইয়াছিল। যদি পুকুরে কোন ব্যক্তিকে উৎসর্গ করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইত, কিম্বা কর্ত্তৃপক্ষের কেহ আত্মদান করিতেন তবে পুকুরে জল উঠিবে লোকের মনে এইরূপ একটা ধারণাও ছিল।

শুষ্কোদ্ধারের জন্য দুশ্চিন্তায় রাজা বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পাহাড়িয়া দেশ, সেখানে সহজে দীঘি কাটিয়া জল আনা যায় না। এজন্য বহু চেষ্টার ফলে দীঘি অতি গভীর করিয়া খনন করিলেও যখন জল পাওয়া গেল না, রসাতল রস-শূন্য হইয়া জল দানে কুণ্ঠিত হইলেন, তখন দুর্ভাবনায় বিচলিত রাজা স্বপ্নে দেখিলেন যেন কমলারাণী জলে নামিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিম্ন হইতে জলের ফোয়ারা নিঃসৃত হইতেছে। দুর্ভাগ্য বশতঃ রাজা রাণীকে স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলাতে অনর্থ উৎপাদিত হইল। রাণী এই স্বপ্নে তাঁহার আত্মদানের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া দীঘিতে জীবনদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

একথা সত্য যে রাজা জানকীনাথ মল্লিক তাঁহার স্ত্রীর নামে "কমলা-সায়র" নামক প্রকাণ্ড একটি দীঘি কাটাইয়া ছিলেন, একথাও সত্য যে কমলারাণী তাঁহার দুধের শিশুটিকে ফেলিয়া স্বামীর পূর্ব্বপুরুষদিগকে নরক হইতে রক্ষা করিবার মানসে দীঘির জলে জীবন

সমর্পণ করিয়াছিলেন, একথাও সত্য যে রাজা জানকীনাথ তাঁহার ধর্ম্মশীলা স্ত্রীর বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া সেই ঘটনার অব্যবহিত পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং একথাও সত্য যে সেই পিতৃ-মাতৃহীন অভাগা শিশু পরে জাহাঙ্গীরের নিকট "রাজা" উপাধি পাইয়াছিলেন।

সুতরাং এই গল্পটির মূল ঘটনা সত্য। পল্লী-কবিবা ইহার করুণ রসাত্মক অংশগুলির উপর কল্পনার ছটা ফেলিয়া ইহা মনোজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছেন। সুবর্ণ মূর্ত্তি বা মর্ম্মরের প্রতিকৃতি যেরূপ প্রকৃত না হইয়াও তাহা লোকের প্রীতি-শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, আধ-কল্পনা বিজড়িত কমলারাণীর মূর্ত্তি তেমনই ধাতব বা প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় এই ৪।৫ শত বৎসর যাবৎ লোকের শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি পাইয়া আসিতেছে। সুসুঙ্গ দুর্গাপুর অঞ্চলে রাণী কমলা সম্বন্ধে পল্লীকবিরা অনেক গান রচনা করিয়াছিলেন, তাহার অনেক গুলিই পাওয়া যায় নাই। চেষ্টা করিলে হয়ত আরো কয়েকটির উদ্ধার হইতে পারে।

রাণীর সংস্কার বা অজ্ঞতা লইয়া বিজ্ঞ পাঠকেরা যতই আলোচনা করুন না কেন, রাণী কমলার চিত্র কবি-কল্পনার সংযোগে এক তিলও মনোহারিত্ব হারায় নাই,—বরং তিনি কল্প-লোকের কোন স্বর্ণপ্রতিমার ন্যায় আমাদের চোখে আরও বেশী মোহনী মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছেন। তাঁহার অটুট গাম্ভীর্য্য, সাম্রাজ্ঞীর মত সংযম ও বাক্যবিরল প্রেম যাহা পল্লী কবিরা আঁকিয়াছেন—তাহা আমাদিগকে বিস্মিত করে এবং করুণায় আমাদের মন ভরিয়া দেয়;—Morti de Arthur-এর আখ্যানের মত জানকীনাথের অলৌকিক প্রেমিকতা ও ত্যাগ; কবি চণ্ডীদাসের দুটি ছত্র দ্বারা রাণীর চরিত্র ব্যাখ্যা করা যায়।

"পীরিতি না কহে কথা।
পীরিতি লাগিয়া পরাণ ত্যজিলে
পীরিতি মিলিবে তথা।"

রাজাই কাঁদিয়া কাটিয়া বিলাপ করিয়া অসহ্য বিরহ বেদনা বুঝাইয়াছেন, রাণী তাহার স্বল্প স্থায়ী জীবনে একবারেই বেশী কোন কথা বলেন নাই! অথচ কি গভীর তাঁর প্রেম, যিনি স্বামীর পূর্ব্বপুরুষদের জন্য অকাতরে রাজস্বামী, চোখের পুতুল দুধের ছেলে এবং রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া জীবন আহুতি দিয়াছেন! পূর্ব্বাধ্যায়ের কবি গল্পটি কবিত্বের ইন্দ্রজালে মণ্ডিত করিয়াছেন। যেখানে সখীরা রাণীর সঙ্গে নদীতে স্নান করিতে চলিয়াছেন;

সেখানকার চিত্র কি সুন্দর! যেখানে বিরহী রাজার চোখের সামনে ধীরে ধীরে সূর্য্যোদয় হইতেছে, সে দৃশ্যটি বৈদিক ঋষির ঊষার কথা মনে করাইয়া দেয়।

"কোন্ পাহাড়ে জ্বলে মাণিক এমন প্রবল।
এক মাণিকে চৌদ্দ ভুবন করিল উজ্জ্বল।।
কোন্ জনে জ্বালাইল বাতিরে এমন আঁধার ঘরে।
এক ঘরে জ্বালাইলে বাতি সকল উজ্জ্বল করে।।"

কবি-প্রসিদ্ধির ধার কবি অধরচন্দ্র ধরিতেন না, সূর্য্যের সপ্তাশ্বের কথা হয়তঃ তিনি শোনেন নাই। ঊষা যে সূর্য্যের প্রণয়িনী, একথা তাঁহার নিছক কল্পনা; তথাপি সূর্য্যোদয়ের যে বর্ণনা তিনি দিয়াছেন তাহা ঋগ্বেদের সূক্তের ন্যায়ই সরল এবং সৌন্দর্য্য মণ্ডিত। সূর্য্যের রথের ঘোড়াটির দুইটি আগুন বর্ণের পাখা। স্নানান্তে সূর্য্যদেব ঊষার সঙ্গে মিলিত হইতে যাইতেছেন, সেই চিত্রটি পাঠক মূল গান হইতে পড়িয়া দেখিবেন, আমার কি সাধ্য যে পল্লী-কবির সরল বিবৃতির পদমাধুর্য্য রক্ষা করিব! আমরা যাহা বলি তার অর্দ্ধেকটার ভাষা ধারকরা, কালিদাস-সেক্ষপীয়র প্রভৃতি মহাকবিগণের কথা আমাদের লিখিবার সময় মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি দিয়া আনাগোণা করিয়া রস ভঙ্গ করিয়া দেয়, তারপর অভিধান তো শব্দের ভাণ্ডার খুলিয়াই আছে, সেই সকল ধার-করা শব্দ দ্বারা ভাব যতটা না প্রকাশ পায়, জটীল ও গুরু শব্দের আবর্জ্জনায় তাহা ততোধিক পরিমাণে চাপা পড়ে। ইহা ছাড়া অলঙ্কার শাস্ত্রের কৃত্রিম উপাদান—উৎপ্রেক্ষা, উপমা প্রভৃতি আমাদের ভাষাতে ক্রমাগত প্রচ্ছন্ন থাকিয়া জাল বুনিতে থাকে। কিন্তু এই সকল পল্লী-কবি মোটেই ঐ সকল সংস্কারের অধীন হন নাই—তাহাদের একমাত্র গুরু প্রকৃতি। সাক্ষাৎ দর্শন, সাক্ষাৎ শ্রবণই তাহাদের গল্প গড়িবার একমাত্র উপাদান। এজন্য তাহাদের কথায় একটিও অবান্তর শব্দ নাই। তাই, বর্ণনা এত সরল, সংক্ষিপ্ত ও উপাদেয়। তাঁহারা যখন করুণ রসের ছবি আঁকেন, তখন যেন তাঁহাদের প্রতিছত্র হইতে অশ্রু ঝরিয়া পড়ে,—যখন কোন চরিত্র অঙ্কন করেন, তখন দুকথায় সরল স্পষ্ট চিত্র ফুটিয়া উঠে, যদিও সে রচনা সংক্ষিপ্ত, তথাপি তাহাতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যথার্থভাবে প্রতিবিম্বিত হয়; বর্ণনার বাহুল্য নাই—পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া সূর্য্যোদয় বা সূর্য্যাস্তের উল্লেখ নাই, অথচ দুই একটি পংক্তিতে যেন কবি, প্রাকৃতিক বৈভব হইতে মণি-মুক্তা খুঁজিয়া বাহির করেন, প্রকৃতি যেন পরম কৃপায় এই পল্লী-কবিদের সঙ্গে নিজে কথাবার্ত্তা বলেন।

সুতরাং যাহারা মূল কবিতাগুলি পড়িবেন, তাঁহারা আমার বর্ণনা পড়িয়া গল্পের কাব্যভাবের প্রকৃত স্বাদ পাইবেন না। যদি আমার এই লেখায়—মূল গীতিকাগুলি পড়িবার জন্য আমি কৌতূহল উদ্রেক করিতে পারি, তবেই আমার লেখা সার্থক মনে করিব।

জানকীনাথ মল্লিক আকবরের সমকালিক। গল্পের রঘুনাথকে অতি শৈশবে গাড়ো প্রজারা জীবনপণ করিয়া ইশা খাঁয়ের বন্দীশালা হইতে উদ্ধার করিয়াছিল, এই কথার মধ্যে অবশ্যই কিছু সত্য ছিল। কিন্তু সেই রঘুনাথ মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে গোড়ারা বিদ্রোহ করিলে এই পাহাড়িয়া প্রজাদিগের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান করিয়া তাহাদিগকে দমন করেন। সেই কাজের পুরস্কার স্বরূপ জাহাঙ্গীর রঘুনাথকে রাজা উপাধি এবং খেতাব প্রদান করেন; গাড়োরা অতি সরল, সাহসী ও বিশ্বস্ত লোক, তাহারা সাধারণতঃ রাজভক্ত, কিন্তু কি কারণে তাহারা বিদ্রোহী হইল এবং কেনই বা রঘুনাথ সিংহ, যিনি ইহাদের প্রাণপণ চেষ্টার ফলে অতি শৈশবে ইশা খাঁর মত প্রবল শত্রুর হস্ত হইতে ত্রাণ পাইয়াছিলেন, সেই পরম কৃতজ্ঞতার পাত্র প্রজাদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন, এই জটিল ঐতিহাসিক সমস্যার আমরা এখনও সমাধান করিতে পারি নাই। রাজবাড়ীর দলিল পত্র ও মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মোগল ইতিহাসের বিবরণের কোন স্থানে হয়ত এমন কিছু আছে, যাহা সুসুঙ্গ দুর্গাপুরের ইতিহাসের এই অন্ধকার অধ্যায়ের উপর ভবিষ্যতে আলোপাত করিতে পারে। আবুল ফজল কৃত আকবর নামায় জানকীনাথের নাম পাওয়া যায়।

রাণী কমলার নামে উৎসর্গ করা কমলা-সায়র এখনও বিদ্যমান; তাহার একাংশ সোমেশ্বরী নদীর গর্ভস্থ হইয়াছে; যেখানে ৩০ হাজার গাড়ো খাল কাটিয়া তাহাদের কোদাল ধোয়ার জন্য ৩০ হাজার কোপ কোদালের ঘায়ে একটা দীঘি করিয়াছিল, জঙ্গল বাড়ীর সেই 'কোদাল ধোয়া দীঘি' এখনও আছে, আর আছে সেই 'ধনাইর খাল'। এই সকল ঐতিহাসিক চাল-চিত্রের মধ্যে পুণ্যশীলা রাণী কমলা ও জানকীনাথের প্রাণ-দেওয়া ভালবাসার যে কল্পনা বিজড়িত চিত্র ফুটিয়াছে, তাহা আধ-আলোক আধ-আঁধারে সূর্য্যাস্ত ও চন্দ্রোদয়ের সন্ধি-স্থলে দৃশ্যমান জগতের ন্যায় কতকটা স্বপ্ন প্রহেলিকাময়, কতকটা সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত।

কাজলরেখা

ধনেশ্বরের দুর্ভাগ্য

ভাটী মুল্লুকে ধনেশ্বর নামক এক সম্ভ্রান্ত সদাগর ছিলেন। তাঁহার কুবেরের মত ঐশ্বর্য ছিল ঃ—-বাড়ীর দুয়ারে হাতী, ঘোড়া বাঁধা থাকিত এবং গৃহে এগার বছরের এক কন্যা ও চার বছরের এক পুত্র, দুইটি সাঁঝের বাতির মত ঘরখানি উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। কন্যাটি এমন রূপবতী ছিল,—

"হীরা মতি জ্বলে কন্যা যখন নাকি হাসে।
নূতন বর্ষায় যেমন পদ্ম ফুল ভাসে।।"

ছেলেটিও একটি সোনার পুতুলের মত আঙ্গিনায় খেলিয়া বেড়াইয়া যেন স্বর্ণ বৃষ্টি করিয়া যাইত। কিন্তু মানুষের সৌভাগ্য চিরদিন স্থির থাকে না।

সদাগরের দুর্বুদ্ধি হইল, তিনি জুয়া খেলায় সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। আগুন লাগিলে যেরূপ অল্প সময়ের মধ্যে দাউ দাউ করিয়া ঘর বাড়ী পুড়িয়া যায়, এই জুয়া খেলায় দেখিতে দেখিতে তাঁহার দুর্দ্দশার চরম অবস্থা দাঁড়াইল। এত বড় রাজপ্রাসাদের 'মালমাত্তা', হাতী, ঘোড়া, যানবাহন যেন ভোজবাজির প্রভাবে অদৃশ্য হইল; বারখানি মাল-বোঝাই জাহাজ তাহাদের সোনার মাস্তুল লইয়া জুয়া খেলার অতল জলে ডুবিয়া গেল। পাশায় হারিয়া মহারাজা যুধিষ্ঠির কৌপীন-বস্ত হইয়া বনে গিয়াছিলেন, ধনেশ্বর সদাগরের অবস্থা সেইরূপ হইল।

মূলে 'সুজাতি' স্থলে আমি 'নূতন' শব্দ দিয়াছি।

ইহার উপর আর এক বিপদ, কন্যাটি দ্বাদশ বৎসরে পড়িয়াছে। ইহাকে এখন বিবাহ না দিলে সামাজিক সম্মান থাকে না; কিন্তু 'জুয়ারীর মেয়ে' বলিয়া কেহ তাহাকে বিবাহ করিতে রাজী হইল না। সদাগর যেন অকূল সমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন।

এমন দুর্দ্দিনে এক জটাজুট সমন্বিত সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহাকে একটি 'শ্রী' চিহ্নাঙ্কিত মানিকের আংটী ও একটি শুক পাখী উপহার দিলেন। বণিক কাঁদিয়া তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন।—সন্ন্যাসী বলিলেন, "এই শুক পাখীটির নাম 'ধর্ম্ম-মতি'। ইহার পরামর্শ মত কাজ করিলে তোমার বিপদের অনেকটা কাটিয়া যাইবে।"

শুকটি অতি-বৃদ্ধ; তাহার লঙ্কার মত টক্‌টকে লাল দুটি ঠোঁট বয়সের দরুণ ধূসর বর্ণ ধারণ করিয়াছে, পক্ষ দুটির সবুজ রং—মলিন হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে পালক খসিয়া পড়িয়াছে—গ্রীবার রামধনু রং—এমন কি মাংস পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়া একটি শীর্ণ কণ্ঠীর মত দেখাইতেছে। কেবল দুইটি দীপ্ত চোখের জ্যোতি কমে নাই, বরং আরও বাড়িয়াছে,—সে দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ যেন তাহা ভবিষ্যতে ও অতিতের যবনিকা ভেদ করিয়া সত্যের আলোক দেখিতে শক্তিমান।

সাধু শুকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—"শুক, আমার দুর্দ্দশা দেখ। আমার রত্ন-মন্দির, 'জলটুঙ্গী' 'কামটুঙ্গী'* ও মণিমণ্ডিত আরামগৃহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। একটা মাদুর পর্য্যন্ত নাই, মাটিতে শুইয়া থাকি—একটা গাড়ু কি পাত্র নাই—অঞ্জলীতে করিয়া জল পান করি, পথের ফকিরের মত বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াই। এই বংশের শেষ বাতিস্বরূপ একটি কন্যা ও একটি পুত্র বিদ্যমান, এই দুই সন্তানকে কি দিয়া প্রতিপালন করিব?" বলিতে বলিতে সদাগরের দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল।

শুক বলিল, "তোমার দারিদ্র্য শীঘ্রই দূর হইবে। সন্ন্যাসী দত্ত 'শ্রী আংটি' বাজারে যাচাই করিয়া বিক্রয় করিয়া ফেল এবং উদ্বৃত্ত টাকা দিয়া তুমি ব্যবসা আরম্ভ কর, তোমার দিন ফিরিবে।"

জলটুঙ্গী ও কামটুঙ্গী—গ্রীষ্মকালে নদী বা পুকুরের মধ্যে উত্থিত গৃহ বিশেষ; বড় মানুষের গৃহ-প্রাঙ্গনে পদ্মপুকুরে 'জলটুঙ্গী' ঘর নির্ম্মিত হইত, শীতল পদ্মগন্ধযুক্ত বাতাসে সুখ-নিদ্রা হইত। 'কামটুঙ্গী' ও সেইরূপ আরাম গৃহ; তাহার সাজসজ্জা বৈঠকখানার মত হইত, তবে 'কামটুঙ্গী' ঘর ঠিক জলের মধ্যে নির্ম্মিত হইত না। পুকুর পাড়ে তৈরী হইত।

অবস্থার পরিবর্ত্তন—কিন্তু কন্যাকে লইয়া বিপদ

শ্রী আংটির দাম যাহা হইল, তাহার কতকাংশ দিয়া তিনি বাড়ী মেরামত করিলেন এবং বাকী টাকা দিয়া তিনি ব্যবসায়ে নামিলেন। শুভ দিনে সব দিক দিয়াই সুবিধা হইল। শুক বলিয়াছিল—"তুমি এক বৎসর ব্যবসা করিয়া যাহা পাইবে, তাহাতে বার বৎসর রাজার হালে জীবন যাপন করিতে পারিবে।" বস্তুতঃ তাহাই হইল। সদাগর পুনরায় ধনী হইলেন, এবং পূর্ব্ববৎ ধনধান্য সমন্বিত, কিঙ্কর ও দাসদাসী পরিবৃত গৃহে—পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন। 'কামটুঙ্গী' 'জলটুঙ্গী' ঘর ও 'ময়ূরপঙ্খী' ও 'হাঙ্গরমুখী' জাহাজগুলি সমস্তই যেরূপ ছিল, তেমনই হইল।

কিন্তু কন্যার বার বৎসর পার হইয়া গেল, অথচ কোন বর জুটিতেছে না। এই এক দুঃখ তাঁহার সমস্ত সুখ মাটী করিল। সদাগর বহু অনিদ্ররাত্রি দুশ্চিন্তায় কাটাইলেন, সোণার ঘর ও মতির থাম তাহাকে কোন সুখ দিতে পারিল না।

অবশেষে তিনি শুকের কাছে যাইয়া তাহার দুলালী কন্যা কাজলরেখার বিবাহ সম্বন্ধে উপদেশ জিজ্ঞাসা করিলেন।

শুক বলিল, "এ কন্যাকে লইয়া তোমার আরো অনেক কষ্ট আছে। আমার কথা যদি শোন, তুমি ইহাকে বনবাস দিয়া আইস; একটি মৃত কুমারের সঙ্গে ইহার বিবাহ হইবে; ইহার কপালের বিড়ম্বনা কে ঘুচাইবে? যদি কন্যার প্রতি স্নেহবশতঃ তুমি আমার উপদেশ না লও, তবে তোমার কন্যা ও তুমি ঘোর বিপদে পড়িবে।"

সদাগর তৃষ্ণায় মৃতপ্রায় হইয়া শুকের নিকট এক ফোঁটা জল চাহিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু যেন পাইলেন একটা তপ্ত লৌহের মুষল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি সর্ব্বনাশ হইতে সেই গৃহ রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইলেন, কারণ শুকের কথার উপর তাঁহার অটুট বিশ্বাস হইয়াছিল।

এই কন্যাকে মাঘমাসের শীতে বুকে রাখিয়া রাত্রি কাটাইয়াছেন। পাছে ঘুম ভাঙ্গে—এই ভয়ে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শোয়াইয়া সোয়াস্তি পান নাই। কত দুঃখের, কত বিপদের স্মৃতি এই আদরের কন্যার সঙ্গে জড়িত, এমন কন্যাকে কেমন করিয়া তিনি বনে পাঠাইবেন!

চোখের জল মুছিতে মুছিতে তিনি বাণিজ্যের ছল করিয়া কন্যাকে লইয়া জাহাজে উঠিলেন। উজান বাহিয়া ডিঙ্গা এক গভীর জঙ্গলের দিকে ছুটিল। দ্বাদশ-বর্ষীয়া কন্যা—সে আকারে-প্রকারে সকল কথাই বুঝিতে পারিয়াছিল। এ তো বাণিজ্যের পথ নহে,—এ

যে ঘোর অরণ্য, এখানে পিতা কেন আমায় আনিলেন? সে কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিতে লাগিল ঃ—"বাণিজ্য করিবার জন্য আসিয়াছ—বাবা, তুমি আমাকে লইয়া জলপথ ছাড়িয়া কেন এই নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলে? যদি বনে দেওয়াই তোমার অভীষ্ট ছিল, কেন আমায় আর দুটি দিন মায়ের কাছে থাকিতে দিলে না, আমার সোণামণি ভাইটিকে বুকে জড়াইয়া দুটি দিন আমার প্রাণ জুড়াইত!

"কি কারণে আইলা বনে কিছুই না জানি।
বনবাসে দিবে মোরে হেন অনুমানি।।
বনের যত তরুলতায় দেখহ জিজ্ঞাসি।
বাপ হৈয়া কন্যাকে কে করেছে বনবাসী।।
চা'র যুগের সাক্ষী ঐ চন্দ্র-সূর্য্য-তারা।
ধর্ম্মের প্রধান খুটি* ধর্ম্মের পাহারা।।
জিজ্ঞাসা করহ বাবা ইহাদের স্থানে।
বাপ হৈয়া কন্যাকে কে দিয়াছে গো বনে।।
পাহাড় থেকে ভাটিয়াল নদী সাগরে বয়ে যায়।
চার যুগের যত কথা জিজ্ঞাস তাহায়।।
জিজ্ঞাসা করহ বাবা জিজ্ঞাসা কর তারে।
বনের পাখীর কথায় কে কন্যা দিছে বনান্তরে।।"

বাপ ও কন্যা ঘোর বনে চলিয়াছেন, দিশেহারা পথিকের মত। চারিদিকে শাল, তাল, তমাল বৃক্ষ যেন স্তম্ভিত হইয়া জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর মত দাঁড়াইয়া আছে। সে অরণ্যে না ছিল মানুষ, না ছিল পশু—দূর নীল আকাশে একটি পাখী পর্য্যন্ত উড়িতে দেখা গেল না, সম্মুখে একটা ভাঙ্গা মন্দির। মন্দিরের মধ্য হইতে কপাট বন্ধ। পিতা ও কন্যা যাইয়া সিঁড়ির উপর বসিলেন।

* খুঁটি—স্তম্ভ।

পথশ্রান্তি ও অনাহারে কাজলরেখা এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহার আর এক পা'ও অগ্রসর হইবার সামর্থ্য ছিল না। সে তাহার পিতাকে বলিল, "তৃষ্ণায় আমার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, আমায় এক ফোঁটা জল আনিয়া দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর।"

ধনেশ্বর সদাগর জল আনিতে গেলেন। কাজলরেখা ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই মন্দিরের চারিদিক দেখিতে লাগিলেন। দরজা বন্ধ ছিল, কিন্তু কাজলের স্পর্শমাত্র দরজা খুলিয়া গেল, কিন্তু সেই মন্দিরে ঢুকিয়া তাঁহার ভয় হইতে লাগিল। তিনি বাহির হইতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু দরজা তখন এত শক্ত ভাবে বন্ধ হইয়াছে যে তিনি কিছুতেই খুলিতে পারিলেন না। ইহার মধ্যে তাঁহার পিতা জল লইয়া উপস্থিত। সদাগর মন্দিরের মধ্য হইতে কন্যার স্বর শুনিয়া ডাকিয়া তাঁহাকে দরজা খুলিতে বলিলেন। কাজল বলিলেন, "আমি দরজা কিছুতেই খুলিতে পারিতেছি না।" তখন তাঁহার বলিষ্ঠ পিতা ও তিনি নিজে খুব ধস্তাধস্তি করিতে লাগিলেন, কিন্তু দরজা খুলিল না। সদাগর মন্দিরের নিকটবর্ত্তী একটা পাথরের স্তূপ হইতে পাথর আনিয়া দরজায় প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত করিতে লাগিলেন, কিছুতেই কিছু হইল না, তখন সদাগর বলিলেন, "কাজল, মন্দিরে কি আছে?" কন্যা বলিলেন, "একটি ঘিয়ের বাতি এই মন্দিরে রাত্রিদিন জ্বলিতেছে, পার্শ্বে এক পালঙ্কে শয্যার উপর একটি যুবকের মৃতদেহ।"

সদাগর বলিলেন, "আমার প্রাণের কুমারী, তোমার কপালে দুঃখ আমি কি করিব! এই শবই তোমার স্বামী, শুকের কথা সত্য। আমি ভাল বরে বিয়া দিতে চাহিয়াছিলাম, দৈব প্রতিবাদী হইয়াছেন। এখন ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া এই মৃত কুমারের সঙ্গে আমি তোমার বিবাহ দিয়া গেলাম। তোমা বিহনে আমার ঘর বাড়ী শূন্য—আমার জাহাজের অমূল্য রত্ন তুমি, তোমাকে বিসর্জ্জন দিয়া আমি কি ধন লইয়া ঘরে ফিরিব?" তাঁহার উচ্চ কান্নার শব্দ শুনিয়া কাজলের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সদাগর কিছু থামিয়া স্বর পরিষ্কৃত করিয়া পুনরায় বলিলেন, "এই মৃত কুমারই তোমার স্বামী। যদি তপস্যার গুণে ইঁহাকে বাঁচাইতে পার, তবে চেষ্টা করিয়া দেখিও। কপালে সিন্দূর রাখিও এবং হাতের শাঁখা ভাঙ্গিও না।"

পিতা কাঁদিতে লাগিলেন, কন্যার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ; চারদিগের তরুরাজিও যেন এই নিদারুণ শোকে স্তম্ভিত হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। কন্যার নিকট বিদায় লইয়া যখন সদাগর চলিয়া যান, তখন তিনি চোখের জলে পথ দেখিতে পাইলেন না। কাজল লুটাইয়া মাটিতে পড়িয়া রহিলেন—কি কষ্ট। বিদায়কালে পিতা ও কন্যা পরস্পরের মুখ দেখিতে পাইলেন না।

মৃত স্বামীর পার্শ্বে

কাজলরেখা কিছুকাল পরে উঠিয়া গিয়া শবের পার্শ্বে বসিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন "হে সুন্দর কুমার, তুমি জাগিয়া উঠিয়া আমার দুর্দ্দশা দেখ, তুমি মৃত তবু তুমি ভিন্ন আমার আর কেহ নাই। বাপ বলিয়া গিয়াছেন, তুমিই আমার স্বামী— সেই কথাই আমার শিরোধার্য্য। চাহিয়া দেখ; তিন দিন-তিন রাত্রি আমি উপবাসী। তোমার মূর্ত্তি চাঁদের মত ঝলমল করিতেছে, অঙ্গুলীগুলি চম্পকের মত, মৃত্যু তোমার শ্রী হরণ করিতে পারে নাই।

"চাঁদের ছুরত* কুমার তোমার কামতনু**
মেঘেতে ঢাকিয়া আছে প্রভাতের ভানু।
তোমার যে মা বাপ না জানি কেমন
বংশের প্রদীপ পুত্রে রেখে গেছে বন।"

তোমার পিতা কি আমার পিতার মতই কপট? তিনি বনে আনিয়া সন্তানকে বিসর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

"যে হও সে হও প্রভু তুমি তো সোয়ামী
যত কাল দেহ তোমার, তত কাল আমি।"
মুখ খুলি কথা কও আঁখি মেলি চাও।
জাগিয়া উত্তর দেও মোরে না ভাঁড়াও।।
কর্ম্ম দোষে বেহুলা রাড়ী, শিরেতে বসিয়া।
মরা পতির কাছে বাবা দিয়া গেছে বিয়া।"

"জোর করিয়া কপালের দুঃখ খণ্ডাইতে যাইও না"

খানিক পরে মন্দিরের কপাট আবার খুলিয়া গেল, চকিত ও ভীত দৃষ্টিতে কাজলরেখা চাহিয়া দেখিলেন, এক তেজস্বী সন্ন্যাসী সেই মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। পিতা ও কন্যা এত ধস্তাধস্তি করিয়া যে কপাট খুলিতে পারেন নাই, তাহা সন্ন্যাসীর স্পর্শমাত্র খুলিয়া গিয়াছে,

* ছুরত—মূর্ত্তি, শ্রী।
** কামতনু= লাবণ্যময় শরীর।

একটু শব্দমাত্র হয় নাই। কাজল ভাবিলেন, সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই কোন সিদ্ধপুরুষ, তিনি সেই সাধুর পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়া বিভোর হইলেন।

সাধু বলিলেন—"তুমি কাঁদিও না, মৃত কুমার এক রাজার পুত্র। তাঁহার মাতা প্রসব করার পর আমি দেখিলাম—এই মৃত-প্রায় শিশুর প্রাণরক্ষা হইতে পারে। রাজাকে কহিয়া এই ভাঙ্গা মন্দিরে আমি ইহার সর্ব্বাঙ্গ সূচিবিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। কতকগুলি দৈবী প্রক্রিয়ার ফলে কুমারের দেহের শ্রী অক্ষুণ্ণ আছে এবং ইহার নৈসর্গিক দেহ-বৃদ্ধি থামে নাই। তুমি একটি একটি করিয়া ইহার সূচগুলি খুলিয়া ফেল, কেবল চোখের সুটি সূঁচ এখনই খুলিও না। দেহময় সূঁচ উদ্ধার হওয়ার পরে, আমি তোমাকে যে পাতা দিয়া যাইতেছি, চোখের দুটি সূঁচ খুলিয়া সেই পাতার রস দিলে ইনি জীবন পাইবেন।

"কিন্তু কাজল, তোমার আরও অনেক কষ্ট আছে,—তুমি কষ্ট সহিয়া থাকিও ,এবং যে পর্য্যন্ত ধর্ম্ম-মতি শুক তোমার পরিচয় না দেন, সে পর্য্যন্ত তোমার পরিচয় নিজে দিতে যাইও না। **জানিও কপালের দুঃখ জোর করিয়া কেহ খণ্ডাইতে পারে না।**"

এই বলিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। কাজল শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া একটি একটি করিয়া সেই সূঁচগুলি খুলিতে লাগিলেন, ইতিপূর্ব্বে তিনি তিন দিনের উপবাসী ছিলেন। এখন আরও সাত দিন সাত রাত্রি উপবাসী থাকিয়া তিনি সর্ব্বাঙ্গের সূঁচ খুলিয়া ফেলিলেন।

তারপর শুদ্ধ-স্নাতা হইয়া চোখের সূঁচ দুটি খুলিয়া স্বামীকে দেখা দিবেন, এই ইচ্ছা করিয়া নিকটবর্ত্তী এক সরোবরে স্নান করিতে গেলেন।

পুকুরের জলের রং ডালিমের মত এবং উহার চারদিকেই বাঁধা ঘাট আছে।

পূর্ব্ব ঘাটে বসিয়া তিনি গাত্র মার্জ্জনা করিয়া স্নান করিলেন, প্রভাতের কিরণে তাহার রূপ ঝলমল করিয়া উঠিল। এমন সময় একটি বৃদ্ধ—চীৎকার করিয়া যাইতেছিল, "দাসী নেবে গো।" বৃদ্ধের পালিত কেশ, সামান্য একটা কটিবাস, না খাইয়া শরীর বিশীর্ণ, তাঁহার সঙ্গে একটি মেয়ে,—সাধাসিধা চাষার ঘরের মেয়ে, পরণে একখানা ময়লা শাড়ী। বৃদ্ধ কাজলের কাছে আসিয়া বলিল, "আমি অতি গরীব, আমার দিন অনেক সময়েই উপবাসে যায়। গ্রহবৈগুণ্যে কন্যাটিকে বিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছি, তাহা না হইলে নিজেই বা কি খাইব ইহাকেই বা কি খাওয়াইব? এই জনহীন জঙ্গলাদেশে কেহ ইহাকে কিনিতে চাহিল না—এ জায়গা জনমানবহীন। কিন্তু এক সন্ন্যাসী এই পুকরের ঘাট দেখাইয়া বলিল, 'ঐ ঘাটে একজন রাজকুমারী স্নান করিতেছেন, তিনি হয়ত তোমার কন্যাকে কিনিতে পারেন'।"

কাজল ভাবিলেন, আমি এক দুর্ভাগা কন্যা, কর্ম্মদোষে আমার বাবা আমাকে বনবাস দিয়াছেন; এই কন্যাও আমারই মত জন্মদুঃখিনী, তাহার বাবা পেটের দায়ে ইহাকে বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। কাজলের প্রাণ সহানুভূতিতে ভরিয়া গেল। "এই মেয়ে আমার দুঃখের দোসর হইবে," সুতরাং কন্যার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তিনি তাঁহার হাতের কঙ্কণ দিয়া কন্যাটিকে কিনিলেন।

কর্ম্মদোষে কাজলরেখা হৈল বনবাসী
কঙ্কণ দিয়া কিনিল ধাই,* নাম কঙ্কণদাসী।।

কাজল ভাঙ্গা মন্দির দেখাইয়া তাহাকে বলিল, "তুমি ঐ মন্দিরে যাও, সেখানে একটি মৃত কুমার আছেন, তুমি ভয় পাইও না। আমি স্নান করিয়া শীঘ্র যাইতেছি। আমি যাইয়া তাঁহার চোখের দুটি সূঁচ খুলিয়া ফেলিব এবং শিয়রের কাছে গাছের পাতা আছে তাহার রস চোখে দিব, তবেই তিনি বাঁচিয়া উঠিবেন। তুমি সেই পাতা বাটিয়া রস করিয়া রাখিও।" তখন হঠাৎ তাঁহার বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল এবং প্রকৃতি যেন নিঃশব্দে দুর্লক্ষণ দেখাইয়া তাঁহার ভাবী দুঃখময় জীবনের আভাস দিলেন।

কঙ্কণদাসীর কৃতঘ্নতা

কঙ্কণদাসী মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সেই পাতার রস প্রস্তুত করিল, এবং কুমারের চোখের শল্য উদ্ধার করিল এবং পাতার রস চক্ষে ঢালিয়া দিল। রাজপুত্রের যেন বহুদিনের ঘুম ভাঙ্গিল। তিনি জাগিয়া উঠিয়া দেখিলেন—সম্মুখে তাঁহার জীবনদাত্রী রমণী। এ দিকে কঙ্কণদাসীর মনে তখন অসুরবুদ্ধি জাগিয়া উঠিয়াছে, সে বলিল, "কুমার আমাকে বিবাহ কর।"

"এক সত্য করে কুমার চিনিতে না পারে।
পরাণ দিয়াছ আমার, বিয়া করব তোরে।।
দুই সত্য করে কুমার দাসীকে ছুঁইয়া।

*ধাই—ধাত্রী, দাসী।

পরাণ বাঁচাইয়াছ আমার, তুমি পরাণ-পিয়া।।
তিন সত্য করে কুমার ধর্ম্ম সাক্ষী করি।
আজি হ'তে হৈলা তুমি আমার ঘরের নারী।।
রাজ্য ধন যত আছে লোক আর লস্কর।
কাননে ফেলিয়া মোরে গেল একেশ্বর।।
কৃপাতে তোমার কন্যা পরাণ যে পাই।
তোমা বিনা এ সংসারে মোর অন্য নাই।।"

কুমারের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি দাসীর পরিচয়াদি কিছু না লইয়াই তাঁহাকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

"ঘরে ছিল ঘৃতের বাতি সদাই অগ্নি জ্বলে।
তারে ছুঁইয়া কুমার প্রতিজ্ঞা যে করে।।"

এই সময়ে সদ্যোস্নাতা কাজলরেখা আসিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন গ্রহণমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় পুনর্জ্জীবিত রাজপুত্রের রূপ ঝলমল করিতেছে। কুমারও কাজলরেখাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, এমন রূপ সংসারে কাহারও আছে বলিয়া তিনি জানিতেন না, তিনি বলিলেন, "তুমি কে?—তোমার মাতা ও পিতা কোথায়—এই ঘোর বন-প্রদেশে এমন রূপসী কন্যাকে তাহারা কিরূপে ছাড়িয়া দিয়াছেন?"

ব্রীড়ানতা কাজলরেখা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই কঙ্কণদাসী অগ্রসর হইয়া বলিল, এ আমার দাসী,

"আগু হৈয়া পরিচয় কহে কঙ্কণদাসী।
কঙ্কণে কিনেছি ধাই নাম কঙ্কণ দাসী।।"

এইবার ভাগ্যের বিপর্য্যয় হইয়া গেল;

"রাণী হৈল দাসী আর দাসী হৈল রাণী।
কর্ম্ম দোষে কাজলরেখা জন্ম-অভাগিনী।।"

সন্ন্যাসীর আদেশে কাজল নিজের পরিচয় দিতে পারিলেন না, দাসী হইয়া স্বামীর রাজ্যে চলিয়া গেলেন।

কাজল রাজপুরীতে নকল রাণীর দাসীর মতন আছেন। তাঁহার কাজ হইল ঘর ঝাঁট দেওয়া, গৃহ মার্জ্জনা করা, বাসন মাজা এবং প্রতিনিয়ত নকল রাণীর পরিচর্যা করা। এত করিয়াও তিনি নকল রাণীকে তুষ্ট করিতে পারেন না, দিনরাত্রি তাহার গালাগালি খান; পাছে কাজল তাহার প্রকৃত পরিচয় বলিয়া ফেলেন এই আশঙ্কায় কঙ্কণদাসী সর্ব্বদা তাহাকে কাছে কাছে রাখে— চোখের আড় হইতে দেয় না। কিন্তু রাজার সতর্ক দৃষ্টিতে কিছুই এড়ায় না। তিনি কাজলের হাব-ভাব, চাল-চলন, আদব-কায়দা এবং সকলের উপর চাঁদের মত তাঁহার রূপের ছটা দেখিয়া মনে মনে তাঁহার অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন।

রাজা পুনঃ পুনঃ কাজলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, "কে তুমি সুন্দরী কন্যা? এই দাসীবৃত্তি মোটেই তোমাকে মানায় না, তুমি কোন রাজ-কুল অলঙ্কৃত করিয়াছ, তুমি কোন রাজার দুলালী কন্যা, আমায় সত্য করিয়া বল,

"তোমার সুন্দর রূপ কন্যা চাঁদ লজ্জা পায়।
ভাঁড়ায়ো না কন্যা মোরে বলগো আমায়।"

মাথা নত করিয়া কাজল কৃতার্থভাবে উত্তর করিত ঃ—

"আমি যে কঙ্কণদাসী রাজা শুন দিয়া মন।
তোমার নারী কিনিল দিয়া হাতের কঙ্কণ।।

"এ কথা তো তুমি তার মুখে শুনিয়াছ।"

"বনে ছিলাম, বনবাসী দুঃখে দিন যায়।
ভাত কাপড় জোটে মোর তোমার কৃপায়।।
মা নাই, বাপ নাই, নাই সহোদর ভাই।
আসমানের মেঘ যেন ভাসিয়া বেড়াই।।"

প্রত্যহ এইরূপ উত্তর পাইয়া রাজা আরও বেশী কৌতূহলী হইলেন। তাঁহার মন যাহা বুঝে, বাহিরে কাজলের কথায় তাহার প্রমাণ হয় না; অথচ কাজল যে কোন গূঢ় কথা ক্রমাগত তাঁহার নিকট গোপন করিতেছেন—তাহা তিনি হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব করেন। "কি দুঃখে তুমি নিজেকে গোপন করিয়া দাসী হইয়া হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিতেছ।" মনে মনে এই প্রশ্ন করিয়া তাঁহার দুটি চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়। অপর দিকে নকল রাণীর বাক্যে ও ব্যবহারে, কথাবার্ত্তা ও ব্যাখানের চোটে রাজপুরীর হাওয়া তাঁহার নিকট দুঃসহ হইল। রাজা

খাওয়া দাওয়া ছাড়িলেন, তাঁহার ঘুম নাই, পৃথিবীটা তাঁহার কাছে ফাঁকা। একদিন তিনি বৃদ্ধ মন্ত্রীকে বলিলেন—"মন্ত্রি, আমি ছয়মাস-ছয়পক্ষের জন্য দেশ ভ্রমণে যাইব, তুমি এই সময়ের মধ্যে কাজলরেখার প্রকৃত পরিচয় জানিতে চেষ্টা করিও। আমার সন্দেহ হয়—এই কন্যা দাসী নহে।"

নকল রাণীর নিকট অন্তঃপুরে যাইয়া রাজা বলিলেন, "আমি কিছুকালের জন্য বিদেশে যাইব, তোমার জন্য কি আনিব, বলিয়া দাও।" রাণী সোৎসাহে বলিল, "আমার জন্য একটা বেতের ঝালি ও বেতের কুলা আনিও," তারপরে একটু ভাবিয়া আবার বলিল, "শুনছ,আম্‌লি কাঠের একটা ঢেঁকি, পিতলের নথ, কাঁসার বাক্, খাড়ু ও কাঠের চিরুণি লইয়া আসিও। রাজা শুনিয়া লজ্জিত ও বিরক্ত হইলেন, কাজলরেখার কাছে যাইয়া বিদায় চাহিতে গেলে তাঁহার মুখখানি বিষাদে যেন সাদা হইয়া গেল; তাঁহার জন্য কি আনিতে হইবে, এই প্রশ্ন লইয়া রাজা পীড়াপীড়ি করিলে—কাজল বলিলেন, "আমি তো তোমার এখানে খুব সুখে আছি, আমার কোন অভাব নাই। আমি আর কিছু চাই না।" তথাপি রাজা ছাড়িবেন না—নিতান্ত বাধ্য হইয়া কাজল বলিলেন—"আমাদের 'ধর্ম্মমতি' নামক একটা শুকপাখী ছিল, যদি পার সেইটিকে আনিও।" নকল রাণীর ফরমাইসী জিনিস সংগ্রহ করিতে রাজার মোটেই কোন বেগ পাইতে হইল না, নিতান্ত দরিদ্র পল্লীর বাজারেও তাহা পাওয়া যায়। কিন্তু কাজলের প্রার্থিত ধর্ম্মমতি শুক খুঁজিয়া রাজা হয়রাণ হইলেন অথচ কাজলের ফরমাইস, ইহা পলন করিতেই হইবে। তাহা না লইয়া তিনি বাড়ী ফিরিতে পারেন না। এক রাজার মুলুক হইতে অন্য রাজার মুলুক, এবং সদাগরের এলাকা হইতে অন্য সদাগরের এলাকায় ঢেঁড়া দিয়া খোঁজ করিতে লাগিলেন।

অবশেষে কাজলরেখার পিতৃরাজ্য ধনেশ্বর মুলুকে ঢেঁড়া পিটাইয়া দিলেন—ধর্ম্মমতি শুকপাখী যদি কেহ বিক্রয় করে, তবে প্রচুর মূল্য দিব। ধনেশ্বর ভাবিলেন "ধর্ম্মমতি শুকের কথাতো আমি এবং কাজলরেখা ছাড়া আর কেহ জানে না। নিশ্চয়ই কাজল বাঁচিয়া আছে, এবং সুখে থাকুক, দুঃখে থাকুক সে-ই এই শুক পাখীটি খুঁজিতেছে।" এই মনে করিয়া তিনি সূঁচ রাজার লোকের কাছে ধর্ম্মমতি শুক আনাইয়া দিলেন।

সূঁচ রাজা অতিশয় আনন্দে বাড়ী ফিরিলেন। নকল রাণীকে তাহার ফরমাইসী দ্রব্যাদি দিলেন এবং কঙ্কণ-দাসীর হাতে শুক পাখীটি দিয়া তাঁহার মুখখানিতে যে আনন্দের দীপ্তি দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার সমস্ত পরিশ্রম সার্থক মনে করিলেন।

নকল রাণী ও কাজলরেখা

রাজা বিদেশে গেলে মন্ত্রী রাজ কার্য্য সম্বন্ধে অনেক কথাই রাণীকে জিজ্ঞাসা করিতেন; রাণী সে সকলের কিছুই বুঝিত না, অথচ যা' তা বলিয়া একটা হুকুম জারি করিত। সেইরূপ ভাবেই মন্ত্রী কাজ করিতেন, রাণীর মর্য্যাদা তিনি লঙ্ঘন করিতেন না; কিন্তু তাহাতে অত্যন্ত ক্ষতি হইত। এক দিন একটা বিপদের সম্মুখীন হইয়া মন্ত্রী কাজলের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন, কাজল এমনই উৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া উপদেশ দিলেন যে তাহাতে রাজ্যের সমস্ত বিপদ কাটিয়া গিয়া বরং ইষ্টই হইল। মন্ত্রী বুঝিলেন, কঙ্কণদাসী কখনই নিম্ন শ্রেণীর কন্যা নহেন।

কিন্তু আর কোন পরিচয় পাওয়া গেল না। ইহার মধ্যে রাজার এক বন্ধু অতিথি হইয়া উপস্থিত হইলেন। সূঁচ রাজা রাণীর উপর তাঁহার আতিথ্যের ভার দিলেন। নকল রাণী রাঁধিলেন ডৌয়ার ঝাল, চা'লতার অম্বল, কচু শাক—তাহাতে লবণ পড়ে নাই। রাজা বন্ধুর সঙ্গে খাইতে বসিয়া লজ্জিত হইলেন।

পরদিন দাসীর উপর আতিথ্যের ভার

কাজল অতি প্রত্যুষে উঠিয়া ভোরের স্নান সমাধা করিলেন, শুদ্ধ শান্ত হইয়া রান্না ঘরে প্রবেশ করিলেন, একখানা ছোট শাড়ী পরিয়া উভু করিয়া মাথার চুল বাঁধিলেন। গঙ্গা জল দিয়া রান্না ঘরখানি মার্জ্জন করিলেন। একটা বাটীতে মসল্লা প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন;—মানকচু কাটিয়া তাহা ভাজিয়া লইলেন, একজোড়া কপোতের মাংস রাঁধিলেন, তারপর নানা প্রণালীতে নানাবিধ মাছের ব্যঞ্জনাদি রান্না হইল। পায়েশ—পরমান্ন রান্নায় কাজল সিদ্ধ হস্ত।

নানা জাতি পিঠা করে গন্ধে আমোদিত।
চন্দ্র পুলী করে কন্যা চন্দ্রের আকৃত।।*

চিতই, পাটি সাপ্টা, মালপোয়া প্রভৃতি পিষ্টকের গন্ধে গৃহ সুবাসিত হইল।

আকৃত= আকৃতি।

"ক্ষীর পুলি করে কন্যা ক্ষীরেতে ভরিয়া।
রসাল করিল তাহা চিনির ভাজ দিয়া।।"

পরিবেশনের স্থানে জলের ছিটা দিয়া সেস্থানে একটা উত্তম কাঁটালের পিড়ি পাতিয়া স্বর্ণ থালায় খাদ্যগুলি সাজাইলেন। অতি সরু শালী-ধানের চাউলের ভাত বাড়িয়া থালার একপাশে পাতিলেবু কাটিয়া রাখিলেন, 'ঘরে মজা'*মর্ত্তমান কলা কাটিয়া অপরাপর ফলের সঙ্গে পরিবেশন করিলেন।

"সোণার বাটীতে রাখে দধি দুগ্ধ ক্ষীর।"

তারপরে স্বর্ণ গাড়ুতে জল রাখিয়া দিলেন। "কেওয়া খয়েরে" সুগন্ধ করিয়া সোণার বাটাতে পান রাখিলেন, এবং রান্না ঘরের এক কোণে যাইয়া বিনীতভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই সমস্তই মন্ত্রীর উপদেশ মত কাজলকে পরীক্ষা করার জন্য ব্যবস্থা হইয়াছিল। আর একদিন কোজাগর লক্ষ্মীর পূজা। রাণী ও কঙ্কণ-দাসীকে ভাল করিয়া আলপনা আঁকিতে বলা হইল। রাজা বলিলেন, "আমার বন্ধু আজ আবার আসিবেন, আলপনা যত ভাল পার,—করিবে।"

নকল রাণী আঁকিলেন বকের পা, সরিষার টাইল (পাত্র), কাকের ঠ্যাং এবং ধানের ছড়া।

কাজল সরু শালী ধানের চাউল আগের দিন জলে ভিজাইয়া—তাহা বাটিয়া অতি মসৃণ পিঠালির প্রলেপ তৈরী করিলেন। সর্ব্বপ্রথম বাপমায়ের পাদ-পদ্ম আঁকিলেন, —উহা তাঁহার প্রাণে গাঁথা ছিল। তারপরে ধানের গোলা আর ধানের ছড়া আঁকিলেন—এবং অবকাশ-স্থানগুলি লক্ষ্মীর পদচিহ্ন দ্বারা পূর্ণ করিলেন।

কৈলাসে শিবদুর্গার যুগল ছবি, হংস রথে মা বিষহরি দেবী, ও ডাকিনীদের মূর্ত্তি—দিক্‌প্রান্তে সিদ্ধ বিদ্যাধরীদের ও বন দেবীর ছবি এবং আরও কত কি আঁকিলেন; সেওরা গাছের নিম্নে বন দেবীর মূর্ত্তি অতি সুন্দর হইল। তারপরে রক্ষা কালীর ছবি, —রাম লক্ষ্মণ সীতার মূর্ত্তি চিত্রিত হইল। কার্ত্তিক গণেশ প্রভৃতি কোন দেবতাই বাদ পড়িল না।

* ঘরে মজা—যাহা ঘরে থাকিয়া পাকান হইয়াছে,—অত্যন্ত পাকিয়া সুস্বাদু হইয়াছে।

এসকল অঙ্কন করিয়া কাজলরেখা হিমাদ্রি পর্ব্বত, লঙ্কার পুষ্পক রথ, ইন্দ্র যম ও তাহাদের আবাস স্থল, গঙ্গা— গোদাবরী প্রভৃতি নদী, সমুদ্রের ঢেউ, চন্দ্র-সূর্য্যের চিত্র, প্রভৃতি কত ছবিই যে আঁকিলেন, তাহার সীমা সংখ্যা নাই।

শেষ চিত্র ভাঙ্গা মন্দির। ঘোর অরণ্য এবং মৃত কুমারের চিত্র; কিন্তু কাজল কোন খানেই নিজের ছবি আঁকিলেন না। সূচ রাজ ও তাঁহার সভাসদ্ দিগের চিত্রও এই সুদৃশ্য আলপনা অলঙ্কৃত করিল। অবশেষে ঘৃতের বাতি জ্বালিয়া চিত্রকরী তাঁহার অঙ্কিত আলপনাকে গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিলেন।

নকল রাণীর আলপনা দর্শনান্তর রাজা, তাঁহার বন্ধু ও পারিষদবৃন্দ—কাজলরেখার আঁকা ছবি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

এদিকে শুক পাখীকে পাইয়া গভীর রাতে কাজলরেখা জিজ্ঞাসা করেন—

পাখী আমার মা বাবা কেমন আছেন বল,
"প্রাণের দোসর* ছিল মোর ছোটভাই
নিশার স্বপনে তার মুখ দেখতে পাই।।"

তারপরে মৃতকুমারকে দর্শনাবধি পরবর্ত্তী দুঃখের অধ্যায় কাজলরেখা কাঁদিতে কাঁদিতে বর্ণনা করিয়া শেষে বলিলেন;—

হাতের কঙ্কণ দিয়া কিনিলাম দাসী।
সে হইল রাণী আর আমি বনবাসী।।
সত্যযুগের পক্ষী তুমি কও সত্য বাণী।
কোন দিন পোহাইবে মোর দুঃখের রজনী।
দশ বছর খোয়াইলাম পাইয়া নানা দুঃখ।
একদিন না দেখিলাম মা বাপের মুখ।"

কত দিন আমার কপালে এই কষ্ট আছে?

শুক বলিল, " শেষ রাত্রে আমার কাছে আসিও, আমি উত্তর দিব।"

"নিশিরা'তে পুনঃ কন্যা ডাক দিয়া ক'য়।
জাগ জাগ শুক পাখী রাত্রি যে ভোর হয়।

দোসর—সমান, তুল্য।

কাজলরেখা
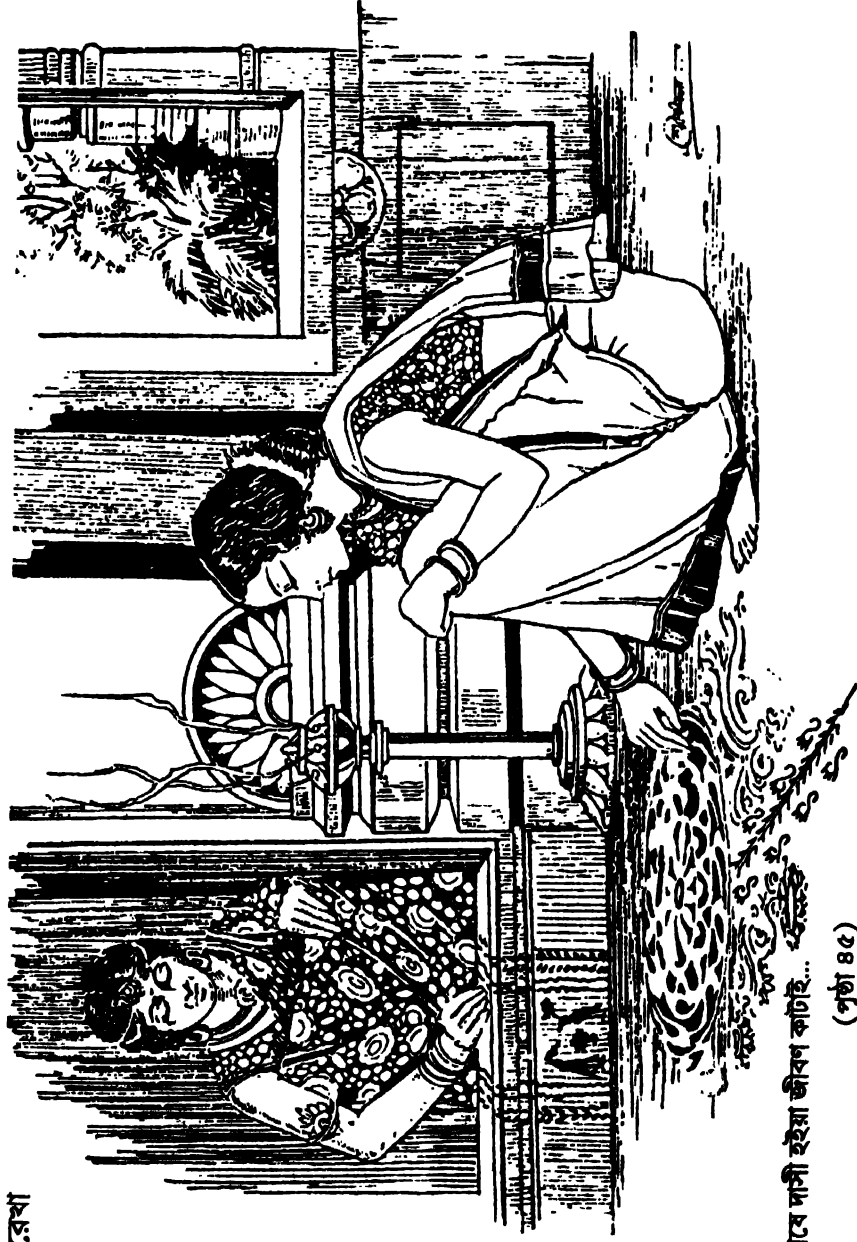
'কর্ম্ম দোষে দাসী হইয়া জীবণ কাটাই...

(পৃষ্ঠা ৪৫)

বাপের বাড়ী দাস-দাসী লেখা জোখা নাই।
কর্ম্ম দোষে দাসী হৈয়া জীবন কাটাই।
বাপের বাড়ীতে খাট পালঙ্ক আছে শীতলপাটি।
কর্ম্ম দোষে আমার পাখী শয়ন ভূঞিং মাটী।।
বাপে তো কিনিয়া দিত অগ্নিপাটের শাড়ী।
সেই অঙ্গে পইরা থাকি জোলার পাছাড়ী।।
হতের কঙ্কণ দিয়া কিনিলাম দাসী।
সে হইল রাণী আর আমি বনবাসী।।
সত্য যুগের পাখী তুমি কহ সত্য বাণী
কোন দিন পোহাবে মোর দুঃখের রজনী।।"

কাজলের কান্নায় ব্যথিত হইয়া শুক গদগদ কণ্ঠে বলিল, "কাজল আর কাঁদিও না, তোমার বাপের বাড়ীর সমাচার বলিতেছি। তোমাকে বনবাস দিয়া এই দশ বছর তোমার পিতা বাণিজ্যে যান নাই। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তোমার মা বাবার চক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছে। দাসদাসীরা এই দশ বছর সর্ব্বদা তোমারই কথা বলিয়া চোখের জল ফেলে। নিরপরাধ কন্যাকে বিনাদোষে ঘোর জঙ্গলে বনবাস দেওয়া হইয়াছে—এই সংবাদ যেন গৃহপালিত পশু পক্ষীরাও মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছে,—হাতী, ঘোড়া ঘাস জল খায় না, তাহাদের চোখে জল টল টল করে। যে দিন হইতে তুমি বাড়ী ত্যাগ করিয়াছ, সেই দিন হইতে তোমাদের পুরীতে সূর্য্যের আলো মলিন হইয়াছে, রাত্রে জ্যোৎস্না নাই ঃ—

"জ্বালালে না জ্বলে বাতি পুরী অন্ধকার"

বনের পাখীগুলি আকাশে উড়িয়া উড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকে— বাপ মায়ের দুলালী কন্যার অভাবে সমস্ত পুরী শূন্য হইয়া গেছে। দশ বছর গিয়াছে; আরো দুই বছর তোমার কপালে দুঃখ আছে।

এই ভাবে রোজ রাতে কাজল শুকের কাছে আসিয়া কথাবার্ত্তা বলে; দুঃখীর দুঃখের কথা,—তাহা আর ফুরায় না।

ইহার মধ্যে রাজার সেই বন্ধু কাজলের রূপ গুণ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তিনি খুব উঁচু দরের জ্ঞানী ছিলেন না, ধর্ম্মাধর্ম্মের জ্ঞান ততটা ছিল না। তিনি ভাবিলেন, "এই কন্যা

নিশ্চয়ই কোন রাজার ঝিয়ারী;* কর্ম্মদোষে দাসীবৃত্তি করিতেছে। যদি ইহাকে কোনক্রমে আমি এই প্রাসাদ হইতে লইয়া যাইতে পারি, তবে আমি ইহাকে বিবাহ করিব।"

নকল রাণীরও বিপদের অন্ত নাই। রাজা—কঙ্কণ-দাসীর প্রতি এতটা অনুরক্ত হইয়াছেন যে, তিনি মধু গন্ধে অন্ধ অলির ন্যায় সর্ব্বদা কাজলের কাছে কাছে থাকেন—রাণীর দিকে ফিরিয়াও চান্ না। রাণী ঠিক করিল যে করিয়া হউক, কঙ্কণ-দাসীকে সেখান হইতে দূর করিয়া দিতে হইবে। রাজপত্নী ও রাজবন্ধুর উভয়ের উদ্দেশ্য এক হইল, তখন তাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া কোন এক রাত্রে কাজলের ঘরের সিঁড়ির উপর সিন্দূর ছড়াইয়া রাখিল। রাজবন্ধু সেই সিঁড়ির উপর পদচারণ করিলেন;—দুইটি স্পষ্ট পদচিহ্ন হইল, তাহাতে বোঝা যায় যে কোন এক ব্যক্তি ঘরে ঢুকিয়া পুনরায় চলিয়া আসিয়াছে।

পরদিন নকলরাণী চীৎকার করিয়া পুরীটা মাথায় করিয়া তুলিল। রাজার কাছে প্রচার করিল, কঙ্কণদাসী কলঙ্কিনী।

কাজলরেখা কলঙ্কিনী

কাজল বলিলেন,—

একলা করি নিশি রাইতে ঘরেতে শয়ন,
কোন জন হৈল মোর এমন দুষমন।
সাক্ষী হৈও দেব ধর্ম্ম তোমরা সকলে
সাক্ষী হৈও চন্দ্র তারা দেখেছ সকলে।"

আর এই ঘরের বাতিটি সারারাত্রি জ্বলে, আমি ইহাকেই সাক্ষী করিতেছি—কালকার রাত্রি সাক্ষী,—আর সাক্ষী কোথায় পাইব?

ঘরে থাকে শুক পাখী সাক্ষী মানি তারে।
সেই ত বলুক ধর্ম্ম সভার গোচরে।

সোনার পিঞ্জরে ধর্ম্মমতি শুক— সেই সভায় আনীত হইল।

* ঝিয়ারী—কন্যা।

"কও কথা পাখী—ধর্ম্ম সাক্ষী করি,
কাল রাতে ছিল কিনা কন্যা একেশ্বরী।
দোষী কি নির্দ্দোষী কন্যা কও সত্যবাণী
ধর্ম্ম সভায় আজ পাখী সাক্ষী হৈলা তুমি"।।

অতিশয় বিপদের সময় একান্ত অন্তরঙ্গও বিরূপ হয়। পাখী যাহা বলিল, তাহাতো কন্যার অনুকূল হইলই না, পরন্তু বিপক্ষের অভিযোগ যেন কতকটা সমর্থন করিল—পাখীর সেই প্রহেলিকাময় উক্তি এইরূপ ঃ—

"কইব কি না কইব রাজা শুন দিয়া মন।
কাইল রাতের কথা নাহিক স্মরণ।।
কপালে করাইছে দোষ পড়িয়াছে দোষে,
কলঙ্কী বলিয়া কন্যায় দেও বনবাসে।"

রাজা তাঁহার বন্ধুকে বলিলেন, সমুদ্রের ধারে বালু-চড়ায় ইহাকে নির্ব্বাসন করিয়া আইস। বন্ধুর অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, কিন্তু এই আদেশ দিতে রাজার মর্ম্মান্তিক কষ্ট হইল।

সকল দুঃখে সকল বিপদে কাজল স্বামীর মুখখানি দেখিতে পাইতেন। আজ তিনি সর্ব্বতোভাবে বঞ্চিতা হইয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। স্বামীর মুখের দিকে চাহিতে পারিতেছেন না, অশ্রুতে গণ্ড ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি বলিতেছেন, "এখানে বড় সুখে ছিলাম, আপনার পায়ে যেন কত ত্রুটি হইয়াছে, আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনি দাসী বলিয়া আমাকে মনে রাখিবেন।" এই বলিয়া কথাটি সংশোধন করিয়া লইলেন—"আমাকে মনে রাখিবেন" এই অনুরোধ করিবারই বা তাঁহার কি দাবী আছে? তিনি বলিলেন, "আপনি আমায় মনে রাখুন বা না রাখুন, আমার একটি অনুরোধ পালন করিবেন; যেখানে যেভাবে আমার মৃত্যু হউক, আপনি জানিতে পারিলে মৃত্যুকালে আমাকে দেখা দিবেন।" মুখখানি অশ্রুর প্লাবনে ভাসিয়া গেল, আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে তিনি নকল-রাণীর নিকটে গেলেন। নকলরাণী তাঁহাকে দেখিয়া বিরক্তির ভাবে মুখ ফিরাইলেন, কিন্তু কাজলের মনে কোন ক্ষোভ বা ক্রোধ নাই ঃ—

"নকলরাণীর কাছে কন্যা মাগিল বিদায়
চোখের জলে কাজলরেখা পথ নাহি পায়।

করেছি অনেক দোষ চিত্তে ক্ষমা দিও।
দাসী বলিয়া মোরে মনেতে রাখিও।"

ইহা প্রচ্ছন্ন রহস্যের কথা নহে, সত্য সত্যই কাজল অত্যাচারীর অত্যাচার ভুলিয়াছিলেন, শত্রুর শত্রুতা ভুলিয়াছিলেন,—এরূপ একটি দৃশ্য কোন সাহিত্যে আর একটি পাওয়া যাইবে কিনা, সন্দেহ। ইহা ক্ষমাশীলতা ও সাধুত্বের গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গ। এই নারীর চরিত্রে যাহা কিছু বুদ্ধ বা ক্রাইষ্ট বলিয়াছেন সেই সমস্ত উপদেশামৃতের উৎস বহিয়া গিয়াছে; বঙ্গনারীর চরিত্রে যে কি মাধুরী, কি ধৈর্য্য, কি আত্মবিলোপী পরার্থপরতা ও সর্ব্বংসহা ক্ষমা বিদ্যমান্—তাহা এই চিত্রে একাধারে বিরাজিত।

অবশেষে— "বিদায় মাগিল কন্যা শুক পক্ষীর কাছে।
চক্ষের জলেতে কন্যার বসুমতী ভাসে।
চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী কৈল উঠিল ডিঙ্গায়।
পুরবাসী যত লোক করে হায় হায়।।"

যাহারা শাস্ত্র পড়ে নাই—পুরোহিতের মন্ত্র শোনে নাই,— চোখের সম্মুখে যাহা ঘটে, তাহা দেখিয়া নিজেরা বিচার করে এবং লোক-চরিত্রের মূল্য নির্দ্ধারণ করে, তাহাদের বোধ হয় ঠিকে ভুল হয় না। এই জন্য কাজলের মর্ম্মবিদারী বিদায় দৃশ্যে পুরবাসীরা হায় হায় করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

অতল অসীম সমুদ্র গর্ভে ডিঙ্গা ভাসিতে লাগিল, রাজার বন্ধু কাজলকে নির্জ্জনে একলা পাইয়া বলিল ঃ—

"আমার বাড়ী কাঞ্চনপুর। আমার পিতা মস্তবড় রাজা—তাঁহার নাম কোটীশ্বর। আমাদের সিংহদ্বারে কত যান-বাহন, কত ঘোড়া-হাতী বাঁধা, আমাদের বাখানেতে* চরে "নবলক্ষ গাই।" সমুদ্রের ধারে স্বর্ণ মণ্ডিত জলটুঙ্গী ঘর আছে—আমি পিতার একমাত্র সন্তান, এখন পর্য্যন্ত অবিবাহিত। আমি তোমাকে বিবাহ করিতে চাই, চল যাই—তোমার সম্মতি লইয়া আমি কাঞ্চনপুরে তোমাকে বিবাহ করিব। শত শত দাস দাসী ও কিঙ্করী তোমার সেবা করিবে। আমি স্বর্ণালঙ্কারে তোমার দেহ মুড়িয়া দিব।"

*বাখানে= প্রান্তরে।

কাজল বলিলেন, "তুমি রাজার বন্ধু, আমি সেই রাজার দাসী। তুমি নিজে রাজপুত্র হইয়া দাসীকে কেন বিবাহ করিবে? আর রাজা আমায় বনবাস দিতে সঙ্কল্প করিয়া তোমার সঙ্গে পাঠাইয়াছেন, তুমি তাঁহাকে সেইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছ, তুমি সে প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গিবে কেমন করিয়া?"

সদাগর-পুত্র বলিলেন, "তুমি আর দাসী থাকিবে না। আমি তোমাকে রাণী করিব। সুবর্ণ মন্দিরে আমার সোণার খাট পালঙ্ক আছে, সেইখানে তোমার স্থান হইবে।"

কাজল বলিলেন, "দেখ কুমার, আমার পিতা আমাকে কলঙ্কী বলিয়া বনবাস দিয়াছেন, যাঁহার আশ্রয়ে ছিলাম তিনিও কলঙ্কী জানিয়া আমাকে বনবাস দিবার জন্য তোমার সঙ্গে দিয়াছেন। যাহার সর্ব্বত্র এই অপবাদ, তাহার নিকট তোমার এরূপ প্রস্তাব করা অসঙ্গত, বরং তুমি আমাকে গলায় কলসী বাঁধিয়া এই সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ কর। পৃথিবী হইতে এই কলঙ্কিনীর নাম চিরতরে মুছিয়া যা'ক্। মনুষ্য সমাজে আমার মুখ দেখাইবার কোন ইচ্ছা নাই।"

কিন্তু সদাগর পুত্র কাজলের কথায় কর্ণপাত করিল না, সে সমুদ্রের পথ ছাড়িয়া সেই অরণ্যপ্রদেশ অতিক্রম করিয়া—কাঞ্চনপুরে তাহার স্বীয় গৃহের দিকে ডিঙ্গি চালাইয়া দিল।

তখন নিঃসহায়া, বিপন্না কাজলরেখা সাশ্রুনেত্রে আকাশের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "হে দেব ধর্ম্ম আমায় রক্ষা কর। কায়মনোবাক্যে যদি আমি নিষ্পাপ হইয়া থাকি, তবে আমাকে উদ্ধার কর। কলঙ্কিনী জানিয়া স্বামী আমাকে ইহার হাতে দিয়াছেন বনবাস দিতে ঃ—

"মড়ার উপরে দুষ্ট তুলিয়াছে খাঁড়া।
সতী নারী হই যদি, সমুদ্রে পড়ুক চড়া।।"

সেই অব্যর্থ অভিশাপে, সতীনারীর উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে সমুদ্র দুলিয়া উঠিল, সেইখানে ধূ ধূ বালির চড়া পড়িল, বণিকের ডিঙ্গা সেই বালিচরায় ঠেকিয়া অনড় অচল হইয়া রহিল।

মাঝি মাল্লারা বলিল, "এই কন্যা ডাকিনী, ইহার মন্ত্রগুণে ডিঙ্গার এই দুর্গতি হইল। যে করিয়া হউক, ইহাকে এইখানে নামাইয়া দেওয়া হউক—নতুবা এই জনমানব-শূন্য বালির চরায় আমরা অনাহারে শুকাইয়া মরিব। সাধুর অনেক প্রতিবাদ সত্ত্বেও লোকজনেরা কন্যাকে সমুদ্রের চরায় নামাইয়া দিল, তখন সত্যসত্যই অচল ডিঙ্গা পুনরায় জলপথে

চলিল। বণিক নিরাশার ঘোরে ঐকান্তিক মনোবেদনায় সেই বালির চরায় বিসর্জ্জিতা রূপসীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই নির্জ্জন চরাভূমি তাহার দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়া গেল।

রত্নেশ্বরের ভুল

ধনেশ্বর সাধু মরিয়া গিয়াছেন, কন্যার শোকে তিনি জীবন্মৃত হইয়াছিলেন, এবার উপর হইতে তাঁর ডাক পড়িয়াছে।

রত্নেশ্বর যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন, তিনি বাণিজ্য করিবার জন্য সমুদ্রপথে ডিঙ্গা বহাইয়া দিলেন। কত গ্রাম-প্রান্তর ঘুরিয়া ভাটীরবাগে একটা বিস্তৃত চরায় আসিয়া ঝড়ের মুখে ডিঙ্গা ঠেকিল। হুহু করিয়া বাতাস বহিতেছে, ডিঙ্গি খালি টলমল করিতেছে, মাঝি মাল্লারা বহু কষ্টে ডিঙ্গির দড়ি কাছি বাঁধিয়া নোঙ্গর করিয়া রাত্রি কাটাইল। প্রাতে সুস্নিগ্ধ বায়ু বহিল, পবন দেব উগ্রভাব ত্যাগ করিয়া শীতল স্পর্শে যাত্রীদের দেহ জুড়াইয়া দিলেন।

রত্নেশ্বর চরায় নামিয়া দেখিলেন, বিশাল নল-খাগড়ার বন, সেখানে মলিন-বসনা এক পরমা সুন্দরী কন্যা। সেই কন্যা যে কাজলরেখা—তাহার সহোদরা ভগিনী, তাহা তিনি চিনিতে পারিলেন না, কাজলরেখাও তাহাকে ভাই বলিয়া বুঝিতে পারিলেন না, কারণ যখন তিনি বাড়ী ছাড়িয়া যান তখন রত্নেশ্বর ছিলেন চার বৎসরের শিশু। প্রায় দুই মাস সেই চরায় পড়িয়া কাজলরেখা নল-খাগড়ার রস চিবাইয়া জীবন ধারণ করিয়াছিলেন।

রত্নেশ্বর নিজের জাহাজে তুলিয়া কাজলরেখাকে বাড়ীতে লইয়া আসিলেন, তখন কাজলরেখা সমস্তই চিনিতে পারিল।

আছে, আছে হাতী ঘোড়া রে যে যাহার ঠাঁই।
অভাগিনী কাজলরেখার মা বাপ নাই।।
বড় বড় দালান কোঠা রয়েছে পড়িয়া।
জন্মের মত মা বাপ গিয়াছে ছাড়িয়া।
এই ঘরে মায়ের কোলে পালঙ্কে শয়ন,
ঘুমাইয়া দেখেছি কত নিশার স্বপন।
এই ঘরে থাকিয়া মায় দিছে ক্ষীর ননী।
সেই মায় হারায়েছি জন্ম-অভাগিনী।

কোথা বাপ ধনেশ্বর গেলা কোথাকারে।
তোমার কন্যা ঘরে আসিছে বার বৎসর পরে।
মা নাই বাপ নাই নাই শুক পাখী।
বড় বাড়ীর বড় ঘরে রয়েছি একাকী।

সেই বহু বাল্য-স্মৃতি জড়িত ঘর বাড়ি দেখিয়া তাঁহার মনের শোক উথলিয়া উঠে। তিনি দিবারাত্র বিমর্ষ চিত্তে, চিত্রার্পিত মূর্ত্তির ন্যায় ঘরের এক কোণে পড়িয়া থাকেন। দাসী ও পরিচারিকারা প্রতিনিয়ত তাঁহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু সেই স্তব্ধ দেবীমূর্ত্তির ন্যায় বিষণ্ণ কন্যা কোন কথা বলেন না। একদিন রত্নেশ্বর স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, বিধুমুখী কন্যা তুমি সমুদ্রের চরায় ভাটীবাগে পড়িয়াছিলে—

"ভাটী বাগে* পড়েছিলা সমুদ্রের চরে।
তথা হইতে রূপসী কন্যা উদ্ধার করলাম তোরে।।
হাঙ্গর কুমীর তোমায় করিত ভক্ষণ।
বাড়ীতে আনিলাম, তোমা করিয়া যতন।"

"আমি বিবাহ করি নাই, তুমি যদি অনুমতি দেও আমি কালই তোমাকে বিবাহ করিয়া জীবন সার্থক করি; বস্তুত আমি এজন্য উদ্যোগের ত্রুটি করি নাই, আমার পিতা মাতা নাই, সুতরাং আমার বিবাহ কাহারো মতের প্রতীক্ষা করিবে না। আত্মীয় বন্ধু, জ্ঞাতি সকলকে খবর দিয়া আনাইয়াছি, পুরোহিত সমস্ত আয়োজন পত্র ঠিক ঠাক করিয়া রাখিয়াছেন, বাজনদার, গায়ক ও যন্ত্রধারী-বাদ্যকর সকলেই উপস্থিত আছে। এখন তোমার মত হইলে কালই আমাদের বিবাহ হইতে পারে। এখানে আমাদের কোন দুঃখ বা অসুবিধা নাই, বাসর ঘর নানারূপ স্বর্ণ পালঙ্ক ও তৈজসপত্রে সাজাইয়াছি। দাস দাসী মঙ্গলাচরণে নিযুক্ত হইয়াছে, আমি শুধু তোমার মতের প্রতীক্ষা করিয়া আছি।"

কাজল উত্তরে বলিলেন, "কুমার আমার বিবাহের একটা সর্ত্ত অছে, তাহা তোমাকে পূরণ করিতে হইবে। আমার বংশ পরিচয়, পিতা মাতা কে—ইহার কিছু না জানিয়াই তুমি আমাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছ? আমি হাড়ি কি ডোমের কন্যা এ সকল তো জানা চাই, তাহা না জানিয়া বিবাহ করা বৈধ হইবে না।"

* ভাটী বাগে—নদীর দক্ষিণ দিকে ভাটীর মুখে।

রত্নেশ্বর বলিলেন, "যাঁহার এমন চাঁদের মত মুখখানি, এত রূপ যার সে কখনও কি হাড়ি ডোমের কন্যা হয়! আচ্ছা, তুমি তোমার বংশ পরিচয় আমাকে বল, তোমার পিতা মাতা কে? কেনই বা একাকী তুমি নলখাগড়ার চরায় পড়িয়াছিলে!"

কাজল বলিলেন, "কুমার আমি দশ বছরের সময় বাড়ী ছাড়িযাছি, সে সময় আমার বংশের পরিচয় জানার কথা নহে। সূঁচ রাজার ঘরে একটি শুকপাখী আছে, তাহার নাম ধর্ম্মমতি। সেই পাখী আমার সমস্ত কথা জানে এবং সেই আমার বিবাহের ঘটকালি করিবে। তুমি তাহাকে খোঁজ করিয়া আন—সেই সর্ব্ব সমক্ষে আমার পরিচয় দিবে।"

এই কথা শুনিয়া রত্নেশ্বর দেশ বিদেশে ধর্ম্মমতি শুকের খোঁজে লোক পাঠাইলেন। সূঁচ রাজার দেশে এক ডিঙ্গি বোঝাই ধনরত্ন লইয়া শুক পাখীর খোঁজে লোকজন রওনা হইল। সূঁচ রাজার দেশে আসিয়া রত্নেশ্বরের দূতেরা দেখিলেন, রাজা দেশান্তরী হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। কঙ্কণদাসী ধনের লোভে রত্নেশ্বরের দূতদের কাছে শুক পাখী বিক্রয় করিল।

ধর্ম্মমতি শুক কর্ত্তৃক পরিচয় দান

এদিকে কাজলরেখাকে বাড়ী হইতে নির্ব্বাসন করিয়া সূঁচ রাজা একবারে পাগল হইলেন, তিনি বাড়ী ঘর ছাড়িয়া রাজ্যে রাজ্যে দেশ বিদেশে তাহার হারাণো রত্নটি খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রত্নশ্বরের মুলুকে আসিয়া শুনিলেন রজা চরায় কুড়াইয়া একজন পরী লইয়া আসিয়াছেন, ধর্ম্মমতি শুকের নিকট তাহার পরিচয় লইয়া তিনি আজই তাহাকে বিবাহ করিবেন। রাজসভায় ভয়ানক ভীড় হইয়াছে। রাজ সভায় একটা বনেলা* পক্ষী সেইজন পরীর পরিচয় দিবে, তখন বহু রাজা ও রাজপুত্র এই আচর্য্য কাণ্ড দেখিবার জন্য রত্নেশ্বরের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছেন। সভার এক কোণে সূঁচ রাজাও পাখীর মুখে এ অলৌকিক কাহিনী শুনিতে বসিয়া গেলেন।

সভায় স্বর্ণশলাকা বিশিষ্ট পিঞ্জরে শুক পাখীটা আনীত হইল। শুক সভাদিগকে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন—

বনেলা—বন্য।
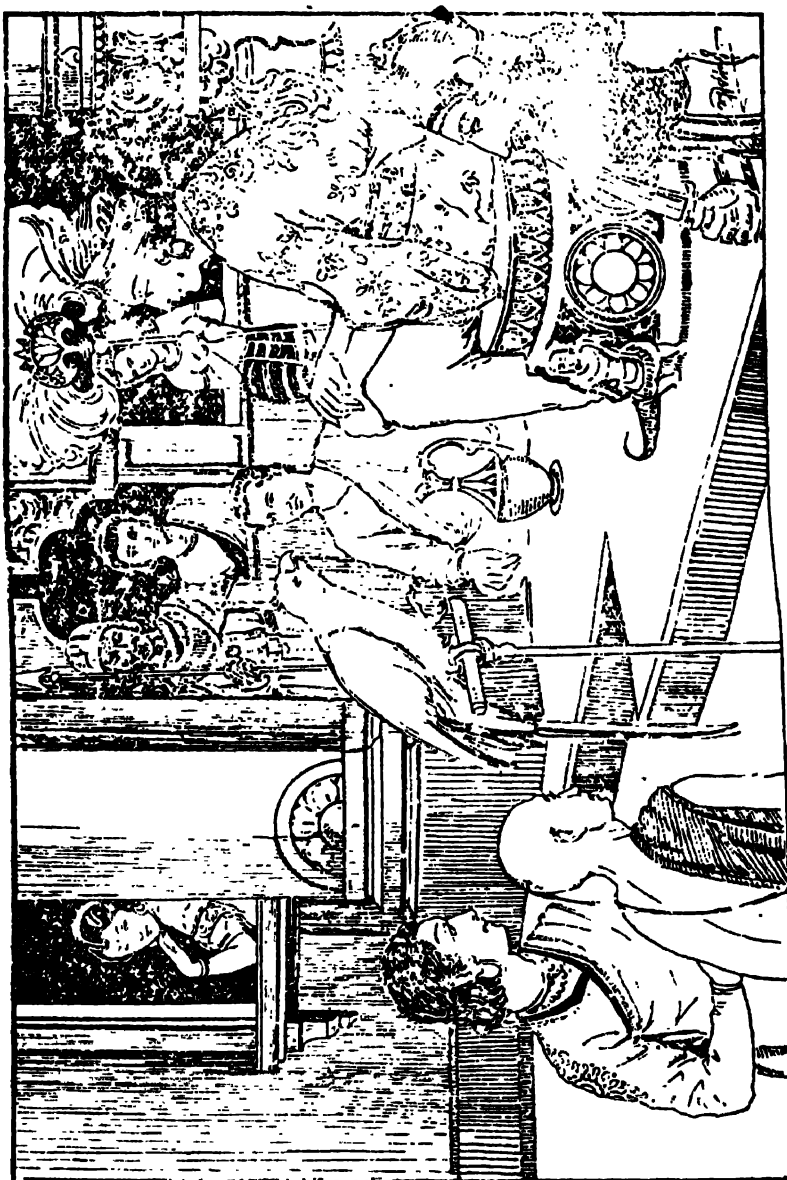
শুক সভাদিগকে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিল...

(পৃষ্ঠা ৫২)

"ভাটিয়াল দেশে ধনেশ্বর নামক বণিকরাজ বাস করিতেন। তিনি কুবেরের মত ধনশালী ছিলেন, তাঁহার একটি পুত্র ও একটি কন্যা। যখন কন্যাটির বয়স ১১ এবং ছেলের বয়স মাত্র চার; তখন জুয়া খেলিয়া তিনি সর্ব্বস্বহারা হইলেন। কোন সন্ন্যাসী তাঁহাকে একটি শ্রী আংটী ও ধর্ম্মমতি নামক একটি শুক পাখী দিয়া বলিলেন, পাখীটির উপদেশ মত যদি তুমি চল, তবে তোমার ইষ্ট হইবে। শ্রী আংটিটি বিক্রয় করিয়া সাধু অনেক ধন পাইলেন, তাহার দ্বারা তাহার বিশালপুরী মেরামত করিয়া উদ্ধৃত্ত অর্থ লইয়া বাণিজ্যে গেলেন। এইবার তাহার ভাগ্য ফিরিল। তিনি বাণিজ্য করিয়া এত লাভবান হইলেন যে তাহার পুরী ধনধান্য ও সমৃদ্ধিশালী হইয়া পূর্ব্ববৎ হইল।

কিন্তু তাহার মেয়ে তখন দ্বাদশবর্ষে পড়িয়াছে। জুয়া খেলার জন্য তাঁহার দুর্নাম হইয়াছিল; জুয়ারীর কন্যাকে কেন বিবাহ করিতে রাজী হইলেন না।

আমাব কাছে সদাগর পরামর্শ চাহিলেন আমি বলিলাম, এই কন্যা অতি দুর্ভাগা, তুমি আজই ইহাকে বনবাসে দিয়া আস,যদি সন্তান স্নেহে তুমি তাহা না পার, তবে কন্যা ও তুমি ঘোর বিপদে পড়িবে। একটি ভাঙ্গা মন্দিরে একটী মৃত রাজকুমার আছেন, কন্যার অদৃষ্ট সেই মৃত কুমারই ইঁহার স্বামী হইবে।

কাঁদিয়া কাটিয়া ধনেশ্বর সে ভাটী অঞ্চলের নিবিড় অরণ্যে কন্যাকে সেই মৃত রাজকুমারের নিকট ফেলিয়া আসিলেন। তিন দিন তিন রাত্রি কন্যা কিছু খান নাই। এক সন্ন্যাসীর উপদেশ সাত দিন সাত রাত্রি জাগিয়া কন্যা একটি একটি করিয়া রাজকুমারের সর্ব্বাঙ্গের শল্য উদ্ধার করিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসীর উপদেশে চক্ষের দুটি সূঁচ তিনি তখনও উঠান নাই। সর্ব্বশেষে সন্ন্যাসী দত্ত পাতার রস চোখে দিয়া সেই সূঁচ দুটি তুলিতে হইবে, এই ছিল সন্ন্যাসীর নির্দ্দেশ। কাজলরেখা পুকুর ঘাটে স্নান করিয়া শুদ্ধ শান্ত ভাবে স্বামীর চক্ষের সূঁচ তুলিবেন, এইজন্য সেই ঘাটে বসিয়া অঙ্গ মার্জ্জনা করিতেছিলেন, এমন সময় একটি বৃদ্ধ তাহার কন্যা বিক্রয় করিতে সেখানে আসিল। বৃদ্ধ একটি চাষা, তাহাকে নিজ হাতের কঙ্কণ দিয়া কাজল কন্যাটিকে ক্রয় করিয়াছিলেন। পিতা হইয়া কন্যাকে বিক্রয় করিতেছে, ইহা শুনিয়া কন্যাটির প্রতি তাহার আন্তরিক সহানুভূতি হইয়াছিল। কিন্তু কন্যার ছিল আসুরিক বুদ্ধি, সে কাজলের কাছে সমস্ত অবস্থা শুনিয়া তাড়াতাড়ি মন্দিরে ঢুকিয়া রাজার চোখের সূঁচ নিজেই তুলিয়া ফেলিয়া সন্ন্যাসী দত্ত পাতার রস তাহার চক্ষে দিল।

রাজপুত্র পুনরায় জীবনলাভ করিলেন, তখন এক অশুভ মুহূর্ত্তে সেই কঙ্কণদাসীকে তাঁহার প্রাণদাত্রী মনে করিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন। এমন সময় স্নানান্তে লক্ষ্মী প্রতিমার ন্যায় কাজলরেখা মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সূঁচ রাজার প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই কঙ্কণদাসী অগ্রসর হইয়া কাজলরেখার পরিচয় দিল, সে বলিল, "এটি আমার দাসী, আমি কঙ্কণ দিয়া ইহাকে ক্রয় করিয়াছি, ইহার নাম কঙ্কণদাসী।"

এই কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধ শুকের চক্ষের জল আর থামে না,—কঙ্কণদাসী এইভাবে রাণী হইল এবং প্রকৃত রাণী তাহার দাসী হইলেন; কাজলকে দাসী যত দুঃখ দিয়াছে, তাহা বর্ণনা করিতে যাইয়া গদগদকণ্ঠে অশ্রুপূর্ণচক্ষে পাখী সব কাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিল; তাহাতে সভার সকল লোক কাঁদিয়া উঠিল। তারপরে কিভাবে বৃথা অভিযোগ করিয়া কলঙ্কিনী করিয়া তাঁহাকে সেই সদাগর যেভাবে সমুদ্রের চড়ায় ফেলিয়া আসিয়াছিল, শুক তাহার একটা বিবৃতি দিল।

এই সময়ে সূঁচ রাজা সম্পর্কেও শুক এক অলৌকিক কাহিনী শুনাইল। চাম্পা নগরের রাজমহিষী এই মৃত কুমারকে প্রসব করেন। এক সন্ন্যাসীর উপদেশে এই মৃত কুমারকে সেই ভাটি অঞ্চলের ভাঙ্গা মন্দিরে রাখা হয়, সন্ন্যাসীর বরে দেহের শ্রী তাহার থাকিয়া যায় এবং দেহের বৃদ্ধি স্থগিত হয় না। সন্ন্যাসী ইহার সর্ব্বাঙ্গে সূঁচ বিঁধাইয়া ভাঙ্গা মন্দিরে রাখিয়া যান এবং তাহারই কথায় কাজল ইহার শল্য উদ্ধার করেন।

সর্ব্বশেষে শুকপাখী বলিলেন, রত্নেশ্বর কাজলকে বিবাহ করিতে চায়।

> "উড়িতে উড়িতে পাখী সভার আগে কয়।
> ভাই হয়ে রত্নেশ্বর বিয়া করতে চায়।
> আজ হৈতে কন্যার বার বছর গত হয়।
> এই কথা কহি পাখী শূন্যেতে মিলায়।।"

নকল রাণীর শাস্তি

রত্নেশ্বর বিষম লজ্জা পাইয়া অন্তঃপুরে যাইয়া দিদির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এতকাল পরে দুই ভ্রাতা-ভগিনীব মিলনে যে আনন্দ হইয়াছিল, তাহাতে রাজপুরী যেন

সুখের বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল। সূঁচ রাজা তাহার হারানো ধন পাইয়া পরম হৃষ্টচিত্তে গৃহে ফিরিলেন। তিন স্বগৃহে যাইয়া একটা অতি গভীর ও প্রকাণ্ড গর্ত্ত খনন করাইলেন এবং অন্তঃপুরে যাইয়া নকল রাণীকে বলিলেন, "ভাটীদেশের রাজা ধনেশ্বর আমাদের বাড়ী লুটিতে আসিয়াছেন, সুতরাং আইস আমরা প্রাণ লইয়া এই বেলা পলাইয়া যাই।" নকল রাণী কালবিলম্ব না করিয়া সর্ব্বাগ্রে তাহার মূল্যবান রত্নগুলি কৌটায় পুরিয়া সেই গর্ত্তে প্রবেশ করিলেন। রাজার ইঙ্গিতে লোক জন আসিয়া সেই গর্ত্ত মাটী দিয়া পূর্ণ করিল, এইভাবে কঙ্কণদাসীর সেইখানে সমাধি হইল।

আলোচনা

কাজলরেখা, ভারতীয় আদর্শের একটি সর্ব্বোচ্চ পরিকল্পনা। এই চিত্র যেন আত্মত্যাগশীল রমণী মহিরুহদের মধ্যে উন্নত গৌরীশঙ্কর।

পল্লী-কল্পনা যে সকল রমণী-চিত্র আমাদের গোচর করিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিতে কোন না কোন গুণ বিশেষভাবে ফুটিয়াছে। সাধুত্ব ও চরিত্রগুণে সকলেই পূজা ও শ্রদ্ধা-ভাজন, কিন্তু কাহারও মধ্যে অদ্ভুত তেজস্বিতা, উদ্ভাবনী শক্তি, কাহারও মধ্যে চূড়ান্ত স্বামী-প্রাণতা, কাহারও মধ্যে অপূর্ব্ব সংযম দৃষ্ট হয়; প্রত্যেকেরই মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে প্রায় এক শত পল্লী-চিত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তন্মধ্যে পুনরাবৃত্তি দোষ, এবং একটি আদর্শকেই বারংবার বেশ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক প্রদর্শন, অনর্থক বাক্য-বাহুল্য প্রভৃতি অসঙ্গতি ও অপূর্ণতা নাই। প্রত্যেক চরিত্র ভিন্ন ভিন্ন এবং সুস্পষ্ট রেখায় অঙ্কিত। এদেশে যে সকল কবি প্রাচীন কালে মহিলা-চরিত্র আঁকিতে গিয়াছেন, তাহার সমস্ত স্থানেই যে সকল চরিত্র সীতা-সাবিত্রীর ছাঁচে ঢালাই করা হইয়াছে; কিন্তু বাঙ্গালার এই পল্লীর ঐশ্বর্য্য কি বিরাট! এই চিত্রশালায় প্রায় ৫০টি আদর্শ রমণী পাইতেছি, তাহার কাহারও সাহস দুর্জ্জয়, কেহ উগ্র-প্রকৃতি, কেহ নানা বিরুদ্ধ অবস্থার পরীক্ষায় ও স্বীয় অকুণ্ঠিত নির্ভিকতা বলে সর্ব্বত্রজয়ী। এই সকল চিত্র-পরিকল্পনায় পাঠক কোন নৈতিক বা ধর্ম্ম-সূত্র পাইবেন না। পল্লী-কবির হাতের কাছে একটিমাত্র শাস্ত্র ছিল, অন্য কোন পণ্ডিতী অনুশাসন ছিল না। সে শাস্ত্র—প্রকৃতি। এই গুরুই কবিকে ভালমন্দের বিচার শিখাইয়াছেন, তিনি অন্য কোন শাসনেব অনুবর্ত্তী হন নাই।

কাজলরেখা মূর্ত্তিমতি সহিষ্ণুতা। এদেশের নারী-জীবন নিরবচ্ছিন্ন কষ্টের ইতিহাস, —নানাবিধ সামাজিক দুর্দ্দশা ও অবস্থার বৈগুণ্যে নারীকে প্রায়ই সকল কষ্ট নীরবে সহ্য করিতে হয়। এই সহিষ্ণুতা কুলরমণীর স্বাভাবিক সাধুত্ব ও লজ্জাশীলতার উপর দাঁড়াইয়া দেব-লোকের কি অপূর্ব্ব পারিজাত পুষ্প উৎপন্ন করিতে পারে, কাজল তাহারই দৃষ্টান্ত।

কাজলকে পিতা ভীষণ জঙ্গলে ভাঙ্গা মন্দিরে একটি শবের পার্শ্বে রাখিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। ইতিপূর্ব্বেই তিন দিন কাজল উপবাসী ছিলেন, তারপর সাতদিন সাত রাত্রি মৃত কুমারের শয্যায় বসিয়া তিনি তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের শল্য উদ্ধার করিলেন। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে ভাগ্য-চক্রনেমির পরিবর্ত্তন হইবে এবং তিনি সুখের মুখ দেখিবেন, তখনই কি অভূতপূর্ব্ব বিপদ উপস্থিত হইল! যাহাকে সমদুখী মনে করিয়া তাহার হৃদয় করুণায় বিগলিত হইয়াছিল, যাহাকে দুঃখের সহচরী ভাবিয়া অতি স্নেহে হাতের কঙ্কণ দিয়া কিনিয়াছিলেন, সেই রমণীর মনে 'অসুরভাব' জাগিয়া উঠিল এবং সে এমনই আঘাত দিল, যাহাতে তাহার জীবনের প্রথম অংশ একান্তভাবে ব্যর্থ হইয়া গেল।

কিন্তু সমস্ত অবস্থাই সহিতে হইবে, সন্ন্যাসী বলিয়া গিয়াছেন, "জোর করিয়া কপালের দুঃখ খণ্ডাইতে যাইও না।" দৈবের বিধান ও সন্ন্যাসীর উপদেশ মানিয়া কাজল চুপ করিয়া রহিলেন; এত বড় একটা মিথ্যার ব্যাপার তাঁহার চক্ষের উপর বহিয়া গেল, কোথায় রাণী হইবেন, তৎপরিবর্ত্তে তিনি তাহার নিজের দাসীর দাসী হইলেন!

এই অকম্পিত দীপ-শিখার মত নির্ব্বাক রমণী চিত্রে আমাদিগের পরম বিস্ময় উৎপাদন করে। অন্য কেহ হইলে কত আর্ত্তনাদ, কত ক্রোধ, কত যুক্তি, কত প্রমাণ উপস্থিত করিয়া সমস্ত বায়ুমণ্ডল আলোড়িত করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু কাজল নিস্পন্দ নিশ্চল,—তিনি দৈব মানিয়া মহাদুঃখের জীবন বরণ করিয়া লইলেন।

দৈব কি? লক্ষ্মণ যখন ধনুর্বাণ আস্ফালন করিয়া বলিতেছিলেন, "হনিষ্যে পিতরং বৃদ্ধং কৈকেয্যাসক্তমানসম্" পুরুষকারের এই জ্বলন্ত মূর্ত্তিকে প্রবোধ দিয়া রাম বলিলেন— "লক্ষ্মণ, ইহা দৈব! যে ঘটনা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত, যাহা কোন্ দিক্ দিয়া ঘটে—মানুষ তাহা বুঝিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়ায়,— সেই সকল ঘটনা দৈব। রাজা দশরথের আমি প্রিয়তম সন্তান,—কৈকেয়ী আমাকে কৌশল্যা অপেক্ষাও স্নেহ করিয়া আসিয়াছেন—আজকার ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে কল্পনাতীত, এই অঘটন কি করিয়া ঘটিল তাহা আমি জানি না; ইহা দৈব. পুরুষকার দিয়া ইহার প্রতিকার হইবার নহে।"

প্রত্যেকের জীবনে সময়ে সময়ে এইরূপ দৈবের খেলা দেখা যায়; তখন যাহা সত্য, যাহা দিবালোক, তাহা প্রমাণ করা যায় না, যাহা হৃদয়ের দরদ দিয়া সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে করা যায়—নিতান্ত অন্তরঙ্গেরা এমন কি যাহাদের ইষ্টের জন্য নিজ সুখ জলাঞ্জলি দিয়া শত দুঃখ বরণ করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহারাও সকলেই সম্মুখের সরল পথ দেখিতে পায় না, প্রত্যেকটি কার্য্যের কূট অর্থ করিয়া তাহা হীন প্রতিপন্ন করে; —যখন নিতান্ত স্বগণেরা ভুল বুঝিয়া শত্রুতা করে, বহু প্রমাণ লইয়া আসিয়া এইরূপ বিপন্ন ব্যক্তি দুর্ভাগ্যের প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিলে আবর্জ্জনার স্তূপ দিয়া আগুন নিভাইবার প্রচেষ্টার মত, তাহাতে সেই দুর্ভাগ্যের আগুন দাউ দাউ করিয়া আরো বেশী জ্বলিয়া উঠে, তখন যতই প্রমাণ সে আনিবে, তাহা বিপক্ষের অনুকূল হইবে, আদালতের বিচারে নিরপরাধের ফাঁসি হইয়া যাইবে।

যাঁহারা জীবনের এই রহস্য জানেন তাঁহারা বুঝিতে পারেন 'দৈব' কী? সন্ন্যাসী এজন্যই বলিয়াছেন, "কপালের দুঃখ জোর করিয়া খণ্ডাইতে যাইও না।" শাস্ত্রে আছে, যখন দৈব প্রতিকূল হয় তখন সমস্ত গুণ দোষে পরিণত হয়, নিঃস্বার্থ ব্যবহার স্বার্থের রূপ বলিয়া প্রমাণিত হয়,—কিন্তু দৈব অনুকূল হইলে দোষগুলি গুণরূপে প্রতিপন্ন হয় এবং যাহা পাপ ও অধর্ম্মের স্বরূপ—তাহা পুণ্য বলিয়া সকলের চক্ষে প্রশংসিত হয়।

এইরূপ দুঃসময় কখনও কখনও উপস্থিত হয়, যখন যাহা কিছু পুস্তকে পড়া গিয়াছে, জীবনে তাহার অন্যথা প্রমাণিত হয়; সত্য কথা, সহানুভূতি ও উদারতা জীবনে ব্যর্থ হইয়া যায়।

এজন্য খ্রীস্ট বলিয়াছেন "Resist not evil"—যখন দুঃসময় আসে তখন প্রতিরোধ করিতে যাইও না।

এক কৃষক ঝড়ের সময় বিপরীত দিকে ঠেকা না দিয়া— যেদিক হইতে ঝড় আসিতেছিল, সেই দিকে ঠেকা দিয়াছিল। লোকে উপহাস করাতে সে বলিয়াছিল, "আমার কি সাধ্য খোদার মর্জ্জির বিরুদ্ধে চলিব? বরং যদি নিজেকে তাঁহার বিধানের অনুকূল করিয়া তুলিতে পারি, তবে লাভ আছে।"

এই গল্পের নীতি-কথা এই ঃ যদি নিতান্ত বিপদের সময় আস্ফালন ও স্বশক্তিতে তাহা খণ্ডাইবার চেষ্টা না করিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া থাক, তবে নির্দিষ্ট সময়ে বিপদের ঘোর কাটিয়া যাইবে এবং আকাশ-বাতাস নির্ম্মল হইবে এবং লোকে তোমার মূল্য বুঝিতে পারিবে। কিন্তু তাহা কি সহজ? বিপদের সময় কি কেহ আত্মরক্ষার চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারে?

কিন্তু নিজের উদ্ধার-সাধনের জন্য বিপন্ন ব্যক্তি যে চেষ্টা করিবে, নির্ব্বিকার হইয়া দৈবের উপর স্বার্থকে নির্ভর করিয়া থাকিতে তদপেক্ষা শতগুণ শক্তির দরকার; কাজল সেই অপরিমিত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার আদর্শ। কাজলের স্বভাবটি ছিল সহিষ্ণু—তাহার উপর তিনি পরম গুণবতী ও ক্ষমাশীলা ছিলেন। কঙ্কণদাসীর সঙ্গে তিনি যে ব্যবহার করিয়াছেন, অন্য কেহ কি তাহা পারিত? তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ সেই দিন তিনি দিয়াছিলেন যে দিন রাজপুরী হইতে বিদায়ের প্রাক্কালে তিনি কঙ্কণদাসীর নিকট ক্ষমা চাহিয়াছিলেন, তখন তাঁহার চক্ষু দুটি জলে ভরা।

পাঠক হয়ত মনে করিতে পারেন, এসকল কথা মাথা ডিঙ্গাইয়া যায়, কোন স্ত্রীলোক কি বাস্তব জগতে এতটা উদারতা দেখাইতে পারে? কিন্তু আমি আমার দেশের মেয়েদের হয়ত কিছু জানি, কারণ পল্লীজগত আমার পরিচিত; এখন সে জগত আর নাই। আমার ধারণা আমাদের দেশের পূর্ব্বেকার মেয়েরা ধর্ম্ম ও নীতির সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ অনায়াসে আরোহন করিতে পারিতেন।

জ্ঞানী ছিল শুকপাখী, তাহার কাজলের উপর দরদের অন্ত নাই। শেষ অধ্যায়ে যখন সে কাজলের দুঃখের জীবন বর্ণনা করিতেছিল, তখন সে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সময়ে সময়ে থামিয়া স্বর পরিষ্কার করিয়া লইয়াছে। কাজলের দুঃখে সে নিজে অত্যন্ত দুঃখ পাইয়াছে। অথচ সে সত্য কথা বলিয়া কাজলকে রাজসভায় সমর্থন করিল না। যাহা কিছু বলিল তাহা দিবা ও রাত্রির সন্ধিস্থলের মত, প্রহেলিকাময় ও অস্পষ্ট। এরূপ করার কারণ কি? পাখী জানিত, কাজলের মাথার উপর দিয়া তখন প্রবল দৈব—ঘূর্ণিবায়ুর মত চলিয়া যাইতেছে। এসময় সত্য বলিয়া চিৎকার করিলে তাহা প্রমাণে টিকিবে না; দৈব তাহা উড়াইয়া লইয়া যাইবে, এজন্য দুঃখার্ত্ত কণ্ঠে সে দ্ব্যর্থবোধক কথা বলিল। কাজলের অদৃষ্টের দুঃখ তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে—সময়ের পূর্ব্বে তাহা খণ্ডিবে না, বরং বাধা পাইলে তাহার গতি আরো বৃদ্ধি পাইবে।

এই গল্পটি সম্ভবতঃ বৌদ্ধ যুগে পরিকল্পিত হইয়াছে। ইহাতে খুব বড় বড় বিপদ ও দুঃখের কথা আছে, কিন্তু 'চণ্ডীর চৌতিসা' অথবা 'শ্রীকৃষ্ণের শত নাম' নাই। বিপদের সময় ভগবানের সহায়তার জন্য চেষ্টা নাই—নিজের সহিষ্ণুতা ও উদারতা মাত্র লইয়া কাজল সর্ব্ব বিপদের অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে।

সেই যুগে মেয়েদের চিত্রাঙ্কন, রন্ধন, শিল্প প্রভৃতির বিশেষ চর্চ্চা হইত। কিন্তু কোন স্থানেই ব্রাহ্মণ্যের প্রভাব দৃষ্ট হয় না। চিত্রাঙ্কণের সময় গণেশের নাম চিত্রকরীর মনে

প্রথম উদয় হয় নাই, রন্ধন-শালায় অন্নপূর্ণা বা লক্ষ্মীকে প্রণাম করিয়া কাজল রাঁধিতে বসেন নাই। দেব দেবীর কথা আছে,—তাহা চালচিত্রের ন্যায়, কিন্তু বৌদ্ধাধিকারে প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি পল্লীদেবতার নাম পাওয়া যায়, যথা— ডড়াই, ডাকিনী, সেওয়া গাছতলায় বনদেবী ইত্যাদি। সমস্ত অবস্থান্তরের মধ্যে বিপদের ঘোরে এবং নৈরাশ্যের আঁধারে কাজলরেখার যে দেবী-মূর্ত্তি ফুটিয়াছে তাহা সূর্য্যরশ্মির মত কিরণজাল প্রক্ষেপ করিয়া বিয়োগবিধুর গল্পটিকে স্বর্ণচ্ছটায় মণ্ডিত করিয়াছে এবং কাজলের ক্ষমাশীল আত্মদান-সমুজ্জ্বল ও সহিষ্ণু পরিচর্য্যার মূর্ত্তিকে বরণীয় করিয়া দেখাইতেছে। চতুর্দ্দিকে লবণ-সমুদ্র, মধ্যে ক্ষুদ্র দ্বীপের ক্ষুদ্র দীঘিটির জল এত মিষ্ট কিরূপে হইল? কাজলের স্বভাব সেইরূপ মিষ্ট। তাঁহার উপর দিয়া কৃতঘ্নতা, নিষ্ঠুরতা ও মিথ্যার বন্যা বহিয়া যাইতেছে কিন্তু এই অমৃতকুণ্ডের জল কেহ বিস্বাদ করিতে পারে নাই। কাজল অমৃত লোকের মানুষ, কি সাধ্য পার্থিব আবর্জ্জনা তাঁহাকে মলিন করিবে? "ঘৃষ্টং ঘৃষ্টং ত্যজতি ন পুনঃ চন্দনঃ চারুগন্ধং" এই অমর পুষ্পের সুরভি নষ্ট করিবার অধিকার জড়শক্তির নাই।

এই কাজলের চিত্রে হিন্দু রমণীর যে আদর্শ আছে, তাহা এক সময়ে বঙ্গের পল্লী ও নগরের আকাশে বাতাসে ছিল; সেই ত্যাগ ও সহিষ্ণুতা ও সেই প্রাণ-দেওয়া নীরব সেবা ও সর্ব্বস্ব-হারার জীবন উৎসর্গ কতবার সকলের গোচর হইয়াছে, কখন বা লোক-চক্ষুর অন্তরালে কোনরূপ ঘোষণা বা স্মৃতি না রাখিয়া তাহাদের লোপ হইয়াছে। কিন্তু এই সকল মহৎ গুণ কোন কালেই ব্যর্থ হইবার নহে। বনের কুসুম শত শত ঝরিয়া পড়িয়া বনের মাটিতে মিলাইয়া যায়, কেহ তাহাদিগকে দেখে না। কিন্তু যে পবিত্র ভূমিতে তাহাদের জন্ম তাহার কাছে তাহাদের প্রতিটি রেণুর ফর্দ্দ আছে; সেই ভূমি নানা বর্ণের—নানা গন্ধের রেণু কুড়াইয়া, রাখেন, এবং পরে যে সকল ফুল ফোটে তাহা ভূমি হইতে সেই বিগত বৈভবের রেণু লইয়া পুষ্ট হয়। আমাদের ধরিত্রীর ভাণ্ডারে তাহা হারায় না। পুনঃ পুনঃ তাহা কলেবর পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন রূপ ধরিয়া পৃথিবীকে লাবণ্যময় করিয়া তোলে।

কাজলরেখার মত কত রমণী এইদেশে রহিয়াছেন, সন্ন্যাসিনীর মত সাধুত্ব লইয়া ত্যাগ ও আত্মদানের চূড়ান্ত নিদর্শন দেখাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। কেহ হয়ত তাঁহাদের মহিমা বুঝে নাই। বিরুদ্ধ বেষ্টনীর মধ্যে তাঁহাদের লোকাতীত সৌন্দর্য্যের ও সরস প্রাণের রস-বোদ্ধা কেহ ছিল না; অকথ্য কষ্ট সহিতে সহিতে তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এ দেশের

বাতাসে এখনও তাঁহাদের সুরভি আছে এবং অনুকূল গ্রহের বিধানে হয়ত আমাদের রমণী-সমাজে আবার সেইরূপ শাঁখা সিন্দূরের অভিমান ফিরিবে,—হয়ত সেই গেরুয়ার নিস্পৃহতা ও সংযমের কষায় বাস আবার জীবন্ত হইয়া দেখা দিবে, তখন বৌদ্ধসঙ্ঘের পবিত্র বহির্ব্বাস হিন্দু ও অন্তঃপুরের পট্টবাসের মহিমা—আবার উজ্জ্বল হইয়া এই দেশে প্রতিষ্ঠা পাইবে। এদেশে কোনকালেই তাহার অধ্যাত্ম সম্পদ বিচ্যুত হয় নাই। যাহারা চিতায় পুড়িয়া প্রেমের অকুতোভয়তা এবং একনিষ্ঠা দেখাইয়াছেন—যাহারা গার্হস্থ্য ধর্ম্মপালন করিতে যাইয়া ব্রহ্মচারিণীদের অপেক্ষাও একব্রত হইয়াছিলেন, সেই সকল অঙ্গনা চলিয়া গিয়াছেন, প্রতিষ্ঠা তাঁহারা চান নাই—এজন্য পান নাই, কিন্তু প্রকৃতি তাঁহার আঁচলে সেই সকল চিতা-ভস্ম রাখিয়া দিয়াছেন। আবার দেশের ভাগ্য ফিরিলে সেই রিক্তাদের মহাবৈভব লোকচক্ষুর গোচর হইবে এবং ভারতবর্ষ অধ্যাত্মসম্পদের অধিকারী হইবে।

এই গল্পের সামাজিক অবস্থা যাহা পরিকল্পিত হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গ দেশের পাল-যুগের বিপুল ঐশ্বর্য্যের কথা আছে, সেই সময়কার অপরাপর অনেক গল্পেই তাহা পাওয়া যায়। হয়ত অনেক অতিরঞ্জন আছে, কিন্তু তথাপি বাদ সাদ দিয়া যাহা সত্যিকার আভাস দিতেছে, তাহাতে মনে হয় বাঙ্গালার তখনকার ধনৈশ্বর্য্যের তুলনা ছিল না। এই গল্প নিছক গল্প—ইহা ইতিহাস-মূলক নহে। এই সকল গল্প রূপকথার পর্য্যায়ে পড়ে। শিশুর কল্পনা ও কৌতূহল ও প্রবীনের চিন্তাশীলতার অনেক উপাদান এই সকল রূপকথায় আছে। যখন বাঙ্গালী জাতি ধন-জন ও ঐশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ ছিল, এবং বাঙ্গলার ডিঙ্গি বাণিজ্য পথে জগৎ পর্য্যটন করিত, এসকল রূপকথা সেই যুগের। ভাষার অনেকটা পরিবর্ত্তন হইলেও ইহার বিষয়-বস্তু অতি প্রাচীন,—সম্ভবত, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পাল-যুগের। সমাজ যে তখন উন্নত সুনীতির পৃষ্ঠপোষক ছিল, তাহার প্রমাণ এই যে জুয়ারীর কন্যাকে কেহ বিবাহ করিতে চাহিত না। অবশ্য তান্ত্রিক-বিদ্যার বিশেষ চর্চ্চা থাকার দরুণ অলৌকিক ঘটনার প্রতি লোকের বিশ্বাস থাকাতে অনেক সময়ে সামাজিক দুর্গতি হইত।

চাকলাদারের কন্যা

ময়মনসিংহে নন্দাইল ষ্টেশন হইতে দশ মাইল দূরে হুলিয়া (বর্ত্তমান হালিউড়া) গ্রামে মানিক চাকলাদার নামে একটি প্রতাপশালী ভাগ্যবন্ত লোক বাস করিতেন। সেই অঞ্চলের রাজার অধীনে তিনি বিস্তৃত জমিদারী ভোগ করিতেন।

তাঁহার বাড়ীতে উলুছণের ছাউনি ও সুঁদি-বেতের বেড়াযুক্ত ২০ খানি বাঙ্গলা ঘর ছিল; সে আমলে অধিকাংশ অবস্থাপন্ন লোকই এরূপ ঘরে বাস করিতেন—পাকা ঘর নির্ম্মাণের বড় একটা রীতি ছিল না। নদীমাতৃক দেশে পাড় ভাঙ্গার বিপদ আছে, ইষ্টকালয়ে বাস নিরাপদ নহে, এবং অনেক সময় বহুব্যয়ে যাহা নির্ম্মিত হইত তাহা পাড় ভাঙ্গায় নদী গর্ভে পড়িয়া যাইত।

কিন্তু এই সকল উলুছণে নির্ম্মিত গৃহ যেরূপ ব্যয় ও যত্নের সহিত গঠিত হইত, তাহা অনেক সময় পাকা ইমারত অপেক্ষা শুধু অধিক আরামপ্রদ ও বাসযোগ্য হইত না, তাহা নির্ম্মাণ করিতেও বহু ব্যয় পড়িত। আইনি আকবরিতে বাংলাদেশের এইরূপ ঘর নির্ম্মাণের কথা আছে,—পাঁচ হাজার টাকার উপরে এক একখানি ঘরের পাছে ব্যয় হইত, কোন কোন সৌখিন লোক একখানি ঘরের পাছে ২৫।৩০ হাজার টাকা খরচ করিয়া ফেলিতেন। বেতের দ্বারা সে সমস্ত হাঙ্গর-মুখ, ব্যাঘ্র-মুখ এবং জীব-জন্তুর মূর্ত্তি রচিত হইয়া চালের কাঠগুলির শোভাবর্দ্ধন করা হইত। আভ ও স্ফটিকের স্তম্ভে কত বিচিত্র কারুকার্য্য প্রদর্শিত হইত। ঢাকার মসলিন ও সোনারূপার কাজ যেরূপ অতুলনীয় ছিল, এই খড়োঘরগুলিও সেইরূপ বাঙ্গালী কারিগরের অপূর্ব্ব দক্ষতার নিদর্শন স্বরূপ পল্লীতে পল্লীতে শোভা পাইত।

চাকলাদারের বাড়ীর ঘরগুলি বেত ও ছণে নির্ম্মিত বলিয়া উপেক্ষনীয় ছিল না। তাঁহার বাড়ীতে বহু লোকজন খাটিত। দশটি হাতী এবং ত্রিশটি ঘোড়া তাহার বাড়ীতে সর্ব্বদা ব্যবহারের জন্য ছিল এবং গো-শাসনে শত শত মহিষ, ভেড়া ও দুগ্ধবতী গাভী বিচরণ করিত। তাঁহার চল্লিশ 'কুড়া' খামারের জমি ও বিস্তর সরু শস্যের গোলা ছিল।

অতিথি ও বৈষ্ণব আসিলে সে গৃহে কতই না আদর অভ্যর্থনা পাইত এবং আশাতীত দানে আপ্যায়িত হইত। ব্রাহ্মণ আসিলে নববস্ত্র ও দক্ষিণা পাইয়া গৃহস্বামীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইতেন এবং খঞ্জ, কাণা ও অন্যান্য ভিখারীরা কাঠা ভরিয়া চাউল ভিক্ষা পাইত। ধনে-ধান্যে লক্ষ্মীমন্ত মানিক চাকলাদার দয়া দাক্ষিণ্য ও সুবিচার দ্বারা সে অঞ্চলে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন; তাঁহার একটি কিশোরী কন্যা ছিল, নাম তার কমলা—যেন পদ্মাসনা পদ্ম ছাড়িয়া ভূতলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এমনই তাহার রূপ। তাহার কালো চোখ দুটি নীলাব্জা বা অপরাজিতার মত সুন্দর ছিল এবং দীর্ঘ কেশগুলি কালো মেঘের লহরীর মত উড়িতে থাকিত, সেই কেশে "কখন খোপা বাঁধে কন্যা, কখন বাঁধে বেণী"— যৌবনাগমে এই কুমারীর রূপ শত গুণ বাড়িয়া জোয়ারের নদীর মত পূর্ণতা লাভ করিল।

রাজাদের নীচে কয়েকজন চাকলাদার বা জমিদার থাকিতেন-—এই পদের নীচে রাজস্ব আদায় উসুল করার জন্য রাজারা 'কারকুণ' নামক একশ্রেণীর কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতেন। মানিক চাকলাদারের অধীনে একজন তরুণ বয়স্ক কারকুণ ছিল। জমিদারী সেরেস্তার সমস্ত দলিল ও কাগজপত্র তাহার হেপাজতে থাকিত এবং চাকলাদারের হিসাব-পত্র এই কারকুণই রাখিত।

একদিন বৈকাল বেলা গ্রীষ্মের উত্তাপে কমলা স্নান করিতে নিকটবর্ত্তী দীঘির ঘাটে গিয়াছে। একটি দারুক গাছের আড়ালে কারকুণ তাহাকে দেখিতে পাইয়া মুগ্ধ হইল। সে কমলাকে লাভ করিবার জন্য একবারে উন্মত্ত হইয়া সেই গ্রামের চিকন গোয়ালিনী নামক এক দুশ্চরিত্রা রমণীর শরণাপন্ন হইল। এই নারী প্রায় বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছিল। সে দুধ বেচিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত কিন্তু যৌবন কালে দুধ অপেক্ষা কথা বেচিয়াই সে অধিক সংখ্যক গ্রাহক সংগ্রহ করিত। "....এই চিকন গোয়ালিনী। এক সের দৈয়ে দিত তিন সের পানি।"

এখন আর তাহার রূপের বাহার নাই "যদিও যৌবন গেছে, তবু আছে বেশ। বয়সের দোষে মাথার পাকিয়াছে কেশ। কোন দন্ত পড়িয়াছে, কোন দন্তে পোকা। সোয়ামী মরিয়া গেছে তবু হাতে শাঁখা।"

" জলেতে সুন্দরী কন্যা ফোটা পদ্ম ফুল।
কন্যারে দেখিয়া কারকুন হইল আকুল।।"

(পৃষ্ঠা ৬৪)

যৌবন চলিয়া গেলে এই শ্রেণীর রমণীরা মন্ত্র তন্ত্র ও টোনা প্রভৃতি শিখাইয়া দুশ্চরিত্র যুবকদিগের কু-অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে সহায়তা করিয়া থাকে। চিকন গোয়ালিনীও সেইরূপ অনেক 'টোনা' জানিত, তাহার পানপড়া একরূপ অব্যর্থ ছিল— সে তাহা দিয়া যুবক যুবতীদের অসৎ অভিপ্রায় পূর্ণ করিতে সাহায্য করিত।

"আর একটা ঔষধ শুনি আছে তার কাছে।
গৃধিণীর কান আর কালপনা মাছে।।
কিছু কিছু পেঁচার মাংস বাটিয়া গুটিয়া।
তিল পরিমাণ বড়ী করে শুকাইয়া।
এক এক বড়ীর দাম পাঁচ বুড়ি কড়ি।
এরে খাইলে পাগল হয় পাড়ার যত নারী।।"

কারকুণ কমলাকে বশীভূত করিবার উপায়ের জন্য এই দুশ্চরিত্রা গোয়ালিনীর বাড়ীতে গেল।

কেওয়া খয়ের ও সুগন্ধি সুপুরিযুক্ত পানের খিলি দিয়া চিকন কারকুণের অভ্যর্থনা করিল; সে অঞ্চলে খাজনা তহসিলের ভার যে কর্ম্মচারীর উপর, তিনি স্বয়ং তাহার বাড়ীতে আসিয়াছেন এই গৌরবে উৎফুল্ল হইয়া চিকন গোয়ালিনী তাঁহার হাতে একটা গুড়গুড়ির নল দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিল, এত বড় সৌভাগ্য তাহার কিসে হইল যে স্বয়ং কারকুণ তাহার কুঁড়ে ঘরে পায়ের ধুলো দিয়াছেন।

কারকুণ অতি গোপনে তাহাকে তাহার অভিপ্রায় জানাইল। গোয়ালিনী এই কথা শোনা মাত্র দাঁতে জিভ কাটিয়া তাহার অক্ষমতা জানাইল, "তিনি তোমার উপরিওয়ালা, একথা জানিলে তিনি তোমার গর্দ্দান লইবেন। আর আমি চাকলাদারের বাড়ীতে দুধ ও দৈ বেচিয়া কায়ক্লেশে দিন গুজরাণ করি, তাঁহার কন্যাকে আমি বিপথগামিনী করিতে চেষ্টা পাইতেছি—একথা শুনিলে কি আমার নিস্তার আছে? এই বুদ্ধি পরিত্যাগ কর।"

কারকুণ বলিল, "দৈবের উপর বল নাই, তুমি যে সকল মন্ত্র-তন্ত্র জান, তাহাদের প্রক্রিয়া ব্যর্থ করিতে পারে—লোকের এমন কোন শক্তি নাই। তুমি তোমার মন্ত্র ও ঔষধের গুণে কমলাকে আমার প্রতি অনুকূল করিয়া দাও।" —এই কথা বলিয়া কারকুণ বহু মিনতি পূর্ব্বক এক তোড়া টাকা চিকনের হাতে দিল। সেই তোড়াতে ১০০ টাকা ছিল।

যদিও চিকনের বুক ভাবী বিপদের আশঙ্কায় দুরু দুরু করিয়া উঠিল, তবু একসঙ্গে এতগুলি টাকার লোভ তাহাকে কতকটা বিচলিত করিল। সে ভাবিয়া চিন্তিয়া টাকাগুলি গ্রহণ করিল এবং কমলার নিকট লিখিত কারকুণের একখানি পত্র আঁচলে বাঁধিয়া লইয়া তাহাকে কতকটা আশ্বাস দিয়া বিদায় করিল। এই কার্য্যের ফলাফল চিকন সন্ধ্যাকালে কারকুণকে জানাইবে—এই বলিয়া গোয়ালিনী চাকলাদারের বাড়ীতে যাওয়ার উদ্যোগ করিল। কারকুণ উৎকণ্ঠিত ভাবে প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

চিকন যাইয়া দেখিল, বকুল ফুলের মালা জড়ানো খোঁপা হেলাইয়া কমলা একখানি রেশমি বস্ত্রের উপর জরোয়া কাজ করিতেছে। চিকনকে দেখিয়া হঠাৎ ক্রুদ্ধভাবে বলিল, "তোমার দই এখন ক্রমশঃ অভক্ষ্য হইয়া উঠিতেছে, বলত দই এত দুর্গন্ধ ও জলো হয় কেন, এরূপ করিলে আমি বাবাকে বলিয়া তোমায় শাসন করিব।"

চিকন বলিল—"এ আমার দৈয়ের দোষ নহে, কপালের দোষও নহে, বয়সের দোষে হইয়াছে। যৌবনে যাহা করিতাম, সকলেই তাহার প্রশংসা করিত; আধজল মিশাইলেও আমার গাহেক কমিত না।

"এখন বয়স গেছে নদী ভাটিয়াল।
পাকা দই টক হয়, এমনি জঞ্জাল।।"

"এখন যাহা করি সকলেই তাহার দোষ ধরে।" এই কথা বলিয়া চিকন কাঁদিতে লাগিল। এবং বলিল, "দই না বেচিব আর ছাড়িব বেশাতি। শেষ কালে কিষ্ট মোর যা করেন গতি।" কমলা একটু অনুতপ্ত হইয়া হাসিয়া কথা কহিল। চিকন উৎসাহিত হইয়া বলিতে লাগিল—"তোমার মত সুন্দরী কন্যার এখনও বিবাহ হইল না— যৌবন চলিয়া গেলে কি ভাল বর পাইবে?

"আধারে বসিয়া কন্যা থাকহ অন্দরে
বিয়া যদি হ'ত তোমার বন দুর্গার বরে।
ভাল দৈ আন্যা দিতাম খুসী কর্ত্তাম বরে।।"

ক্রমে চিকন গোয়ালিনীর রসিকতার ফোয়ারা ছুটিল এবং সময় বুঝিয়া সে একটা আখ্যানের ছলে কারকুণের কথা পাড়িল। তাহার নাম করিল না, কিন্তু তাহাকে কল্পিত কোন দেবতা বলিয়া তাহার রূপ গুণের ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। কমলাও এগুলি শুধুই

ারের কন্যা

তাঁহার মুখমণ্ডলে রক্তের আভা খেলিতে লাগিল...

(পৃষ্ঠা ৭১)

রহস্য মনে করিয়াছিল। কিন্তু যখন চিকন মুখ টিপিয়া হাসিয়া কমলাকে কারকুণের প্রণয়-পত্রখানি হাতে দিল, তখন ফুলবনে আগুন লাগিলে যেরূপ রক্তরাগে বাগানের সমস্তটা রঞ্জিত হইয়া উঠে, তাঁহার মুখমণ্ডলে, সমস্ত দেহে,—এমন কি তাঁহার চেলাঞ্চলে পর্য্যন্ত রক্তের আভা খেলিতে লাগিল; সে একটা থাপড় মারিয়া চিকনের পড়ন্ত দাঁতগুলি ফেলাইয়া দিল এবং এমন প্রহার করিল যে সেই রূপসী মূর্ত্তি যেন মহিষমর্দ্দিনী রূপ পরিগ্রহ করিল। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চিকনকে দগ্ধ করিয়া কমলা বলিল—

"কারকুণে কহিস তার মুখে মারি ঝাঁটা।
বাড়ীর চাকর হৈয়া এত বুকের পাটা।।
পায়ের গোলাম হৈয়া শিরে উঠতে চায়
গোবরা পোক পদ্মমধু খাইবার যায়।।"
চুপি চুপি গোয়ালিনী আসিল বাহিরে
দন্ত বাহিয়া তার রক্তধারা ঝরে।।"

এদিকে কারকুণ বড় আশা করিয়া চিকনের পথের দিকে চাহিয়া রহিয়াছিল; পথের লোকেরা গোয়ালিনীকে তাহার ভাঙ্গা দাঁত ও রক্ত-পাত সম্বন্ধে কত প্রশ্নই না করিয়াছিল,

পথের লোক জিজ্ঞাসা করে "রক্ত কেন দাঁতে।"
গোয়ালিনী কহে "মোরে মারিল সান্নিকে।।"
আরও লোক জানিবারে চাহিত খোলসা
যতই জিজ্ঞাসা করে তত হয় গোসা।"

কারকুণকে নিজ কুটিরে অপেক্ষা করিতে দেখিয়া সে যেন জ্বলিয়া উঠিল,

কারকুণরে দেখিয়া কয়, "আটকুড়ির বেটা।
মোর বাড়ী আইলে পুন, মুখে মারব ঝাঁটা।।
তোর লাগিয়া মোর এত অপমান।
পুরুষ হইলে তোর কাইট্যা দিতাম কান।"

কারকুণ আকার ইঙ্গিতে সবই বুঝিতে পারিল এবং শপথ করিয়া বলিল—

"আর না আসিব ফিরে গোয়ালিনীর বাড়ী।
ছারখার করিব চাকলা সাতদিনের আড়ি।।"

রাজার নাম দয়াল রায়—তিনি রঘুপুরে বাস করেন। সহসা তিনি এক বেনামী চিঠি পাইয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। চিঠিতে লেখা ছিল,—

"ধর্ম্মাবতার, আপনার চাকলাদার মানিক রায় আপনার জমিতে সাত ঘড়া মোহর পাইয়া নিজে আত্মসাৎ করিয়াছে। আপনার জমিতে প্রাপ্ত এই ধনের মালিক আপনি। কিন্তু চাকলাদার ঘুণাক্ষরে ইহা হুজুরে না জানাইয়া নিজে দখল করিয়াছে, আমি আপনার একজন দীনাতিদীন প্রজা, আমি চিঠি লিখিয়া মহারাজকে সংবাদ দিয়াছি, একথা জানিলে চাকলাদার আমাকে খুন করিবে—এই ভয়ে নিজের নাম গোপন করিলাম।"

রাজা মানিক চাকলাদারকে বাঁধিয়া আনিতে হুকুম করিলেন। এক শত অশ্বারোহী সেনা হুকুমনামা লইয়া ছলিয়া গ্রামে উপস্থিত হইল, এবং চাকলাদারকে তখনই বাঁধিয়া রঘুপুরে রাজধানীতে লইয়া গেল।

রাজা বিচারাসনে বসিয়াছিলেন। মানিক চাকলাদারকে দেখিয়া ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "তুমি কত ধন পাইয়াছ? আমাকে না জানাইয়া তাহা আত্মসাৎ করিয়াছ!"

চাকলাদার বলিলেন—"কিসের ধন? আমি তো কিছুই জানি না।"

রাজা তাঁহার কথা বিশ্বাস করিলেন না, ধন-লোভে তিনি উত্তেজিত অবস্থায় ছিলেন। চাকলাদারকে বন্দীশালায় লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন, সেখানে তাঁহার পায়ে লোহার শৃঙ্খল পরানো হইল এবং বুকে পাথর চাপা দিয়া ধনের কথা প্রকাশ করিবার জন্য পীড়ন করিবার ব্যবস্থা হইল।

এদিকে মানিক চাকলাদারের পরিবারে যখন এই অচিন্তিতপূর্ব্ব বিপদ, এবং তাঁহারা দুঃখে অবসন্ন, তখন কারকুণ যাইয়া চাকলাদারের দ্বাদশ বর্ষীয় বালক সুধনের কাছে বন্ধুর ছদ্মবেশ ধরিয়া উপদেশামৃত বর্ষণ করিতে লাগিল। চাকলাদার গিয়াছেন, সুধন তরুণ বয়স্ক হইলেও তো সে পুরুষ—এবং তাহার উদ্দেশ্য সফলতা লাভের বিঘ্ন স্বরূপ। সুতরাং এই কন্টকটিকেও পথ হইতে সরাইতে হইবে।

কারকুণ বলিল— "তোমার এই মহা বিপদের সময় তোমার পিতার জন্য কি করিতেছ? কি আশ্চর্য্য, তুমি তোমার পিতার উদ্ধারের জন্য কিছু করিতেছ না! ধনপতি সিংহলে যাইয়া রাজরোষে বন্দী হইলে তাহার দ্বাদশ বর্ষীয় পুত্র মাতার নিষেধ না শুনিয়া পিতাকে উদ্ধার করিয়া আনিবার জন্য—সুদূর দক্ষিণ দ্বীপে রওনা হইয়া গিয়াছিল। পিতার আদেশে রাম-লক্ষ্মণ রাজত্বের আশা ছাড়িয়া দিয়া কৌপীন ও জটা পরিয়া বনে গিয়াছিলেন,

—পরশুরাম তাহার পিতার আদেশে তাঁহার মাতা রেনুকার শিরচ্ছেদ করিয়াছিলেন। পিতা মহাগুরু, নিজের জীবন বিসর্জ্জন করিয়াও তোমার তাঁহাকে রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত।"

সুধন অশ্রুপূর্ণ চোখে বলিল, "কি করিতে প্যারি? আপনি উপেদশ দিন্।"

কারকুণ বলিল, "তুমি অগৌণে রঘুপুরে চলিয়া রাজার সঙ্গে দেখা করিয়া তিনি যাহাতে সন্তুষ্ট হন, তাহার চেষ্টা কর। আর দেখ, এক থলিয়া মোহর লইয়া যাও, এবং তাহা রাজাকে নজর দিও।"

কারকুণের উপদেশ অনুসারে সুধন তখনই এক থলিয়া মোহর লইয়া রঘুপুর রাজধানীতে রওনা হইয়া গেল।

রাজা বলিলেন, "তোমার পিতা সাত ঘড়া মোহর আত্মসাৎ করিয়া কোথায় রাখিয়াছেন, তাহা তুমি অবশ্যই জান।"

সুধন বহু মিনতি করিয়া বলিল, "এখবর সম্পূর্ণ মিথ্যা।"

কারকুণের কথামত রাজাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য মোহরের থলিয়াটি নজর স্বরূপ দেওয়া হইয়ছিল; ফল উল্টা হইল. রাজার ধারণা বদ্ধমূল হইল যে চাকলাদার নিশ্চয়ই মোহর পাইয়াছে, সেই মোহর হইতে এই থলিয়া আমাকে দিয়া আমার রাগ দূর করিতে চেষ্টা করিতেছে। তিনি সুধনকে বলিলেন, "এ কয়েকটি মোহরে কি হইবে? তুমি সমস্ত মোহর আমাকে দাও—তাহা হইলে আমি তোমার পিতার বিষয় বিবেচনা করিতে পারি।"

সুধন যতই অস্বীকার করিতে লাগিল ততই রাজার ক্রোধ বাড়িয়া চলিল। অবশেষে তিনি সেই বালককেও বন্দীশালায় শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিতে আদেশ দিয়া বিরক্তির ভাবে দরবারগৃহ ত্যাগ করিলেন।

পিতা-পুত্রকে গৃহ হইতে এইভাবে বিতাড়িত করিয়া কারকুণ—সেই অঞ্চলের বাকী খাজনা খুব জোরে আদায় করিতে লাগিয়া গেল। অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর খাজনা আদায় করাতে রাজা কারকুণের দক্ষতার পরিচয় পাইয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং মানিক রায়ের স্থলে তাহাকেই চাকলাদারের পদে নিযুক্ত করিলেন।

এইভাবে সমস্ত অঞ্চলের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া কারকুণ—কমলার সঙ্গে দেখা করিয়া তাহার নিজের গুণপণার অনেক ব্যাখ্যা করিতে লাগিল এবং চাকলাদারীপদের নিয়োগ পত্রখানি কমলাকে দেখাইয়া বলিল ঃ—

"কমলা, আমি চাকলাদারী পাইয়াছি, এই দেখ হুজুরের আদেশ। এখন তোমার কাছে আমার প্রস্তাব—তুমি আমাকে বিবাহ কর, চাকলাদারী কাজে বহাল থাকিয়া আমি তোমার সেবা করিব, দুজনে পরম সুখে জীবন যাপন করিব। আর যদি সম্মত না হও, তবে আমি তোমার এমন হাল করিব যে, তোমার দুঃখ দেখিয়া গাছের পাতা পর্য্যন্ত ঝরিয়া পড়িবে।"

"আর এক কথা,—যে ঘর-বাড়ীতে তোমরা আছ তাহা রাজার। আমি এখন চাকলাদার—সুতরাং এ বাড়ী ঘর আমার অধিকারে। আশা করি তুমি বিবাহে সম্মত হইবে, তাহা হইলে এই বিশাল প্রাসাদ তোমারই অধিকারে থাকিবে, অন্যথা তোমাদের এখানে থাকা চলিবে না। তোমাকে শীঘ্রই স্থানান্তরে যাওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত কমলা জ্বলিয়া উঠিল এবং কারকুণকে 'পশুর অধম, নর পিশাচ' প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া ভর্ৎসনা করিল, কমলা বলিল—

"আমার বাপের লুন খাইয়া বাঁচিলি পরাণে
তার গলায় দিতে দড়ি না বাধিল প্রাণে।
পরাণের সোদর ভাইয়ে যে সব দুঃখ দিল"

—এই পাপিষ্ঠের মুখ দেখিলে পাপ হয়; আমরা মায়ে ঝিয়ে ভিক্ষা করিয়া খাইব, গাছের তলায় শয়ন করিব—তবু তোর এই ঘৃণ্য বাড়ীতে থাকিব না।" উদ্ধতভাবে কারকুণকে বিদায় করিয়া দিয়া কমলা আঁধি সাঁদি নামক দুই ভাইকে ডাকিয়া পাঠাইল। ইহারা দুইজন এই পরিবারে বহু কালাবধি পাল্কী-বেহারার কাজ করিতেছে।

এই দুই বিশ্বস্ত ভৃত্য কমলা ও তাহার মাতাকে সেই দিনই কমলার মাতুলালয়ে পৌঁছিয়া দিল।

এই সংবাদ পাইয়া কারকুণ তখন সেই মামাকে চিঠি লিখিল—

"আপনার ভাগিনেয়ী কমলা অতি দুশ্চরিত্রা, কোন চণ্ডাল যুবকের সঙ্গে তাহার আসক্তির কথা প্রকাশ হইয়া পড়াতে সে নিজের দেশে না থাকিতে পারিয়া তাহার মাতাকে লইয়া আপনাদের বাড়ীতে গিয়াছে। কিন্তু আপনি জানিয়া রাখুন, যদি এই কুলকলঙ্কিনীকে আপনার বাড়ীতে আশ্রয় দেন, তবে আপনার ধোপা-নাপিত বন্ধ হইবে এবং পুরোহিত আপনার বাড়ীতে পূজা করিবে না; এই বিষয়টির গুরুত্ব আপনি বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারিবেন; ইহা রাজার কর্ণগোচর হইয়াছে এবং তিনি বলিয়াছেন, যে কেহ এই দুষ্ট মেয়েকে আশ্রয় দিবে, সে তাঁহার কোপানলে পড়িবে।"

কমলার মাতুল বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে বিদেশে থাকিতেন কিন্তু পরিবারবর্গ বাড়ীতেই থাকিত—তিনি কমলার বিরুদ্ধে এই পত্র পাইয়া তাঁহার পত্নীকে লিখিলেন ঃ

"ভারাই চাঁড়ালের সঙ্গে ঘরের বাহির হইল।
বিয়া না হইতে কমলা কুল মজাইল।।
এমন কন্যারে তুমি নাহি দিবা স্থান।
ঘরের বাহির কৈরা দিবা করি অপমান।।
এক দণ্ড যেন নাহি থাকে মোর ঘরে।
চুলে ধরি ঘরের বাহির কৈরা দিবা তারে।।
সমাজে না লৈবে মোরে কমলা থাকিলে।
পতিত হইয়া রৈব, মজব জাতি কুলে।।"

মামী এই পত্র পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। "সহোদরা ভগিনী আর তার অবিবাহিত কন্যা ইহাদিগকে কেমন করিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিব?"

"জাতিকুল লৈয়া কন্যা যাবে কার কাছে।
এমন কমলার ভাগ্যে কত দুঃখ আছে।
মায়ে ঝিয়ে কাঁদবে যখন কিবা কইব কথা।
এমন কোমল প্রাণে কেমনে দিব ব্যথা।।"

ভাবিয়া চিন্তিয়া মামী কি করিবেন তাহা সিদ্ধান্ত করিতে পারিলেন না। চিঠিখানি কমলার শয্যার উপরে ফেলিয়া রাখিলেন।

সন্ধ্যা বেলা, কমলা নিজের শয়ন-কক্ষে আসিয়া দিবসের ক্লান্তির পর একটু বিশ্রাম ইচ্ছা করিয়াছিলেন; হঠাৎ বিছানার উপরে চিঠিখানির উপর দৃষ্টি পড়িল ঃ—

"পত্র পড়ি চক্ষের জলে ভাসিছে কমলা।
এত দুঃখ ভাগ্যে মোর বিধি লিখেছিলা।"

বাপ-ভাই কারাগারে বন্দী, শত্রু সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাবা দুটি প্রাণী গৃহত্যাগ করিয়া মাতুলালয়ে আশ্রয় লইয়াছে—কিন্তু ইহার পরেও অদৃষ্টের লাঞ্ছনা কমিল না। কমলা পত্রখানির উপর পুনরায় চক্ষু বুলাইতে লাগিল ঃ—

"পড়িতে পড়িতে কন্যার চক্ষে বহে পানি।
সম্মুখে যে আইসে তার কি কাল-রজনী।
চন্দ্র সূর্য্য ডুবে গেছে আঁধার সংসার।
এক দণ্ড এই ঘরে না থাকিব আর।"

কমলার দুঃখ সহিবার ক্ষমতা অসাধারণ ছিল, কিন্তু সে অপমান সহিতে পারিত না। যেখানে নারী-মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়— সেখানে সে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া লাঞ্ছিত জীবন বহন করিতে চায় না। তাহার অন্তর-দেবতা তাহাকে বুঝাইয়াছিলেন, যেখানে হীনতা ও কলঙ্ক সহিয়া—অপমান ও নির্য্যাতন ভোগ করিয়া শুধু প্রাণ রক্ষার জন্য মানুষ লালায়িত হয়—তখন সে একেবারে অধম হইতে অধম হইয়া পড়ে। সেই ঘৃণ্য জীবনের প্রতি সে বীতাকাঙ্ক্ষ।

"বাপের বেটী হৈয়া থাকি যদি হই সতী।
বিপদে করিবে রক্ষা দুর্গা ভগবতী।।
জলে ডুবি, বিষ খাই, গলে দেই কাতি।
মামার বাড়ী না থাকিব আর এক রাতি।"

যাহারা ভবিষ্যতে পরিবারের কি বিপদ্ হইবে— সেই আশঙ্কায় অন্যায় অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া জোঁকের মত পর পদতল ধরিয়া থাকে, কমলা সে শ্রেণীর লোক ছিল না।

যা করেন বনদুর্গা মনে মনে আছে।
একবার না গেল কন্যা আপনা মায়ের কাছে।।
একবার না গেল কন্যা মামীর সদনে।
একবার না চাইল কন্যা মায়ের মুখপানে।
একবার না ভাবিল কন্যা জাতিকুল মান
একবার না ভাবিল কন্যা পথের আন্ধান*।
একবার না ভাবিল কন্যা কি হবে মোর গতি।
একেলা পথেতে পড়ি কি হবে দুর্গতি।।

*আন্ধান=সন্ধান।

একবার না ভাবিল কন্যা আশ্রয় কেবা দিবে।
সন্ধ্যা কালে তারা ফুটে, সূর্য্য ডুবে ডুবে।।

এই কাল-রজনী সম্মুখে করিয়া—কমলা বনজঙ্গলের পথে রওনা হইল। তাহার সর্ব্বাপেক্ষা কোমল স্থানে—নারীমর্য্যাদায় ঘা পড়িয়াছে। সহিষ্ণুতা নারীচরিত্রের ভূষণ, কিন্তু এই সহিষ্ণুতা সর্ব্বত্র প্রশংসনীয় নহে। এমন সময় জীবনে আসে, যখন সহ্য করার প্রশ্নই উঠে না, তখন মানুষকে সর্ব্বস্ব পণ করিয়া দাঁড়াইতে হয়—তখন খুড়ো, কাকা, বাবার পরামর্শের প্রতীক্ষা করিলে মনুষ্যত্বের গৌরব নষ্ট হইতে পারে, তখন ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিলে নৈতিক বল-বিচ্যুত হইয়া মানুষ একবারে হীন-বীর্য্য ও অধম হইয়া পড়ে। কমলা চূড়ান্ত বিপদ সহ্য করিয়া যে অকুতোভয়তা দেখাইয়াছে—তাহা তাহার নারী-প্রকৃতিকে দেবী-মহিমা-মণ্ডিত করিয়াছে—তাহার তেজ, সাহস ও পণ প্রকৃতই বীরাঙ্গনার মত। এ দেশে নারী ও পুরুষ সেই তেজস্বিতা ও সাহস হারাইয়াছে—তজ্জন্য আমাদের এত দুর্গতি। কমলার চরিত্রে এমন উপাদান আছে, যাহা হইতে আমাদের ভণ্ড ভীরু সাধুরা কিছু শিক্ষালাভ করিতে পারেন, মর্য্যাদা-হীন জীবন একবারে রিক্ত। একসময় জ্ঞানীর ধীর পাদক্ষেপ ও সতর্কতা প্রশংসনীয় কিন্তু অন্য সময়ে তাহা ভীরুতা ও জাতীয় অধোগতির লক্ষণ।

এই সন্ধ্যাকালে কমলা "বনদুর্গা"কে স্মরণ করিয়া পথে চলিতে লাগিল ঃ—

"আঁখি জলে ভরে, কন্যা নাহি দেখে পথ।
বারে বারে চক্ষু মুছে, নাহি চলে রথ।।"

ক্রমশঃ নির্জ্জন রাস্তায় আঁধারের ঘোরে কমলা এক বিস্তৃত হাওরের* ধারে আসিয়া পড়িল। কখনও পথ পর্য্যটনের অভ্যাস নাই, আঁধার পথে একবার উঠিতেছে, একবার বসিতেছে—তাহার দেহে আর শক্তি নাই। নিতান্ত অসহায় অবস্থায় তাহার অন্তর কাঁদিয়া উঠিল। একান্ত নির্ভরপরায়ণার সেই অন্তরের ক্রন্দন বুঝি বিধাতার কর্ণে পৌঁছিল।

সেই পথে আর একটি মাত্র পথচারী, বৃদ্ধ একটি মহিষপালক। কমলা তাহাকে দেখিয়া যেন প্রাণ পাইল। অগ্রসর হইয়া—তাহাকে বলিল, "আমি নিরাশ্রয়—আমার কেহ নাই, তুমি আমার ধর্ম্মের বাপ, এই রাত্রিটির জন্য আমাকে আশ্রয় দাও। বাবা, আমি বড় বিপদে

* হাওর=নল খাগড়াপূর্ণ বিলা জায়গা।।

পড়িয়াছি, তোমার বাড়ীর গোয়াল ঘরের একটি কোণে আমি আঁচল পাতিয়া শুইয়া থাকিব, আমি ভাত-জল চাই না, গোয়াল ঘরের এক কোণে আজ রাতে থাকিবার একটু জায়গা পাইলেই কৃতার্থ হইব।"

মহিষাল তাহার চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না,—এমন রূপ এমন গা ভরা গয়না—এ তো মানুষের মূর্ত্তি নহে, এ যে সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মীর মূর্ত্তি। তাহার একান্ত বিশ্বাস হইল লক্ষ্মী স্বর্গ হইতে তাহাকে ছলনা করিতে আসিয়াছেন; সে করযোড়ে বলিল, "যদি দয়া করিয়া এই বুড়ো ছেলেকে দেখা দিয়েছ, তবে মা ছেড়ে যেওনা। আমার ঘরে আইস, আমাকে বর দেও, যেন আমার মহিষ ও গুরু দ্বিগুণ দুধ দেয়, যেন আমার ক্ষেতে সোনার ফসল হয়, আইস আমার ভাঙ্গা ঘরে মা লক্ষ্মী, আমার ভাঙ্গা ঘর সোণার ঘর হইয়া যাইবে।"

কমলা মহিষালের বাড়ীতে আসিল, প্রতি দিনে তিন বার মহিষালকে রাঁধিয়া খাওয়ায়; গামছা-বাঁধা দৈ তৈরী করে, গোয়াল ঘরে ধোঁয়া দেয়, ঘর দোর ঝাঁট দিয়া ঝক্ঝকে তক্তকে করিয়া রাখে, মহিষালের আনন্দের সীমা নাই। তাহার ঘরে সত্যই লক্ষ্মী আসিয়াছেন ভাবিয়া দিনরাত সে পূজার উৎসবে মাতিয়া আছে।

সন্ধ্যাকালে মহিষ চরাইয়া মহিষাল বাড়ী আসিয়া দেখে, খড় বিছাইয়া কমলা তাহার জন্য বিছানা করিয়া রাখিয়াছে, গরম ভাত কলার পাতে পরিবেশন করিয়াছে, তাহা হইতে ধোঁয়া উঠিতেছে। বিন্নি খানের খই, খেজুবের গুড় ও গামছা বাঁধা দৈ খাইয়া বুড়োর কি স্ফূর্ত্তি!' সে যেন মা লক্ষ্মীকে পাইয়া আবার ছেলেমানুষ হইয়া গিয়াছে।

তিন দিন কমলা মহিষালের কুটিরে বাস করিল।

একদিন এক শিকারী সেই মহিষালের কুটিরে উপস্থিত হইলেন। তিনি তরুণ বয়স্ক, অতি সুদর্শন,—শরীরের বর্ণ কাঁচা সোণার মত এবং সেই অঙ্গে স্বর্ণময় পোষাক ঝলমল করিতেছিল। তাঁহাকে কোন রাজার ছেলে বলিয়া মনে হইল।

বৃদ্ধ মহিষালকে এই কুমার বলিলেন ঃ—"আমি কুড়া শিকার করিতে জঙ্গলে গিয়াছিলাম। বড়ই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি, আমাকে একটু জল দিয়া প্রাণ বাঁচাও, তৃষ্ণায় কথা পর্য্যন্ত বলিতে পারিতেছি না।"

কমলা গাছের পাতার পাত্রে জল দিয়া গেল। সমস্ত জলটা এক নিশ্বাসে পান করিয়া অতিথি বলিলেন ঃ

"টুপায় ভরিয়া জল কমলা আনিল। জল না খাইয়া কুমার শীতল হইল।।" (পৃষ্ঠা ৭৮)

"এই যিনি আমাকে জল দিয়া গেলেন ইনি তোমার কে? ইহাকে দেখিয়া কোন রাজকুমারী বলিয়া মনে হইতেছে, ইঁহার পিতামাতা কে? তুমি ইঁহাকে কিরূপে পাইলে? ইনি বিবাহিতা বা কুমারী? অথবা কোন জন্মের তপস্যার ফলে দেবতার বরে তুমিই ইঁহাকে কন্যারূপে পাইয়াছ?"

মহিষাল বলিল—"আমি ইঁহার পরিচয় জানি না। আমি ইঁহাকে স্বয়ং লক্ষ্মী বলিয়াই মনে করি; হয়ত কোন দেবতার প্রসাদে ইনি আমাকে কৃপা করিয়াছেন। যে কয়েকদিন যাবৎ ইনি আমার কুটিরে পায়ের ধূলা দিয়াছেন, তদবধি আমার ভাগ্য ফিরিয়াছে, বহুদিনের বন্ধ্যা মহিষ গাভীন হইয়াছে। আমার গোয়ালে দুধ ও দৈ চারগুণ বাড়িয়াছে, আমার এই ঘরে যেন আনন্দের ঢেউ বহিয়া যাইতেছে। শেষের কয়টা দিন বোধ হয় আমার সুখেই কাটিবে।"

কুমার বলিলেন, "তুমি ইহাকে আমায় দাও, আমি ধামা ভরিয়া তোমাকে ধন মণি-মুক্তা দিব, বাবাকে বলিয়া তোমাকে চৌদ্দ "পুরা" জমি দিব; তোমার কোন অভাবই থাকিবে না।"

মহিষাল এই কথা শুনিয়া অতি আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, "আমি ধন-দৌলত ও চৌদ্দ পুরা জমি চাই না। আম আমার মায়ের প্রসাদে সবই পাইয়াছি। এই কয়টি দিনে আমি এত সুখী হইয়াছি যে, বাড়ীতে দেবতা প্রতিষ্ঠা করিলে কেউ এত সুখী হয় না। ইঁহাকে ছাড়িয়া দিলে আমার জীবন দুঃসহ হইবে।"

সারাদিন বাদানুবাদ চলিল, অবশেষে মহিষাল রাজী হইয়া বলিল, "আমি বিনিময়ে কিছু চাই না—মা যেন আমায় আশীর্ব্বাদ করেন এবং অন্তিম কালে ইঁহার পাদ-পদ্মে যেন মাথা রাখিয়া মরিতে পারি।" বলিতে বলিতে বৃদ্ধ কাঁদিয়া ফেলে,—অবিরত বর্ষণশীল দুটি চোখের জলে তাহার উঠানের উলুখড় ভিজিয়া গেল।

কন্যাকে লইয়া কুমার নিজের দেশে চলিয়া গেলেন।

রাজবাড়ীতে কমলা আসিয়া তথাকার ঐশ্বর্য্য ও বৈভব দেখিয়া চমৎকৃত হইল কিন্তু দিবা রাত্রি মাতার বিরহে সে কাঁদিতে থাকিত। দুর্ভাগা মাতাকে না কহিয়া না বলিয়া সন্ধ্যাকালে ছাড়িয়া আসিয়াছে,—ভয় হইল, তাহার পলায়ন—মিথ্যা কলঙ্ক কথার সঙ্গে জড়াইয়া লোকে কত রকম ব্যাখ্যাই যেন করিতেছে। মাতার লাঞ্ছনা ও অপমানের কথা আশঙ্কা করিয়া কমলা মরমে মরিয়া আছে। কুমার যখনই কমলার কক্ষে প্রবেশ করেন, তখনই দেখেন পালঙ্কের উপর বসিয়া গালে হাত দিয়া সে কাঁদিতেছে। কুমার আদর

করিয়া তাহাকে কত কথাই বলিতে থাকেন। "তুমি কে পরিচয় দাও, আমি যে তোমা-ছাড়া অন্য সমস্ত চিন্তা ছাড়িয়াছি। আমার এত সখের বাগানে কোন ফুল ফুটিলে, কোন লতা ও গাছের কুঁড়ি হইলে নিত্য উষাকালে আমি তাহা দেখিতাম—কতদিন হইল আমার সে বাগানের কথা একটিবারও মনে হয় না। শিকারে যাওয়া আমার সর্ব্বপ্রধান আমোদের বিষয় ছিল কিন্তু সেই যে আসিয়াছি, তদবধি শিকারে যাওয়া ছাড়িয়াছি। বন্ধুদের সঙ্গ এখন আর ভাল লাগে না; তোমাকে আমি আমার গলার হার করিয়া রাখিব, মণি-মুক্তা জ্ঞানে যত্ন করিব, তোমার পরিচয় দাও, আমি তোমাকে বিবাহ করিয়া সুখী হই। কি দুঃখে তোমার চক্ষে দিন রাত অশ্রু ঝরিয়া পড়ে, তোমার দুঃখ দেখিলে যে আমার প্রাণ বিদীর্ণ হয়, তুমি সে কথা আমায় বল, আমি প্রাণ দিয়া তোমার দুঃখ মোচন করিতে চেষ্টা করি।"

সহৃদয় তরুণ কুমার এইরূপ শত প্রশ্ন লইয়া বারংবার কমলার নিকট আসেন, কমলা কোন কথা বলে না, তাহার অশ্রুই সে সমস্ত প্রশ্নের একমাত্র উত্তর।

একদিন কমলার মুখ একটু ফুটিল, সে বলিল, "কুমার ব্যস্ত হইবেন না, সময়-সুযোগ হইলে আমি আপনা হইতে পরিচয় দিব, কিন্তু এখন সে সময় হয় নাই। আপনি মহিষালের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, আশা করি তাহা আপনার মনে আছে। আপনি জোর করিয়া আমার পরিচয় লইতে চেষ্টা করিবেন না, আমার প্রতি যেন বল প্রয়োগ না হয়।"

কুমার প্রাতে ঘুরিয়া গিয়া মধ্যাহ্নে পুনরায় অনুনয় বিনয় করিয়া সেই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। আবার সন্ধ্যায় আসিয়া সেই ম্রিয়মানা শোকার্ত্তা কুমারীর মনের দুঃখ জানিতে চাহেন, কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া বিমর্ষ হইয়া ফিরিয়া যান।

ভ্রমর উষাকালে একবার কুঁড়ির কানে কানে প্রেমের কথা গুঞ্জন করে, কিন্তু কুঁড়ি ফোটে না, পুনরায় ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে এবং সেইরূপ চেষ্টা করে—কিন্তু কুঁড়ি বাতাসে মাথা হেলাইয়া—তাহাকে বিদায় করিয়া দেয়—সে ফোটে না। কুমারের সেই অবস্থা।

"এইরূপে কুমার যে প্রতিদিন আসে।
বিফল হইয়া ফিরে আপনার বাসে।।
অন্তর গোপন, কলি নাহি ফুটে মুখ।
ভৃঙ্গ যেমন উড়ি যায় পাইয়া মন দুঃখ।।"*

* ভৃঙ্গ যেমন.....দুঃখ = এত অনুনয়ন করিয়াও কলিটির মুখের কথা না পাইয়া ভ্রমর যেরূপ ফিরিয়া যায়।

"এইরূপ করিয়া যে তিন মাস গেল।
একদিন রাজপুরে বাদ্য যে বাজিল।।"

কমলা জিজ্ঞাসা করিল ঃ—

কিসের বাদ্য বাজে আজি রাজপুরীর মাঝে।

উত্তরে শুনিল ঃ—

"নরবলি দিয়া রাজা রক্ষাকালী পূজে।।"
কেবা নর কিসের পূজা—"
পরিচয় কথা কন্যা শুনিল সকলি
বাপ ভাই বলি হবে শুনে চন্দ্র-মুখী।
কমলার কান্দনে কাঁদে বনের পশু পাখী।

এই সময় প্রদীপ কুমার সোৎসাহে কমলার কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"কমলা, শুনেছ, আজ পিতা নরবলি দিয়া রক্ষাকালী পূজা করিবেন। চল, আমরা দুজনে যাইয়া নরবলি দেখিয়া আসিব।"

কমলা বিষণ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"বলির নর কোথা হইতে পাওয়া গিয়াছে, কত মূল্যে ক্রয় করা হইয়াছে।" কুমার সমস্ত বিবরণ বলিলেন এবং পরিচয় দিলেন। বাপভাই-এর এই দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া কমলার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। প্রবল শক্তিতে পতনোন্মুখ অশ্রু নিরোধ করিয়া বলিতে লাগিল ঃ—একটি কি দুইটি বিন্দু অশ্রু গণ্ডে গড়াইয়া পড়িতে উদ্যত হইয়াছিল—কুমারী তাহা দেখিবা না দেখি করিয়া মুছিয়া ফেলিল—প্রদীপ কুমার তাহা দেখিতে পাইলেন না।

স্থিরভাবে কমলা বলিল ঃ—

"কুমার, আজ আমি নিজের পরিচয় দিব কিন্তু এখানে নহে; রাজার ধর্ম্মসভার কাছে আমার অভিযোগ বলিব, আশা করি তাঁহারা আমার কথা শুনিতে রাজি হইবেন।"

"কিন্তু তৎপূর্ব্বে তুমি একটি কাজ করিবে। হুলিয়া গ্রামে মানিক চাকলাদারের কারকুণকে, এবং সেই গ্রামের আন্দি সান্দি নামক দুই জন পাল্কীবাহককে তুমি ডাকাইয়া আন, এই দু'তিন জন ছাড়া আরও কয়েকজন লোককে এখানে আনার প্রয়োজন; হুলিয়া

গ্রামে 'চিকন' নামা আধবয়সী এক গোয়ালিনী আছে, তাহাকেও সাক্ষী স্বরূপ রাজসভায় অবিলম্বে উপস্থিত করা হউক।"

নিজের সম্পর্ক ও পরিচয় সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত না দিয়া কমলা তাঁহার মাতুল ও মাতুলানীকে উপস্থিত করিতে অনুরোধ করিল। ইহা ছাড়া

"মহিষাল বন্ধুকে তুমি আন শীঘ্র করি।
আমাকে পাইয়া ছিলে তুমি যার বাড়ী।।"

এই সকল লোক উপস্থিত হইলে ধর্ম্মসভায় আমি আমার পরিচয় দিব।

রাজসভা সরগরম; এতগুলি সাক্ষী মান্য করিয়া প্রদীপ-কুমার কর্ত্তৃক রাজ-অন্তঃপুরে আনিতা অনিন্দ্য সুন্দরী তরুণী নিজের পরিচয় ও অভিযোগ শুনাইবে। এদিকে রাজপুরীতে রক্ষাকালীর পূজার উপলক্ষ্যে নর বলির বাজনা বাজিতেছে। নানারূপ কৌতূহলে রঘুপরের লোকদের চক্ষের ঘুম উড়িয়া গিয়াছে।

রাজসভার এক কোণে দাঁড়াইয়া কমলা তাহার দুঃখের কথা নিবেদন করিতেছে, তাহার আর্ত্ত কন্ঠের ধীর ও করুণ সুরে ধর্ম্ম-সভা নিস্তব্ধ হইয়া গেল। "অভাগিনীর দুঃখের কথা আপনারা শুনুন" এই বলিয়া কমলা চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-উপগ্রহদিগকে সাক্ষী মানিয়া, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গকে সাক্ষী করিয়া বলিল, "আমার সাক্ষী ইহারা—ইহারাই সকল জানে", অদূরে রক্ষাকালীর মন্দির,—জোড় হস্তে মন্দিরকে প্রণাম করিয়া বলিল, "মা আমার প্রতি গৃহে প্রতি ঘটে আছেন—সেই জগন্মাতা আমার সাক্ষী।" কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবতাকে কমলা সাক্ষী মান্য করিল। যে অগ্নি মানুষের সর্ব্বকার্য্যের সহায়— যে জল মানুষকে জীবিত রাখিয়াছে—সেই সর্ব্বত্র পূজিত জল ও অগ্নিকে কমলা সাক্ষী মান্য করিয়া বনের অধিষ্ঠাত্রী বন-দেবতাকে প্রণাম করিল।

দেবতাদিগকে ও আকাশ ও পৃথিবীর সকল প্রাণীকে কমলা ধর্ম্ম-সভায় সাক্ষী মান্য করিয়া পিতা ও মাতাকে সাক্ষী করিল এবং প্রাণের ভাই সুবলকে সাক্ষী মান্য করিবার সময় চোখের জলে ভাসিতে লাগিল।

পরিশেষে সন্ধ্যা-তারাকে সাক্ষী করিয়া বলিল,—"তুমি জগতের সকল বস্তুর দিকে চাহিয়া আছ, আমার সমস্ত কাজ তুমি নির্ব্বাক দৃষ্টিতে দেখিতেছ, হে মৌন দ্রষ্টা. তুমি আমার সাক্ষী। আমার চোখের জল আমি রোধ করিতেছি না, ইহাকেই আমি সাক্ষী মান্য করিতেছি, আমার অন্তরের বেদনা ও অকপটতার ইহা অপেক্ষা বড় সাক্ষী নাই।

"সন্ধ্যাকালের তারা সাক্ষী,
সাক্ষী চোখের পানি।।"

তারপর স্বীয় মাতুলানীকে সাক্ষী করিয়া মাতুল তাহার নিকট যে পত্রখানি লিখিয়াছিল, তাহাই ধর্ম্ম-সভার প্রমাণ স্বরূপ দাখিল করিল, চিকন গোয়ালিনী "ভাঙ্গা দন্ত যার" সম্মুখে উপস্থিত ছিল,—কমলা তাহাকে দেখাইয়া দিল, কারকুণকে দেখাইয়া দিল এবং গোয়ালা জাতির বৃদ্ধ সাধুপুরুষ মহিষালকে শ্রদ্ধার সহিত দেখাইয়া বলিল—

'গলুর* গোষ্ঠি সাক্ষী আমার মহিষাল ছিল।
সন্ধ্যাকালে বাপের মত আমায় আশ্রয় দিল।।"

সর্ব্বশেষে প্রদীপ কুমারের উল্লেখ করিয়া কমলা বলিল ঃ—

"সর্ব্বশেষ সাক্ষী আমার রাজার কুমার।
যাহার কারণে আমি পাইলাম নিস্তার।।"

"ইনি শুধু আমার প্রাণ দাতা নহেন, ইনি আমার প্রাণের দেবতা।"

ইহার পরে কমলা তাহার জীবন-কাহিনী বলিতে লাগিল। তাহার সুর কখনও স্নেহ-মধুর, কখনও পূর্ব্ব স্মৃতিতে গৌরবে ভরপূর, কখনও বিপদের কথা বলিতে যাইয়া গদগদ কণ্ঠ ও আতঙ্কিত, কখনও পিতৃগৃহে দেব পূজার উৎসব বর্ণনায় ভক্তি-কৌতূহল-মিশ্র স্নিগ্ধ কণ্ঠ। কখনও বা বঙ্গের পল্লীর শান্তি ও পার্ব্বত্য নদীর বর্ণনায় তাহা উদ্দীপনাময়; পরিসমাপ্তির সময়—তাহার নিজের অশ্রু অপেক্ষা শ্রোতৃবর্গের অশ্রুর বন্যায় ধর্ম্ম-সভা একবারে ভাসিয়া গেল। এই দুঃখের কাহিনী শুনিয়া ইহার সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার প্রয়োজন হইল না, কমলা যে সকল প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছিল তাহা সকলে হৃদয় দিয়া অনুভব করিল। তখন কারকুণের বিরুদ্ধে সভাসদগণের ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল ঃ—

কমলা স্বীয় শৈশবের ইতিহাস এইরূপে কহিল ঃ

"জ্যৈষ্ঠ মাস, ষষ্ঠী তিথি, শুক্রবার শেষ রাত্রে যখন আকাশ মেঘমণ্ডলে আবৃত ছিল এবং ঘোর অন্ধকার সমস্ত দিক্ দেশ ব্যাপিয়া রাজত্ব করিতেছিল, সেই সময় এই

* গলুর গোষ্ঠি = গয়লা সমাজের।

অভাগিণীর জন্ম। মাতা আমার নাম রাখিলেন কমলা। আমার বয়স যখন চা'র, তখন আমার এক সহোদরের জন্ম হইল।

"পূর্ণিমার চাঁদ যেমন দেখি মায়ের কোলে
সর্ব্ব দুঃখ দূর হ'ল তার জন্ম কালে।
কোলে করি কাঁখে করি, করি দোলা-খেলা।
এইরূপ যায় নিত্য শৈশবের বেলা।।

"এই ভাবে লীলা-খেলা করিয়া আমার সুখের শৈশব অতীত হইল। কিশোর বয়সে আমাকে মা সর্ব্বদা সতর্ক করিতেন,—একা বাহিরে যাইতে নিষেধ করিতেন। আমার গায়ের গৌরবর্ণ আরও উজ্জ্বল হইল এবং নানা অলঙ্কার আমার অঙ্গের শ্রীবৃদ্ধি করিল। আমি প্রত্যহ দীঘির সানবাঁধা ঘাটে সহচরীদের সঙ্গে স্নান করিতে যাইতাম, তাহারা চাঁপার কলি ও বকুল ফুল দিয়া আমার দীঘল চুল বাঁধিয়া দিত, শরীরে গন্ধ তৈল মাখাইত, এবং আভের চিরুণী দিয়া চুল আঁচড়াইয়া দিত।

"একদিন পৌষমাসের প্রভাত। বার মাসের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ পৌষমাস,—দেখিতে দেখিতে সূর্য্যোদয় হয়, আমি প্রত্যুষে উঠিয়া বনদুর্গার পূজা শেষ করিলাম এবং স্নানের জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমার সখীরা আমার দেহে ও চুলে গন্ধতৈল মাখাইয়া দিল। তাহার পূর্ব্বে সহচরীরা আমার হীরামতির হার গলা হইতে খুলিয়া রাখিল। আমরা আনন্দে মাতিয়া দীঘির ঘাটে গেলাম, আমার কাঁখে সোনার কলসী—সখীদের কেহ নৃত্য করিতে লাগিল, কেহ গান গাইল; এই ভাবে আমরা তরল পাদক্ষেপে হাসি ঠাট্টা ও রং তামাসা করিতে করিতে ঘাটে যাইয়া পৌঁছিলাম। সেখানে যাইতে মাটিতে পা ঠেকিয়া আমি বাধা পাইলাম, আমি কি জানি সে পথে আমাকে দংশন করিতে বিষধর প্রতীক্ষা করিতেছে! সে দিনের সাক্ষী এই কারকুণ, জলের ঘাটে ইহাকে দেখিয়াছিলাম-—তখন কিছুই বুঝিতে পারি নাই।

পৌষ গেল, মাঘ আসিল—একদিন ঐ যে চিকন গোয়ালিনী—আমাদের বাড়ীতে দুধ দৈ জোগাইত, সে আসিল এবং আমাকে একখানি পত্র দিল,— সেই পত্র আমার কাছেই আছে, আমি তাহা এখানে দাখিল করিতেছি।

"ধর্ম্ম অবতার রাজা ধর্ম্মে তব মতি।
আমার দুঃখের কথা কর অবগতি।।"

চিকন গোয়ালিনীর দাঁত ভাঙ্গিল কেন, আপনারা উহাকে জিজ্ঞাসা করুন।

আমি যে পত্র দাখিল করিলাম, তাহাতেই রাজসভা আমার বিচার করিবেন, আমার বলিবার কহিবার কিছুই নাই।

"না বলিব না কহিব—পত্রে লেখা আছে।
এই পত্র রাখিলাম আমি সভার কাছে।।"

ফাল্গুন মাসে বসন্ত ঋতু দেখা দিল ঃ—

"ভ্রমরা কোকিল কুঞ্জে গুঞ্জরি বেড়ায়
সোণার খঞ্জন আসি আঙ্গিনা জুড়ায়।"

এই সুখ-বসন্তকালে বাবা মা আমার বিবাহের কথা চুপে চুপে বলিতেন, আমি আড়াল হইতে কাণ পাতিয়া শুনিতাম। মহারাজ, আমার কপালে যে এত দুঃখ ছিল, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই।

এই সময় মহারাজের দূত আসিয়া আমার পিতাকে হুজুরের দরবারে তলব করিয়া লইয়া গেল।

হাতী-ঘোড়া লোক-লস্কর লইয়া বাবা পুরী অন্ধকার করিয়া চলিয়া গেলেন।

"আইল চৈত্রের মাস অকাল দুর্গা পূজা।
নানা বেশ করে লোক নানা রঙ্গের সাজা।।
ঢাক বাজে, ঢোল বাজে পূজার আঙ্গিনায়।
ঝাঁক ঝাঁক শঙ্খ বাজে নটী গীত গায়।।
মণ্ডপে মায়ের মূর্ত্তি দেখিতে সুন্দর।
চান্দোয়া টাঙ্গাইয়া করে ঘর মনোহর।।
পাড়াপড়শি সবাই সাজে নূতন বস্ত্র পরি।
ঘরের কোণায় লুকাইয়া আমি কেঁদে মরি।
মায়ে ঝিয়ে কাঁদি ঘরে গলা ধরাধরি।
বিদেশী হইল পিতা অন্ধকার পুরী।।
এমন সময় দেখ কি কাম হইল।
রাজার বাড়ী হৈতে পত্র যে আসিল।।
সেই পত্র সাক্ষী করি ধর্ম্ম সভার আগে।

আমার বাপ হইল বন্দী কোন অপরাধে।।
বাড়ীর কারকুণ ভাইরে বুঝাইয়া কয়।
বাপেরে আনিতে যাইতে উচিত তোমার হয়।।
সরল অবুঝ ভাই কিছুই না জানে।
বিদেশে চলিল ভাই পিতার সন্ধানে।।
মায়ে ঝিয়ে কাঁদি মোরা ধুলায় পড়িয়া।
কার পূজা কেবা করে না পাই ভাবিয়া।।
গলায় কাপড় বাঁধি পড়িয়া ধূলায়।।
বাপ ভাইয়ের বর মাগি ঝিয়ে আর মায়।।"

তারপরে জ্যৈষ্ঠ মাস—তখন আমের কুঁড়িতে ডাল ভর্ত্তি—

"পুষ্প ফোটে—পুষ্প ডালে ভ্রমর গুঞ্জরি
আর বার আসে পত্র মায়ের গোচর।
পিতা পুত্র দুই জন বন্দী পরবাসে।
মাতার চোখের জলে বসুমতী ভাসে।
মায় ঝিয়ে ধন্বা দিলাম চণ্ডীর দুয়ারে।
তার পরের কথা কহি সভার গোচারে।"

জ্যৈষ্ঠ মাসে আমাদের বাগানে কত ফল পাকিল, কে তা' দেখে?

"রাত্রি দিবা না শুকায় নয়নের জল"
"মায়ে করে ষষ্ঠী পূজা পুতের লাগিয়া
প্রাণের ভাই বিদেশে আমার দুঃখে কাঁদে হিয়া।।"

আমি এক হাতে নিজের চোখের জল মুছিতাম, অপর হাত দিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিয়া সান্ত্বনা দিতে দিতে ঘরে ফিরাইয়া আনিতাম।

এই দুঃসময় দুষ্ট কারকুণ "আমার বাপ ভাই বন্দী" সোল্লাসে এই খবর দিয়া নিজে যে চাকলাদারী পদ পাইয়াছে তাহা আমাদের বাড়ীতেআসিয়া শুনাইল। সে ভুলে তাহার নিয়োগ-পত্রখানি ফেলিয়া আসিয়াছিল, সেই দলিল আমি এখানে উপস্থিত করিতেছি।

গৃহখানি হইতে বিতাড়িত হইলাম।,সেই সন্ধ্যাকালে একটি কানাকড়ি না লইয়া মা ও আমি আঁদি সাঁদি এই দুই পাল্কী-বাহকের সাহায্যে মামাবাড়ীতে আসিলাম।

তখন আষাঢ় মাস—নদী জলে ভরা, আমরা কাঁদিতে কাঁদিতে আশা করিয়া থাকি, একদিন না একদিন এই নদী বাহিয়া আমাদের ডিঙ্গা বাপ ভাইকে লইয়া আসিবে, বৃথা আশা। ইতিমধ্যে মাতুলের পত্র আসিল।

এই পত্রের কথা মাতা কিছুই জানেন না, আমি পত্রখানি এইখানে দাখিল করিতেছি।

দুঃখের কপালে দুঃখ লিখিল বিধাতা।
কাকে বা কহিব আমি এই দুখের কথা।।
আগুনের উপরে যেন জ্বলিল আগুনি
এই কথা নাহি জানে অভাগী জননী।।
সন্ধ্যা গুঞ্জরিয়া যায় না দেখি উপায়।
একেলা হাওরে পড়ি করি হায় হায়।।
মামার বাড়ীর অন্ন না খাইব আমি।
গলায় কলসী বাঁধি তেজিব পরাণী।।
সাপে না খাইল মোরে, বাঘে নাহি খায়।
কোথায় যেয়ে লুকাই মুখ না দেখি উপায়।।
দেবেরে ডাকিয়া কই আশ্রয় দিতে মোরে।
কেবা আশ্রয় দিবে মোরে এই অন্ধকারে?
চক্ষুর জলেতে মোর বুক ভাসি যায়।
অঞ্চল ধরিয়া মুছি পানি না ফুরায়।

দুই চক্ষের জলে পথ দেখিতে পাই না।

সাত জন্মের সুহৃৎ মোর মহিষাল ছিল
গোয়ালে যাইবার কালে পথে দেখা হৈল।।
জন্মের সুহৃৎ মোর বাপের সমান।
তিন দিন দিল মোরে গোয়ালেতে স্থান।।

মায়া মমতায় সে যে বাপের হৈতে বাড়া।
এইখানে পাইলাম, সুখের আশ্রা।।*

এইখানে সেই মহিষাল সাক্ষীকে আপনারা জিজ্ঞাসা করুন।

শ্রাবণ মাসের ঘন-বর্ষণে ও গর্জ্জনে কুড়া পাখী বিলের ধারে ধারে উড়িয়া আসিয়া বসে। মেঘের সুরে সুর মিশাইয়া তাহারা গর্জ্জন করে, শিকারীরা এই বিল-অঞ্চলে প্রায়ই আনাগোণা করে।

একদিন রাজকুমার শাওনিয়া মেঘ মাথায় করিয়া মেঘ-নির্মুক্ত রৌদ্রে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া মহিষালের কুটিরে আসিলেন; তাঁহার রূপ দেখিয়া আমার মন জুড়াইয়া গেল। কুমার আমার পরিচয় চাহিলেন, আমি বলিলাম, "সময় হইলে আপনি আমার পরিচয় পাইবেন—এখন নহে।" কুমার আমার দেওয়া জল অঞ্জলী ভরিয়া খাইয়া তৃপ্ত হইলেন। এত দুঃখের মধ্যেও কুমারকে দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। আমি তাঁহার সুন্দর ময়ূরপঙ্খী নৌকায় রাজবাড়ীর অভিমুখে রওনা হইলাম। সোণার পানসী ক্রীড়াশীল বাতাসে পাল খাটাইয়া দ্রুত বেগে চলিল। আমার মনের ঠাকুরের সঙ্গে আমি আনন্দে আসিলাম। কিন্তু তাঁহাকে আমার মনের ভাব জানিতে দেই নাই।

এখানে আসিয়া আমি রাণীর সেবা কার্য্যে লাগিয়া গেলাম; আমার প্রাণের যত দুঃখ গোপন করিলাম—মায়ের জন্য যত ব্যথা তাহা গোপন করিলাম, পিতা ও ভাইয়ের জন্য অহর্নিশ প্রাণ কাঁদিয়া উঠে—এই দুঃখ কাহাকে বলিব? তথাপি আমার বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া রাণী বুঝিতে পারিতেন, আমি কোন গুরুতর বেদনা বুকে বহন করিতেছি। রাজকুমারের জন্য তখন আবার নূতন আশা-নিরাশা আমাকে বিচলিত করিতে লাগিল—

"মনের আগুন মোর মনে জ্বলে নিতে।
আর কত দুঃখ মোর পরাণে সহিবে?"

ইহার মধ্যে একদিন দেখিলাম, নগরের মধ্যস্থলে বহু নরনারী একত্র হইয়া উৎসব করিতেছে—তাহাদের সকলেই নববস্ত্র পরিহিত এবং আনন্দে উৎফুল্ল, তাহাদের কেহ গাহিতেছে, কেহ নাচিতেছে, তাহাদের মিষ্ট কলরব বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে।

আশ্রা = আশ্রয়।

দাসদাসীদের যার যে বেশভূষা ছিল, তাহা পরিয়া কি উৎসব করিতেছে! এই বাদ্যগীতি ও ঢোলের বাজনা কিসের জন্য জিজ্ঞাসা করিলাম। শুনিলাম ঃ—

"শ্রাবণ সংক্রান্তে রাজা—মনসারে পূজে"

আমার দুচক্ষু ছাপিয়া জল উথলিয়া উঠিল, বুকে যেন শক্তিশেল বিঁধিল। এই শ্রাবণ সংক্রান্তিতে আমাদের বাটিতে কি ঘটা করিয়াই না দেবীর পূজা হইত।

"এই বাপের বাড়ীর মণ্ডপ শূন্য কেবা পূজা করে?
অভাগিনী মা আমার কেঁদে কেঁদে ফিরে।
একদণ্ড না দেখিলে হত পাগলিনী।
সন্ধ্যাবেলা ছাড়ি আইলাম আমি অভাগিনী।
ভাদ্র মাসে তালের পিঠা খাইতে মিষ্ট লাগে।
দরদী মায়ের মুখ সদা মনে জাগে।।"

দিনের বেলা আমার চক্ষু অশ্রু বিসর্জ্জন করিত। আর রাত্রে সকলই আমার চক্ষে অন্ধকার বোধ হইত। ভাদ্রমাসের চাঁদনি এমন উজ্জ্বল—সমুদ্রের তলদেশ পর্য্যন্ত সেই চাঁদনীতে দেখা যায় ঃ—

"ভাদ্রমাসের চান্নি দেখায় সমুদ্রের তলা।
সেও চাঁদনী আঁধার দেখি কাঁদিত কমলা।।"

ভাদ্র মাস গেল, আশ্বিন মাসে দেবীপূজার ধুম পড়িল। চারদিকে আনন্দের হিল্লোল, জলে স্থলে আনন্দের ছবি ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। আমার বাবার বৃহৎ মণ্ডপে দেবী প্রতিমা নাই,—ভাবিতে আমার প্রাণ হু হু করিয়া কাঁদিতে লাগিল। দশমীতে নৌকা বাচ হওয়ার পরে দেবী প্রতিমা নদীর জলে বিসর্জ্জিত হইত। যাহা দেখি তাহাতেই আমাদের বাড়ীর উৎসবের কথা মনে হইলে প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

আশ্বিন গেল, কার্ত্তিক মাসে ঘরে ঘরে কার্ত্তিক-পূজা। পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা সারারাত্রি জাগিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিতে লাগিল—আমি আমার কক্ষের জানালা খুলিয়া সেই উৎসব দেখিতাম ও চোখের জলে ভাসিতাম। অগ্রহায়ণে লক্ষ্মীপূজা—গৃহস্থ ধান মাথায় করিয়া সাঁজের বেলায় বাড়ী ফিরিত,— মেয়েরা শঙ্খধ্বনি করিয়া হুলুধ্বনি সহকারে প্রদীপ জ্বালাইয়া সেই নূতন ধান্য বরণ করিয়া লইত। ঘরে ঘরে দীপশিখা, নূতন ধান্য, কত

আনন্দ! নূতন ধানের নূতন অন্ন, নূতন চিড়া—তাহাতে পিঠা তৈরী হয়, পায়শ-পিষ্টক রাঁধিয়া সকলে নবান্ন-উৎসব করে, লক্ষ্মীকে নিবেদন করিয়া দেয়।

আমার বাবা কোথায়, ভাই কোথায়? উৎসবের দিনে তাঁহাদিগকে বেশী করিয়া মনে পড়ে, প্রাণ ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠে।

এই সময়ের আমার দুঃখের সাক্ষী স্বয়ং রাণীমাতা।

সেইদিন রাণীর মাথায় তৈল মাখাইয়া আমি কলসী কক্ষে জলের ঘাটে গিয়াছি, সেই শীতল জলে রাণীকে স্নান করাইব। পথে শুনিলাম, আবার বাদ্য ভাণ্ড বাজিতেছে, লোকে দেবীর মন্দিরের কাছে ছুটাছুটি করিতেছে, জিজ্ঞাসা করিলাম, "আজ আবার কিসের উৎসব?" লোকে বলিল, "তাও জান না! আজ নরবলি দিয়া রাজা রক্ষাকালীর পূজা করিবেন।"

"কেবা নর কোথা হইতে আনিল ধরিয়া।
নরবলি হইবে শুনি স্থির নহে হিয়া।।
লোকে করে বলাবলি পথে কানাকানি।
বাপে ভাইয়ে দিবে বলি এই কথা শুনি।।"

আর ক্ষণমাত্রও পথে দেরি করিলাম না। অতি শীঘ্র বাড়ী ফিরিয়া সেই শীতল জলে রাণীকে স্নান করাইলাম।

রাণী দেবীর মন্দিরে যাইতে সাজ-সজ্জা করিতে লাগিলেন। আমি একা অজ্ঞানের মত নিজের কক্ষে আসিয়া বিছানায় পড়িয়া রহিলাম :—

"আঁচল ধরিয়া মুছি নয়নের পানি
উপায় না দেখি মোর, আমি অভাগিনী।"

এই সময়ের সাক্ষী রাজপুত্র স্বয়ং; আমার কক্ষে আসিয়া পুনরায় বলিলেন—"আমার সঙ্গে বিবাহে সম্মতি দাও, আমাকে পরিচয় দিয়া আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর।"

আমি সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলাম :—

"আজ কেন রাজপুরে আনন্দের রোল,
কিসের লাগিয়া আজ বাজে ঢাক ঢোল।"

কহিলা রাজার পুত্র মনেতে ভাবিয়া,
"কালী পূজা করে বাপে নরবলি দিয়া।"

আমি বলিলাম—"আজ রাজপুত্র, তোমাকে নিজের পরিচয় দিব,— তুমি বহুবার যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা আজ সকলই শুনিবে; কিন্তু এখানে নহে, চল দেবীর দুয়ারে, যেখানে কোচ ঢুলিরা নরবলির বাদ্য বাজাইতেছে।"

কুমার আগে আগে চলিলেন, আমি তাঁহার পিছু পিছু চলিয়া এখানে আসিয়াছি, আমার বাপ ভাই বন্দীবেশে এখানে আছেন; আমার অভাগিনী জননী এই ধর্ম্ম-সভায় সাক্ষী হইয়া আসিয়াছেন, মহারাজ তুমি নরবলি দিবে, কিন্তু আগে প্রকৃত বিচার কর—তার পর রক্ষাকালী পূজা করিবে।"

এই বলিয়া কমলা পরিশ্রান্ত ও শোকাহত হইয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল। শ্রোতৃবর্গ, মন্ত্রীমণ্ডলী ও স্বয়ং রাজা সেই করুণ দেবী-প্রতিমার বুক-ফাটা দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

রাজা বিচার গৃহে সিংহাসনে বসিলেন, সভাসদ ও মন্ত্রীরা যথাযোগ্য স্থানে আসন লইলেন, সর্ব্বপ্রথম কারকুণের ডাক পড়িল। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে গুরুতর অভিযোগের উত্তর দিতে বলিলেন। তাহার নিজ হাতের লেখা চিঠি—সুতরাং উত্তর দিবার তাহার কিছু ছিল না; আকাশ ভাঙ্গিয়া মাথায় পড়িলে যেরূপ হয়—বজ্রাহত ব্যক্তির মত সে স্তব্ধ হইয়া শুধু কাঁদিতে লাগিল। তারপর চিকন গোয়ালিনীর জবানবন্দী, রাজা তাহার দাঁত কিরূপে ভাঙ্গিল জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রথমতঃ সে থতমত করিয়া বলিতে চাহিল, "সান্নিকে পড়িল দন্ত আর নাহি জানি"—তারপর যখন রাজার ইঙ্গিতে যমদূতের মত কোটাল যাইয়া তাহার চুল ধরিল, তখন উপায় না দেখিয়া কারকুণকে গালি পাড়িতে লাগিল ঃ—

"পত্রে কি লেখা ছিল নাহি জানি তার।
দোষ ক্ষমা দিয়া মোরে করহ নিস্তার।"

আন্দি-সাঁন্দি দুইভাই তাহাদের সাক্ষ্যে বলিল, তাহারা কমলা ও তাহার মাতাকে পাল্কীতে লইয়া মামাবাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। মামা ও মামী সত্য ঘটনা বলিলেন, এবং মহিষাল বন্ধু কমলার সহিত সাক্ষাতের পর, রাজকুমারের তাঁহাকে লইয়া যাওয়া পর্য্যন্ত সকল কথা সাশ্রুনেত্রে বর্ণনা করিল। রাজকুমার বৃদ্ধ গোয়ালার বাড়ীতে যাইয়া কিরূপে কমলাকে দেখেন এবং রাজবাড়ীতে লইয়া আসিয়াছিলেন তাহার সাক্ষ্য দিলেন। প্রদর্শিত

পত্রগুলি বিচার সভায় আলোচিত হওয়ার পর মন্ত্রীরা কারকুণকে ঘোর অত্যাচার ও মিথ্যাচরণের জন্য দোষী সাব্যস্ত করিলেন; তাঁহারা পাপিষ্ঠকে শূলে দিতে বলিলেন, কিন্তু রাজা বলিলেন, "রক্ষাকালী পূজায় নরবলি মানত আছে। কারকুণের ন্যায় পাপিষ্ঠকে সেই দণ্ড দেওয়াই উচিত হইবে।"

তখন নাগাড়া, কাড়া, ঢাক-ঢোল আবার বাজিয়া উঠিল এবং পুরোহিত দেবীপূজার মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে লাগিলেন; মন্দির ও মণ্ডপ গৃহ ধূমাচ্ছন্ন হইল, সেই ধূমায় ঝাড় ফানুষ প্রভৃতির আলো প্রায় ম্লান হইয়া গেল, কেবল পঞ্চ-প্রদীপের ক্ষীণ রশ্মি সেই ঘন অন্ধকার ভেদ করিয়া কারকুণের কর্ত্তিত শোণিতার্দ্র মুণ্ডটি আভাসে দেখাইল।

বিবাহ ও শেষ

ইহার পরে কমলার সঙ্গে প্রদীপকুমারের বিবাহের প্রস্তাব পাকা হইয়া গেল। সোণার কালিতে লেখা পত্রের উপর সাতটা সিন্দূরের দাগ দেওয়া হইল এবং সেই সংবাদ দেশে-বিদেশে আত্মীয়বন্ধুদের মধ্যে প্রচারিত হইল। শত শত ময়রা মিঠাই প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত হইল এবং সাতদিন সাতরাত্রি বাদ্যভাণ্ডের শব্দে ও নৃত্যগীতে রাজপুরী প্রমত্ত হইয়া রহিল। গুরু-পুরোহিত ও পণ্ডিতমণ্ডলীর কলরবে প্রাসাদ মুখরিত হইল; বনদুর্গা, একচুড়া প্রভৃতি দেবতার পূজা হইলে জোড়া পাঁটা দিয়া ইহাদের পূজা সমাপ্ত করা হইল, ডরাই নামক গ্রাম্য-দেবতার পূজায় মহিষ বলি হইল। অতঃপর অন্তঃপুরিকারা নান্দীমুখের মাটি কাটিল, এবং কমলার মা ও মামী মাথায় 'সোহাগের ডালা' করিয়া এয়োদিগকে লইয়া গান করিতে করিতে বাড়ীতে বাড়ীতে সোহাগ মাগিতে গেলেন, —তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাদ্যকরেরা বাজনা বাজাইতে বাজাইতে চলিল। গীত ও হুলুধ্বনিতে বিবাহের মণ্ডপ মুখরিত হইল। বর ও কনে জলের ঘট সম্মুখে করিয়া বসিলেন। নবদ্বীপ হইতে নাপিত আসিয়াছিল, সে সোণার খুর দিয়া কামাইতে লাগিল, সেই সময় মেয়েরা ক্ষৌরকার্য্যের গান করিতে লাগিল। তখন বরকন্যাকে হলুদ মাখাইয়া স্নান করান হইল, গায়ে হলুদের যত গান জানা ছিল— মেয়েরা তাহা গাহিল।

কমলাকে "আসমানতারা" নামক শাড়ী পরান হইল, তাহা হাতে লইলে ঝলমল করিয়া উঠে, শূন্যেতে লইলে তাহা উড়িয়া যায়, মাটিতে রাখিলে মনে হয়, নীলতারা-ভূষিত আকাশের এক খণ্ড মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে। কমলার কানে স্বর্ণ-চম্পক দুল ও মণিমণ্ডিত

ঝুমকা পরান হইল, নাকে সোণার 'বলাক', মস্তকে স্বর্ণ সিঁথি. পায়ে গুঞ্জরী ও হাতে বাজুবন্ধ ও কঙ্কণ পরাইয়া তাহাকে যখন দাঁড় করান হইল, তখন সত্য সত্যই সে দেবী-প্রতিমার মত দেখাইল। "গলায় পরাইল এক হীরার হাঁসুলী" মেয়েলী আচার মত ছাতনাতলায় বরকন্যার বরণ হইল।

তখন ঢাক ঢোলের বাদ্যে আকাশ পরিব্যাপ্ত হইল, বন্দুকের আওয়াজে মেদিনী কম্পিত হইল।

"তুবড়ি ছাড়িল যেন আগুনের গাছ পারা।
হাউই ফানুষ ছুটে আসমানের তারা।।"

কুমার কমলাকে পাইয়া আনন্দিত হইলেন।

"এই মতে বিয়া কাজ হৈয়া গেল শেষ।
পুত্রসহ চাকলাদার গেল নিজ দেশ।।"

আলোচনা

এই গল্পের প্রধান চরিত্র কমলা। কমলা স্বভাবতঃ রহস্য-প্রিয়, শৈশব ও সুখ-কৈশোরে সে একটা আনন্দের পুতুলের মত ছিল; প্রথম অধ্যায়ে সে চিকন গোয়ালিনীকে লইয়া যে সকল রঙ্গরস ও কৌতুক করিয়াছে, তাহা আমি গল্প-ভাগে দেই নাই। সেই সকল বর্ণনা পড়িলে মনে হইবে কমলা কতকটা তরল প্রকৃতির। পিতা-মাতার আদরিণী ও নানা সোহাগে লালিত-পালিতার স্বভাবের এই একটু চাপল্য স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখই মানুষের প্রকৃত উপাদান চিনাইয়া দেয়; যখন বিপদের দিন আসিল, তখন এই চঞ্চল বিদ্যুৎপ্রভ মূর্ত্তি সূর্য্যের মত একটি স্থির জ্যোতিষ্কে পরিণত হইল।

উপস্থিত-বুদ্ধি কমলার যথেষ্ট ছিল, কিন্তু কমলার বিপদ এমনই সাংঘাতিক যে, শত উদ্ভাবনী শক্তি সত্ত্বেও সেই সকল বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া তাঁহার পক্ষে সহজ ছিল না। তাহার চরিত্র ছিল দৃঢ় ন্যায়-অন্যায় বোধ এবং সততার উপর প্রতিষ্ঠিত। বৈষয়িকের সতর্কতা তাহার ততটা ছিল না,—থাকিলে সে কতকটা চাতুরী খেলিতে পারিত এবং ছলিয়া গ্রামে নিজবাটীতে আর কয়েকদিন কারকুণকে ভুলাইয়া—থাকিতে পারিত। পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকায় ভেলুয়া ভোলা সদাগরকে এইভাবে ভাঁড়াইয়া রাখিয়াছিলেন, এমন কি

দেওয়ান জাহাঙ্গীরকে মলুয়াও নানা ছলে প্রতারিত করিয়াছিলেন—আদর্শ সততা ও সাধ্বীর পবিত্রতা থাকা সত্ত্বেও ইহারা উপস্থিত ক্ষেত্রে চতুরতা প্রদর্শনে দ্বিধাবোধ করেন নাই। কিন্তু কমলা কারকুণকে বিবাহ করার প্রস্তাব শুনিয়া মুখের উপর যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাতে দেখা যায় তাঁহার সততা একেবারে সাংসারিক হিতাহিত-জ্ঞানের সীমার বাহিরে, তাহা অমোঘ ও বজ্রকঠোর, সুতরাং তাহাকে মহাবিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। তাঁহার প্রকৃত পরীক্ষা আরম্ভ হইল সেইদিন— যেদিন নিজের শয্যার উপর তিনি মাতুলের চিঠিখানি পাইলেন। এই চিঠি পাওয়ামাত্র তাঁহার সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেল,—সাংসারিক হিতাহিত জ্ঞান এবং ভবিষ্যতের জন্য চিন্তিত দুর্ব্বল চিত্তের সতর্কতা এমন কি মাতার প্রতি অসীম স্নেহ পর্য্যন্ত এই দুলালী কন্যাকে বিচলিত করিতে পারিল না। মাথায় বজ্রপাত হউক, জলে ডুবিয়া মরি অথবা দস্যুর হাতে প্রাণ দিই, সব সহ্য করিব, কিন্তু কিছুতেই আর মাতুলের বাড়ীর অন্ন খাইব না।

হায়! আমাদের দেশের কত শত বলিষ্ঠকায় মনস্বী পুরুষ পর পদাঘাত সহ্য করিয়াও চাকুরীটিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন। কেবল স্ত্রী-পুত্র কন্যা ও আশ্রিতদের প্রতি বাৎসল্য বশতঃ; চাকুরী গেলে তাহাদের দশা কি হইবে ইহাই তাহাদের আশঙ্কা। কিন্তু কমলা স্ত্রীলোক, একান্ত নিরাশ্রয়; তাহার আশ্রয়ের একমাত্র খুঁটি— স্নেহাতুরী মাতা, তাহাকে হারাইলে তিনি শোকে পাগল হইবেন অথবা মরিয়া যাইবেন, একথা কমলা একবার চিন্তা করিলেন না, নিরাশ্রয়ভাবে অন্ধকার রাত্রে হাওরের পথে কোন্ দস্যুর হাতে পড়িবেন, তিনি তো অপূর্ব্ব সুন্দরী,—এসকল চিন্তা তিনি মনে স্থান দিলেন না। তাঁহার অপেক্ষা শতগুণে বলিষ্ঠ, পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা উপস্থিত বিপদে যে সতর্কতা অবলম্বন করেন, তিনি তাহা একটি বারও করিলেন না,—ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া কপালে আরও যাহা আছে হউক, এই সঙ্কল্প করিয়া—সেই ভীষণ রাত্রে নিজেকে অদৃষ্টের হাতে ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু এইভাবে নিজের সততার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া যে অপর সমস্ত সাবধানতা ত্যাগ করে, সুবিধাবাদীদের অপেক্ষাও সে পরিণামে অধিকতর জয়ী হয় এবং বিপদে উত্তীর্ণ হয়—কমলার জীবন তাহারই উদাহরণ। এজন্য কমলা আমাদের মত এ দেশের সহস্র সহস্র লোকের অপেক্ষা প্রশংসনীয়— তাঁহার চরিত্র পূজ্য। যে ব্যক্তির বা জাতির এইরূপ তীব্র আত্ম-মর্য্যাদা বোধ আছে, তাঁহারাই বিজয়ীর স্বর্ণ কুণ্ডল পরিতে পারে, সুবিধাবাদীরা তাহা পারে না, উপস্থিত বিপদ এড়াইয়া কোনরূপে টিকিয়া থাকিতে পারে মাত্র।

কমলা বড় ঘরের মেয়ে, তাঁহার আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান ও সংযত সহিষ্ণুতা আমাদের শ্রদ্ধা বিশেষ-করিয়া আকর্ষণ করে। তিনি কিছুতেই তাঁহার আত্ম-পরিচয় কুমারকে দিলেন না। রাজদ্বারে তাঁহার পিতা ও ভ্রাতা চৌর্য্যাপরাধে ধৃত ও বন্দী; তাঁহার পরিচয় পাইলে কুমার তাঁহার প্রতি কি ব্যবহার করিবেন তাহা অনিশ্চিত। সুতরাং যাহাতে তাঁহার অটুট সম্ভ্রম চরিত্র-গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়, এমন কাজ করিতে তিনি স্বভাবতঃই কুণ্ঠিত হইলেন।

কিন্তু এই গল্পের শেষভাগে আমরা কমলার স্বরূপ দেখিলাম। পোর্শিয়া যেরূপ বক্তৃতা করিয়া সাইলকের হস্ত হইতে নিজের স্বামীকে উদ্ধার করিয়া ছিলেন, কমলা সেইরূপ এক বিষম পরীক্ষার সম্মুখীন, তাঁহার বন্দী পিতা ও ভ্রাতা নির্ম্মম মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত। সেক্ষপিয়র গল্পের একটা প্রাচীন কাহিনী পাইয়াছিলেন। সেই কাহিনীর উপর তাঁহার অলৌকিক কবি-প্রতিভার ছটা দিয়া উহা সাজাইয়াছিলেন। কিন্তু এই গল্পের রচক কবি ঈশাণ সেরূপ কোন প্রাচীন গল্পের খসড়া পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তথাপি কমলার বিবৃতিতে যে অপূর্ব্ব সংযম ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং নারীজনোচিত সম্ভ্রম এবং অব্যর্থ প্রমাণ প্রয়োগের বহর দৃষ্ট হয়, তাহাতে এই বাঙ্গালী নারীর প্রতি পরম শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা নত হইয়া পড়ে। এই অতি জঘন্য অভিযোগ প্রমাণ করিতে যাইয়া তিনি তাঁহার উচ্চকুলোচিত শীলতা এক বিন্দুও হারান নাই।

তিনি উচ্চকুলসম্ভূতা মেয়ে হইয়া রাজসভায় তাঁহার অভিযোগ উচ্চারণ করিবেন কিরূপে? প্রগল্‌ভার মত তিনি কি কারকুণের জঘন্য চেষ্টার সকল কথা এমন বিশিষ্ট সভায় বলিতে পারেন? অথচ আত্মপক্ষ সমর্থনে সেই সকল কথা একরূপ অপরিহার্য্য।

কমলা তাঁহার অভিযোগে নিজের কথা কিছুই বলেন নাই, অপরের সাক্ষ্যেও যতটা প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে সেই সকল ঘৃণ্য কথার উল্লেখমাত্র নাই। কারকুণ যে প্রণয়-পত্রখানি লিখিয়াছিল, সেই পত্রখানি প্রথমত প্রদর্শিত হইল, তাহাতেই কারকুণের চরিত্রের কথা সভায় বিদিত হইল। তারপরে চিকন গোয়ালিনীর ভাঙ্গা দাঁতের প্রমাণে এই সাব্যস্ত হইল, যে সেই অশিষ্ট প্রস্তাব ও চিঠিখানি লইয়া কমলার কাছে যাওয়াতে তিনি তাহাকে উচিৎ শাস্তি ও শিক্ষা দিয়াছেন। আঁদি সাঁদির সাক্ষ্যে প্রমাণ হইল, কমলা কোন দুষ্ট লোকের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেন নাই, মাতার সঙ্গে মাতুলালয়ে গিয়াছেন। তাহার পর মাতুলের চিঠিখানি উপস্থিত করা হইলে সকলে বুঝিতে পারিলেন, কারকুণ তাহাকে গৃহ হইতে তাড়িত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, মাতুলালয় হইতে কলঙ্কের কালিমা মাথায় লেপিয়া তাহাকে একেবারে পথে আনিয়া নিতান্ত নিরাশ্রয়ার উপর আরো অত্যাচার চালাইবেন, এই

তাহার মনোভাব। মহিষালের সাক্ষ্যে প্রমাণিত হইল, কোন দুষ্ট লোক তাহাকে ফুসলাইয়া মাতুল গৃহ হইতে লইয়া যায় নাই। বৃদ্ধ মহিষাল তাঁহাকে নির্জ্জন হাওরের পথে যে ভাবে পাইয়াছিল তাহাতে তাঁহার একনিষ্ঠ সরল চরিত্র, চরম দুর্দ্দশা ও নিতান্ত নিরপরাধের প্রমাণ উপলব্ধি হইল।

ইহার পরে রাজকুমার যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝা গেল, মহিষালের গোয়াল ঘরে কিরূপে পঙ্কের মধ্যে পঙ্কজের মত তিনি এই পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্যের খনির আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

এই সত্য-বর্ণনা ও উজ্জ্বল সাধুত্বের মূর্ত্তি সভা সমক্ষে প্রকটিত হওয়ার পর কারকুণের ষড়যন্ত্র এমনভাবে ধরা পড়িল যে তৎসম্বন্ধে কোন দ্বিধার অবকাশ রহিল না। রাজসভার ভাব কমলার জন্য করুণার ভরপুর হইয়া গেল।

কমলা নিজের কথা নিজে কিছুই কহেন নাই। দলিলের প্রমাণই যথেষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাঁহারাও যাহাতে জঘন্য কথাগুলি যথাসম্ভব এড়াইয়া যান অথচ মামলাটি সম্বন্ধে বিচারকগণ নিঃসন্দেহ হন, কমলার বিবৃতি তাহারই অনুকূল। কমলার উক্তি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও নিজের পদ-মর্য্যাদা তথা নারীজনোচিত সম্ভ্রম এবং লজ্জা বজায় রাখিয়া আত্মসমর্থনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত-স্থলীয়। তিনি প্রারম্ভে সমস্ত দেব দেবীকে সাক্ষী করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রাধান্য দিয়াছিলেন সন্ধ্যাতারা ও স্বীয় চক্ষু-জলের উপর। প্রকৃতই সেই ধ্রুব নক্ষত্র যাহা প্রতি সন্ধ্যায় জগতের কার্য্যাবলী নিশ্চিতভাবে দেখে—এবং তাঁহার চক্ষুজল—যাহা সমস্ত হৃদয় মথিত করিয়া অন্দরের ব্যথার পরিচয় দেয়—এই দুই সাক্ষীই তাঁহার কাহিনীর যথার্থ পরিচয় দিয়াছিল।

কমলার চরিত্রের আর একটা বৈশিষ্ট্য—তাঁহার বাঙ্গলা দেশের প্রতি আন্তরিক দরদ। বাঙ্গলার শ্যামল প্রকৃতি, আম্রমুকুলের গন্ধে ভরপুর, কোকিল কূজনে এবং ভ্রমর গুঞ্জরণে মুখরিত বাঙ্গলার কুটীর, দুর্গা-পূজা, বন-দুর্গা-পূজা, কার্ত্তিক ও ধান্য-লক্ষ্মীর পূজা—বাঙ্গলার বার মাসে তের পার্ব্বণের মনোহারিত্ব কমলার এই দরদ-পূর্ণ বিবৃতিতে এমন স্পষ্ট হইয়া মনোজ্ঞ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে আমরা এই কাহিনী পড়িবার সময় চোখের জলের সঙ্গে আমাদের পল্লীমাতাকে বারবার স্মরণ করিয়াছি। এই গীতিকাটি পরিপূর্ণ ভাবে পল্লীরস মাধুর্য্যে ভরা। কমলা দুঃখ-কষ্টের চূড়ান্ত সীমায় যাইয়াও পল্লীর আনন্দ ভোলেন নাই।

পল্লীরসে চিরদিনই তাঁহার মনকে সরস রাখিয়াছে। ঘোর বিপদের দিনেও নদী বাহিয়া সোণার ময়ূরপঙ্খী নৌকায় প্রিয়জনের সঙ্গসুখ তাঁহাকে আনন্দ দিয়াছে। দুঃখের অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিতেও ক্ষণতরে হইলেও বিধাতার দান আনন্দটুকু উপভোগ করিবার শক্তি তিনি রাখিয়াছেন।

কমলার বিবাহের বর্ণনায় আমরা তাৎকালিক সমাজের যে চিত্র পাইতেছি, তাহা কৌতূহলকর। ২।৩ শত বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গে বড় লোকের বিবাহে, নবদ্বীপ হইতে নাপিত আনা হইত, তাহারাই "গৌরচন্দ্রিকা" আবৃত্তি করিত এবং সোণার খুর দিয়া খেউরি করিত। ডড়াই নামক পল্লী দেবতার পূজায় মহিষ বলি হইত। মেয়েদের বিবাহে নানারূপ বস্ত্রের উল্লেখ এই পল্লী সাহিত্যের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। এই গল্পেও 'আসমান তারা' নামক এক প্রকার শাড়ীর উল্লেখ আছে, তাহা মসলিনের প্রকার-ভেদ বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দ্বিজ ঈশাণ নামক এক পল্লী কবি এই গানটি রচনা করিয়াছিলেন, অনুমান—সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইহা রচিত হইয়া থাকিবে।

কাঞ্চন

রাজপুত্র ও ধোপার মেয়ে

এক ধোপার পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল; সেই অঞ্চলের রাজপুত্র কন্যার অসামান্য রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। কাঞ্চনমালাও রাজপুত্রের রূপে-গুণে মুগ্ধ; উভয়ে উভয়ের অনুরাগী। কাঞ্চন রাজকুমারের বাঁশী শুনিয়া ঘরে থাকিতে পারে না, বাহির হইয়া আছে—কিন্তু যখন রাজপুত্র তাঁহার আঁচল ধরিয়া টানেন, তখন কিছুতে ধরা দিতে চান না। তাঁহার গায়ের বর্ণ চাঁপাফুলের মত, তাঁহার চক্ষু দুটি অপরাজিতার ন্যায় নীলকৃষ্ণ, মাথার চুল পৃষ্ঠদেশ হইতে নিবিড় মেঘের লহরীর মত নিম্নে লুটাইয়া পড়িয়াছে, রাজকুমার বলেন, "কাঞ্চন, আমি যে তোমার ঐ অপরাজিতা ফুলের ন্যায় দুটি চক্ষু দেখিয়া ভুলিয়াছি, আমি তোমার মাথার চুল দেখিয়া ভুলিয়াছি।"

"আমি যে পাগল হৈছি দেখি মাথার চুল।"

আমি তোমাকে বিবাহ করিব, তোমার সম্মতি পাইলে আমি রাজার সম্মতি নিতে পারিব।"

কাঞ্চন কুমারের আবেদন নিবেদন শোনেন, তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া যায়, অথচ মুখে বলিতে পারেন না। কতদিন আঁধার রাতে বর্ষায় রাজকুমার ধোপার কুটিরের আঙ্গিনার এক কোণে দাঁড়াইয়া থাকেন, বর্ষার জলে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হয়—কাঞ্চন—রাজপুত্রের কেশ-বেশ মুছাইবার জন্য হাত বাড়াইয়া ফিরিয়া আসেন—কত করিয়া কুমারকে বুঝান—"তুমি এত কষ্ট পাইও না, আমাকে কষ্ট দিও না। তোমার বাঁশীর সুরে আমার অন্য সমস্ত চিন্তা ডুবিয়া যায়—আমার মনে হয় চরাচর স্তব্ধ, কেবল বাঁশীই সত্য, বাঁশীর সুর আমার মর্ম্ম বিদ্ধ করে, আমাকে পাগল করে।

"তুমি কি জান না কুমার তুমি কে আর আমি কে? আমি তোমায় কি বলিব? আমার পিতা তোমাদের রাজবাড়ীর ধোপা—আমি ধোপার মেয়ে, তোমার সঙ্গে কি আমার মিলন সম্ভব? আমার পক্ষে এরূপ আশা করা বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে যাওয়া, তুমি তোমার যোগ্যা কোন নারীকে বিবাহ করিয়া সুখী হও।"

রাজকুমার বলেন, "তোমার বাড়ী হইতে যখন রাজবাড়ীতে ধৌত বাস আইসে, তখন আমার ধুতি চাদরে তোমার পাঁচটি আঙ্গুলের স্নিগ্ধ ও সুগন্ধ চিহ্ন আমি দেখিতে পাই, সেই দাগ দেখিয়া আমি আর আমাতে থাকি না। তোমার মালার গন্ধে সেই বস্ত্র ভরপুর, আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই সকল নিদর্শন পাইয়া— তোমার জন্য পাগল হইয়া থাকি। এখানে তোমার সঙ্গে আমার বিবাহে অনেকে বাধা দিবে, তুমি যদি ইহাই মনে কর, তবে চল আমরা দুজনে এই রাজ্য হইতে চলিয়া যাই। কোকিল কেবল আমাদের রাজ্যে ডাকে না, ফুল কেবল এদেশের বাগানে ফোটে না, চাঁদের জ্যোৎস্না আর আর দেশে তাহার রজত জালে তরুগুল্মলতা গৃহাদি পরিশোভিত করে, এদেশ হইতে আমরা দুজনে যাইয়া অন্য কোন দেশে কুটির বাঁধিয়া থাকিব,—এই সকল ফুল লতা ও পাখীর কূজন আমাদের মিলন-মঙ্গল গান করিবে—তাহার তুলনায় রাজ্যসুখ আমার কাছে তুচ্ছ।"

কাঞ্চন তাহার কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিল না। একদিকে কুল মানের ভয়, অপর দিকে রাজকুমারের এতাদৃশ অনুরাগ—একদিকে তাহার চিত্ত ভয়ে দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতেছে অপর দিকে অদৃষ্ট যেন তাহাকে কোন যাদুকরের রাজ্যের দিকে জোর করিয়া টানিতেছে। অবশেষে কাঞ্চন রাজকুমারের কথায় ভুলিল, রূপে ভুলিল এবং অনুরাগে ভুলিল।

তাঁহারা উভয়ে নদীতীরে মিলিত হইতেন। তাঁহাদের রাত্রি-ভোর আনন্দের কথা শত আশা ও ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্নের কাহিনী শুনিতে শুনিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইত। রাত্রি জাগরণে ক্লান্ত রাজকুমার নদীর তীরে বাঁশপাতার বিছানায় ঘুমাইয়া পড়িতেন, কাঞ্চন ভাবিতেন "কি দুরদৃষ্ট আমার! যাহার শয্যা স্বর্ণ-পালঙ্ক, তিনি আমার জন্য এই কঠিন মৃত্তিকার উপর গাছ-পাতার বিছানায় পড়িয়া আছেন, এখুনি তো লোকের চলাচল হইবে। সারারাত্রি জাগিয়া দুইটি ক্লান্ত চক্ষু ঘুমে এই মাত্র বুজিয়া আসিয়াছে, আমি কেমন করিয়া ইহার কাঁচা ঘুম ভাঙ্গি, তথাপি না করিলে নয়"—কোমল হস্তে তাহাকে ঠেলিয়া উঠাইয়া দেন।

কাঞ্চন বুঝিলেন, রাজকুমারের এত স্নেহ এত অনুরাগ তিনি তাহাকে জীবনে

ছাড়িবেন না, হয়ত কোন দূর দেশে যাইয়া তাহারা দাম্পত্য জীবন কাটাইবেন "স্বর্গের দেবতারা আমাদের এই একনিষ্ঠ পবিত্র প্রণয়ের মূল্য বুঝিবেন।"

কানাকানি ও শাস্তি

ক্রমশঃ জানাজানি হইয়া গেল। রাজদরবারে এই ব্যাপার লইয়া কাণা-ঘুষা হইতে লাগিল। রাজাকে এক মন্ত্রী সংবাদ দিলেন—"মহারাজ আপনি কি করিতেছেন? আপনার বড় ধুপীর কন্যা কাঞ্চন তাহার রূপ দিয়া রাজকুমারকে ভুলাইয়াছে। রাজকুমার এই কন্যার প্রতি আসক্ত হইয়াছেন, এ যেন চাঁদ ও রাহুর মিলন হইয়াছে। অধম কাপড় কাঁচা ধুপির ঘরে রাজপুত্র যাতায়াত করেন, ইহা হইতে ঘৃণার বিষয় আর কি হইতে পারে।"

এই কথা শুনিয়া রাজা আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিলেন এবং তখনই ধোপাকে আনিতে লাঠিয়াল পাঠাইয়া দিলেন।

কাঞ্চনের পিতার নাম গোদা, সে অতি বৃদ্ধ, রাজার হুকুমে কাঁপিতে কাঁপিতে লাঠি ভর করিয়া দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইল। দরবার গৃহে মস্ত বড় ফরাস বিছানা পাতা, লোক লস্করে ঘর ভর্ত্তি, এমন সময় ধোপা হাত যোড় করিয়া সেই ঘরের এক কোণে দাঁড়াইয়া বলিল, "হুজুর, একয়েক দিন ধরিয়া ক্রমাগত ঝড় তুফান ও বাদলা চলিতেছে, কাপড় শুকাইতে পারি নাই। এইজন্য এবার একটু দেরী হইয়া গিয়াছে।"

রাজা রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "তোর এক কন্যার বিয়ের বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, আমার ছেলে সেই কন্যার জন্য পাগল হইয়াছে, শুনিতে পাইলাম। আজ রাত্রির মধ্যে যদি তুই তাহার বিবাহ না দিস, তবে কাল সকালে পাইক পাঠাইয়া তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া এখানে আনিয়া তাহাকে জাতিচ্যুত করিব।"

ধোপা কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "মহারাজের বাগানে যে মালীর কাজ করে, কালই সকালে আমি তাহার সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহ দিব।"

এই বলিয়া লাঠি ভর করিয়া ধোপা বাড়ীতে ফিরিয়া গেল, এবং সারারাত্রি সে ও তাহার স্ত্রী কাঁদিয়া কাটাইল।

কিন্তু প্রাতে রাজকুমার ও কাঞ্চনের খোঁজ কেহ দিতে পারিল না, তাহারা কোথায় গেল?

" দুই দিন গেছে বিষ্টি বাদল ঝড়ে আর তুফানে
কাপড় না শুকায় এই দারুন দুর্দ্দিনে।"

(পৃষ্ঠা ১০২)

"কইবা গেল রাজার পুত্র, কইবা কাঞ্চন মালা
দেশেতে পড়িল ঢোল—ধর এই বেলা।"

পলায়ন

পরিশ্রান্ত রাজকুমার ও কোমলাঙ্গী কন্যা সমস্ত রাত্রি জাগিয়া পথে চলিয়াছেন। কাঞ্চন আর্ত্তকণ্ঠে বলিল,

"বঁধু, আমি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি, বনের পথ অন্ধকারে চিনিতে পারিতেছি না, নদীর ধারে কেওয়াবন—ফুলের গন্ধে ভরপুর, ঐখানে যাইয়া আজ যে একটুখানি রাত বাকী আছে, চল শুইয়া কাটাই, আমার পা আর চলিতেছে না।"

রাজপুত্র বলিলেন, আর একটু চল,—আমার পিতার মুলুক হইতে অন্য মুলুকে যাই। রাতি শীঘ্রই পোহাইবে, পূর্ব্বগগনে একটুখানি ঝিলিমিলি ছটা দেখা যাইতেছে। আমরা প্রভাত হইতে না হইতেই অন্য রাজার মুলুকে যাইয়া পৌঁছিব, তখন যদি কোন গৃহস্থ আমাদিগের আশ্রয় দেন তবে ভাল, নতুবা

"বনে বনে ফিরিব লো কন্যা তোমারে লইয়া।
ক্ষিদা পাইলে বনের ফল খাইব পাড়িয়া।।
গাছের তলায় বাড়ীঘর পাতার বিছানা
বনের বাঘ ভালুক তারা হইবে আপনা।।"

পরিশ্রান্তা কাঞ্চনমালা রাজপুত্রকে বলিল, "পূর্ব্বদিকে চাঁদের ঝিলিমিলি দেখা যাইতেছে, চাঁদ অস্ত যাইতেছে। বোধ হয় আমরা তোমার বাপের মুলুক ছাড়িয়া অন্য রাজার রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। তুমি তোমার ঘর বাড়ী ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া আসিয়াছ, আমি আমার কুল মান ছাড়িয়াছি। আমার বুড়া বাপ নদীর তীরে বসিয়া কাঁদিবেন। মা আমার পাষাণে মাথা ভাঙ্গিবেন। আমি দুর্ব্বল স্ত্রীলোক হইয়া নির্ম্মম পাষাণের মত তাহাদিগকে আঘাত দিয়া আসিয়াছি।"

"রাত্রি পোহাইয়া যায়, হায়! আর খোয়াই নদীর ঘাট দেখিতে পাইব না। বাড়ীর কাছে যে বিস্তৃত শালি ধানের মাঁঠ তাহা জন্মের মত দেখিয়া আসিয়াছি। প্রভাত হইলে আর তাহা দেখিব না। আমার পাড়াপড়শীদের ছেলেমেয়েরা রোজ প্রাতে বাড়ীর

চৌদিকে কলরব করে, সেই মিষ্ট প্রিয়জনের স্বর আর শুনিতে পাইব না, রাত্রি প্রভাত হইলে আমাদের গাছগুলিতে নানাবর্ণের পাখীরা গান করে, আজ প্রাতে আর তাহা শুনিব না, আমাদের বাড়ীর পূর্ব্বে যে আকাশ রৌদ্রে ভাসিয়া উঠে, সেই প্রিয় আকাশ আজ প্রাতে আর দেখিতে পাইব না,—কত সাধে বাগান করিয়াছিলাম, সেই বাগানের ফুল ফোটা আজ প্রাতে আর দেখিব না—জন্মের মত বাড়ীঘর ও দেশের মায়া কাটাইয়া চির বিদায় লইয়া আসিয়াছি।"

"রাত্রি না পোহালে দেখব খুয়া নদীর ঘাট।
রাত্রি না পোহালে দেখব শালী ধানের মাঠ।।
রাত্রি না পোহালে দেখব তোমার আমার বাড়ী
রাত্রি না পোহালে দেখব পাড়ার নর নারী।।
"রাত্রি না পোহালে শুনব অইনা পাখীর গান।
রাত্রি না পোহালে দেখব ভোরের আসমান।।
রাত্রি না পোহালে দেখব সেই না বাগের ফুল।
জন্মের মত ছাড়ি আইলাম মা বাপের কুল।।"

রাজপুত্র কাঞ্চনের পাশে বসিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন, তাহার চোখের জল মুছাইয়া আদর করিয়া বলিলেন,

"না কাঁদ না কাঁদ কন্যা চিত্তে দেও ক্ষমা,
ঘর ছাড়ি বনচারী হ'লাম দুইজনা।'

"আর কাঁদিও না, আমরা এক সূতায় গাঁথা দুটি বন-ফুলের মত হইলাম। তোমার আমার দুঃখ তোমার আমার মুখের দিকে চাহিয়া ভুলিব।

এ নদীর ঘাটে অনেক লোক দেখিতে পাইতেছি। আমরা অপর এক রাজার রাজ্যে আসিয়াছি।"

তাহারা অগ্রসর হইয়া এক বৃদ্ধ ধোপাকে দেখিতে পাইল। রাজপুত্র সেই ধোপাকে বলিলেন, "দেখ আমরা বড়ই দুরবস্থায় পড়িয়াছি. পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। তুমিই আমার ধর্ম্মের বাপ, তুমি কি আমাদিগকে আশ্রয় দিবে?"

বৃদ্ধ ধোপা সেই দুই জনের রূপ দেখিয়া চমৎকৃত হইল—

"সূর্য্যের সমান পুরুষ, চাঁদের সমান নারী।
ইহারা হইবে কোন রাজার ঝিয়ারী।।"

বিস্ময়ে ও ভয়ে ধোপা খানিকক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া রহিল, তারপরে বলিল,—"আমার পুত্র কন্যা নাই, তোমরা আমার বাড়ীতে আসিয়া থাক, আমার স্ত্রী অদুনা ঘরে আছে, তাকে মা বলিয়া ডাকিও। তোমরা আমার পুত্র-কন্যা হইবে। রাজার বাড়ীর কাপড় কাচিয়া খাই, তাহাতেই আমাদের দিন গুজরান হয়।"

রাজপুত্র বলিলেন, "আমিও ধোপার ছেলে, আমি তোমার কাপড় কাচিয়া দিতে পারিব। এই মেয়ে ঘরের সব কাজ জানে, আমরা সব বিষয়ে তোমাদিগকে সাহায্য করিতে পারিব এবং চিরকাল তোমার ঘরে থাকিয়া যাইব।"

রুক্মিণী

রাজকুমারী রুক্মিণী তাঁহার এক পরিচারিকাকে বলিলেন, "এতদিন যাবৎ ধোপা কাপড় কাচিতেছে, কিন্তু এমন সুন্দর পাইট করা কাপড় কাচা তো কখনও দেখি নাই।"

পরিচারিকা বলিল, "তা বুঝি জান না, কিছু দিন হইল এক নূতন ধোপা আসিয়াছে, সেই এখন কাপড় কাচে।

"চাঁদের সমান রূপ দেখিতে সুন্দব।
এই ধোপা হইবে কোন রাজার কুমার।।"

তার সঙ্গে একটি তরুণী মেয়ে আসিয়াছে, তাহার সে পাগল করা রূপ দেখিলে চোখ ফিরিতে চায় না। বর্ণ অতসী ফুলের মত ও মুখখানিতে কাঁচা সোণার দীপ্তি, মাথায় একরাশ চুল যেন চামর। যে তাহাকে দেখে সেই চমৎকৃত হয়।"

কুমারী রুক্মিণী ধোপানীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাহাকে বলিলেন, "হঠাৎ দৈবের কৃপায় নাকি তোমাদের আপনা হইতেই কন্যা জামাই মিলিয়া গিয়াছে। কন্যাটি নাকি বড় সুন্দরী, একবার তাকে আমার কাছে পাঠাইয়া দিও, আমি তার সাথে সই পাতাইব।"

কাঞ্চন এইভাবে রাজকন্যা রুক্মিণীর সখী হইল। সে অনেক সময় রাজবাড়ীতে থাকে এবং অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে রুক্মিণীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে। উভয়ে, উভয়কে প্রীতির চক্ষে দেখে এবং একদিন না দেখিলে পরস্পরের জন্য উতলা হইয়া পড়ে।

একদিন গুরু-গুরু মেঘ ডাকিতেছে; দুপুরবেলা, কাঞ্চন রাজপুরীতে রুক্মিণীর কক্ষে বসিয়া তাঁহার চুল আঁচড়াইয়া দিতেছে, বর্ষার নূতন জলে কাঞ্চনের মনে পুরাতন ব্যথা জাগিয়াছে। সে নিবিষ্ট হইয়া তাহার বাল্যজীবনের কথা ভাবিতেছে। এমন সময় রাজকুমারী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—

"কোথা বাড়ী কোথা ঘর কোথা মাতা পিতা।
কোথা হইতে কেন আইলা যাইবে বা কোথা।।
মা ছাড়িলা বাপ ছাড়িলা নবীন বয়সে।
দেশ ছাড়িলা বাড়ী ছাড়িলা কোন্ কর্ম্মদোষে।।"

"অতি সুপুরুষ এক যুবক তোমার সঙ্গী, এই ব্যক্তিই বা কে? জোর করিয়া কি তোমাকে এই লোকটি লইয়া আসিয়াছে, না স্বেচ্ছায় তুমি ইহাকে আত্মসমর্পণ করিয়া ঘরবাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছ?"

একে ত কাঞ্চনের মন দুঃখে ভরা,—পূর্ব্ব স্মৃতিতে ভরপুর ছিল, সে না ভাবিয়া না চিন্তিয়া সরলভাবে রুক্মিণীর নিকট তাহার জীবনের সমস্ত কথা বলিয়া ফেলিল।

রুক্মিণীর মনে নূতন এক অনুভূতি জাগিয়া উঠিল। রাজকুমারের দরদে তাঁহার মন ভরিয়া গেল। তাঁহার মন কুমারের রূপে মুগ্ধ হইল, রাজকন্যা ভাবিতে লাগিলেন, "রাজকুমার! এমন সুন্দর রূপ তোমার! তুমি কি দুর্ভাগ্যের ফলে জন্মিয়াছিলে যে একটা ধোপানীর জন্য এত কষ্ট সহিয়া আছ? তুমি যখন কাপড়ের বস্তা মাথায় করিয়া রাজবাড়ীতে আইস, তোমার কষ্ট দেখিয়া আমার কলিজা ফাটিয়া যায়, আমি খিড়কীর পথে তোমার দিকে চাহিয়া থাকি, তুমি ভ্রমর হইয়া জন্মিয়াছিলে, কর্ম্মদোষে গোবরা-পোকা হইয়া পড়িয়াছ!"

"ভ্রমরা আছিলা তুমি হৈলা গোবরিয়া।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রাজকুমারী রুক্মিণী সত্য সত্যই একখানা চিঠি লিখিয়া কাপড়ের ভাঁজে রাখিয়া দিল। ধোপার ছদ্মবেশী রাজকুমার যথা সময়ে সে চিঠিখানি

পাইলেন।

রুক্মিণী লিখিয়াছে ঃ—

প্রাণের বঁধু, তোমায় চিনি বা না চিনি, আমি তোমার রূপ দেখিয়া পাগলিনী হইয়াছি। তুমি নিজকে ভাঁড়াইয়া এই রাজার রাজ্যে বাস করিতেছ!

"আইল বসন্তকাল এই নব ফাল্গুন মাসে।
কোকিলের কলরবে ফুলে জোয়ার আসে।।
আবির লইয়া খেলে নাগর-নাগরী।
এমনকালে কাপড় লৈয়া আইস রাজার বাড়ী।।
এক দণ্ড পাইতাম তোমায় কইতাম মনের কথা।
সঙ্কেতে বুঝিয়া লৈবা রুক্মিণীর মনের ব্যথা।।"

প্রবাসে গমন, প্রতীক্ষা

একদিন রাজপুত্র কাঞ্চনকে বলিল, "বহুদিন একস্থানে থাকিয়া আমার মনটা কেমন করিতেছে, তুমি বলিলে আমি তিনটি মাস একটু ঘুরিয়া আসি। এই সময়টা এইখানে তুমি থাকিও, তিনমাস পরে আমরা আবার মিলিত হইব।" সরল কাঞ্চন না ভাবিয়া না চিন্তিয়া সম্মতি দিল।

"অত না ভাবিল কন্যা শত না ভাবিল।
সরল হৃদয়ে কন্যা নাগরে বিদায় দিল।।"

একমাস দুই মাস করিয়া তিন মাস গেল। একদিন রাজ-বাড়ী নানা আনন্দের বাজনার রবে পূর্ণ হইল; ঢাক, ঢোল, বেণু ও বাঁশীর রব বাতাসে ভাসিয়া আসিল। কাঞ্চন তাহার ধর্ম্মমাতা অদুনাকে জিজ্ঞাসা করিল—"রাজবাড়ীতে এই সকল বাদ্যভাণ্ড কিসের?" অদুনা জানিয়া আসিয়া বলিল, "রাজকুমারী রুক্মিণীর বিবাহ হইবে। ভিন্ন দেশী এক রাজপুত্রের সঙ্গে তাহার বিবাহের কথাবার্ত্তা ঠিক হইয়াছে।"

কাঞ্চন দিন গুণিতে আরম্ভ করিয়া দিল। তিন মাস অন্তে কুমার আসিবেন, এখন তো চার মাস অন্ত হইতে চলিল। পাঁচ মাসও গেল, ছয় মাস পরে কাঞ্চন খাওয়া ছাড়িল;

সাত মাস গেল, রাত্রে দিনে কাঞ্চনের চোখে ঘুম নাই। তারপর আশার আলো নিবু নিবু হইতে চলিল। দশমাসে আশার দশ কোঠায় শূন্য পড়িল। ক্রমে এক বছর অতীত হইল। কাঞ্চন কাঁদিয়া কাটিয়া তাহার ঘরের বাতি নিভাইয়া ফেলিল।

"রাত্রিতে জ্বালাইয়া বাতি কাঁদিয়া নিভাইল।"

কাঞ্চন শোকে উন্মত্তা হইয়া নদীর তীরে ঘুরিয়া বেড়ায়, মনে মনে বলে, "হে নদী, তুমি কোন্ দূর দেশ হইতে আসিয়াছ, কোন্ দূর দেশে যাইবে—জানি না। হয়ত তুমি যে দেশে কুমার গিয়াছেন, তাহার সন্ধান পাইবে,—অতি গোপনে তাঁহাকে আমার কথা বলিও, আমি যে কত দুঃখ পাইতেছি, তাহা তাঁহার কানে কানে বলিও।"

শত শত ডিঙ্গা নদী বহিয়া যায়,—তাহাদের পাল হাওয়ার জোরে স্ফীত হইয়া নদীর ঢেউ কাটিয়া যায়। কাঞ্চন মনে ভাবেন, "এই সকল ডিঙ্গায় যে সব বণিক আছেন, তাহাদের মধ্যে হয়ত কেহ রাজকুমারের সন্ধান জানেন। হয়ত আমার জন্য আমার বঁধু হীরামতির ফুল আনিবেন, আমি অতি দুঃখিনী, আমি কৃতজ্ঞতায় ও স্নেহে গলিয়া যাইব, প্রতিদানে তাঁহাকে কি দিব? আমার আর কিছু নাই, এই দুঃখিনীর সম্বল দুটি চোখের জল—তাহাই মূল্য স্বরূপ দিব।"

"আমার লাইগা আনবে বঁধু হীরা-মতির ফুল।
দুই ফোঁটা চক্ষের জল দিব সে ফুলের মূল॥"

তসিলদার, তমসা গাজি

রাজার তসিলদার সেই ধোপাকে ডাকাইয়া গোপনে কহিল, "তোমার বাড়ীতে একটি সুন্দরী মেয়ে আছে, আমি তাহাকে চাই। প্রতিদানে আমি তোমাকে নগদ পাঁচ শত টাকা ও ঘরবাড়ী জমি দিব। যদি তুমি সম্মত না হও, তবে তো তুমি আমার প্রতাপ ভালরূপই জান, এ অঞ্চল আমার ভয়ে কম্পমান্। তোমার ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া সর্ব্বনাশ করিব।"

বুড়ো ধোপা কাঁপিতে কাঁপিতে বাড়ীতে আসিয়া তাহার স্ত্রী অদুনাকে বলিল, —"কাঞ্চনকে আর কি করিয়া রাখা যায়! পরের মেয়ের জন্য আমরা কি এই বয়সে অপমৃত্যু মরিব?"

" তিন মাস তের দিন গুঞ্জরিয়া গেল।
নানা দ্রব্য লৈয়া গাজি বাড়ীতে ফিরিল।।

(পৃষ্ঠা — ১১৪)

অদুনা চোখের জল মুছিতে মুছিতে কাঞ্চনের কাছে যাইয়া তাহাকে বলিল, "মা, তুমি এক বছর এইখানে আছ, আমরা এই সময়ের মধ্যে তোমাকে ভালরূপই চিনিয়া তোমার মায়ায় ঠেকিয়াছি। কিন্তু এখন উপায় নাই। এদেশের দুরন্ত তসিলদার কি করিয়া যেন তোমার সন্ধান পাইয়াছে, এখন আর রক্ষা নাই। আমি তোমার ধর্ম্মের মা, তুমি সতী কন্যা; আজ রাত্রের মধ্যে যদি তুমি আমাদের বাড়ী না ছাড়, তবে আমাদের সকলেরই ঘোর বিপদ। হে ঠাকুর! আজ রাত্রি আমাদিগকে রক্ষা কর।"

পীরকান্দা গ্রামের তমসা গাজি তাহার পাঁচখানি ধান-বোঝাই জাহাজ লইয়া বাণিজ্য করে। উত্তর হইতে ধান ভাঙ্গাইয়া সে খোরাই নদীতে ভাগীদারের সঙ্গে চলিয়া যাইতেছিল। নদীর তীরে একটা ভাল জায়গা দেখিয়া সে পাঁচখানি ডিঙ্গি নোঙ্গর করিয়া ধান চালের হিসাব করিতেছে ও কোন্ স্থানে গেলে ব্যবসায় ভাল হইবে তাহার পরামর্শ করিতেছে, এমন সময় ভাগীদার জানাইল যে নদীর ঘাটে একটি অপূর্ব্ব সুন্দরী কন্যা বসিয়া কাঁদিতেছে। তমসা গাজির কোন সন্তান ছিল না,—তাহার মন বাৎসল্য-রসে ভরপুর ছিল। কন্যাটিকে সে যত্ন করিয়া তাহার ডিঙ্গিতে তুলিয়া আনিল।

তমসা গাজির বাড়ীতে কাঞ্চন দিনরাত গৃহকর্ম্ম করে, যখন রাঁধিতে বসে, তখন দুই চক্ষের জলে তাহার শাড়ীর আঁচল ভিজিয়া যায়, উঠানে ঝাঁট দেওয়ার সময়ে সে শোকাকুলা হইয়া অবসন্নভাবে পড়িয়া যায়, কখনও কখনও জল আনিতে নদীর ঘাটে যাইয়া অশ্রু দিয়া যেন বিনা সুতায় মালা গাঁথে। তাহার হাড়ভাঙ্গা খাটুনি দেখিয়া তমসা গাজি ও তাহার স্ত্রী তাহাকে এত পরিশ্রম করিতে নিষেধ করে ও তাহাকে কত সোহাগ ও মমতা দেয়, কিন্তু এই বিষণ্ণ প্রতিমা যে কি দুঃখে এরূপ কাতর থাকে, একবার হাসে না, কোন আমোদে যোগ দেয় না, কি দুঃখে যে সে এমন বিমনা হইয়া থাকে—তাহা তমসা গাজি অথবা তাহার স্ত্রী কিছুই বুঝিতে পারে না।

একদিন তমসা গাজি কাঞ্চনকে বলিল ঃ—

"বাণিজ্যে যাইব লো কন্যা মোরে দেও কইয়া।
কি চিজ আনিব আমি তোমার লাগিয়া।।
তুমি তো ধর্ম্মের ঝি, আমরা বাপ মায়।
না পাইয়া পাইয়াছি ধন খোদার দোয়ায়।।"

কাঞ্চন কি আনিতে বলিবে? সে কাঁদিয়া আকুল হইল। সে যে রত্ন হারাইয়া পাগল হইয়াছে, তাহার কথা তো মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না।

ঠিক তিন মাস তের দিন অতীত হইলে গাজি বাণিজ্য করিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। সে দেশ-বিদেশ হইতে নানা দ্রব্য লইয়া আসিয়াছে; কতকগুলি কৌটা ভরিয়া সে ঝিনুকের ফুল আনিয়াছে; সমুদ্রের উপকূল হইতে সে কতকগুলি মতির মালা সংগ্রহ করিয়াছে—কাঞ্চন তাহা যদি পরে, তবে তাহার মুর্ত্তি দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিবে। কাঞ্চনের জন্য অগ্নিপাটের শাড়ী আনিয়াছে,—তাহার সুগৌর কান্তিতে সেই শাড়ী খুব মানানসই হইবে। তাহার কোমরে পরিবার জন্য ঘুঙ্গুর আনিয়াছে, নাকের "বলাক" (নোলক) পায়ের বাক-খাড়ু ও "বেকী" আনিয়াছে; মধুর মাছি তাড়ইয়া রসপূর্ণ বড় বড় মৌচাক গাজি মেয়েকে খাওয়াইবার জন্য সংগ্রহ করিয়াছে। সে দেশের উপাদেয় খাদ্য শুট্‌কি মাছ বাদ পড়ে নাই, আঁটি বাঁধিয়া প্রচুর পরিমাণে তাহা ও অন্যান্য বিবিধ দ্রব্য সে ডিঙ্গা ভর্ত্তি করিয়া বাড়ীতে লইয়া আসিয়াছে।

গাজি কি কি দেশে গিয়াছে, কোথায় কোথায় গিয়াছে, বিস্তারিতভাবে তাহার স্ত্রীর নিকট বর্ণনা করিল; এক দেশে সে দেখিয়াছে, কি চমৎকার উলু ছণের ঘর, তাহাতে কত কারিগরী। আর এক জায়গায় দেখিয়াছে, সেখানে লম্বা লম্বা গাছ, তাহাদের "মাথার উপর পানী"। সে দেশে পুরুষেরা রাঁধে বাড়ে এবং মেয়েরা হাল বায়, হাট বাজারে অবাধে মেয়েরাই বিকিকিনি করে। কত নদীর তীরে মহিষের 'বাথান' দেখা গেল, ছড়াতে (নির্ঝরে) পড়িয়া হরিণগুলি জলপান করিতেছে ঃ—

"নদীর কিনারে দেখিলাম মহিষের বাথান।
ছড়াতে পড়িয়া হরিণ করে জলপান।।
পাহাড় পর্ব্বত কত যাই ডিঙ্গাইয়া।
কত কত দূরের দেশ আইলাম দেখিয়া।।
কত কত নদী দেখিলাম তীরে ছুটে পানী।
কত কত দেখিলাম সাধুর তরণী।।
কত কত রাজার মুলুক আইলাম দেখিয়া।
গৃহিণীর কাছে কথা কয় বিস্তারিয়া।।"

তারপর গাজি বলিল ঃ—একখানে একটি মানুষ দেখিলাম, তাহার দুঃখে আমার প্রাণ গলিয়া গিয়াছে, তাহার কথা কিছুতেই ভুলিতে পারিব না; লোকটি একজন বুড়ো ধোপা। সে, সে দেশের রাজার বাড়ীর কাপড় কাচে; অদূরে রাজ-প্রাসাদ—তার এক পার্শ্বে সেই ধোপার কুঁড়ে; সে জরাজীর্ণ, গায়ে কোন সামর্থ্যই নাই, চোখ দুইটি ঘোলা, খুব উচ্চস্বরে কথা না বলিলে সে কানে শুনিতে পায় না; গায়ে একটুকু বল নাই, একদিনের কাজ সাত দিনে করে। দেখিলাম, সে এক একবার কাপড় কাচিতেছে ও পুনঃ পুনঃ বসিয়া পড়িতেছে ও তাহার বুক বাহিয়া চোখের জল পড়িতেছে। তাহার সেই দুঃখ দেখিয়া আমার বড় কষ্ট হইল, আমি নৌকা হইতে নামিয়া গিয়া তাহার কি দুঃখ জিজ্ঞাসা করিলাম। সে আমার দয়ার্দ্র কণ্ঠের স্বর শুনিতে পাইয়া হাউ মাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং বলিল—"ভগবান আমায় কেন বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন জানি না, আমার মৃত্যুই মঙ্গল।"

তাহার পরে বলিল, "আমার পুত্র বা অন্য সন্তান নাই, একটি কন্যা ছিল, সে কুলটা হইয়া বাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে, আমার কলঙ্কিত জীবনকে ঘৃণা করিয়া সমাজ আমাকে জাতিচ্যুত করিয়াছে। মেয়েটি আমার চোখের মণি ছিল,—আমি কানে শুনি না, চোখে দেখি না, আমার কেউ নাই, তবু সে আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল; তবুতো দিনরাত তাহার শোকে আমার প্রাণ হু হু করিয়া জ্বলে," এই বলিয়া সে নদীর কূলে বসিয়া মা মা বলিয়া কাঁদিতে লাগিল, তাহার দুঃখ দেখিলে পাষাণও বুঝি বিগলিত হইত।"

কাঞ্চন আর শুনিতে পারিল না, উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া গাজিকে বলিল—"তুমি যাহাকে দেখিয়াছ সেই ধোপা আমার বাপ, আমিই তাহার কলঙ্কিনী কন্যা,—আমি তাহার বুকে বড় দাগা দিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি। তুমি আমার ধর্ম্মের বাপ, আমাকে আমার বাবার কাছে লইয়া যাও, আমার বুকে দিন রাত্রি তুঁষের আগুন জ্বলিতেছে।"

মিলন, শেষ দর্শন ও দেহত্যাগ

বৃদ্ধ ধোপা কন্যাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল ঃ—"তোকে আর কি বলিব, শিশুকাল হইতে কত যত্নে কলিজার হাড়ের মত করিয়া পালিয়াছি; সেই কন্যা এত

নির্ম্মম হইলি, আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গেলি। তোর শোক তোর মাতা সহ্য করিতে পারিল না, ঐ খোরাই নদীর শ্মশান ঘাটে সে চিরতরে শয়ন করিয়া আছে।"

"এই ঘাটে কাপড় ধুই চক্ষে বহে পানী।
কন্যা হইয়া হইলা তুমি নির্দয়া পাষাণী।।"

কাঞ্চন পিতার বুকে মুখ লইয়া কাঁদিয়া তাহার দুঃখের কাহিনী শুনাইল, কন্যার হৃদয়ের ব্যথা পিতার মন বিদীর্ণ করিল। রাজার বাড়ীর সংবাদ কাঞ্চন পিতার মুখেই শুনিতে পাইল। রাজপুত্র এক রাজ-কন্যা বিবাহ করিয়া পরম সুখে জীবন যাপন করিতেছে। বিবাহ করিয়া সে সুখী হইয়াছে, একদিনও কাঞ্চনের কথা মনে করে না।

কাঞ্চনের মস্তকে যেন বাজ ভাঙ্গিয়া পড়িল। বৃদ্ধ ধোপা তাহার দুঃখ বুঝিতে পারিল এবং অতিশয় দুঃখার্ত্ত স্বরে বলিল ঃ—

"বড়র সঙ্গে ছোটর প্রীতি হয় অঘটন।
উঁচা গাছে উঠলে যেমন পড়িয়া মরণ।।
জমি ছাড়িয়া পা' দিলে শূন্যে না সহে ভর।
হিয়ার মাংস কাইটা দিলে আপনা না হয় পর।।
মেঘের সঙ্গে চাঁদের প্রীতি কতকাল রয়।
ক্ষণে দেখি অন্ধকার ক্ষণেক উদয়।।
কুলোকের সঙ্গে প্রীতি শেষে জ্বালা ঘটে।
জিহ্বার সঙ্গে দাঁতের প্রীতি সুবিধা পাইলে কাটে।।
না বুঝিয়া না শুনিয়া আগুনে হাত দিলে।
কর্ম্মদোষে অভাগিনী আপনি মরিলে।।"

বৃদ্ধ বলিল—"প্রীতি (পীরিতি) দোষের জিনিষ নহে। এক প্রেমে মানুষ বাঁচে, অন্য প্রেমে মৃত্যু ঘটে। চোখের কাজল কি সুন্দর, কিন্তু অস্থানে পড়িলে তাহার নাম হয় কালী। "চোখের কাজল কন্যা ঠাঁই গুণেতে কালী।" অস্থানে প্রেম অর্পণ করিলে তাহা কলঙ্কের কারণ হয়।

"শিরেতে বাঁধিয়া লইলে কলঙ্কের ডালি।
বাপে কাঁদে ঝিয়ে কাঁদে গলা ধরাধরি।।"

কিন্তু কাঞ্চন যে বাড়ী ফিরিয়াছে, তাহা কেহ জানে না। সকলে বলে, এক পাগলী রাস্তা, গাছতলা, নদীর পাড় ও হাট ঘাট ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার কোথায় বাস, কি করে কিছুই জানা নাই। হঠাৎ ঘূর্ণী বায়ু যেমন ধূলি উড়াইয়া লইয়া যায়, এই নারী তেমনই কিছুকাল একস্থানে থাকিয়া ছুটিয়া অন্যত্র যায়।

"গাছের তলা নদীর পাড়ে এই আছে এই নাই" কখন বিনা কারণে কাঁদে, কখনও হাসে, কখন করতালি দিয়া গান গায়।

একদিন সকলে দেখিল যে সে রাজঅন্তঃপুরে ঢুকিল; পালঙ্কে রুক্মিণী বসিয়াছিল, খানিক স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। বাহিরে আসিয়া দেখিল, রাজকুমার দরবারে আসীন, তাহার রূপ চাঁদের মতন আরো বেশী ঝলমল করিতেছে। সেইখানে কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া পাগলী চলিয়া গেল। কোথায় সে গেল, আর কেহ জানে না, তদবধি তাহাকে সে রাজ্যে আর কেউ দেখিতে পাইল না।

রাজবাড়ী হইতে বাহির হইয়া সে ছুটিয়া নদীর পাড়ে গেল।

কাঞ্চন নদীর পাড়ে আসিয়া নিজ মনে বলিয়া যাইতে লাগিল—

"আমি তোমার জন্য এতদিন বাঁচিয়াছিলাম, সে সাধ আজ মিটিয়াছে, তোমাকে চক্ষু ভরিয়া দেখিয়া লইয়াছি। তোমার সুন্দরী স্ত্রী লইয়া আজন্ম সুখে থাক, চিরকাল সুখে গৃহে বাস কর, এই আমার প্রার্থনা ঃ—

"না লইও না লইও বঁধু কাঞ্চনমালার নাম।
তোমার চরণে আমার শতেক পরণাম।।"

"নদীর এই ঘাটে পাতার বিছানায় তোমাকে পাইয়াছিলাম, সুখে দুজনে কত রজনী যাপন করিয়াছি। তুমি সে সকল দিনের কথা মনে করিও না,—তখন যে উভয়ে উভয়ের জন্য নিবিষ্ট হইয়া মালা গাঁথিতাম—সে সকল দিনের কথা একবারে ভুলিয়া যাও। সারারাত জাগিয়া আমি তোমার বাঁশীর গানে বিভোর হইয়া থাকিতাম। সে সকল দিনের কথা স্মরণ করিও না। অভাগিনীর সকল কথা ভুলিয়া যাও।"

নদীতীরে বসিয়া কাঞ্চন বলিল, "নদী! আমি তোমার ক্রোড়ে স্থান পাইতে আসিয়াছি। আমি যে মরিতেছি তাহা যেন কেহ জানে না, তোমার ঢেউগুলি যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে কথা প্রচার না করে। হে টুনটুনি পাখী, নদীর চরার হলদে পাখী, তোমরা আকাশে উড়িয়া আমার মৃত্যুর কথা কাহাকেও বলিও না। হে আকাশব্যাপী বাতাস,

জল-স্থলের সকল কথা তুমি জান, আমার কলঙ্কের কথা তুমি সবই জান, কাহারো কানে কানে আমার মৃত্যুর কথা বলিও না, তুমি রাত্রির সাক্ষী, দিনেরও সাক্ষী, সকলই তুমি জান, আমার মৃত্যুর কথা গোপন রাখিও।

"দেশের লোকে যেন নাহি জানে আমার মরণ-কথা।
কি জানি শুনিলে বঁধু পাইবে মনে ব্যথা।।"

পিতার উদ্দেশে কাঞ্চন মনে মনে প্রণাম জানাইয়া বলিল—"আমি যে দেশে ফিরিয়াছি সেই কথা কাহাকেও বলিও না। কলঙ্কিনীর নাম মন হইতে মুছিয়া ফেল।" চন্দ্রতারা, পশু-পক্ষী সকলকে ডাকিয়া কাঞ্চন তাহার মৃত্যুর কথা গোপন করিতে অনুরোধ জানাইল।

রাত্রি নিথর, নিঝুম—নদী নীরবে সমুদ্রের দিকে চলিয়াছে। তারকারা নিষ্পন্দ নিশ্চল চোখে সংসারের দিকে চাহিয়া আছে—শেষবার কাঞ্চন নদীকে প্রণতি জানাইয়া বলিল ঃ—

কোন দেশ হইতে আসিছ ঢেউ যাইবা কোথাকারে।
আমারে ভাসাইয়া নেও দুস্তর সাগরে।।
* * *
তারা হৈল নিমি ঝিমি রাত্র নিশাকালে।
ঝাঁপ দিয়া পড়ে কন্যা সেই না নদীর জলে।।

আলোচনা

কাঞ্চনমালা যে যুগের রচনা, তাহা চণ্ডীদাস-যুগকে স্মরণ করাইয়া দেয়। সে সময় বঙ্গদেশে সহজিয়া তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের ঢেউ চলিতেছিল। সহজিয়াদের প্রেম-রাজ্যে নাপিতবধু, ধোপানি ও বাঙ্গলার অপরাপর নিম্ন শ্রেণীর মেয়েদের সঙ্গে প্রেমের অনুষ্ঠানের বিধি আছে। এই যুগের পল্লীগীতগুলিতে বড়লোকের সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের ভাবের আদান-প্রদানের কথা প্রায়ই পাওয়া যায়। শ্যামরায়ের গান, মহুয়া, আঁধা বঁধু প্রভৃতি কতকগুলি পল্লীগীতি এই ভাবের। এটা একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা যে—এই আদর্শে যে সকল গীতি রচিত হইয়াছে, তাহার সকলগুলির ভাব ও

ভাষার সঙ্গে চণ্ডীদাসের পদাবলীর সাদৃশ্য আছে। সে সকল কথা এখানে লিখিতে যাওয়া ঠিক স্থানোচিত হইবে না। পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকায় আমি এ সকল বিষয়ের কতকটা সবিস্তার উল্লেখ করিয়াছি।

যে সকল গল্প এই ভাবে সমাজ-সাম্যের অনুকূল, তাহা ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ভাব ও ভাষার দ্বারা এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়।

কিন্তু সহজিয়া ও তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে যে সকল জটিল বিধান পাওয়া যায়, পল্লীর গান—সে সমস্ত হইতে নায়ক নায়িকাদিগকে মুক্ত করিয়া লইয়াছে। কোন তত্ত্ব কথার বাহানা নাই, কোন পারিভাষিক বা দোহার দুর্ব্বোধ সূত্রের বালাই নাই—এই সকল গল্পের নায়ক নায়িকার প্রকৃতি সহজ পথে বিকাশ পাইয়াছে—যেভাবে ফুল ফুটিয়া উঠে, লতা মুঞ্জরিত হয় ও কোকিলের স্বরে বায়ুমণ্ডল মুখরিত হয়। এখানে 'গুরু'র উপদেশের জন্য প্রতীক্ষা নাই, পর পর ভালবাসা কি কি সূত্র আশ্রয় করিয়া স্তরে স্তরে উন্নত কোন ধর্ম্মের আদর্শে পৌঁছিবে তাহার বিবৃতি নাই। অথচ সহজিয়াদের সর্ব্বস্ব দেওয়া প্রেমের হাওয়া যে ইহাদের মধ্যে বহিয়া নিষ্কলুষ প্রেমকে মূর্ত্তিময়ী হ্লাদিনী শক্তিতে পরিণত করিয়াছে, তাহা অতি স্পষ্ট কথায় বোঝা যায়।

এই চিত্রের প্রধান চরিত্র কাঞ্চন যৌবনের সার-ধর্ম্ম প্রেম বুঝিয়াছিল, অথচ সে এবং তাহার প্রণয়ী যে সামাজিক বিধানানুসারে পাংক্তেয় নহে, তাহা কাঞ্চন যতটা বুঝিয়াছিল—তাহা তাহার পূর্ব্বানুভূতির ছত্রে ছত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। সে হৃদয়ের সঙ্গে দুরন্ত সংগ্রাম চালাইয়া দ্বিধা কম্পিত চরণে অগ্রসর হইয়াছে—এবং সহজে ধরা দেয় নাই। পরিণামের চিন্তা তাহার ভাবের দ্রুত গতিকে মন্থর করিয়াছিল—কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে হৃদয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কেহ জয়ী হইতে পারে না। কাঞ্চন যখন পালাইয়া আসিল, তখনও ভাবী বিপদের আশঙ্কা তাহার মনের ভিতর লুক্কায়িত ছিল। সুখের নির্ম্মল পল্লী-জীবন তাহার হৃদয়ে একখানি স্বর্ণ পটের মত আঁকা ছিল; আর সে দিগন্তে বিলীন শালী ধানের ক্ষেত, তাহাদের গৃহ-তরুগণের শ্যামল শোভা ও তদবকাশে দৃষ্ট আকাশের নীলিমা ও প্রতিবাসী প্রিয়জনদের মুখ সে দেখিতে পাইবে না—এই দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। রাজকুমার তাহাকে অনেক প্রবোধ দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার প্রাণ রহিয়া রহিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল।

এত ভালবাসার যে ভীষণ প্রতিদান সে পাইল, তাহার সরল প্রাণ তজ্জন্য

একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। তিন মাসের পরিবর্ত্তে সে এক বৎসর প্রতীক্ষা করিয়াছিল, তথাপি সে আশা ছাড়িতে পারে নাই, মোহিনী আশার আকর্ষণ এত বেশী। এক বৎসর পরেও সে নদী তীরে বসিয়া ভাবিয়াছিল, কুমার তাহার জন্য হীরামতির ফুল আনিবেন, সে দরিদ্র অভাগিনী সে সেই উপহারের কি মূল্য দিবে? সে তাহার দুটি চক্ষের জল দিয়া সেই হীরামতির ফুল গ্রহণ করিবে।

তাহার এত আশা এত ভরসার পরে ত্রয়োদশ মাসের পরেও যখন কুমার আসিলেন না, তখন কাঁদিয়া কাটিয়া ঘরের বাতি সে ফুঁ দিয়া নিবাইল। আর প্রতীক্ষার অবকাশ নাই।

কুমার বা কুমারের চিন্তা ছাড়া তার আর সংসারে কোন আকর্ষণ ছিল না, কুমার সুখী হইয়াছেন, ইহা জানিয়া সে নিশ্চিন্ত মনে প্রাণ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইল। এই মহাদুঃখ ও পরকৃত মহা অত্যাচারের মধ্যেও সে কুমারের নিষ্ঠুরতার কথা,—রুক্মিণীর বিশ্বাসঘাতকতার কথা একবারও উচ্চারণ করে নাই। শুধু কুমারের জন্য নহে, রুক্মিণীর জন্যও সে শুভ কামনা করিয়া ভালবাসার যজ্ঞে প্রাণ আহুতি দিয়াছে। নদীর কূলে পাতার বিছানা তৈরী করিয়া যে স্থানে রাজকুমারকে অভ্যর্থনা করিয়াছে, সেই চিহ্ন দেখিতে দেখিতে সজল চক্ষে সে সংসার হইতে বিদায় নিল; মৃত্যুকালে সে চরাচরের জীব-জন্তু সকলকে মিনতি করিয়া সাবধান করিয়া গেল—যেন তাহার মৃত্যু কথা কেহ প্রচার না করে। সে নীরবে প্রেমের জন্য চূড়ান্ত আত্মত্যাগ দেখাইতে জগতে আসিয়াছিল, —সে প্রেমের মধ্যে কোন অভিযোগ, অদৃষ্টের প্রতি ধিক্কার কিম্বা পরের প্রতি বিরূপ ভাব ছিল না; তাহার প্রেমাভিনয একান্তই নীরব ছিল, এবং নীরবে সে কাহাকেও মৃত্যুর জন্য দোষী না করিয়া বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। সে এই মৃত্যু-কথা গোপন করিতে সকলকে বলিয়া গেল কেন—তাহা একটি কথায় সে বলিয়া গেল। প্রকৃত ভালবাসায় সংশয়ের স্থান নাই, সে জানিত তাহার এত ভালবাসার ফল অবশ্যই ফলিবে, কুমার কোন না কোন সময় অনুতপ্ত হইবেন, কিন্তু কাঞ্চন রাজকুমারের মনে এতটুকু দুঃখ হয় ইহা চায় না ঃ—

"কি জানি শুনিলে বঁধু পাইবে মনে ব্যথা।"

এই ছত্র অমূল্য। এত যে নিষ্ঠুর তাহার প্রতিও কাঞ্চনের কতখানি দরদ! কতখানি বিশ্বাস!

এই স্বর্ণ-প্রতিমাকে সমাজের দিক দিয়া এমন কি নিজের স্বগণের দিক দিয়া,

কুল-শীল-মান-ধর্ম্ম এ সকলের দিক দিয়া বিচার করিলে তাহা অবিচার হইবে। একটি মাত্র মানদণ্ডে তাহার বিচার হইতে পারে, তাহা শুধু অমিশ্র ও বিশুদ্ধ প্রেমের মাপকাঠি। সে দিক দিয়া সে একেবারে নিখুঁত, একটি চরম আদর্শ। বাঙ্গালা দেশ, যেখানে চৈতন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—সেখানে যে প্রেমের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ খেলিয়াছে, তাহা অন্যত্র সুদুর্লভ। কাঞ্চনের জোড়া অন্য কোন দেশের সাহিত্যে আছে কিনা, তাহা বলিতে পারি না।

একালে যাহারা যুদ্ধজয় করে, পরকে হত্যা করিবার নানা বৈজ্ঞানিক অভিসন্ধি উদ্ভাবন করে, যুদ্ধে আহতদিগের শুশ্রূষা করে, তাহাদেরই ঢি ঢি নাম। কাঞ্চনের মত আত্মত্যাগের চিত্র—এখন যবনিকার অন্তরালে। কিন্তু হয়ত দ্যুলোকে ভূলোকে প্রচুর রক্তবর্ষণের পর—মানুষের রক্তপিপাসা যখন মিটিয়া যাইবে,—যখন পুনরায় দয়ামায়া ত্যাগ প্রভৃতি মহৎ গুণের জন্য আত্মা লালায়িত হইবে, তখন বঙ্গদেশের এই প্রেমের আদর্শগুলি দরে বিকাইবে, জগতের চিত্রশালায় শ্রেষ্ঠ নর-নারীদের পংক্তিতে আসন গ্রহণ করিবে। তখন একটি নিঃস্বার্থ অশ্রুর দাম গুণবেত্তার নিকট দশটি "ফটি পাউণ্ডার" অপেক্ষা অধিক আদরের জিনিষ হইবে।

গল্পগুলি খুব সংক্ষিপ্ত। পল্লীকবিরা বাজে কথা জানে না, যেটুকু বলা দরকার, তাহার অতিরিক্ত কথা দ্বারা তাহারা গল্প পল্লবিত করে না। তমসা গাজির যে ছবি কবি দুই একটি রেখায় আঁকিয়াছেন—তাহা কেমন জীবন্ত! সেকালের বাণিজ্য, মেয়েদের গহনা, খেলার জিনিষ, এমন কি পল্লীবাসিরা মধুর চাক ভাঙ্গিয়া, তাহা কি আনন্দে খাইত, তাহার বর্ণনা কি চমৎকার! যে দেশে নারিকেল জানা নাই, তাহারা সেই গাছ দেখিয়া এবং তাহার মাথার উপর ফলে জলের সঞ্চার দেখিয়া কিরূপ আনন্দিত হয়—যে দেশে বাথানে মহিষ চরিয়া বেড়ায় এবং পাহাড়ের গাত্র-নিঃসৃত ছড়া হইতে বড় বড় চোখ বিস্তার করিয়া হরিণ জল পান করে, যে দেশে ধান ভাঙ্গিয়া চাউল করিয়া উত্তর দেশ হইতে শত শত বৃহৎ ডিঙ্গি দক্ষিণ দেশের উপত্যকায় চলাফেরা করে—সেই সকল দেশের কথা—কবি চিত্রকরের মত দুই একটি রেখার টানে কেমন সুন্দরভাবে আঁকিয়াছেন। তমসা গাজির বাড়ীতে কবি অতি কৌশলে কাঞ্চনের পিতার কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়া সেই দৃশ্যটি করুণ রসে প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছেন। কাঞ্চনের প্রতি তাহার পিতার উপদেশগুলি হ্যামলেট নাটকের পলনিয়াসের উক্তির মত, কতকগুলি সাংসারিক জীবনের অভিজ্ঞতাসূচক নীতি-কথা। কিন্তু কাঞ্চনের পিতার উপদেশগুলি বেশী সারগর্ভ এবং তাহাতে পলনিয়াসের বাক্য-পল্লবতা নাই।

চন্দ্রাবতী

জয়চন্দ্র ও চন্দ্রা—কৈশোরে

অদূরে ফুলেশ্বরী নদী বহিয়া যাইতেছে; পাড়ুড়িয়া পল্লী নদীর ধারে একখানি ছবির মত দাঁড়াইয়া আছে। এই পল্লীতে অনেক ব্রাহ্মণের বাস, সেইখানে একটি পুকুরের চারিধারে ফুলের বাগান, কত নাগেশ্বর, কুন্দ, জবা, মালতী ও চাঁপা ফুটিয়া আছে, —অতি প্রত্যুষে একটি মেয়ে ও একটি তরুণ যুবক সেই পুকুরপাড়ে ফুল তুলিতে আসে। একদিন সুন্দরী কুমারী বালককে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি? তুমি তো আমাদের গাঁয়ের লোক নও, তুমি রোজ আসিয়া ডাল ভাঙ্গ ও সকল ফুল তুলিয়া লইয়া যাও।" জয়চন্দ্র বলিল, "আমি তোমার গাঁয়ের কেহ নহি, কিন্তু আমি দূরের লোক নহি। তোমার গ্রাম ও আমাদের গ্রাম—এই নদীর দুই পারে।"

দুইজনে আবার নীরবে ফুল তুলিতে লাগিল; চন্দ্রার সাজি জবা ফুল, গান্ধা, মল্লিকা ও মালতীতে ভর্ত্তি হইয়া যায়; ক্রমশঃ তাহাদের আলাপ একটু ঘনিষ্ঠ হইল, যে সকল ফুলগাছের ডাল উঁচু, চন্দ্রা হাতে পায় না, তাহা জয়চন্দ্র নোয়াইয়া ধরে এবং চন্দ্রা অনায়াসে ফুল পাড়িয়া লইয়া যায়।

"ডাল যে নোয়াইয়া ধরে জয়চন্দ্র সাথী।"

একদিন চন্দ্রা একটি ফুলের মালা জয়চন্দ্রের গলায় পরাইয়া দিল এবং সেই হইতে চন্দ্রা রোজই একটি করিয়া মালতীর মালা গাঁথিয়া জয়চন্দ্রকে উপহার দেয়। চন্দ্রাবতীর পিতা বংশীদাস রোজ রোজ চন্দ্রার তোলা ফুলে শিবপূজা করেন।

একদিন চোখের জলে সিক্ত করিয়া জয়চন্দ্র চন্দ্রাকে পুষ্পপত্রে অতি সংক্ষেপে একখানি চিঠি লিখিল, তাহাতে তাহার মনের কথা তাহাকে জানাইল;—"আমি তোমার রূপে মুগ্ধ হইয়াছি, এইখানে ফুল তুলিতে আসি তোমার সঙ্গলাভের জন্য; তুমি চলিয়া গেলে এই ফুলের বাগান আমার চোখে আঁধার হইয়া যায়।"

"পুষ্পবন অন্ধকার তুমি চলে গেলে।"

তোমার গাঁথা মালা হাতে লইয়া যে আমি সারাদিন কাঁদিয়া কাটাই, তাহা তুমি জান না। আমার মাতা পিতা নাই, মামার বাড়ীতে থাকি। যদি তোমার সদয় উত্তর পাই, তবেই আমি এ অঞ্চলে থাকিব, নতুবা চিরকালের জন্য তোমার নিকট বিদায় লইয়া দূরদেশে চলিয়া যাইব।"

পরদিন প্রাতে মেঘের উপর তরুণ সূর্য্যের ঝিকিমিকি খেলিতেছে। অরুণ ঠাকুরের গায়ে হলুদ-মাখান রংয়ের মত আজ তাহাকে দেখাইতেছে। চন্দ্রার শয্যা হইতে উঠিতে একটু দেরী হইয়া গিয়াছে, সে তাড়াতাড়ি ফুলের বাগানে আসিয়া সর্ব্বপ্রথম কতকগুলি জবা ও অপরাপর ফুল তুলিল, সেগুলি তাহার পিতার শিব-পূজার জন্য; তারপর একটি মালতি ফুলের মালা গাঁথিয়া শেষ করিয়াছে, এমন সময় জয়চন্দ্র আসিয়া তাহার হাতে পুষ্প-পত্রে লেখা চিঠিখানি দিল; জয়চন্দ্র বলিল, "চন্দ্রা একটু অপেক্ষা কর, আমার দুটি কথা বলিবার আছে," কিন্তু বালিকা বলিল, "আজ বেলা হইয়া গিয়াছে,—পিতার শিব-পূজার দেরী হইয়া যাইবে, আজ আমি ঘরে যাই।" এই বলিয়া সে জয়চন্দ্রের লেখা চিঠিখানি নিজের আঁচলের কোণে বাঁধিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

"পুষ্প পত্রে বাঁধি কন্যা আপন অঞ্চলে।
দেবের মন্দির কন্যা ধোয় গঙ্গাজলে॥
সম্মুখে রাখিল কন্যা দেবের আসন।
ঘষিয়া লইল কন্যা সুগন্ধী চন্দন॥"

তারপর শিব পূজার ফুল পুষ্পপাতে রাখিয়া দিল। বংশীদাস পূজা করিতে আসিয়া আসনে বসিলেন। তাঁহার দেহ স্থির, অকম্পিত, মন একাগ্র। তাঁহার মনের প্রধান কামনা তিনি দেবতার নিকট নিবেদন করিলেন। একাগ্রচিত্তে শিবের কাছে তাঁহার অভীষ্ট বর প্রার্থনা করিলেন। প্রথম পুষ্পটি অর্পণ করার সময় প্রাণ-মনে জানাইলেন, "আমি নিঃসহায় সঙ্গতিশূন্য ব্রাহ্মণ, আমি কেমন করিয়া কন্যাটির বিবাহ দিব?"

"এত বড় হৈল কন্যা না মিলিল বর।
কন্যার মঙ্গল কর অনাদি শঙ্কর॥
বনফুলে মন-ফুলে পূজিব তোমায়।
বর দিয়া পশুপতি ঘুচাও কন্যাদায়॥
সম্মুখে সুন্দরী কন্যা আমি যে কাঙ্গাল।
সহায় সঙ্গতি নাই দরিদ্রের হাল॥"

প্রথম পুষ্প শিবের চরণে অর্পণ করিয়া বলিলেন, "দেব! আজই যেন ভাল বরের প্রস্তাব লইয়া ঘটক আমার বাড়ীতে আইসে।"

দ্বিতীয় পুষ্প অর্পণ করিয়া এই বর যাচ্ঞা করিলেন, "যেন বর পুরন্দরের মত প্রতাপশালী হয়।"

তৃতীয় পুষ্প আরাধ্যের পদে অর্পণ করিয়া বলিলেন, "আমার বংশ উজ্জ্বল, বর যেন এই ভট্টাচার্য্য বংশের যোগ্য হয়, তাহার কুলশীল যেন দীপ্তিমান হয়।"

তারপর ষাষ্টাঙ্গে ভূতলে লুটাইয়া করযোড়ে এই প্রার্থনা করিলেন, "দেবাদিদেব—আমার কন্যার যেন ভাল বরে ভাল ঘরে বিবাহ হয়।"

পিতার পূজার আয়োজন করিয়া দিয়া চন্দ্রাবতী নিজের ঘরে আসিয়া জয়চন্দ্রের পত্রখানি খুলিল। পত্র পড়িয়া তাহার চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল। "ছোটকাল হইতে তোমার সঙ্গে একত্র খেলা করি, তোমায় দেখিতে ভালবাসি, বেশ সুখেই ত ছিলাম, তুমি এভাবে পত্র লিখিলে কেন? আমার যে কত লজ্জা হইতেছে, তাহা কি বলিব।" সে অতি সাবধানে দুটি ছত্রে পত্রের উত্তর লিখিল।

"ঘরে মোর আছে বাপ আমি কিবা জানি।
আমি কেমনে দেই উত্তর অবলা রমণী॥"

তাহার মনের কথা কিছুই বলা হইল না, শত কথা গোপন করিয়া ঐ দুটি মাত্র ছত্রে উত্তর দিল।

"যত না মনের কথা রাখিল গোপনে।
পত্রখানি লিখে কন্যা অতি সাবধানে॥"

কিন্তু সে কথা পত্রে ফুটিল না। নিজ কক্ষে বসিয়া তাহার আরাধ্য দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট সে করযোড়ে বলিল :—

"জয়চন্দ্রকে আমার স্বামী করিয়া দাও, আমার কোন দুঃখই দুঃখ বলিয়া মনে হইবে না, আমার জন্ম সার্থক হইবে, জীবন ধন্য হইবে।" চন্দ্র সূর্য্যকে সাক্ষী করিয়া বলিল, "হে রাত্রি ও দিনের ঠাকুর! তোমাদের অগোচর কিছুই নাই। জয়চন্দ্র ভিন্ন আমি কাহারও গলে মালা দিব না, আমায় আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমার মনের বাসনা পূর্ণ হয়।"

কিন্তু মনে মনে যাহাই প্রার্থনা করুক, জয়চন্দ্রের পত্রখানি পাওয়ার পর হইতে তাহার হৃদয়ে একটা দারুণ লজ্জার ভাব আসিল। সে আর ফুল তুলিতে পুকুরের ঘাটের উদ্যানে যাইতে পারিল না; তাহার দ্বিধাকম্পিত পদদ্বয় ঘরের বাহির হইতে কুণ্ঠা বোধ করিতে লাগিল। সে লজ্জায় আর চক্ষু মেলিয়া সরল দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাহিতে পারে না—কি জানি পাছে জয়চন্দ্রকে দেখিয়া ফেলে। অতিশয় লজ্জা যেন তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল।

তদবধি সে পুকুর ঘাটে আর যায় না, বাড়ীর আঙ্গিনার পূর্ব্ব দিকে যে সকল নাগেশ্বর ও চাঁপা ফোটে তাহাই দিয়া সে পিতার পূজার ব্যবস্থা করে, আর ঘরের পাছে একটা টক্‌টকে লাল জবা ফুলের গাছ আছে, সেই গাছটার অজস্র দানে তাহার তাম্রকুণ্ড পূর্ণ হয়।

কিন্তু যদিও একটা কুঁড়ির মত লজ্জাশীলা, তথাপি তাহার প্রেম গভীর ও আকুতিপূর্ণ। সে মনে মনে বলে, "এই যে বাড়ীর মালতি ফুলের গাছটা, ইহারই ফুলে আমি রোজ রোজ মালা গাঁথিয়া তোমার উদ্দেশে তাহা বায়ুর স্রোতে ভাসাইয়া দিব। এই জবা ফুলগুলি ফুটিয়া লাল হইয়া আছে, বাবা যেমন এই ফুল দিয়া শিব পূজা করেন, আমি তেমনই জবা ফুলে তোমাকে পূজা করিব। আর কি সুন্দর ওই মল্লিকা ও কেওয়া ফুল—ইহাদিগকে সাক্ষী করিয়া আমি প্রার্থনা করিতেছি, জন্মে জন্মে যেন জয়চন্দ্রকে আমি পতিরূপে পাই।"

আর জয়চন্দ্রের সঙ্গে দিনে একবারও দেখা হয় না। কিন্তু চন্দ্রার মানস-পটে সে জয়চন্দ্রকে আঁকিয়া রাখিয়াছে, তাহা মুছিয়া ফেলিবার নহে, সুখে-দুঃখে, আশা-উৎকণ্ঠায় সে চোখের জলে সেই স্মৃতির তর্পণ করে।

বিবাহের উদ্যোগ

ইহার মধ্যে বংশীদাসের বাড়ী একদিন এক ঘটক চন্দ্রাবতীর বিবাহের একটা প্রস্তাব

লইয়া আসিল। সে বংশী ভট্টাচার্য্যকে বলিল, "আপনার কুল নির্ম্মল, চন্দ্রের মত—এদেশে আপনার বংশের ন্যায় আর দ্বিতীয়টি নাই। আপনার কন্যা শুনিয়াছি, রূপে গুণে ধন্যা, বিদ্যাধরীর মত সে সুন্দরী। শুনিয়াছি তাহার বিবাহের যোগ্য বয়স হইয়াছে। আপনি আমাকে অনুমতি দিন, এই বিবাহের আমি ঘটকালি করি।"

বংশী বলিলেন, "অবশ্য কোন বর আপনার মনে আছে, বলুন না সে কে, তাহার পরিচয় দিন!" ঘটক বলিল—"আপনি ঠিকই অনুমান করিয়াছেন, আমি একটা প্রস্তাব লইয়াই আসিয়াছি। ফুলেশ্বরীর অপর পাড়ে সুন্ধা গ্রামের জয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে চন্দ্রার সম্বন্ধের প্রস্তাব করিতেই আমি আসিয়াছি। তাহার কুল উচ্চ, আপনার বংশের সঙ্গে বেশ মিলিবে। আর আপনার কন্যা যেরূপ রূপবতী, জয়চন্দ্রও সেইরূপ রূপবান, দেখিতে সে কার্ত্তিকের মত। তাহা ছাড়া সে অল্প বয়সেই শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত, "নানা শাস্ত্র জানে বর অতি সুপণ্ডিত।" এই বরের সঙ্গে বিবাহ দিলে কন্যাটি সুখে থাকিবে, "কন্যা বরয়তি রূপং", রূপে জয়চন্দ্র তরুণ সূর্য্যের ন্যায়। অন্যান্য কোন বিষয়েই সে খাট নহে। "শুভস্য শীঘ্রং" আপনার মনোনীত হইলে বিবাহে বিলম্ব করিবেন না। দেখুন, বসন্ত ঋতু দেখা দিয়াছে, আমের মুকুল মুঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে, মাঝে মাঝে নূতন পাতা দেখা দিয়াছে, এখনও পশ্চিম হাওয়ায় গায়ে কাঁটা দেয়,—শীতকালের রেশটুকু এখনও ফুরায় নাই। মধ্য নদীতে ভাঁটা পড়িয়াছে, জলে টান ধরিয়াছে। এই বসন্তের আগমনে চারিদিকে যেন বাসর-শয্যা দেখা যাইতেছে, আপনি অনুমতি করিলে এই মাসেই একটা ভাল দিন স্থির করিতে পারা যায়।"

বংশীদাস কোষ্ঠী বিচার করিলেন, একবারে রাজযোটক, বর ও কনের আশ্চর্য্য মিল সচরাচর বড় দেখা যায় না। যখন কোষ্ঠীর ফল শুভ, তখন বংশীদাসের আর কোন দ্বিধাই রহিল না—বিবাহের দিন পাকা হইয়া গেল।

শুভ লগ্ন স্থির হইল। তখন বসন্তের হাওয়া প্রকৃতিকে আনন্দরসে ডুবাইয়া ধরিত্রীর বক্ষ পুলকে স্পন্দিত করিয়া ঘন ঘন বহিতেছে,—আম গাছের মুকুল হইতে শ্যামবর্ণের কুঁড়ি বাহির হইয়াছে। চারিদিকে অশ্বত্থ ও পন্নগ বৃক্ষে নূতন পাতার সমারোহ। পান ও খিলি বিতরিত হইয়া বিবাহের উদ্যোগ চলিল।

প্রথম দেবতাদের পূজা,—বাগানে, বনে যত লাল, নীল, সাদা ফুল—তাহারা সুরভি দিতে দিতে মেয়েদের হাতে পড়িয়া সাজি ভর্ত্তি করিল। সর্ব্বপ্রথম দেবাদিদেব শঙ্করের

পূজা হইল, তার পর বনদুর্গা, একচূড়া ও শ্যামা পূজা হইল। ইহার পর অধিবাস ও আভ্যুদিকের ঘটা চলিল। মেয়েরা নিজহাতে মাটি কাটিয়া ইষ্টক প্রস্তুত করিল, পাঁচটি এঁয়ো সেই ইঁটে তৈল সিন্দূর মাখাইল। আভ্যুদিক শেষ হইলে, এঁয়োগণ বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া "সোহাগ" মাগিতে লাগিল। কন্যার মাতা ও খুড়ি সর্ব্বপ্রথম বরণ ডালা লইয়া পল্লী-পথে যাইতে লাগিলেন, ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনির রোল উঠিল, এঁয়োরা জলপূর্ণ ঘট লইয়া বাড়ী বাড়ী আশীর্ব্বাদ চাহিয়া চলিল।

বিবাহে বিভ্রাট

সেই সময়ের আর একটি ঘটনা। সুন্ধা নদীর তীরে কে এক সুন্দরী জল আনিতে চলিয়াছে? তাহার বর্ণ ঠিক চাঁপা ফুলের মত, তাহার গতি খঞ্জনের ন্যায়, চোখের চাউনি যেন মর্ম্মভেদ করিয়া চলিয়া যায়। একটি তরুণ যুবক হিজল গাছের মূলে বসিয়া চির-পিপাসিতের ন্যায় সেই রূপ-সুধা পান করিতেছে।

একদিন সেই বসন্তের হাওয়ার মর্ম্মর শব্দে যখন নব পল্লব শোভিত, অশ্বত্থ গাছ যেন শিহরিয়া উঠিয়াছে, তখন যুবক একখানি পত্র লিখিয়া হিজল গাছের মূলে রাখিল এবং পাগলের মত হিজল গাছকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ঢেউ পাড়ে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়ে, কিন্তু ফিরিয়া যাইয়া আবার সেই পাড়ে মাথা কুটে; আমি এখন চলিয়া যাইব, কিন্তু মর্ম্মের বেদনা লইয়া, হে হিজল তরু, আবার তোমার কাছেই আসিব। এই সুন্দরী ললনা যখন এ পথ দিয়া যাইবে, তখন তোমার পত্র-কম্পনের শব্দে তাহাকে ইঙ্গিত করিও, তোমার ডালে বসিয়া যে সকল পাখী গান করে, তাহারা যেন ইশারা করে, পত্রখানি যেন সুন্দরীর দৃষ্টিগোচর হয়;—তোমরা বুঝাইয়া বলিও, আমি তাহার জন্য আহার নিদ্রা ছাড়িয়াছি, আমার দুঃখের কথা তাহাকে বলিও।"

পরদিন পত্রের উত্তরের আশায় যুবক সেইখানে অতি প্রত্যূষে যাইয়া প্রতীক্ষা করিয়া রহিল ঃ—

"যেখানে ফুটেছে ফুল মালতী-মল্লিকা,
ফুট্যা আছে টগর বেল আর শেফালিকা,
হাতেতে ফুলের সাজি কপালে তিলক ছটা
ফুল তুলিতে যায় কুমার মনে বিন্ধ্যা কাঁটা।"

জয়চন্দ্রের প্রেমের এই দ্বিতীয় অধ্যায়—এদিকে বংশীদাসের বাড়ীতে তাহার বিবাহের বাজনা বাজিতেছে ও এঁয়োরা চন্দ্রাকে সাজাইয়া একখানি রূপের প্রতিমা করিয়া তুলিয়াছে।

ঢোল ডগর বাজিতেছে। চতুর্দ্দিকে হুলুধ্বনি, মেয়েরা মালা গাঁথিতেছে ও বিবাহের গান গাইতেছে, সমস্ত গৃহময় আনন্দের কলরব। এমন সময় জনরব এক দুঃসংবাদ ভাসাইয়া আনিল। আনন্দের কলরবে মুখরিত গৃহ সহসা স্তব্ধ হইয়া পড়িল; বিবাহের গানের পরিবর্ত্তে, বুক-ফাটা কান্নার রোল পড়িয়া গেল; "কি হইয়াছে?" "কি হইয়াছে?" বলিয়া লোকজন ধাওয়া ধাই করিতে লাগিল; এ যেন বন্দরে আসিয়া মাল বোঝাই নৌকার ভরা ডুবি হইল।

দৈবের আঘাত এমনই সাংঘাতিক ও অচিন্তিতপূর্ব্ব। জয়চন্দ্র হঠাৎ মুসলমান-কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া মুসলমান হইয়াছে। এ যেন আকাশ-চুম্বী মঠের অগ্রভাগে বজ্রপাত হইল। এত বড় বংশ, এত বড় পাণ্ডিত্য ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা, তার উপর এমন দাগা কে দিল? ঠাকুর বংশীদাস মাথায় হাত দিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলেন ঃ—

"ধুলায় বসিল ঠাকুর শিরে দিয়া হাত।
বিনা মেঘে হৈল যেন শিরে বজ্রাঘাত॥"

সহচরীরা চন্দ্রারে ঘিরিয়া বসিল, তাহারা কান্নাকাটি করিতে লাগিল; কেহ দৈবের দোষ কীর্ত্তন করিতে লাগিল, কেহ বা এমন সুলক্ষণা রূপসী কন্যার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কত দুঃখ করিল। তাহারা মাথায় হাত দিয়া কান্না জুড়িয়া দিল। কিন্তু চন্দ্রা স্তব্ধ—প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায়। সে কিছুই বলিল না, যার জন্য ঘর-ভরা লোক বিলাপ ও আর্ত্তনাদ করিতেছে সে নীরব।

"না কাঁদে না হাসে চন্দ্রা নাহি কহে বাণী।
আছিল সুন্দরী কন্যা হইল পাষাণী॥
মনেতে ঢাকিয়া রাখে মনের আগুনে।
জানিতে না দেয় কন্যা জ্বলি মরে মনে॥"

একদিন দুইদিন করিয়া চারদিন কাটিয়া গেল। চন্দ্রা খাইতে যাইয়া বসে কিন্তু একটি ভাতও খায় না—পাতের ভাত পাতে পড়িয়া থাকে। রাত্রে তাহার শর-শয্যা, তখন নির্জ্জনে উৎসের ন্যায় চোখের জল উথলিয়া ওঠে, বালিস ভিজিয়া যায়। শৈশবের সেই

চন্দ্রাবতী

" —পিতা মোর বাক্য ধর
জন্ম না করিব বিয়া হৈব আইবর।"

(পৃষ্ঠা ১৩১)

ফুল তোলার কথা, ফুলেশ্বরী নদীতে সাঁতার কাটা ও জলখেলা—সেই শত কথা যেন বৃশ্চিকের মত দংশন করে। একটু ঘুম আসিলে সেই মূর্ত্তি,—তাহার স্বপ্ন-দৃষ্ট মূর্ত্তির মুখে সেই পাঁজর-কাটা হাসি। বিনা ঘুমে রাত্রি কাটাইয়া শুষ্ক মুখে শয্যার একপ্রান্তে বসিয়া থাকে। সহচরীদের সঙ্গে আলাপ নাই, নিজের মনের দুঃখ নিজ মনে গোপন করিয়া চন্দ্রা জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিল। কিন্তু বংশীদাস চন্দ্রার মনের দুঃখের কথা বুঝিলেন, যে সকল কথা সে সহচরীদের কাছে গোপন করিল, কন্যার মুখের কথায় ব্যক্ত না হইলেও পিতা তাহার সবই বুঝিলেন। এ ব্যাপারে কন্যার কি দোষ? বরং তাহার প্রতি সকলেরই করুণা হইল; বংশীদাস নিজে মহাপণ্ডিত ছিলেন। নিজে চন্দ্রাকে শাস্ত্র পড়াইয়াছিলেন। এরূপ রূপসী ও গুণবতী কন্যাকে বিবাহ করিতে অনেকেই প্রস্তুত হইল। বিবাহের প্রস্তাব নানাস্থান হইতে আসিতে লাগিল।

বংশীদাস সেই সকল প্রস্তাব বিচার করিতে লাগিলেন, কিন্তু চন্দ্রা বলিল ঃ—

"—পিতা মোর বাক্য ধর।
জন্মে না করিব বিয়া হৈব আইবর।।
শিব পূজা করি আমি শিবপদে মতি।
দুঃখিনীর কথা রাখ, কর অনুমতি।।"

যে শিব জগতের হলাহল পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়াছিলেন, যিনি চির ভিখারী; —সুখের প্রতি বীতস্পৃহ, শ্মশানবাসী, সেই শিবকে পূজা করিয়া চন্দ্রা উর্দ্ধলোকে উঠিয়া দুঃখের অতীত হইবেন।

বংশীদাস মহাজ্ঞানী, ধার্ম্মিক ও সংযমী ছিলেন, তিনি অন্য কোন পিতার ন্যায় কন্যাকে সংসারে আসক্ত হইতে উপদেশ দিলেন না। তিনি কন্যাকে আজীবন কুমারী ব্রত অবলম্বন করিয়া থাকিবার অনুমতি দিয়া বলিলেন, "শিবপূজা কর, আর লিখ রামায়ণে।"

পিতার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তিনি শিব আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। ফুলেশ্বরী নদীর তীরে চন্দ্রাবতীর শিবের মঠ বহুদিন বিদ্যমান ছিল,—তাহার করুণ রামায়ণী গীতি এখনও নয়ন জলে সিক্ত হইয়া ময়মনসিংহের মেয়েরা বিবাহোপলক্ষে গান করিয়া থাকে। সেই রামায়ণের কতকাংশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করিয়াছেন।

ফুলেশ্বরী নদীর তীরে চন্দ্রাবতীর শিবমন্দির উত্থিত হইল। পিতার আদেশ শিরোধার্য্য

করিয়া চন্দ্রা দিনরাত্রি শিব আরাধনায় ব্যাপৃত থাকেন। কেহ কিছু বলিলে উত্তর দেন না। আজন্ম কুমারী থাকিয়া তিনি শিবপূজায় জীবন কাটাইয়া দিবেন—এই তাঁহার সংকল্প।

"একনিষ্ঠ হইয়া পূজে দিব ত্রিপুরারি"

তাঁহার মুখে কোন অভিযোগ নাই, মুখের হাসি ফুরাইয়া গিয়াছে, সন্ধ্যাকালে মালতী ফুটিয়াছিল, রাত্রি শেষ না হইতে হইতেই তাহা ঝরিয়া পড়িল।

চন্দ্রা যখন এইভাবে লোকাতীত রাজ্যের শান্তির সন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময় জয়চন্দ্রের এক চিঠি আসিল।

যে রমণীকে বিবাহ করিয়া জয়চন্দ্র স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিল, চন্দ্রাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, সেই রমণী কৃতঘ্নতা করিল। জয়চন্দ্র চক্ষে সর্ষের ফুল দেখিল, তাহার অনুতাপের অবধি রহিল না, চন্দ্রার কাছে যে পত্রখানি পাঠাইল, তাহার মর্ম্ম এইরূপ ঃ—

"শুন রে প্রাণের চন্দ্রা তোমারে জানাই।
মনের আগুনে দেহ পুড়্যা হৈছে ছাই॥
অমৃত ভাবিয়া আমি খেয়েছি গরল।
কণ্ঠেতে লাগিয়া রৈছে কাল হলাহল॥
জানিয়া ফুলের মালা কাল সাপ গলে।
মরণে ডাকিয়া আমি এনেছি অকালে॥
তুলসী ছাড়িয়া আমি পূজিলাম সেওরা।
আপনি মাথায় লইলাম দুঃখের পসরা।"

তাহার পরে লিখিল ঃ—"আমার ক্ষমাভিক্ষার মুখ নাই। কিন্তু জন্মের শোধ একটি ইচ্ছা আছে—তোমার মুখখানি একবার দেখিয়া যাইব।

"একবার দেখিব তোমায় জন্মের শোধ দেখা।
একবার দেখিব তোমার নয়ন ভঙ্গী বাঁকা॥
একবার শুনিব তোমার মধুরস বাণী।
নয়ন জলে ভিজাইব রাঙ্গা পা দুখানি॥
না ছুঁইব, না ধরিব দূরে থেকে দেখব।
পুণ্য মুখ দেখি আমি অন্তর জুড়াব॥

শিশু কালের সঙ্গী তুমি যৌবন কালের মালা।
তোমারে দেখিতে মন হৈয়াছে উতলা।
জলে ডুবি, বিষ খাই, গলায় দেই দড়ি।
তিলেক দাঁড়াইয়া তোমার চাঁদ মুখ হেরি॥
ভাল নাহি বাস কন্যা এ পাপিষ্ঠ জনে।
জন্মের মতন হইলাম বিদায় ধরিয়া চরণে॥
একবার দেখিয়া তোমা ছাড়িব সংসার।
কপালে লিখেছে বিধি মরণ আমার॥"

আবার সমস্ত এলোমেলো হইয়া গেল, যিনি দেবাদিদেবের পদে আত্মনিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন—মন স্থির করিয়াছিলেন, সেই নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত অবিচলিত সংযম ও ধৈর্য্য টুটিয়া গেল।

"পত্র পড়ি চন্দ্রাবতী চোখের জলে ভাসে।"

শিশু কালের সমস্ত কথা আবার মনে হইতে লাগিল। একবার, দুইবার, তিনবার চন্দ্রা চোখের জলে ভাসিয়া পত্রখানি পড়িলেন, তারপর কাঁদিতে কাঁদিতে পত্রখানি লইয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "জয়চন্দ্র আমাকে মুহূর্ত্তের জন্য দেখিতে চাহিতেছে, তুমি তোমার দুঃখিনী কন্যার মনের বেদনা সকলই জান, এখন কি করিব?"

বংশীদাস তাঁহার ধর্ম্ম-নিষ্ঠ কন্যার সাংসারিক-জীবনের সুখ কামনা করিয়া অন্য স্থানে বিবাহ স্থির করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু যখন সে নিজে সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যের উচ্চ আদর্শের কথা বলিল, তখন তিনি তাহাতে বাধা দেন নাই। বংশীদাসের মত সাধু কখনও ধর্ম্মের আদর্শের মূল্য দিতে কুণ্ঠিত হইতে পারেন না। কিন্তু এবার বিষম সমস্যা। বংশী রমণী-হৃদয়ের দুর্ব্বলতা ভালই জানিতেন, একবার এই ব্যাপারে শিথিলতার প্রশ্রয় দিলে চন্দ্রার জপ-তপ মাটি হইবার আশঙ্কা কিছু ছিল; অথচ বিধর্ম্মী জয়চন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বা বিবাহের আর সম্ভাবনা নাই, সুতরাং চন্দ্রাকে যদি জয়চন্দ্রের সহিত দেখা করিতে অনুমতি দেন, তবে তিনি দুই ডিঙ্গায় পা দিয়া অকূলে পড়িতে পারেন; বোধহয় এইরূপ কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়া তিনি নির্ম্মমের মত কন্যার দুঃখ বুঝিয়াও বুঝিলেন না, কঠোরভাবে বলিলেন ঃ—

"তুমি যে কাজে প্রাণ মন অর্পণ করিয়াছ, তাহাই কর। যে ব্যক্তি তোমার জীবনের

সকল আশা নষ্ট করিয়া দিয়াছে, যে অন্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সাংসারিক সকল সুখ-সুবিধার পথ রোধ করিয়া দিয়াছে—তাহার কথা মনে স্থান না দেওয়াই ভাল। গঙ্গাজল অপবিত্র হইয়াছে, সদ্যঃ বিকশিত পদ্মটি বাসি হইয়া গিয়াছে,—সমস্তই দৈবের বিধান বলিয়া জানিবে ঃ—

"তুমি যা লৈয়াছ মাগো সেই কাজ কর।
অন্য চিন্তা মনে স্থান নাহি দিও আর॥"

পিতার উপদেশের মর্ম্ম চন্দ্রা ভাল কবিয়াই বুঝিল; সে জয়চন্দ্রকে অল্প কথায় নিষেধ জানাইয়া উত্তর দিল। তারপর ফুল ও বেলপাতা লইয়া শিব মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক অর্গল বন্ধ করিয়া দিল। এখানে পল্লী-কবি যে ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা কুমারসম্ভব-কাব্যের তৃতীয় অধ্যায়ের অমর আলেখ্যের মত।

যোগাসনে বসিয়া চন্দ্রা ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিলেন; মনের দ্বার রোধ করিলেন, তাঁহার চোখের জল শুকাইয়া গেল। ধীরে ধীরে সংসারের সমস্ত ব্যাপার হইতে মন সরাইয়া লইয়া তিনি যে রাজ্যে প্রবেশ করিলেন, তাহা অবিচলিত শান্তির রাজ্য, তাঁহার অন্তরের সমস্ত তোলপাড় থামিয়া গেল। শৈশবের কথা মন হইতে মুছিয়া গেল, এমন কি জয়চন্দ্রকেও তিনি ভুলিয়া গেলেন ঃ—

"যোগাসনে বসে কন্যা নয়ন মুদিয়া।
একমনে করে পূজা ফুল বিল্ব দিয়া॥
কিসের সংসার, কিসের বাস, কিসের পিতা মাতা।
পূজিতে ভুলিল কন্যা সংসারের কথা॥
জয়চন্দ্রে ভুলি কন্যা পূজয়ে শঙ্করে।
একমনে ভাবে কন্যা হর বিশ্বেশ্বরে॥"

পিতা বংশীদাসের উপযুক্ত কন্যা চন্দ্রাবতী এইভাবে আত্মহারা হইয়া শিব-ধ্যানে নিরতা হইলেন। তখন চক্ষুর জ্যোতি, কর্ণের শ্রুতি, মনের স্মৃতি যেন লোপ পাইল, চন্দ্রা বাহিরের জ্ঞান সমস্ত হারাইলেন।

এমন এক সময়ে জয়চন্দ্র পাগলের মত ছুটিয়া ফুলেশ্বরী নদীর তীরে সেই শিব-মন্দিরের পাশে আসিয়া দরজায় ঘা মারিল। সেই দরজায় মাথা খুঁড়িয়া কোন উত্তর

পাইল না। যোগাসনে আসীনা চন্দ্রা তাহার উন্মত্ত আহ্বান শুনিতে পান নাই। কেহ সাড়া দিল না—কেহ দ্বার খুলিল না। জয়চন্দ্র চিৎকার করিয়া বলিল ঃ—

"দ্বার খোল চন্দ্রাবতী দেখা দাও আমারে।
পাগল হইয়া জয়চন্দ্র ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।।
না ছুঁইব না ধরিব দূরে থাক্যা খাড়া।
ইহ জন্মের মত কন্যা দেও মোরে সাড়া।।
দেব পূজার ফুল তুমি, তুমি গঙ্গার পানি।
আমি যদি ছুঁই কন্যা হৈবা পাতকিনী।।"

কিন্তু চন্দ্রা এই উচ্চৈঃস্বর শুনিতে পান নাই।

"যোগাসনে আছে কন্যা সমাধি শয়ানে।
বাহিরের কথা কিছু নাহি পশে কানে।।
না খোলে মন্দিরের দ্বার নাহি কয় কথা।
মনেতে লাগিল যেন শক্তি-শেলের ব্যথা।।"

নিরাশ হইয়া জয়চন্দ্র উন্মত্তবৎ চারিদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দেখিতে পাইল, অদূরে সন্ধ্যা-মালতীর রক্তবর্ণ ফুল অজস্র ফুটিয়া আছে। সে তাহার কতকগুলি লইয়া আসিল এবং তাহা নিংড়াইয়া রস বাহির করিল, সেই রক্তাক্ষরে সে মন্দিরের কপাটে লিখিল ঃ—

"শৈশব কালের সঙ্গী তুমি যৌবন কালের সাথী।
অপরাধ ক্ষমা কর তুমি চন্দ্রাবতী।।
পাপিষ্ঠ জানিয়া মোরে না হৈলা সম্মত।
বিদায় মাগি চন্দ্রাবতী জনমের মত।।"

অনেকক্ষণ পরে চন্দ্রার সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি বাহির হইলেন, দরজায় জয়চন্দ্রের হাতের লেখার উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, তখন চোখের জল মুছিতে মুছিতে কলসী কাঁখে লইয়া নদী হইতে জল আনিতে গেলেন।

সহসা দেখিলেন, নদী-তরঙ্গ উজানের দিকে বহিতেছে, সেখানে জনমানব নাই ঃ—

"একেলা জলের ঘাটে সঙ্গে নাই কেহ।
জলের উপরে ভাসে জয়চন্দ্রের দেহ॥
দেখিতে সুন্দর কুমার চাঁদের সমান।
ঢেউ-এর উপরে ভাসে পৌর্ণ মাসী চাঁদ॥
আঁখিতে পলক নাই। মুখে নাই বাণী।
পারেতে দাঁড়াইয়া দেখে উন্মত্তা কামিনী॥"

মন্তব্য ও আলোচনা

এইখানে কবি নয়নচাঁদ চিত্রপটের উপর যবনিকা পাত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা জানি, এই দুর্ঘটনার পর চন্দ্রা আর বেশী দিন জীবিত ছিলেন না। পিতার আদেশে রচিত রামায়ণখানি অসমাপ্ত রাখিয়া ফুলেশ্বরী নদীর তীরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফুলটি অকালে ঝড়িয়া পড়িয়াছিল।

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রভৃতি কোন কোন সুধীসমালোচকের মতে "চন্দ্রাবতী" পল্লী-সংগীতগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনের যোগ্য।

এই গানটির একটি বৈশিষ্ট্য আছে। ইহাতে হিন্দুর আধ্যাত্মিকত্ব আছে। পল্লী-আখ্যায়িকাগুলির অপর কোনটিতে তাহা নাই,—তাহাদের সকলগুলিতে প্রেম ও অপরাপর প্রসঙ্গে নিছক বাস্তবতা দৃষ্ট হয়, সেই প্রেম খুব উচ্চ গ্রামে উঠিয়া স্থানে স্থানে আদর্শ-লোকে পৌঁছিয়াছে সত্য, কিন্তু হিন্দুর জপ, তপ, নাম-কীর্ত্তন প্রভৃতির লেশ তাহাতে নাই। যোগের সমাধি এবং সংসারের ঊর্ধ্বে আত্মার যে উচ্চস্থান পরিকল্পিত হয়--পল্লীগ্রামের গীতিকাগুলির কোথাও তাহার আভাস নাই। বৌদ্ধধর্ম্মে আত্মার অস্তিত্ব ও ঈশ্বরের বিশ্বাস স্থান পায় নাই, কিন্তু তাহাতে কর্ম্মফলের প্রতি খুব অতিরিক্ত মাত্রায় জোর দেওয়া আছে। গল্পগুলিতে বৌদ্ধ-প্রভাবের নিদর্শন অনেক আছে। এখানে তাহা আলোচনা করার প্রয়োজন নাই। চন্দ্রাবতীতে ব্রাহ্মণের আদর্শ রক্ষিত হইয়াছে, এই হিসাবে কুমারী চন্দ্রাবতী অপরাপর গল্পের নায়িকা হইতে একটু ভিন্ন প্রকারের। তাঁহার চরিত্রে আগাগোড়া ব্রাহ্মণ-কন্যার যোগ্য সংযমের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়—অথচ তাহা শুষ্ক কাষ্ঠের মত নীরস নহে। একদিকে বাস্তব জগতের হৃদয়োচ্ছ্বাস পূর্ণমাত্রায়--অপর দিকে তপস্যা-জনিত সংযম তাঁহার চরিত্রে মিশ্র-সৌন্দর্যের চিত্র দেখাইতেছে।

"একেলা জলের ঘাটে সঙ্গে নাহি কেহ
জলের উপরে ভাসে জয়চন্দ্রের দেহ।"

(পৃষ্ঠা — ১৩৬)

তাঁহার ভালবাসা খরতোয়া নদীর মত অতি বেগে চলিয়াছে; কিন্তু অপরাপর পল্লী-চিত্রে সেই ভালবাসা যেরূপ অবাধ এবং শেষ পর্য্যন্ত সেই ভালবাসাই পূর্ণমাত্রায় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, এই গল্পে তাহা নহে। চন্দ্রাবতীর ভালবাসার আবেগ প্রতি পদে বাধা মানিয়া চলিয়াছে, চঞ্চল হৃদয়ের আবেগ উচ্ছ্বাস সর্ব্বত্রই সংযম ও তপস্যার অধীন হইয়া চলিয়াছে।

ফুল তুলিবার আগ্রহ, জলে সাঁতার কাটা, জয়চন্দ্রের গলায় ফুল মালা পরাইয়া দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে চন্দ্রাবতীর মুক্ত হৃদয়ের সরল স্বাভাবিক গতি পরিদৃষ্ট হয়; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে জয়চন্দ্র তাঁহাকে প্রেম নিবেদন করিয়া চিঠি লিখিল—সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহার নিজ হৃদয়ের প্রতি প্রথম দৃষ্টি পড়িল, সে সাবধান হইয়া গেল। যদিও সে মনে প্রাণে জয়চন্দ্রের অনুরাগী ছিল, এবং মনের নিভৃত কোণে—যে দেবতার দৃষ্টি, সেই দেবতাকে তাহার মনের আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করিতে কুণ্ঠিত হইল না,—তথাপি বাহিরে সে সতর্ক হইয়া গেল। এই সতর্কতা, এই সংযম সে জোর করিয়া আনে নাই। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ-বংশের শোণিতে ইহার অস্তিত্ব বিদ্যমান। চন্দ্রাবতী যে দিন প্রথম প্রণয় চিঠিখানি পাইল সেই দিন হইতেই ফুলেশ্বরী নদীর পারে ফুল কুড়াইতে যাওয়া ছাড়িয়া দিল। চিঠি পাইয়া সে একবার দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিল,—"এ কি করিলে, তোমার মুখখানি দেখার সুযোগ হইতে আমাকে বঞ্চিত করিলে?" তদবধি সে নিজের আঙ্গিনায় যে সকল জবা, নাগেশ্বর, চাঁপা ও গান্ধা ফুটিত, তাহাই কুড়াইয়া পিতার পূজার আয়োজন করিতে লাগিল। জয়চন্দ্রের সঙ্গে দেখা শুনা সমস্তই বন্ধ হইয়া গেল। এই সংযম তাহার চরিত্রের বিশেষত্ব।

জয়চন্দ্রের পত্রের উত্তরে সে দুইটি ছত্র মাত্র লিখিল। তাহার হৃদয়ের প্রবল উচ্ছ্বাসের কোন কিছু তাহাতে ছিল না, অপূর্ব্ব সংযম-সাবধানতায় সে পত্রখানি লিখিয়াছিল, "আমি কি জানি? আমার পিতা আছেন, তিনিই কর্ত্তা।" এই সংক্ষিপ্ত উত্তরের ভিতর তাহার হৃদয়ের বেগবতী ভালবাসার একটি ঢেউ আসিয়া পড়ে নাই। তাহা সংযত-শীলতার পরিচায়ক।

প্রথম লিপি পাইয়া সে তৎক্ষণাৎ কোন কৌতূহল প্রকাশ করে নাই, অপর কোন নায়িকা হৃদয়ের অদম্য আবেগে তখনই পত্র পড়িবার জন্য উৎসুক হইত। কিন্তু চন্দ্রা পত্রখানি আঁচলে বাঁধিয়া ফুলগুলি সংগ্রহ করিল, পিতার ঠাকুর-ঘরখানি মার্জ্জনা করিল,

পুষ্পপাত্রে আহৃত ফুলগুলি সাজাইয়া রাখিল, পিতার জন্য আসন পাতিল ও চন্দন ঘষিল। বংশীদাস পূজোপকরণের পার্শ্বে আসনে আসিয়া চোখ বুজিয়া ধ্যানে বসিলেন, তখন চন্দ্রা নিজ কক্ষে যাইয়া চিঠিখানি পড়িতে বসিল। অথচ তাহার মনে যে কৌতূহল ও পিপাসা জাগিয়াছিল, তাহা অতি প্রবল। সর্ব্বত্রই চন্দ্রা রমণী-জনোচিত, ব্রাহ্মণ কন্যার শোণিতের বিশুদ্ধতাজনিত সংযমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া আসিয়াছে—তাহা কষ্ট-কৃত নহে, স্বভাবই তাহাকে এই সংযম চরিত্রের ভূষণ স্বরূপ গড়িয়া দিয়াছিলেন।

যে দিন ভয়ানক বিপদের সংবাদ আসিল,—কোথায় রাম রাজা হইবেন, তাঁহাকে বনবাসী হইতে হইল, তখনকার চন্দ্রার চিত্র অতি অপূর্ব্ব। চারিদিকে কান্নাকাটি, —আর্ত্তনাদ, কিন্তু যাহার মাথায় বাজ পড়িয়াছে,—সে একেবারে নিশ্চল ও অবিচলিত। অথচ তাহার প্রেমে—স্বাভাবিক দুঃখ-বোধ ও নিরাশার ভাবের এক বিন্দুও ব্যত্যয় হয় নাই, তাহার চিত্র তখন মৌন সন্ন্যাসিনীর চিত্র, উহার দৃষ্টান্ত সমাজে দেখা যায় না। "ধারয়ন্ মনসা দুঃখং ইন্দ্রিয়ানি নিগৃহ্য চ"—ইহা সেই যোগ-সাধনার প্রথম অবস্থা।

চন্দ্রা পিতার উপদেশের মর্ম্মগ্রাহী ছিলেন। একবার যখন তাঁহার মন একটুকু হেলিয়া পড়িবার মতন হইয়াছিল তখন পিতার উপদেশে হৃদয়ের গতিমুখ তিনি ফিরাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার খুব কষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু তপস্যার গুণে তিনি সেই অবস্থা অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন। পিতা তাঁহাকে বিবাহ দিয়া পুনরায় তাঁহাকে সুখী করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু চন্দ্রা যখন নিজে ধর্ম্মের পথ বাছিয়া লইলেন, তখন তাঁহার সাধু তেজস্বী পিতা তাঁহাকে একটিবারও বাধা দিলেন না। কিন্তু যখন তাঁহার কঠোর তপস্যার ভাব কথঞ্চিত শিথিল হইবার উপক্রম হইল, জয়চন্দ্রের চরম দুর্দ্দশা ও অনুশোচনা-সূচক চিঠিতে যখন দুর্দ্দম পদ্মাস্রোতের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ের সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিবার উপক্রম করিল, তখন সাধু পিতা সেই দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দিলেন না, তিনি কতকটা কঠোরভাবে তাঁহাকে কর্ত্তব্যের পথ দেখাইয়া দিলেন;—চন্দ্রা সেই উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন।

তারপর পল্লীগীতিকা দুর্ল্লভ সমাধির চিত্র। চন্দ্রার যোগ সমাধির ছবিখানি—

> "অবৃষ্টি সংরম্ভমিবাম্বুবাহ
> অপাং মবধারং অনুত্তরঙ্গং।
> অন্তশ্যরাণাং মরুতাগ্নি রোধাৎ
> নিবাত নিষ্কম্প মিব প্রদীপং।।"

কিন্তু এই বাঙ্গালি যোগিনী-মূর্ত্তি কালিদাসের নকল নহে, কোন শ্লোকের পুনরাবৃত্তি নহে, তাহা পল্লীর মৌলিক চিত্র। পল্লীতে বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণের গৃহে যে তপস্যা চিরকাল চলিতেছিল;—ইহা তাহারই দৃষ্টান্ত। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সেই সমাধির ভাব

তখনও অনাস্বাদিত, এজন্য গীতিকায় তাহার ছায়া পড়ে নাই। পল্লীগীতিকার মূলে বৌদ্ধ প্রভাব ক্রিয়া করিতেছিল।

এই গল্পের বিশেষ একটা দিক্ এই যে ইহাতে বাস্তব ও অবাস্তবের মিলন দৃষ্ট হয়। তপস্যা, সংযম প্রভৃতি অধ্যাত্ম জীবনের তত্ত্ব ইহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, —তাহা সূত্রাকারে নহে, সহজ সরল সত্য পরিষ্কার কবিত্বের ভাষায় কথিত হইয়াছে—তাহাতে জ্ঞানী বা দার্শনিকের শুষ্কতা বা জটিলতা নাই—গল্পের ছন্দে বা বর্ণনায় তাহা বেখাপ্পা হয় নাই। অথচ প্রেমের গভীরতায়, উপলব্ধির গাঢ়তায়, অবস্থার বৈগুণ্যে, আত্মদানের মহিমায়—এই নায়িকা শ্রেষ্ঠ কাব্য-বর্ণিত প্রেমিকাদের এক পংক্তিতে সমাসীন। যেমন উন্মত্ত উচ্ছ্বসিত সেই প্রেমের প্লাবন, তেমনই কঠোর শক্ত সেই সংযমের বাঁধ—আত্মহারার আত্মদান ও তপস্বীর সাধনা একত্র এই মহান্ দৃশ্যপটে দেখা যাইতেছে। পদ্মার ভাঙ্গন পাড়ে দাঁড়াইলে যে বিস্ময়কর দৃশ্য চক্ষে পড়ে— ইহা তাহাই। ঘনঘটা করিয়া উন্মত্ত তরঙ্গ অবাধ শক্তিতে ছুটিয়াছে, আকাশ বক্ষ প্রসারিত করিয়া সেই তরঙ্গকে বাধা দিতেছে। পৃথিবী ও স্বর্গ দিগ্বলয়ে পরস্পরকে ছুঁইয়া আছে, যেন প্রেম বড় কি সংযম বড় এই সমস্যার সৃষ্টি করিবার জন্য।

চন্দ্রাবতী তাহার পিতা বংশীদাসের সঙ্গে একযোগে মনসা দেবীর মঙ্গলকাব্য রচনা করেন। তাঁহার মাতার নাম অঞ্জনা, ফুলেশ্বরী নদীর তীরে ইঁহারা খড়ের কুটিরে বাস করিতেন। ১৫৭৫ শকাব্দায় 'মনসার ভাসান' রচিত হয়, তন্মধ্যে কেনারামের পালাটি সম্পূর্ণ ইঁহার রচনা। কবিত্বে ও করুণ রসে সেই কাহিনীটির জোড়া পাওয়া দুর্ঘট। চন্দ্রাবতীর দ্বিতীয় কাব্য মলুয়া—পল্লীগীতিকার শিরোমণি; পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, চন্দ্রাবতী পিতার আদেশে যে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আংশিকভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে যে সকল মহিলা-কবির রচনা পাইয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে চন্দ্রাবতীর অবিসংবাদিত ভাবে সর্ব্বোচ্চ আসন। ১৫৭৫ শকে অর্থাৎ ১৬৬৩ খৃঃ অব্দে চন্দ্রা পিতার সহযোগে মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বলা হইয়াছে। তখন তাঁহার বয়ক্রম ২৫ বৎসর ধরিয়া লইলে তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বলা যাইতে পারে। চন্দ্রাবতীর জীবনের অনেক কথা তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে জয়চন্দ্র-ঘটিত প্রেম-কাহিনীটি বাদ পড়িয়াছে, ইহা স্বাভাবিক লজ্জা ও সম্ভ্রম বশতই হইয়াছে। অপর সকল বৃত্তান্তের সঙ্গে নয়নচাঁদ কবি-বর্ণিত আখ্যায়িকার খুব মিল আছে। ময়মনসিংহ পাতুয়ার গ্রামে বংশীদাসের বংশধরগণ এখনও বাস করিতেছেন। আমি অন্যত্র দেখাইয়াছি, মাইকেল মধুসূদন কৃত মেঘনাদ-বধ কাব্যের সীতা-সরমার কথোপকথনের অংশটি সম্ভবত কবি চন্দ্রাবতীর রামায়ণ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রূপবতী

নবাব-দরবারে

দক্ষিণ ময়মনসিংহের কোন পরগণায় জয়চন্দ্র নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার লক্ষ লক্ষ টাকা আয় ছিল; বিশাল পুরী, হাতী ঘোড়ার লেখা-জোখা নাই। মন্ত্রী, উজীর, নাজির লোক-লস্করে পুরীখানি ভর্ত্তি। ঢোল, কাড়া, নাকাড়া, বাঁশী রোজ প্রত্যুষে রসুনচৌকীর সুরে প্রাণ আকুল করে,—হাওয়াখানা হইতে সেই গীতবাদ্য ধ্বনিতে রাজার ঘুম ভাঙ্গে।

একদিন রাজা জয়চন্দ্র তাঁহার সভাসদদিগকে বলিলেন, "আমি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে একবারও মুর্শিদাবাদ যাই নাই, নবাব-দরবারে একবার যাওয়া উচিত। আমি তথায় যাইব, আয়োজন-পত্র ঠিক-ঠাক্ কর।"

গণকের ডাক পড়িল,—তিনি গণিয়া আট দিনের পরে শুভদিন স্থির করিলেন।

কাণা চইতা ও উভতিয়া—এই দুই ভাই রাজবাটীর মাঝি। ইহারা ময়ূরপঙ্খী পান্‌সী নৌকা সাজাইবার ভার পাইল। নৌকাখানির ষোলটি দাঁড়,—নানাবর্ণে রঞ্জিত বৃহৎ পাল উত্থিত হইল। দরবারে উপহার দিবার জন্য নানা দ্রব্য নৌকায় তোলা হইল; অভ্র-নির্ম্মিত নানারূপ কারুখচিত চিরুণী, বিবিধ রং-বিরঙ্গের পাখা, হাতীর দাঁতের অপূর্ব্ব পাটী, গজমতির মালা প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্য নবাব সাহেবকে ভেট দেওয়ার জন্য নৌকাতে সাজাইয়া রাখা হইল। সংগীতবিদ্যা-বিশারদ কয়েকজন গায়ক ও বাদ্যযন্ত্রে দক্ষ ব্যক্তি রাজার সঙ্গে চলিলেন। রাজা দশ হাজার টাকার একটি তোড়া নবাবকে নজর দেওয়ার

জন্য লইয়া চলিলেন।

রাজার পানসী উজান পানি বাহিয়া চলিল। যাওয়ার পূর্ব্বে নাগরিকগণ সম্বর্দ্ধনা করিয়া রাজাকে বিদায় দিল। রাজা ব্রাহ্মণগণকে যথোচিত দান দিলেন, এবং রাজ্ঞীর নিকট বিদায় লইয়া কুমারী রূপবতীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া রাজধানী অভিমুখে রওনা হইলেন। ফুলেশ্বরী নদী বাহিয়া নৌকা নরসুন্দার মুখে পড়িল। সেই নদী ছাড়াইয়া ঘোড়া-উৎরা পার হইয়া ময়ূরপঙ্খী বিশাল মেঘনা নদীতে পড়িল। মেঘনার তরঙ্গ পাহাড়ের মত উঁচু, ঢেউএ ঢেউএ যখন আঘাত-প্রতিঘাত হয়, তখন তুমুল শব্দে আকাশ প্রকম্পিত হয়,—এই নদীও অতিক্রম করিয়া রাজা তিন মাস পরে মুর্শিদাবাদ শহরে উপস্থিত হইলেন।

সঙ্গের লোকেরা ভেটের নানা দ্রব্য হুজুরে হাজির করিল! পূব দেশের আভের অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্যখচিত চিরুণী ও বিজনী,—মুর্শিদাবাদের লোকেরা চোখে দেখে নাই, নবাব ভাটির দেশের কারিগরী দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। হাতীর দাঁতের শীতলপাটি, তাহার সূক্ষ্ম শিল্প ও নানারূপ কারুকার্য্য দেখিয়া তিনি খুব খুশী হইলেন। দশহাজার টাকার তোড়াটি পাইয়া তিনি কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ করিলেন যে রাজা জয়চন্দ্রের জন্য উৎকৃষ্ট মুছাপেরখানার (অতিথিশালা) ব্যবস্থা করা হউক। একটি রাজপ্রাসাদের মত বড় বাড়ীতে সম্মানিত অতিথির বাসস্থান নিয়োজিত হইল। নবাবের সঙ্গে রাজার মৈত্রী ক্রমশঃ ঘনিষ্ট হইল; তাঁহার সৌজন্য ও সমাদরে মোহিত হইয়া রাজা মুর্শিদাবাদেই রহিয়া গেলেন। বিদায় চাহিলে তাঁহাকে নবাব ছাড়িয়া দেন না।

রাণীর পত্র

এইভাবে তিনটি বৎসর অতীত হইল। এদিকে দেশে রাণী অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন; কুমারী রূপবতী তখন চৌদ্দ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন; রাণী রাজার অভাবে ও রূপবতীর ভাবনায় অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন, রাত্রে তাঁহার ঘুম নাই, এমন সোনার বর্ণ তাহা বিবর্ণ হইল। অবশেষে আর না থাকিতে পারিয়া তিনি রাজার নিকট চিঠি লিখিয়া দূত পাঠাইলেন।

চিঠিতে রাজ্যের অবস্থা সবিস্তারে লিখিয়া রাজা কেন, কোন্ আকর্ষণে দেশ ছাড়িয়া এতকাল প্রবাসে পড়িয়া আছেন, তজ্জন্য রাণী নানারূপ মিষ্ট অনুযোগ করিলেন; ঘরে

মেয়ে দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে, লোকে কাণাঘুষা করিতে ছাড়িবে কেন। সে তো রাজার একমাত্র সন্তান, কণ্ঠের হারের মত আদরের ছিল, কি করিয়া তিনি তাহার বিবাহের কথা ভুলিয়া আছেন? রাজাকে আর কালবিলম্ব না করিয়া বাড়ীতে আসিতে শত অনুরোধ জানাইয়া রাণী চিঠিখানি শেষ করিলেন।

গণকদের গণনা

এদিকে রোজ রোজই কোন না কোন গণক রাণীর দরবারে আসিতেছে এবং রূপবতীর কোষ্ঠি বিচার আরম্ভ করিয়াছে।

উত্তর দেশের এক গণক অনেকগুলি খুঙ্গী পুঁথি লইয়া আসিল, বয়সের দরুণ তাহার দেহ কুব্জ হইয়া পড়িয়াছে, মুণ্ডিত মস্তকের পিছন দিকটায় একটা মস্ত বড় টিকি ঘাড় নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন লাফাইতেছে। গণক হাত পা' নাড়িয়া ভবিষ্যতের দ্বার যেন উদ্ঘাটন করিয়া ফেলিল। কন্যার ভাগ্যলিপি গণনা করিয়া সে বলিল ঃ—

"মেয়ে অপূর্ব্ব সুন্দরী, স্বর্গের অপ্সরারা ইহার কাছে দাঁড়াইতে পারে না, অতি সুলক্ষণা। এই কন্যার কোন তরুণ রাজকুমারের সঙ্গে বিবাহ হইবে, ইনি পাটরাণী হইবেন। যদি অন্যথা হয় তবে হুঁ—আমাকে তোমরা ধিক্ দিও।"

আর এক গণক আসিলেন, তিনি হাঁপানি রোগের রোগী, হাঁফাইতে হাঁফাইতে গণক বলিলেন, "এই মেয়ের জোড়া ভুরু, মাথার চুলের অগ্রভাগ বক্র, কপাল প্রশস্ত এবং দাঁতগুলি ঠিক মুক্তার মত। দক্ষিণ দেশের এক ধন-কুবের সদাগর-পুত্রের সঙ্গে ইহার বিবাহ হইবে। শত শত কিঙ্কর ইহার পা ধোয়ার জল লইয়া প্রভাতে শয়ন-মন্দিরের কাছে অপেক্ষা করিবে।"

আর একজন প্রৌঢ় বয়স্ক গণক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কন্যার পদাঙ্গুলীগুলি নিরীক্ষণ করিয়া বলিতে লাগিল, "এ কন্যার কখনই দক্ষিণ দেশে বিবাহ হইবে না, ইনি উত্তর দেশের কোন রাজার পাটরাণী হইবেন; পায়ের আঙ্গুলগুলি পদ্মের কোরকের মত, হাঁটিয়া যাওয়ার সময় ইহার সমস্ত পদতল ভূমি স্পর্শ করে, মাটির উপর কোন অংশ উঁচু হইয়া থাকে না,—এই সকল লক্ষণ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করিতেছে যে, প্রতাপশালী কোন রাজার ঘরে ইঁহার বিবাহ হইবে।"

আর এক গণক অতি দাম্ভিক—তিনি বলিলেন, "আপনারা কেন এখানে গণকের

"একে একে ভেট দিল নবাবের স্থানে।"
(পৃষ্ঠা ১৪৩)

হাট বসাইয়াছেন? জাহাজ একাই যথেষ্ট শক্তি রাখে, ডিঙ্গি-নৌকাগুলি তাহার পেছনে রাখিয়া ফল কি? আমাকে ডাকিলে আর কাহাকেও ডাকার প্রয়োজন হয় না।" গণক কর-কোষ্ঠী বিচার করিয়া বলিলেন, "অতি শীঘ্র ইঁহার কোন রাজার ঘরে বিবাহ নিশ্চিত, আপনারা আমার কথা লিখিয়া রাখুন। চক্ষুর খঞ্জন-গতি, মুখখানি পদ্মের বিলাস, গালে একটু লজ্জায় বা অভিমানে সিন্দূরের মত লোহিতাভা দৃষ্ট হয়। ইঁহার প্রতিটি অঙ্গ অতি সুলক্ষণ-যুক্ত। রাজার ঘরে ইঁহার বিবাহ হইবে এবং ইনি সাত ছেলের মা হইবেন।"

শেষ যে গণকটি আসিলেন, তিনি বলিলেন—"কন্যার চক্ষুর তারা নিবিড় কাল বর্ণ, ইনি সুখী হইবেন। তবে ইঁহার সম্প্রতি একটি দোষ দেখা যাইতেছে, জ্যোতিষে ইঁহাকে 'গরদোষ' বলে। গরদের একটি জোড়, থালাতে ঘি, দুধ, চা'ল, মর্ত্তমান কলা প্রভৃতি সাজাইয়া দ্বাদশটি ব্রাহ্মণের প্রত্যেককে ভাল করিয়া ভোজন করান হউক। তারপর কন্যাটিকে তীর্থজলে স্নান করাইয়া ব্রাহ্মণদের পদ রজঃ মাথায় ধারণ করান হউক। তাহা হইলে 'গরদোষ' কাটিয়া যাইবে। আজ যদি এই রিষ্টি কাটিয়া যায়, কাল ইঁহার বিবাহ কে ঠেকাইবে?"

রাজার গৃহে ফেরা ও উদাসীনের ভাব

কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে চেষ্টা করিবার জন্য রাজা জয়চন্দ্র স্বীয় রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এবার তাঁহার সম্পূর্ণ ভাবান্তর দেখিয়া রাণী বিস্মিত হইলেন। রাজা সারারাত্রি বিছানায় উঠা-বসা করেন, এক মুহূর্ত্ত ঘুমান না; কি ভাবিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন এবং নিতান্ত নিরাশ্রয়ের মত একদিকে চাহিয়া থাকেন, কোন কথা বলেন না। রাণী একদিন তাঁহাকে বলিলেন—"তুমি এবার এমন হইয়া গিয়াছ কেন? এতদিনের পর বাড়ী আসিলে, আমার সঙ্গেও একটিবার কথা বলিতে ইচ্ছা হয় না। প্রাণের দুলালী কন্যা, সে তোমার চক্ষের বিষ হইয়াছে, তাহাকে তুমি ডাকিয়া একটি কথা জিজ্ঞাসা কর না। সোণার বাটাতে পান, চুয়া, কেওয়ার খয়ের ও সুগন্ধী সুপুরি পড়িয়া থাকে, তুমি একটি পান খাও না। সরু সুগন্ধি চালের ভাত সোণার থালায় পড়িয়া থাকে, তুমি হাত দিয়া নাড়াচাড়া কর, একটি দানা তোমার পেটে যায় না। তোমার কি হইয়াছে? যদি তুমি আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার কর, তবে আমার মৃত্যুই মঙ্গল। এত বড় মেয়ে—তুমি তাহার বিবাহের কথা ব'ল না।"

রাজা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "রাণী, আমার প্রতি নিষ্ঠুর হইও না, আমি মরণে মরিয়া আছি। শত শত বিছা, হাঙ্গর, কুমীর যেন আমায় কাটিয়া ফেলিতেছে, আমি যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিতেছি না। কেহ যেন শেল দিয়া আমার বুক চিরিয়া ফেলিতেছে।

"কুক্ষণে তুমি আমায় চিঠি লিখিয়াছিলে, আমি সেই চিঠি হাতে করিয়া দরবারে বিদায় চাহিতে গিয়াছিলাম। নবাব চিঠি পড়িয়া বলিলেন, "হাঁ হে রায়! তোমার তো বয়স্থা এক কন্যা আছে। শুনিয়াছি সে নাকি পরমা সুন্দরী, আমার সহিত তাহার বিবাহ দাও। তোমার সবদিক দিয়াই সুবিধা হইবে। আমার পূজনীয় আত্মীয় বলিয়া দরবারে তোমার প্রথম স্থান হইবে, তুমি বড় খেতাব পাইবে। দরবারে তুমি আমার ছালাম পাইবে, কত বড় সম্মান ভাবিয়া দেখ। তুমি শীঘ্র তোমার বাড়ী চলিয়া যাও, আমি এদিকে বিবাহের উদ্যোগ করিতে থাকি।"

"রাণী, জাতিনাশ-ধর্ম্মনাশ হইলে আমার জীবনে কি কাজ! রাজত্ব ছাড়িয়া চল আমরা দুজনে জঙ্গলে পলাইয়া যাই।

"মুসলমানে কন্যা দিব নাহি সরে মন।
রাজত্ব হইল আমার কর্ম্ম-বিড়ম্বন।।
গলায় কলসী বাঁধি, জলে ডুব্যা মরি।
এ বিষ না ঝাড়তে পারে ওঝা ধন্বন্তরি।।"

রাজা আরো বলিলেন—"আমি ঠিক বুঝিয়াছি, কন্যাকে না দিলে আমার জমিদারী থাকিবে না। জয়পুর-রাজ্য নবাব দরিয়ায় ভাসাইয়া দিবেন। পাঠানেরা আসিয়া আমাকে বাঁধিয়া লইয়া যাইবে এবং নবাবের হুকুমে আমার গর্দ্দান কাটা যাইবে। নির্দ্দিষ্ট দিনের আর বেশী বাকী নাই, সেইদিনের পূর্ব্বে রাজকুমারীকে নবাবের অন্তঃপুরে পাঠাইতে হইবে। তাহার পূর্ব্বে ইহাকে আগুনে পুড়িয়া মারিব অথবা বিষ খাওয়াইব, তাহাই ভাবিতেছি। কোন্ দেশে গেলে আমাদের জীবন রক্ষা হইবে?

"আয়োজন কর রাণী পাঠাও কন্যারে।
গলায় কলসী বাঁধি, আমি ডুবিব সায়রে।।"

রূপবতীর বিবাহ

এই বিপদে রাণী নিজে যা' হোক করিয়া একটা উপায় উদ্ভাবনা করিলেন। রাজবাড়ীতে অতি তরুণ, কার্ত্তিকের মত সুন্দর একটি কর্ম্মচারী ছিল, তাহার স্বভাব ছিল বিনয়-নম্র এবং মুখে সদাই একটা হাসির মধুর রেখা যেন লাগিয়া থাকিত, তাহার কাজ ছিল অন্তঃপুরের ফরমাইস জোগান এবং শিবপূজার ফুল কুড়ানো।

এই যুবককে রাণী ডাকাইয়া আনিলেন, সে চক্ষু মাটির দিকে নত করিয়া দাঁড়াইল। রাণী বলিলেন, "রাতদুপুরে তোমাকে দিয়া আমার কাজ আছে, তুমি হাজির থাকিও।"

রাণী সন্ধ্যার পর আহারাদি সারিয়া যখন তাঁহার কন্যা রূপবতী ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, তখন শীতল মন্দিরে রাজকুমারীর কক্ষে যাইয়া তাহার শিয়রে বসিলেন; তাহার চোখের ফোঁটা ফোঁটা জল রূপবতীর গায়ে পড়িতে লাগিল, কুমারী জাগ্রত হইয়া উঠিয়া বসিলেন; মায়ের কান্না দেখিয়া তাঁহারও কান্না পাইল। তিনি বলিলেন, "এমন কি ঘটিয়াছে, যাহাতে তুমি এত দুঃখ পাইয়াছ? আমি কি কোন অপরাধ করিয়া তোমার মনে ব্যথা দিয়াছি?" রাণী বলিলেন, "কোন অপরাধ তুমি কর নাই; তোমার, আমার ও রাজার কপালের দোষ—আমার নগরে আগুন লাগিয়াছে, শীতল মন্দির পুড়িয়া ছাই হইবে। আমার আদরিণী কুমারী, আজ তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা, বিদায় লইতে আসিয়াছি।" অস্পষ্ট, অব্যক্ত, এক গুরুতর আশঙ্কায় রূপবতীর হৃদয় কাঁপিতে লাগিল; কিছু না বুঝিয়া না শুনিয়া মাতা ও কন্যা গলা জড়াজড়ি করিয়া পরস্পরকে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

গভীর রাত্রে কোন হুলুধ্বনি হইল না, এঁয়োরা আসিয়া স্ত্রী-আচার করিল না, অন্তঃপুরিকারা ফুলের মালা গাঁথিতে বা চন্দন ঘষিতে বসিল না। মাতা পাড়াপড়সীদের কাছে সোহাগ মাগিতে গেলেন না, পুরনারীরা আভ্যুদিকের জন্য ইঁট কাটিতে গেল না। চোরাপানীর জলে বরকনের কৌতুকপূর্ণ খেলা হইল না; পুরোহিত আসিয়া মঙ্গলচরণপূর্ব্বক বিবাহের ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন না। মঙ্গল-ঘট নাই, বরণডালা নাই—বাদ্যভাণ্ড নাই। মদন মধ্যরাত্রে রাণীমাতার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। রাণী আশীর্ব্বাদের একটি কথা বলিলেন না,—তাঁহার দুই চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল। রূপবতী সজলচক্ষু মাটিতে নত করিয়া মৌন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। মদনের বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, ব্যাপার কি সম্যক বুঝিতে না পারিয়া মদন রাণীর নির্দ্দেশমত

সেই কাঞ্চন-প্রতিমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

রাণী বলিলেন, "এই বংশের একমাত্র প্রদীপ—এই দুলালী কন্যাকে মদন, আমি তোমার হাতে সমর্পণ করিলাম; আকাশের তারা সাক্ষী, জগত-ব্যাপক বাতাস সাক্ষী, আর দ্বিযামা রাত্রি এই কন্যাদানের সাক্ষী! মদন! এ আমার বড় আদরের কন্যা, তুমি ইহার মনে ব্যথা দিও না, এই হতভাগিনীর এত বড় রাজবাটী থাকিতে হেথায় একটু জায়গা হইল না, আমি ইহার গর্ভধারিণী, গর্ভে স্থান দিয়াছিলাম কিন্তু বাড়ীতে স্থান দিতে পারিলাম না। রাজা দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, এই বিশাল রাজত্বের মালিক, কিন্তু তিনি এই নিরপরাধ কন্যাকে আশ্রয় দিতে পারিলেন না। তুমি ইহার পাণিগ্রহণ কর, এই আঁধার দ্বিযামা রাত্রিকে সাক্ষী করিয়া আমি ইহাকে তোমার হস্তে সম্প্রদান করিলাম।"

রাণী কাঁদিতে লাগিলেন, রূপবতী কাঁদিতে লাগিল, মদনেরও চক্ষু ছাপিয়া অশ্রুর ধারা বহিতে লাগিল। মাথার দীঘল চুলের বেণী খসাইয়া কুমারী রূপবতী লাজ-নম্র চোখে বেশ ভূষা করিল, কোন দাসী বা পরিচারিকা তাহার প্রসাধনের সহায়তা করিল না।

"না করিল পুরোহিত কুল আচরণ।
নিঝুম রাতে করে মায় কন্যা সমর্পণ।।
লইয়া কন্যার হাত মদনেরে দিল।
কেহ না জানিল মায় কন্যা সমর্পিল।।
কেহ না দিল তায় মঙ্গল জোকার।
বিবাহের গীত হৈল—মর্ম্মের হাহাকার।।"

মাতা চোখের জল আঁচলে মুছিয়া পুনরায় বলিলেন ঃ—

"সুখে থাক, দুঃখে থাক, তুমি প্রাণপতি।
তুমি বিনা অভাগীর নাহি অন্য গতি।।"

নিশি রাতের এই ঘটনা নাগরীয় লোকের কেহ জানিতে পারিল না। রাজা নিজেও জানিলেন না, রাজপুরীর মশা-মাছি পর্য্যন্ত এই বিবাহের কথা কেহ ঘুণাক্ষরে জানিতে পারিল না।

কাণা চইতা সেই রাজবাড়ীর বিশ্বস্ত মাঝি; তাহাকে দ্বিপ্রহর রাত্রে রাণী ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন; "তোমার নৌকায় কাহারা যাইবেন, তুমি তাহা জানিতে চাহিও না। তোমাকে এই ধনরত্ন দিতেছি, ইহাই তোমার পুরস্কার। যেখানে পৌঁছিয়া প্রাভাতিক তারা দেখিতে পাইবে, তুমি ও তোমার মাঝিরা সেইখানে এই চরণদারকে নামাইয়া দিবে, ইহারা কে কোথায় যাইবে জিজ্ঞাসা করিও না, বৃথা কৌতূহল বশতঃ ইহাদিগকে কোন প্রশ্ন করিও না।"

নৌকাখানিতে মদন ও রূপবতী এইভাবে উঠিয়া অনির্দ্দিষ্ট ভাগ্য-পথে রওনা হইয়া গেলেন।

পাল উঠাইয়া সারা নিশি কাণা চইতা ডিঙ্গাখানি বাহিয়া চলিল। অতি দ্রুত চৌদ্দ বাঁক অতিক্রম একটা পাহাড়িয়া মাটিতে আসিয়া পড়িল। তখন রাত্রি ভোর হইয়া গিয়াছে। কাণা চইতা সেইখানে আসিয়া নৌকা নঙ্গর করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "চরণদার, তোমরা রাণীমার হুকুমে এইখানে নামিবে, ইহা ছাড়িয়া আব এক বাঁকও যাইবার আমার হুকুম নাই।"

কাঙ্গালিয়া, জঙ্গলিয়া ও পুণাই

যখন পানসী দূরে চলিয়া গিয়াছে, তখন রূপবতী স্বগত বিলাপ করিয়া বলিতেছে— "বাপের বাড়ীর নৌকা, বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়া আমার পিতাকে আমাদের দুঃখের কথা জানাইও। আমার অভাগিনী মাতাকে বলিও, "মা, তোমার নির্ব্বাসিতা কন্যাকে জঙ্গলের বাঘে খাইয়া ফেলিয়াছে।"

মদন রূপবতীকে শোকার্ত্ত দেখিয়া বিনীতভাবে বলিল—"তুমি কেঁদনা লক্ষ্মী—দৈবের অভিশাপে তুমি আমার হাতে পড়িয়াছ! তুমি ত যজ্ঞের ঘৃত, এই কুকুরের হাতে সমর্পিত হইয়াছ। আমি চণ্ডাল অপেক্ষাও নিচু, তুমি গঙ্গাজল হইতেও পবিত্র; "না ধরিব, না ছুঁইব, তোমার চরণখানি।"

"যখন ক্ষুধা লাগিবে নফরকে বলিও সে তোমার জন্য বনের ফল আনিয়া দিবে,—এই পাহাড়িয়া দেশের নির্ম্মল জল আনিয়া তোমার পিপাসা মিটাইবে।"

"রাজার দুলালী কন্যা নাহি জান ক্লেশে।
একলা হইয়া কেম্‌নে তুমি থাকবে বনবাসে।।"

"আমি তো তোমার সঙ্গী নই, যে মনের কথা বলিয়া খানিকটা আরাম পাইবে!

"বনের দোসর সঙ্গী—আমি তো নফর।
কথা শুন্যা কাঁদি কন্যা করিল উত্তর।।"

কন্যা কহিলেন—"জঙ্গলেই থাকি বা ঘন ঘোর অরণ্যেই থাকি, মা তোমার হাতে আমাকে অর্পণ করিয়াছেন—তুমিই আমার স্বামী ও একমাত্র গতি। তোমা ভিন্ন অন্য কাহাকেও আমি জানিনা। ভাগ্য-দোষ কেবল আমার নহে, তুমিও ভাগ্য-বিড়ম্বিত।

"এতেক করিল বিধি কপালেরে দোষী।
আমার লাগিয়া বঁধু তুমি বনবাসী।।"

কাঙ্গালিয়া ও জঙ্গলীয়া দুই সহোদর—ইহারা জাতিতে জেলে। সেই পাহাড়িয়া নদীর তটে সারাদিন মাছ ধরিয়া বেড়ায়; উভয়ের কোমরে মাছ রাখিবার চুপড়ী বাঁধা—এবং হাতে জাল। তাহাদের দুভাই-এর কোন সন্তান নাই। শিশুর কলরবহীন বাড়ী তাহাদের অন্তরের মতই খাঁ খাঁ করিতেছে। দু'ভাই-এর তিনটি স্ত্রী, একটিরও কোন ছেলেমেয়ে হয় নাই। তিন বধূর মধ্যে পুনাই বড়গিন্নি, এই মেয়েটি যেমনই গৃহ কর্ম্ম-নিপুণ তেমনই তেজস্বিনী ও বুদ্ধিমতী। দুই ভাই সেদিন জাল ফেলিয়া ফেলিয়া হয়রাণ হইয়াছে, একটি পুঁটি, খল্‌সে বা চিংড়ীও পায় নাই। কিন্তু তাহারা হঠাৎ দুইজন অপূর্ব্ব রূপবান্ ও রূপবতী তরুণ-তরুণী দেখিয়া বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইল।

কাঙ্গালিয়া ইহাদিগকে বাড়ীতে লইয়া আসিয়া পুনাইকে ডাকিয়া বলিল, "আজ সারাদিনে কোন মাছ পাই নাই, কিন্তু আসিয়া দেখ কি আনিয়াছি।" রূপবতীকে দেখিয়া বিস্মিতা পুনাই স্বামীকে বলিল, "এ যে দেখিতেছি, নদীর জল হইতে লক্ষ্মী-প্রতিমা আনিয়াছ।"

বহুদিন যে কামনা হৃদয়ে পুষিয়াছিল, সেই বাৎসল্যরস পূর্ণ করিতে দেবতা যেন এই দেবী-মূর্ত্তি পাঠাইয়া দিয়াছেন। কত স্নেহে পুনাই রূপবতীকে তাহার বাড়ী ঘর সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিল, কি জন্য নদীর তটে নির্জ্জনে কাঁদিতেছিল এবং সঙ্গের সুদর্শন পুরুষই বা কে? ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

লজ্জিতা রূপবতীর গণ্ডদ্বয় আরক্ত হইল, সে কথা খুব অল্পই বলিল, কিন্তু তাহার চোখের জলই যেন সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিল।

পুনাই বলিল, "প্রশ্ন করিলে যদি কষ্ট পাও, তবে উত্তর চাই না। রত্ন বোঝাই নৌকা যদি দেবতার ইচ্ছায় ঘাটে লাগে—তবে কে আর তার কৈফিয়ৎ লইবার জন্য প্রতীক্ষা করে? আমার ঘরে পুত্র-কন্যা নাই—তোমরাই আজ হইতে এই ঘরের পুত্র-কন্যা হইলে।"

মদনের বিদায় গ্রহণ

সেই দিন প্রাতে উষার আলো পূব দিক হইতে সবে ঝিলি মিলি খেলিতেছে, স্বামী আসিয়া রূপবতীকে বলিলেন, "আজ ছয় বৎসর তোমাদের বাড়ীতে কাটাইলাম। একদিনও

"পুত্র কন্যা নাই পুনাইর বড় দুঃখ মন।
কনারে দেখিয়া পুনাইর প্রফুল্ল বদন।।"

(পৃষ্ঠা ১৫২)

দেশে যাই নাই, আমার পিতা-মাতা কেমন আছেন, তাহা জানি না। তুমি অনুমতি দিলে আমি কয়েকটা দিনের জন্য দেশে যাইতে পারি।"

অনেক কান্নাকাটির পর রূপবতী স্বামীকে বিদায় দিলেন। স্বামী বলিয়া গেলেন "৮।১০ দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই আসিব।"

৮।১০ দিন চলিয়া গেল। জেলে বাড়ীর মরা কুলগাছের ডালটার উপর বসিয়া কোকিল ডাকিয়া ডাকিয়া হয়রান হইল, নদীর ওপার হইতে ডাহুক পাখী সারারাত্রি চীৎকার করিয়া আকাশ ফাটাইয়া দিল,—কিন্তু কই কেউ ত সাড়া দিল না। রূপবতীর প্রাণ যে অহর্নিশ সেইরূপ চীৎকার করিয়া উঠে, মরা চাঁদ ধীরে ধীরে পূর্ণ জীবিত হইতে লাগিল। রূপবতীর হাতের বকুল-মালা রোজই শুকাইয়া যায়, কাজল-বরণ ভ্রমরেরা তাহার কাছে ছোট ছোট ফুলের চারিদিকে ঘুরিয়া গুণ গুণ করে,—রূপবতী যাহা দেখেন, যাহা শুনেন, তাহাতেই মন উতলা হইয়া উঠে। দু'টি পক্ষ চলিয়া যায়। এখনও ত মদন আসিল না, রূপবতীর আহারের রুচি চলিয়া গেল, রাত্রিতে এক মুহূর্ত্তের জন্য চোখে ঘুম নাই—মনে সদাই মদনের জন্য হাহাকার হইতে লাগিল। তিনি কাহার কাছে তাঁহার দুঃখের কথা বলিবেন? পুনাই যত সোহাগ করে, তাহাতে মুখে বাহিরে একটা হাসির রেখা খেলিয়া যায়, কিন্তু চোখে অশ্রু টলমল করে।

নিষ্ঠুর সংবাদ ও পুণাইএর অভিযান

একদিন রূপবতী কি নিদারুণ সংবাদই না শুনিলেন, তাঁহার আছাড়ি-বিছাড়ি ক্রন্দনে পুণাইর প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। দেশের রাজা ডঙ্কা দিয়াছেন, "রাজকুমারী পলায়ন করিয়াছে, মদন নামক তাহার এক কর্ম্মচারী তাহাকে লইয়া পলাইয়া গিয়াছে। যে সেই মদন ও রাজকুমারী রূপবতীকে ধরিয়া দিতে পারিবে তাহাকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হইবে। অপরাধী মদনকে কালী মন্দিরে বলি দেওয়া হইবে।"

যে এই সংবাদ দিল, সে বলিল, "এই মদনই কাঙ্গালিয়া ও জঙ্গলিয়াদের বাড়ীতে ছিল, রাজার লোকজন তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। রাজা তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দিবেন, কুমারীর খোঁজেও লোকজন ঘুরিতেছে।"

এইভাবে সমস্ত কথাই প্রকাশ হইয়া পড়িল।

হতভাগিনী রাজকুমারী চাপা সুরে পুণাইকে কাঁদিয়া বলিল, "আমার ধর্ম্মের মা, তুমি নিরাশ্রয় অবস্থায় আমাদিগকে আশ্রয় দিয়াছ, আবার যে অকূলে পড়িলাম, কে এসময়ে আশ্রয় দিবে?

"মাগো, রাজার ঘরে জন্মিয়াছিলাম, কিন্তু দৈব দোষে সকলই হারাইয়াছি, আমার রাজবাড়ী, দাস দাসী সবই গিয়াছে, যাক্ তাতে দুঃখ নাই। কিছুই জানি না মাগো, দ্বিপ্রহর রাত্রে একদিন ঘুম ভাঙ্গাইয়া মাতা আমাকে এই স্বামীর হাতে সমর্পণ করিয়া নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন, কি অপরাধ? জানি না। দৈবের বিধান মাথা পাতিয়া লইলাম, আমার স্বামীকে পাইয়া সকল দুঃখ ভুলিলাম। আমি মা, বাপ, বাড়ী-ঘর সকলই ভুলিলাম,—আমার কর্ম্মের লেখা ছিল, আপন জন আমার পর হইয়া গেল।

"কিন্তু একটা দুঃখে আমার প্রাণে বড় দাগা লাগিয়াছে, আমি একটি দিন বাসর-ঘরে তাঁহার হাতে নিজ হাতে বানাইয়া একটি পানের খিলি দিতে পারি নাই, আমি ঘিয়ের বাতি জ্বালাইয়া তাহার চন্দ্র-মুখখানি মনের সাধে দেখিবার সময় পাই নাই, হাতীর দাঁতের শীতল পাটী পাতিয়া একদিন তাহার জন্য শয্যা প্রস্তুত করিতে পারি নাই, একদিনের জন্য সুখের গৃহস্থালী আমার অদৃষ্টে হয় নাই, একদিন বকুল ফুলের মালা তাহার গলায় পরাইতে পারি নাই,—গাঁথিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু সুবিধা পাই নাই; লজ্জায় তাহা পরাইতে না পারিয়া পরদিন চোখের জলে ভিজা সেই মালা পুকুরে ভাসাইয়া দিয়াছি। চিকন শালী ধানের ভাত রাঁধিয়া তাহাকে পরিবেশন করিতে পারি নাই। কত দুঃখে যে আমার মনে দিন রাত শেল বিঁধিয়াছে, তাহা তোমাকে কি বলিব!"

> "জ্বালাইয়া ঘৃতের বাতি একদিন না দেখিলাম গো
> বঁধুর চাঁদ মুখ।
> দুই দিন না বঞ্চিলাম সুখের গৃহ বাস।
> কর্ম্ম দোষে অভাগিনী হইল নিরাশ।।"

ধর্ম্ম-মাতা পুণাই অনেকরূপ সান্ত্বনা দিল,—কিন্তু সে কোন কথাই শুনিল না; বিলাপ করিয়া বলিল—"মা, আমাকে আমার স্বামীর নিকটলইয়া চল। আমি তাঁহাকে ছাড়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিব না,—আমি তাঁহার জীবন-মরণের সঙ্গী—আমার পিতা দুষমনের মত তাঁহাকে আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে পারিবেন না! আমাকে যদি তাঁহার নিকট লইয়া না যাও, তবে আমি বিষ খাইব, জলে ডুবিয়া মরিব, না হয় গলা কাটারি দিয়া কাটিব।

"বিষ খাইয়া মরিব আমি,
যদি না দেখাও গো স্বামী
গলেতে তুলিয়া দিব কাতি।"
পুনাই বুঝাইয়া কয়।
"এত বড় বিষম হয়।"
বলি কহি পোহাইল রাতি।।

পুণাই রূপবতীর কান্না ও দারুণ বিলাপ শুনিয়া সারারাত্রি অস্থির ভাবে কাটাইল। আজ রাত্রি প্রভাত হউক, কাল একটা বিহিত করিব, রূপবতীকে এই সান্ত্বনা দিল। কিন্তু সে কি সান্ত্বনা শুনে? কোন কথা শুনে? রহিয়া রহিয়া তাহার আর্ত্তকণ্ঠ ছিন্ন-তার বীণার মত বাজিয়া উঠিতে লাগিল, সারা রাত্রি সে বিলাপের অন্ত নাই।

পরদিন কাঙ্গালিয়া ও জঙ্গলিয়া একটি ডিঙ্গি লইয়া আসিল, পুণাই রাজকুমারীকে লইয়া ডিঙ্গিতে উঠিল।

দরবার গৃহ পূর্ণ, রাজা সভাসদদিগকে লইয়া বিচার-কার্য্য করিতেছেন।

এমন সময়ে দুইটি পুরুষ ও দুইটি স্ত্রীলোক কোন বাধা না মানিয়া ঝড়ের মত সেই দরবারে প্রবেশ করিল। অগ্রবর্ত্তিনী প্রৌঢ়া রমণীর একবারে উন্মত্ত বেশ, সে সভায় কোণে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া দাঁড়াইল। তার পরে রাজার দোহাই দিয়া বলিল—তখন চোখের জল তাহার গণ্ড প্লাবিত করিতেছে এবং সে উত্তেজনায় তাহার হাত দুটি আন্দোলন করিতেছে।

সে বলিল, "মহারাজ আপনি কোন্ দোষে জামাইকে বন্দী করিয়াছেন, আমাকে বলুন।"

পাত্রমিত্রগণ বলিল, "কেই বা বন্দী এবং কেই বা জামাই?"

পুণাই অশ্রুর বেগ সামলাইয়া লইয়া বলিল, "সে পরিচয় আমি দিব না। কিন্তু মহারাজ! পাখীকে যত্নে পালন করিয়া কে কবে তাহাকে শর দিয়া বধ করে? বহু যত্নে ঘর তৈরী করিয়া কে কবে সেই ঘরে আগুন লাগাইয়া দেয়? বাগান করিয়া সখের গাছগুলি নিজ হাতের কাটারি দিয়া কে কবে কাটিয়াছে? পূজার ঘট লাথি মারিয়া কে কবে ভাঙ্গিয়াছে? ঘোর অন্ধকার রাত্রে মহারাণী স্বয়ং তাঁহার প্রিয়তমা কন্যাকে দান করিয়াছেন, ইঁহাদের কি দোষ?

"পাগলিনী হৈয়া কন্যা জলে ডুবতে চায়
বাউরা কন্যাকে তোমার ঘরে রাখা দায়।"

"মহারাজ, তোমার কন্যার কথা কি বলিব! স্বামীহারা সতী স্বাধ্বীর দশা চোখে দেখুন,—সে একবার গলায় দড়ি দিতে গিয়াছে, আরবার বিষ খাইয়া মরিতে চাহিয়াছে। সারারাত্রি তোমার পাগলিনী মেয়েকে যে ভাবে রাখিয়াছি, তাহা আর কি বলিব—তাহাকে বাঁচাইতে পারিবেন না। অবিলম্বে বন্দী-শালায় যাইয়া জামাইকে মুক্তি দিন, আমি ইহার কষ্ট আর সহ্য করিতে পারিতেছি না।" এই বলিযা পুণাই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। অসম্বৃত কেশ-পাশ, সেই মহিমান্বিত জেলে রমণীকে দরদের একখানি জীবন্ত মূর্ত্তির মত দেখিয়া লোকেরা তাহার পশ্চাতে রোরুদ্যমানা নিশ্চল পাষাণ মূর্ত্তির ন্যায় কুমারীকে দেখিতে পাইল।

রাজা সমস্তই জানিলেন। তিনি স্বয়ং কারাগারে যাইয়া নিজ হস্তে বন্দীর বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলেন। সেই সঙ্গে সমস্ত বন্দিই মুক্তি পাইল।

" সকরুণ মন রাজা ভাসায়ে চক্ষের জলে।
পাত্র মিত্র জনে রাজা বুঝাইয়া বলে।।
রাজার আদেশে হৈল বিয়ার আয়োজন।
বন্দীখানা হৈতে মুক্তি পাইল মদন।।
হাতী দিল ঘোড়া দিল আর জমি বাড়ী।
জামাই কন্যারে লেখ্যা দিল বাড়ীর জমিদারী।।
বাড়ীতে বাঁধিয়া দিল বার দুয়ারী ঘর।
রূপবতী লইয়া জামাই যায নিজ ঘর।।

আলোচনা

রূপবতী পালাটি সত্যঘটনা-মূলক। আদত গানটিতে যে সকল নাম ছিল, তাহা সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত চন্দ্র কুমার দের অনুরোধে আমি পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিয়া কাহিনীটি আইনের চোখে নিরাপদ করিয়াছি। পালাটির দুইটি সংস্করণ আমি পাইয়াছিলাম, একটির সঙ্গে অপরটির মূলগত সামঞ্জস্য থাকিলেও কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য ছিল।

একটি পালায় কথিত হইয়াছে, রাজা বাড়ী ফিরিয়া মুসলমানের হাতে কন্যা সমর্পণ করা অপেক্ষা বাড়ী ঘর ও রাজত্ব ত্যাগ করিয়া বনবাসী হইবেন, এই স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু সমস্ত ত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্বে এই সঙ্কল্প করিলেন যে, পরদিন প্রভাতে যাহার

মুখ দেখিবেন, তাহারই হস্তে কন্যাটিকে সমর্পণ করিয়া যাইবেন। রাজা তাঁহার অভিপ্রায় রাণীকে জানাইলে রাণী তাঁহাদের বাড়ীর তরুণ অধস্তন কর্ম্মচারী মদনকে গোপনে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, "তুমি রাজার শয়নকক্ষের পার্শ্বে সারা রাত্রি থাকিয়া পাহারা দিবে। রাজা দরজা খুলিলে, হাজির হইয়া তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষা করিবে।"

মদন অতি সুদর্শন, অল্প বয়স্ক, কর্ম্মঠ ও বিশ্বাসী লোক ছিল। এই মহাবিপদ ঘাড়ে করিয়া স্বজাতীয় কোন বড় লোকের ছেলে বিবাহ করিতে রাজী হইত না। বিশেষ বিবাহ খুব গোপনে নির্ব্বাহিত হইবে, যেন এ সংবাদ ক্ষুণাক্ষরেও মুর্শিদাবাদ না পৌঁছিতে পারে— রাজবাড়ীর এক সামান্য সরকারের নিশাকালে রাজকন্যাকে পত্নীস্বরূপ গ্রহণ ও রাজবাড়ী ত্যাগ এমন একটা কিছু ঘটনা নয়, যাহা লইয়া মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত একটা হৈ চৈ হইতে পারে, কিংবা সন্দেহের উৎপত্তি হইতে পারে। এইজন্য রাণী উপস্থিত বিপদের মধ্যে যথাসম্ভব সুবিধাজনক এই ব্যবস্থা করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। রাজা অতি প্রত্যুষে উঠিয়া মদনের মুখ দেখিয়া একটুকু বিস্ময়ের ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এত ভোরে আমার শয়ন-গৃহের কাছে কি করিতেছিলে?" মদন নত-মস্তকে উত্তর করিল, "আমি ৬ বৎসর যাবৎ মহারাজার বাড়ীতে কাজ করিতেছি এবং আমি অন্দর বাড়ীতে সর্ব্বদা যাতায়াত করিয়া থাকি, মহারাজার কোন প্রয়োজন হইতে পারে—এইজন্য আদেশ প্রতীক্ষায় আমি এখানে আছি।"

রাজা মনে মনে কতকটা খুসীই হইয়াছিলেন, কারণ পদ ও জাতি হিসাবে অযোগ্য হইলেও মদনের অনেক গুণ ছিল। সুতরাং নিতান্ত বিপদে পড়িয়া এরূপ লোকের হস্তে রূপবতীকে সমর্পণ করা বরং কতকটা ভাল, এইজন্য ভৃত্যের অসময়ে তথায় উপস্থিতির প্রশ্ন লইয়া কালক্ষয় ও লোক জানাজানির সুবিধা না দিয়া রাজা পরদিন রূপবতীর সঙ্গে মদনের বিবাহের ঘোষণা করিয়া দিলেন।

পালাটির এই অংশ নিতান্তই অবিশ্বাস্য। বহু পূর্ব্ব হইতে এরূপ অনেক রূপকথা এদেশে প্রচলিত আছে যে, মুস্কিলে পড়িয়া রাজা প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছেন, "কাল সকালে উঠিয়া যাহার মুখ প্রথম দেখিব, তাহার সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিব।" এই চির-প্রচলিত রূপকথার অংশ কাহিনীটিতে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয়, এই জোড়া খুব বেমালুম রিপু-কার্য্য হয় নাই। রাজা ঢাক-ঢোল বাজাইয়া মদনের সঙ্গে তাঁহার কন্যার বিবাহ দিলেন। জানাজানি হইল, সুতরাং মুর্শিদাবাদের রোষাগ্নি তাহাতে নির্ব্বাপিত হইবার

কথা নহে, বরং বিপদ তো সমস্তই রহিয়া গেল, কেবল কন্যাটিকে একটি অপাত্রে দান করা হইল।

তদপেক্ষা অপর পালাটির কথিত অংশ বিচারসহ ও সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। তাহা আমার এই গল্পে দেওয়া হইয়াছে, ময়মনসিংহ গীতিকায় দুইটি অংশই দেওয়া হইয়াছে।

এই গল্পে প্রদত্ত ঘটনা অনুসারে রাণী স্বয়ং রাজার নিকটও বিষয়টি গোপনে রাখিয়া দ্বিপ্রহর রাত্রে মদনের হাতে রূপবতীকে দিলেন, "কাণা চৈতা"কে (নৌকার মাঝি) বলা হইল সে যেন তাহার নৌকার যাত্রী দুইজন সম্বন্ধে কোনওরূপ কৌতূহল না দেখায়, এবং তাহারা কে এবং কোথায় যাইতেছে প্রভৃতি না জিজ্ঞাসা করিয়া নদীর চৌদ্দ বাঁক পরে যে স্থান পাইবে, তাহা লোকালয় হউক, বা বিজন বনই হউক— সে সম্বন্ধে বিচার না করিয়া অতি প্রত্যূষে ইহাদিগকে সেই স্থানে নামাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসে।

ইহাতে রাজ-বাড়ীর কেহ, নৌকার মাঝি, এমন কি রাজা পর্য্যন্ত এই গোপনীয় বিবাহ সম্বন্ধে কেহই কিছু জানিতে পারিলেন না। রাজা পরদিন জাগিয়া শুনিলেন, কন্যাটি রাজপুরী হইতে পলাইয়া গিয়াছে এবং মদনকেও পাওয়া যাইতেছে না। সকলের নিকটই বিষয়টি স্বাভাবিক বোধ হইল। মুসলমানের হাতে যাইয়া পড়ার অপেক্ষা এইরূপ পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করা রাজকুমারীর পক্ষে অস্বাভাবিক নহে, সকলেই এই কথা ভাবিল। পরদিন যখন রাজার আদেশে ঢেরি পিটাইয়া প্রচার করা হইল যে দুষ্ট ভৃত্য তাহার জাতি কুলে কলঙ্ক দিয়া রাজকুমারীকে লইয়া পলাইয়াছে, তাহাকে ধরাইয়া দিলে রাজা পুরস্কার দিবেন এবং অপরাধী ভৃত্যকে কালীর নিকট বলি দিবেন, তখন এই রাজ-রোষ স্বতঃই হইয়াছিল, কারণ প্রকৃত ঘটনা রাজা কিছুই জানিতেন না এবং এ সংবাদ শুনিয়া মুর্শিদাবাদের নবাবও রাজার প্রতি বরং সহানুভূতি-পরায়ণ হইয়াছিলেন।

রাণী কর্ত্তৃক রাজকুমারীকে দানের কথা অবশ্য রাজা পরে শুনিয়াছিলেন। খড়ের আগুন যেমন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এবং তাহা নিবিয়া যাইতেও গৌণ হয় না, নবাবদিগের লালসায় বাধা পড়িলে যেমন সহসা তাঁহারা ক্রুদ্ধ হন, কতকটা সময় অতীত হইলে সে ক্রোধ আর বেশী থাকে না। সুতরাং তারপরে মদনকে এজন্য আর কোন লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয় নাই।

এই গল্পটির আদ্যন্ত একটি কান্নার সুর আছে; নবাবের আদেশ পাওয়ার পর হইতে রাজা ও রাণীর দুঃসহ মনোবেদনা ও দুশ্চিন্তার কথা বেশ আন্তরিকতা ও দরদ দিয়া রচিত হইয়াছে। গল্পটি আদ্যন্ত কৌতূহল-উদ্দীপক।

চরিত্র হিসাবে রূপবতীর চিত্রটি কোন অসামান্য বৈশিষ্ট্য বা গুণপনার পরিচায়ক না হইলেও উহা একটি নিখুঁত ছবি। কোন কোন ছোট ফুল এরূপ দেখা যায়, যাহার সুরভি দূরের বাতাস পর্য্যন্ত পৌঁছায় না; কিন্তু কাছে আনিলে বুঝা যায় ফুলটি সুঘ্রাণে ভরপুর। রূপবতী যে সকল অবস্থায় শঙ্কটের ভিতর দিয়া দ্রুত চলিয়াছেন, তাহার কোনটিতেই তাঁহার গুণপনার টের পাওয়া যায় নাই। হিন্দু পরিবারের কুমারীরা অনেক সময়েই মাটীর পুতুলের মত, তাহাদের মনোবৃত্তি সর্ব্বংসহা; যে পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া না যায়—সে পর্য্যন্ত সকল অবস্থার সঙ্গেই তাহা নিজেকে মানাইয়া চলিতে পারে। তাহার গভীর মনোবেদনা বা চাঞ্চল্য সহজে বুঝা যায় না, গভীর কূপের মত তাহা নিম্নে অজস্র জল-সঞ্চয় ধারণ করিয়াও বাহিরের সল্প পরিসর উপরিভাগে সেই গভীরতার কোন লক্ষণই দেখায় না।

কিন্তু যেদিন স্বামীর বিপদের কথা রাজকুমারী শুনিল, সেদিন তাহার চিত্তের সমস্ত কারুণ্য ও ভালবাসা যেন উৎসারিত হইয়া উঠিল: এই সুকুমারী নব বধূটির মনে যে নীরবে কত রস-ধারা সঞ্চিত ছিল তাহার গোপন আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথা সেইদিন বাহির হইয়া পড়িল। তাহার বড় সাধ ছিল সে শীতল-পাটি পাতিয়া স্বামীর সঙ্গ-সুখ লাভ করে, ঘিয়ের বাতি জ্বালাইয়া সারারাত্রি তাঁহার চন্দ্রমুখখানি দেখিয়া কাটায়,—প্রতি প্রভাতে শিবপূজার ফুলের মত বাগানের ফুল কুড়াইয়া স্বামীর জন্য মালা গাঁথে এবং নিজে উৎকৃষ্ট শালী ধানের ভাত রাধিয়া উষ্ণ ধোঁয়া থাকিতে থাকিতে তাহা পরিবেশন করিয়া কাছে বসাইয়া খাওয়ায়—সে রাজবাড়ীর স্বর্ণ পালঙ্ক, মণি মুক্তার অলঙ্কার, হাতী ঘোড়া যান-বাহন, স্বর্ণ রৌপ্য-মণ্ডিত জলটুঙ্গী ঘর বা আরাম গৃহ—এসকল কিছুরই আকাঙ্ক্ষা করে নাই, কিন্তু হিন্দু বধূদের নিভৃত হৃদয়ের যে সকল যাচ্ঞা জানাইয়াছে, তাহা এদেশের রাজবাড়ীতে সম্রাজ্ঞী হইতে কুটীরবাসিনী সকল রমণীরই অতিপ্রার্থিত; এই অধ্যায়ে রূপবতী বঙ্গের বধূরূপে ধরা দিয়াছে।

দ্বিতীয় চরিত্র পুণাই-এর,—তাহার হৃদয়ে রূপবতীর জন্য যে কি অসামান্য প্রীতি ছিল, তাহা রাজবাড়ীতে তাহার ক্ষেদোক্তিতে বুঝা যায়। দরবারের সশস্ত্র সৈন্য ও দেহরক্ষী

দলের বিভীষিকা এবং সভাসদ্‌গণের উগ্র প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা কিছুতেই সে ভড়কাইয়া যায় নাই, বরং রাজার প্রতি ক্রোধ-প্রবণা মুখরা কলহকারিণীর মনের ক্ষোভ গ্রাম্য ভাষায়ই সে ব্যক্ত করিয়াছে। এই অকুণ্ঠিত বিক্ষোভ ও ক্রোধের ভাষা তাহার ধর্ম্ম-কন্যার প্রতি আবেগময় স্নেহ হইতেই উৎসারিত হইয়াছিল। এই অসংযতবাক্ পাড়াগেঁয়ে মেয়েটির চরিত্রের সরলতা ও উচ্ছ্বাস আমাদিগের খুব ভাল লাগিয়াছে।

গল্পটি দুইশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। রচক ইচ্ছা করিয়াই তাঁহার নাম ধাম গোপন রাখিয়াছেন।

তিলক বসন্ত

রাজ্য—বিলোপ ও কাঠুরিয়াদের আশ্রয়

একদা এক ত্রিপাদ বিশিষ্ট (তেঠেঙ্গা) কর্ম্ম-পুরুষ-দেবতা রাজা তিলক-বসন্তের উপর বিরূপ হওয়াতে রাজার ধনজন ঐশ্বর্য্য কর্পূরের মত উবিয়া গেল।

তাঁহার হাতী-ঘোড়া যান-বাহনের অবধি ছিল না; দ্বারে দ্বারে খাড়া পাহারা ছিল, কিন্তু নিশির স্বপ্নের মত সে সকল অন্তর্হিত হইল। রাজ মন্দিরের চূড়া চন্দ্র সূর্য্যকে যেন স্পর্শ করিয়া হাসিতে থাকিত।

"দুয়ারে দুয়ারে পাহারা, রাজমন্দিরের চূড়া,
চাঁদ-সূরুজ ছুঁইয়া হাসেরে।"

সে সব কোথা গেল? কোথায় গেল, কুবেরের মত ধন-ভাণ্ডার?

"সোণার মন্দিরে জ্বলে বাতি
সোণার পশরা।[১]
ধীরে ধীরে সেই দীপ
হ'ল আঁধিয়ারা।"[২]

রাজা রাজধানী ত্যাগ পূর্ব্বক পলাইয়া বনে চলিলেন। রাণীকে কত করিয়া বলিলেন রাজপ্রাসাদে থাকিতে। রাণী সম্মত হইলেন না,

১ পশরা = আলোর প্রবাহ।
২ আঁধিয়ারা = আঁধার।

"জোড়মন্দিরে ঘর সোণার কপাট,
আমি নাহি চাই রাজা সোণার পালং[১] খাট।।"
বনের কুটিরে গো রাজা অঞ্চল বিছাইব।
মাটির মঞ্চেতে[২] শুইয়া সুখে নিদ্রা যাব।।
বৃক্ষতলা বাড়ী ঘর পাতায় বাঁধিও।
সেই ঘরে অভাগীরে পদে স্থান দিও।।
দুইজনে মিলি বন ফল কুড়াইয়া খাইব।
পাতার কুটীরে দোঁহে সুখে গোঁয়াইব।।
বনের যত পশু পক্ষী তারা সদয় হবে।
আপনা বলিয়া তারা আমাদেরে লবে।।"[৩]

রাজা কিছুতেই রাণীকে এড়াইতে পারিলেন না। রাণীর নাম 'সুলা'[৪]; সুলারাণী রাজার সঙ্গে চলিতে চলিতে এক ঘন গহীন অরণ্যে প্রবেশ করিলেন।

সেখানে শত শত কাঠুরিয়া কাঠ কাটিতেছিল,

"বনে থাকে কাঠুরিয়া,
বুক ভরা দয়া মায়া;
গাছ্ কাটে বৃক্ষ কাটে,
বিকায় নিয়া দূরের হাটে;
শাল চন্দন তাল তমাল আর যত,
বৃক্ষের নাম আর কইব কত।
কাঠ বিকাইয়া খায়,
এক রাজার মুলুক থেকে
আর রাজার মুলুকে যায়।"

১ পালং = পালঙ্ক।
২ মঞ্চেতে = মাচায়।
৩ আপনা বলিয়া..........লবে = তাহারা আমাদিগকে আপনার জন বলিয়া গ্রহণ করিবে।
৪ সুলা = সম্ভবতঃ "সুলক্ষণা" শব্দের অপভ্রংশ।

সুতরাং তারা এক শ্রেণীর যাযাবর জাতি।

তারা "বনের ফল খায়।
পাতার কুঁড়্যায় [১]শুয়ে সুখে নিদ্রা যায়।।"

তাদের বর্ণনায় গ্রাম্য সৌন্দর্য্য ও সরলতা কবি সুন্দর ভাবে আঁকিয়া দেখাইয়াছেন,

"মুখ ভরা হাসি চাঁদের ধারা।
না জানে ছল—না জানে চাতুরী তারা।।
বনে গমন বনের পথে।
বাঘ ভালুক যায় সাথে সাথে।।
পথে পাইয়া কুড়ায় ফল, কুড়ায় ময়ূরের পাখা।
ধার্ম্মিক রাজ-রাণীর সঙ্গে হৈল পথে দেখা।।"

রাজা ও রাণীর সুগঠিত দেব-মূর্ত্তি দেখিয়া তাহারা চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,

"কে তোমরা গো; তোমরা ত নিশ্চয় কোন দেশের রাজা ও রাজ-কন্যা। এ ঘোর জঙ্গলে তোমরা কেন আসিয়াছ?

এখানে "আথালের ধন[২] পাথালে[৩]পড়ে।
বাঘ ভালুক বনে বসতি করে।।
দানা আছে ডাইনি আছে।
এই বনে কি আসতে আছে?
রূপে গুণে ধন্যা।
ওগো তুমি কোন রাজার কন্যা?
এমন দীঘল কেশ—পরণে পাটের শাড়ী।
তুমি কোন রাজার মেয়ে গো, তুমি কোন রাজার নারী?
সঙ্গে তোমার কে? একি তোমার পতি?
পতি থাকিতে তোমার এতেক দুর্গতি!"

---

১ কুঁড়্যায় = কুটিরে।
২ আথালের = মন্ত্রের।
৩ পাথালে = বন জঙ্গলে।

রাণী কাঁদিয়া নিজের পরিচয় দিলেন। "তোমরা যাহা বলিলে এক কালে তাহা আমার সকলই ছিল, এখন কিছুই নাই;কর্ম্ম-পুরুষ সকলই কাড়িয়া লইয়াছেন। আমার দুঃখ সহিতে সহিতে শরীর হইতে দুঃখ-বোধ লুপ্ত হইয়াছে—

"আমার দুঃখ নাই।
কাটিয়া ফেলিলে অঙ্গে ব্যথা না সে পাই।।"

* * * *

"কাণা কড়া সঙ্গে নাহি কি হবে উপায়।
তিন দিন উপোসী রাজা কাঁদিয়া বেড়ায়।।
সোণার না ছত্র উড়ত যার শিরে।
গাছের পাতা দিয়া রৌদ্র বারণ করে।।
অঙ্গেতে বসন নাহি পরণে নাহি ধটি।[১]
ভাবিয়া সোণার অঙ্গ হইয়াছে মাটি।।"

এই কাঠুরিয়াদের কি আশ্চর্য্য দরদ ও মমতা, তাহারা কেহ কোন বক্তৃতা করিল না; কেহ বন হইতে নিজ বল্কল-বাসের পুঁটুলিতে ফল পাড়িয়া লইয়া আসিল। কেহ দূর নদী হইতে পাতার পান-পত্রে নির্ম্মল জল লইয়া আসিল, কেহ গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া ইহাদের মাথায় বাতাস করিতে লাগিল। কেহ বা মধুর চাক ভাঙ্গিয়া মধু আনিয়া রাণীকে খাইতে দিল, কেহ বা রাজা-রাণীর দুঃখের কথা শুনিয়া 'হায় হায়' করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহাদের এতখানি দরদের পরিচয় পাইয়া ঃ—

"রাজা-রাণীর চক্ষের জল ঝরে।
এমন সোহাগ মায় না করে।।"

কেবল ইহাই নহে, পরদিন হইতে তাহারা রাজা ও রাণীর জন্য ঘর বাঁধিতে লাগিয়া গেল।

কেহ গাছে উঠিয়া কুড়ুলের কোপে বড় বড় গাছের ডাল কাটিতে লাগিল। পূব-দুয়ারী ঘর বাঁধিল, মধ্যে মধ্যে শক্ত শালের খুঁটি। রাজ-বাড়ী হইবে,—ঘর উঠিল পাঁচতলা। চারিদিকে

---
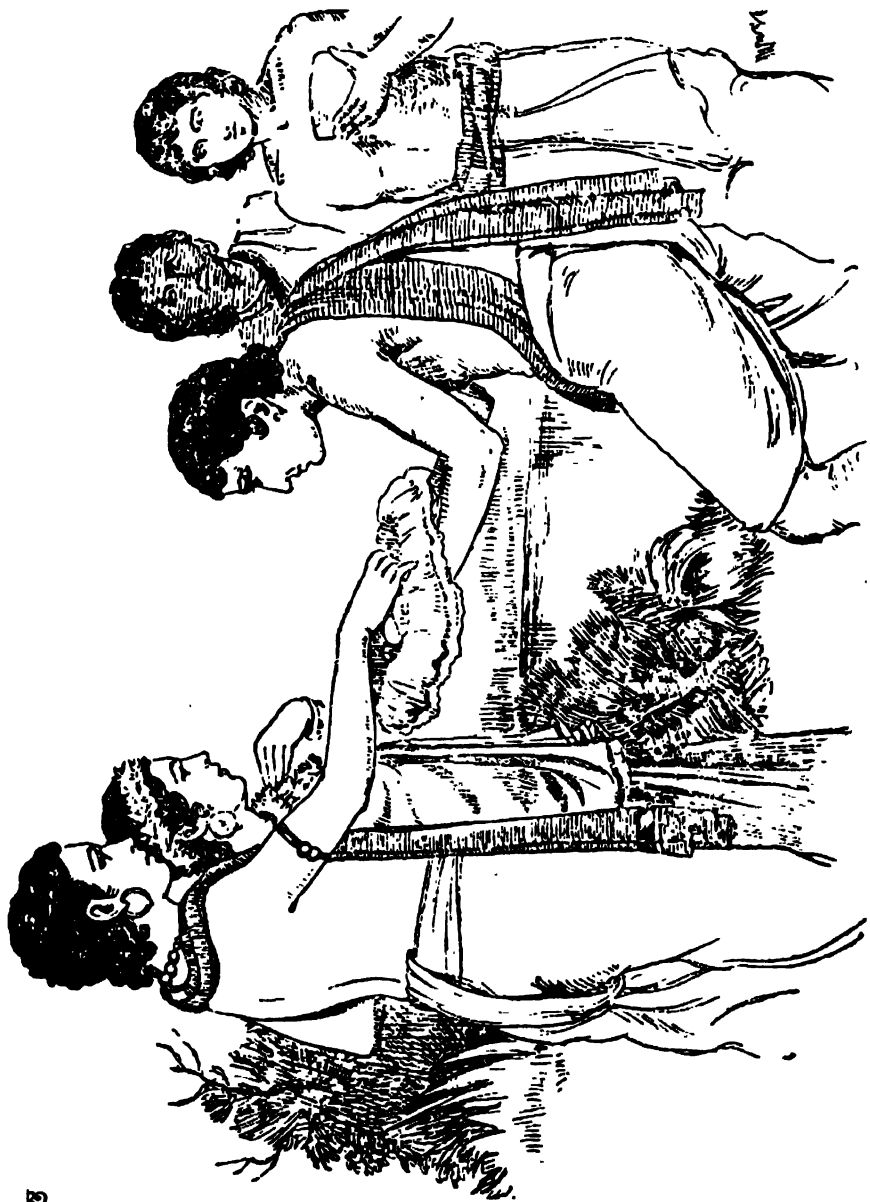
১ ধটি = ধুতি।

"অঞ্চলে বাঁধা, দূর নদীতে জল
কেউ জল আনে, কেউ করে হা হুতাশ।"

(পৃষ্ঠা ১৬৬)

কলরব, কেহ জিজ্ঞাসা করিতেছে, কেহ উত্তর দিতেছে,—সকলে মিলিয়া দিন রাত্র কাজ করিয়া তাহারা অল্প-সময়ের মধ্যে বাড়ী-নির্ম্মাণ শেষ করিল।

শাল গাছের পাতা সাত পংক্তি করিয়া রাজা-রাণীর শয্যা তৈরী হইলঃ—

"সাত পরতে শাল বৃক্ষের পাতার বিছানি
সেই ঘরে থাকবেন রাজা আর রাণী।।"

কাঠুরাণীদের সঙ্গে রাণী বনে যাইয়া ময়ূরের পাখা কুড়াইয়া আনেন।

বৃদ্ধা কাঠুরাণীরা রাণীমাকে ঘিরিয়া বসিয়া থাকে— সেই লোকেরা যেন তাঁর কত কালের গোলাম!

এদিকে কুড়ুল কাঁধে করিয়া রাজা কাঠুরিয়াদের পেছনে পেছনে কাঠ সংগ্রহ করিতে নিবিড় বনে যান;বনের যে অংশ চন্দনের গন্ধে আমোদিত, রাজার সেইদিকে আনাগোনা বেশী।

অনেক সময় রাজা কাঠুরিয়াদের সঙ্গে বনে রাত্রিবাস করেন।

এইভাবে রাজা তিলক বসন্ত কাঠুরিয়া বেশে সেই জঙ্গলে ৪০ দিন কাটাইলেন।

চন্দনকাঠ বিক্রয় করিয়া সেদিন রাজা এক কাহন কড়ি লাভ করিয়াছেন।

তিনি হাসি মুখে রাণীকে বলিলেন, "আজ কাঠুরিয়াদের নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান যাক্, তুমি তো রাঁধিতে পারিবে?" রাণী বড়ই আনন্দিত হইয়া রান্না ঘরে রাঁধিতে গেলেন। একখানি গামছা কাঁধে ফেলিয়া রাজা কাঠুরিয়াদের নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন এবং বাজারে যাইয়া দ্রব্যাদি কিনিয়া আনিলেন। তারপর রাণীকে বলিলেন, "এই বনে অনেক চন্দন গাছ আছে, এবার কাঠ কাটিয়া আমরা অনেক সোণা পাইব।"

রাণী অন্নপূর্ণার মত রাঁধিতে বসিলেন, শাল পাতা দিয়া অনেকগুলি "ডুঙ্গা" প্রস্তুত করিয়া ৩৬টি ব্যঞ্জন ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে রাখিলেন। তারপরে পায়েস ও পিস্টক অনেক রকমের তৈরী হইল। ডুঙ্গাগুলি ভর্ত্তি হইয়া গেল। উৎকৃষ্ট 'চিকনিয়া' চালের ভাত তালপাতের থালায় রক্ষিত হইল, তাহাদের সুবাসে সমস্ত বন আমোদিত হইল এবং উষ্ণ অন্ন ব্যঞ্জন হইতে মনোরম ঘ্রাণ উত্থিত হইতে লাগিল এবং সুগন্ধ ধোঁয়ায় ক্ষুধার উদ্রেক করিতে

ডুঙ্গা = পাত্র

লাগিল। রাণী রাঁধিয়া বাড়িয়া নিজে তৃপ্তি বোধ করিলেন এবং কাঠুরাণীদিগকে বলিলেন, "চল আমরা এইবার নদীতে স্নান করিয়া আসি।" এক একটি মেটে কলসী লইয়া কতক কতক কাঠুরাণী রাণীর সঙ্গে চলিল।

জাহাজ উদ্ধার ও রাণীকে লইয়া পলায়ন

কোন ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণের অভিশাপে এক সাধুর চৌদ্দখানি মাল-বোঝাই নৌকা সেই নদীর চরে আটকাইয়া গিয়াছিল; অতিথি ক্ষুধার পীড়নে হাত পাতিয়া কিছু সাহায্য চাহিয়াছিল, কিন্তু মাঝিরা মনের স্ফূর্ত্তিতে সারি গাহিয়া যাইতেছিল, তাহারা অতিথির কাতর নিবেদন গ্রাহ্য করে নাই।

ডিঙ্গাগুলি চরায় আটকাইয়া যাইবার পর যাত্রীদের হুস্ হইল। তখন বণিক অনেক আর্ত্তনাদ ও কান্নাকাটি করার ফলে দৈববাণী হইল, "কোন সতী নারী তোমার জাহাজ ছুঁইয়া দিলে—আবার তাহারা জলে ভাসিবে।"

সেই নদীর তীরে সতী নারীর খোঁজে যখন সাধু ব্যাকুলভাবে সন্ধান করিতেছিলেন, তখন একদল কাঠুরাণীর মধ্যে অলোকসামান্য রূপসী রাণী সেই ঘাটে আসিয়া পড়িলেন।

তাঁহার চাঁদের মত মুখখানি এবং মূর্ত্তিমতী পতি-পরায়ণতার জ্বলন্ত তেজ দেখিয়া মাঝি মাল্লা ও বণিক সকলেই চমৎকৃত হইল। "কোন রাজমহিষী এই বনে রাজার সঙ্গে আসিয়া পথ হারাইয়া কাঠুরিয়াণী সাজিয়াছেন," সকলে এই বলাবলি করিতে লাগিল।

বণিক গলায় কাপড় বাঁধিয়া যাইয়া সুলা রাণীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার অবস্থা জানাইল। রাণী স্বভাবতঃই করুণাময়ী, দুঃখ কষ্টে পড়িয়া এবং দরিদ্র কাঠুরিয়াদের মধ্যে থাকিয়া সেই স্বভাবতঃ স্নেহ-প্রবণ প্রকৃতি আরও দয়াশীল হইয়াছে। তিনি সাধুর দুঃখে বিগলিত হইয়া প্রত্যেকটি জাহাজকে কর দ্বারা স্পর্শ করিলেন।

> "সদাগরের ডিঙ্গি রাণী পরশ করিল।
> চোদ্দখানি ডিঙ্গা অমনই ভাসিয়া উঠিল।।"

কাঠুরাণীরা অবাক্, মাঝি মাল্লারা অবাক্, বণিক রাণীর পায়ে পড়িয়া তাঁহার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইল। কিন্তু মাঝিরা তাঁহাকে বলিল, "প্রভু, দরিয়ার বিপদ আপনার অবিদিত

নাই, আবার এই সকল মাল বোঝাই ডিঙ্গি যাইয়া কোন চরায় ঠেকে তাহার ঠিকানা নাই, এই দেবীকে আমরা কিছুতেই ছাড়িয়া যাইব না।" সাধুর অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাঝি মাল্লারা জোর করিয়া রাণীকে ডিঙ্গায় তুলিয়া লইল।

রাণী বিপদে পড়িয়া কর্ম্ম-পুরুষের নিকট প্রার্থনা করিলেন—"এই পুরুষগুলি আমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে, হে দেবতা তুমি কুড়কুষ্ঠ দিয়া আমার রূপ ধ্বংস কর, আর যেন কেহ আমারে না ছোঁয়।"

যখন মাঝিরা ডিঙ্গা বাহিয়া চলিয়া গেল, তখন কাঠুরাণীদের দিকে চাহিয়া রাণীর কি মর্ম্মান্তিক কান্না! "আমার পাগল রাজাকে তোমরা চারটি খাওয়াইও। বড় সাধের ভাত ব্যেনুন পড়িয়া রহিল, কাঠুরিয়ারা শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আসিয়া কি খাইবে, কে পরিবেশন করিবে? রাজা হয়ত ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিবেন, খাইতে চাহিবেন না,—তোমরা আমার প্রাণ-পতিকে বাঁচাইয়া রাখিও। তোমাদের মনের স্নেহ আমি জানি, আমি রাজ্যহারা হইয়া পাতার বিছানায় রাজ্যসুখ পাইয়াছিলাম, আজ বিধাতা তাহা কাড়িয়া লইলেন, এই চৌদ্দ জাহাজ কোন্ দূর বন্দরের দিকে যাইতেছে, তাহা জানি না। আমি আর আমার স্বামীর মুখখানি দেখিব না, তোমরা আমার বড় প্রিয়জন, অন্তরঙ্গ— তোমাদের মুখ আর দেখিব না, তোমরা আমাকে দুঃখের সমুদ্রে ফেলিয়া চলিলে।" বিলাপের সুর ঢেউএর উপরে বহু দূর পথে ভাসিয়া আসিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে রাণী আর সহচরীদিগকে দেখিতে পাইলেন না, তখন সাধুর দিকে দৃষ্টি পড়িল; তিনি যোড় হস্তে কর্ম্ম-পুরুষের উদ্দেশে বলিলেন, "এই সাধু রাক্ষস; কি দোষে ভাগ্যহীন, রাজ্যহীন অভাগীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ হইতে বঞ্চিত করিল? আমার পাগল স্বামীর সঙ্গ হইতে আমাকে কাড়িয়া লইল? হে দেবধর্ম্ম—তুমি আবার চরায় এই চৌদ্দ জাহাজ ঠেকাইয়া দাও।" কর্ম্ম-পুরুষ তাঁহার কথা শুনিলেন, তাঁহার প্রার্থনায় তাঁহাকে কুষ্ঠ রোগ দিলেন। তাঁহার রূপের বনে আগুন লাগিল, তাঁহার হাত পা খসিয়া পড়িতে লাগিল এবং সমুদ্রের মধ্যে সহসা এক চরা পড়িয়া চৌদ্দ জাহাজ প্রলয় শব্দে তাহাতে আসিয়া ধাক্কা খাইল এবং শরাহত ঐরাবতের মত কা'ত হইয়া একদিকে শুইয়া পড়িল।

মাঝি মাল্লারা ইহার পূর্ব্বেই এই রমণীর দৈব-শক্তির পরিচয় পাইয়াছিল, এবার হতবুদ্ধি হইয়া বলিল—"এক মুহূর্ত্তও আর ইহাকে ডিঙ্গাতে রাখার প্রয়োজন নাই, নতুবা বিপদের

অন্ত থাকিবে না। এখনই ইহাকে নামাইয়া দেওয়া হউক।" তাহাদের আর রাণীকে স্পর্শ করিতে হইল না, রাণী স্বয়ং বহু কষ্টে সেই অজ্ঞাত প্রদেশের সিকতা-ভূমিতে নামিয়া পড়িলেন।

রাজার কাঠুরিয়াদের কুটির ত্যাগ, ও নূতন রাজার মুলুকে প্রবেশ এবং রাজকন্যাকে বিবাহ

রাজা তিলক বড় আনন্দে বন হইতে বাড়ী ফিরিয়াছেন;আজ অনেক চন্দন কাঠ পাওয়া গিয়াছে, "রাণী দেখ আসিয়া, আজ বড় লাভের কাঠ কাটা হইয়াছে। দূর নগরে এই কাঠ সোনায় বিক্রি হইবে। আহা কাঠুরিয়াদের বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, রান্নার আর বিলম্ব কত, তুমি ভাত বাড়িয়া রাখ, আমরা স্নান করিয়া আসি।" এই বলিয়া রাজা রান্না ঘরের কাছে দাঁড়াইয়া রাণীকে ডাকিতে লাগিলেন। কে উত্তর দিবে? পাগলের মত রাজা এদিক্ ওদিক্ খুঁজিতে লাগিলেন। কাঠুরাণীরা তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিল, তাহাদের চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত, তাহারা একটা কথা বলিতে যাইয়া আর বলিতে পারে না, 'হায়' 'হায়' করিয়া কাঁদিতে থাকে।

রাজা পাগলের মত হইয়া গেলেন, তিনি বিলাপ করিয়া বলিলেন;—"আমি রাজ্যহারা হইয়াও এই বনে রাজ্যসুখ পাইয়াছিলাম, আমার পাতার বিছানা আজ খালি হইল, আমার বাড়া ভাতে কে ছাই দিয়া গেল? এই পাতার কুটির, আমার বড় আদরের, কিন্তু এখন আর ইহাতে আমার প্রয়োজন নাইঃ—

"যাহার সুখের লাগি কাটিতাম কাঠ।
যে জন আছিল আমার সুখের রাজ্য-পাট।।
আর না থাকিব আমি এই গহিন বনে।
বিদায় দেও কাঠুরিয়া যাব অন্য স্থানে।।"

এই কথা শুনিয়া কাঠুরিয়াদের বসতি-স্থানে কান্নার রোল পড়িয়া গেল। তাহারা রাজাকে অনেক বুঝাইয়া শুঝাইয়া সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা পাইল, রাজার শোকে আর রাণীকে হারাইয়া তাহাদের মন জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইতেছিল। তাহারা বলিল, রাত্রি প্রভাত হইলে তাহারা নানা দিকে দল বাঁধিয়া রাণীর খোঁজে বাহির হইবে, এবং যেরূপে পারে তাঁহাকে খুঁজিয়া আনিবে। রাজার সে সকল কথা কাণে গেল কিনা বুঝা গেল না।

তাঁহার সে পর্ণ কুটির—রাজবাড়ী—একটু দূরে ছিল, তিনি শেষ রাত্রে সেই পাতার গৃহে আগুন লাগাইয়া দিলেন, এবং নিজে একদিকে চলিয়া গেলেন, কাঠুরিয়ারা আর তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

তাহারা প্রাতে উঠিয়া "হায়! হায়! পাগল রাজা গেল কোথাকারে?" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আর এক রাজার মুলুক। মস্ত বড় রাজা, তাঁহার বাড়ীর হাজার দুয়ারে হাজার কোটওয়াল খাড়া; হাতী-ঘোড়া, দাস-দাসী, সৈন্য-সামন্তের অন্ত নাই। সাত ছেলে ও এক কন্যা। কন্যা পরমা সুন্দরী, চারিদিকের রাজপুত্রেরা তাহাকে বিবাহ করিতে চায়, কিন্তু রাজার কাহাকেও পছন্দ হয় না।

একদিন রাণী সোণার গাড়ুতে রাজার ঘরের শীতল জল আনিতে কন্যাকে বলিলেন, দাসী-পরিচারিকাদিগকে না বলিয়া কন্যাকেই জল আনিতে রাজার ঘরে পাঠাইলেন। ঘুমের ঘোরে একটি চোখের কোণে রাজা তাহাকে দেখিলেন, দীঘল কোঁকড়ানো চুলে মুখ আচ্ছন্ন ছিল—রাজা তাহার মুখ দেখিতে পাইলেন না, নিজ কন্যাকে রাণী বলিয়া ভ্রম করিয়া তাহাকে পরিহাস্ করিলেন। কুমারী লজ্জায় পলাইয়া গেলেন। রাজা তখন নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া বড়ই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইলেন। তিনি স্থির করিলেন, "মেয়ে এত বড় হইয়াছে তাহা জানিতাম না। আর বিলম্ব করিব না, কাল প্রাতে উঠিয়া যাহার মুখ প্রথম দেখিব, তাহার হাতেই কন্যাকে সমর্পণ করিব।"

রাজার ফুল বাগানের মালীর অসুখ, কে যেন তরুণ যুবক তাহার হইয়া ফুল বাগানে কাজ করিতেছে,—দেখিতে দেবতার মত সুদর্শন, শরীরে দেবতাদের মত জ্যোতিঃ—একি কোন দেবতার অংশ? লোকে কেউ বুঝিতে পারে না, রাজ-বাড়ীতে এ নূতন মালী কে?

সে দিন

"সকাল বেলা বাগানে ফুল ফোটে।
আসমানেতে সূর্য্য ওঠে।।"

রাজা অভ্যাস অনুসারে প্রত্যূষে উঠিয়া বাগানে গিয়াছেন, প্রথমেই সেই নূতন মালীর সঙ্গে তাঁর দেখা হইল।

"রাজার দুই চোখ বাহিয়া পড়ে দরিয়ার পানি।
এত বেছে[১] তারপরে কন্যা হৈল মালীর ঘরণী।।[২]

যাহা সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা ভাঙ্গিতে পারেন না। দৈব নির্ব্বন্ধে সেই মালীর সঙ্গেই রাজকুমারীর বিবাহ হইয়া গেল। রাজা বলিলেন—"আমার বড় আদরের বড় সোহাগের এই পবনকুমারী,—যাহা অদৃষ্টে ছিল, হইয়াছে। কুমারী যেন ভাত কাপড়ের কষ্ট না পায়।"

বিবাহের কোন অনুষ্ঠান হইল না,—কিন্তু কন্যা সমর্পণ হইয়া গেল।

"না বাজিল ঢোল, না বাজিল দগড়া, না জ্বলিল বাতি।
অভাগা মালী হৈল রাজকন্যার পতি।।"

রাজা হুকুম দিলেন—"বাহির ভাণ্ডারের ধান-চাল, মালীর গোলা ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হউক।"

"রাজার ক্রন্দনে পাষাণ গলে।
রাণীর ক্রন্দনে দরিয়া ভাসে।।"

মালী অনেক দুঃখ করিয়া রাজকুমারীকে বলেন—

"কোন্ সে নিষ্ঠুর বিধি আমায় আনিল নগরে।
চাঁদের সমান রাজ-কন্যা দুঃখ দিলাম তারে।।
যে অঙ্গে ফুলের ঘা সহেনা কুমারী
ননীর দেহেতে তোমার মশার কামুড়ি!
তোমার বাপের বাড়ীতে কন্যা ঝিলিমিলি মশারী।
'খেংড়া চাটির' বিছানায় রহিয়াছ পড়ি।।"

রাজ-কন্যা আঁচলে চক্ষু মুছিয়া বলেন—

"আমার লাগিয়া পতি নাহি কর দুখ।
তুমি যার আছ পতি তার সব সুখ।।

[১] এত বেছে = এত বিচার করিয়া অবশেষে।

[২] ঘরণী = গৃহিণী।

দুই হস্ত তোমার পতি আমার স্বর্ণমালা।
তোমার সোহাগের ডাক আমার কর্ণ দোলা।।[১]
তোমার পায়ের ধুলা অঙ্গ আভরণ।
তুমি আমার হীরামণি তুমি সে কাঞ্চন।।
নয়নের জলে পতি তোমার পা ধোয়াই।
সেই পা' মুছাইয়া কেশে বড় তৃপ্তি পাই।।
সেই ত ধোয়া পানি কেশে শাচি তেল।
মা বাপের পুরীর সুখ নাহি চায় দেল।।[২]
তোমার চরণ পতি আমার উত্তম বিছান।
ধরম করম[৩] তুমি জাতি কুলমান।।"

রাজকুমারী এইরূপ কথায় মালীর মনের জ্বালা দূর করেন। তাঁহার বৃহৎ ধানের গোলার সমস্ত ধান পবনকুমারী প্রার্থী দরিদ্রদিগকে বিলাইয়া দেন এবং এমন মধুর বাক্যে তাহাদিগকে আপ্যায়ন করেন যে তাহারা আর রাজ-বাড়ীতে যায় না, "মালীরাজার" বাড়ীতেই ভিক্ষা করিতে যায়।

১ দোলা= দুল।

এই সকল অতি প্রাচীন পালা গানের অংশ হইতে টের পাওয়া যায় যে কোমল অনুভূতি ও করুণ রসাত্মক রচনায় বাঙ্গালী নরনারী বহুপূর্ব্বেই অগ্রসর হইয়াছিলেন।
এদেশের মেয়েরা কথায় কথায় যে সকল ভাব প্রকাশ করিতেন, সেই ভাষার জাতীয় ভাণ্ডার হইতে বৈষ্ণব, শাক্ত, বাউল, পালা গানরচক প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর বাঙ্গালী ভাব-সম্পদ আহরণ করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর কবি কৃষ্ণকমলের "ভরত মিলন" হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি যে এই রচনা পূর্ব্বানুবৃত্তি মাত্র।

"ভাই শত্রুঘ্ন, কররে ধারণ এই আমার গজমতি হার,
আমার হিয়ার আভরণ শ্রীরাম চরণ, এছার হারে কি কাজ আর।
আমার কর্ণের কুণ্ডল খুলে নেরে,
আমার শিরে জটা বেঁধে দেরে।
আমার কর্ণের ভূষণ—নাম সঙ্কীর্ত্তন,
আমার মণির মুকুট খুলে নেরে
শিরে জটা বেঁধে দেরে
প্রভুর শীতল পদ পরশিয়ে আছে পথের ধূলা শীতল হয়ে,
আমার অঙ্গে মেখে দেরে।"

২ দেল = হৃদয়।
৩ ধরম করম = ধর্ম্ম কর্ম্ম।

রাজকুমারদের ষড়যন্ত্র

রাজার সাত পুত্র বসিয়া যুক্তি করে। বাগানের মালী, সে হইল কিনা 'মালী রাজা'! বড় মানুষ হইয়াছেন, আমাদের চৌদ্দপুরুষের ভাণ্ডার দু'হাতে লুটাইয়া দিয়া প্রজাদের মধ্যে নাম কিনিতেছেন, এত বড় আস্পর্দ্ধা! বুড়া রাজা না থাকিলে আজ ওকে দেখাইয়া দিতাম!" ভাণ্ডারীদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া রাজপুত্রেরা হুকুম দিলেন, ভাণ্ডার হইতে এক কণা জিনিষও যেন মালীর বাড়ীতে না যায়। ভাণ্ডারে তিনটি তালা পড়িল, তাহার এক তালার চাবি রাজকুমারদের হাতে।

সমস্ত কথা মহিষী শুনিলেন, মেয়ের জন্য তাঁহার প্রাণ দরদে ভরিয়া গেল। তিনি নিজ দাস-দাসীকে বলিলেন, "সংসারের জন্য যে সকল জিনিষ রোজ রোজ আসে, তাহার ক্ষুদ কণা যা' থাকে, তাহা লুকাইয়া আমার কন্যাকে দিও।"

"লুকাইয়া তারা নিত্য দেয় ক্ষুদ কণা
এক কোণা ভরে পেটের—আর এক থাকে ঊনা।"[১]

রাজকন্যার দুঃখ নাই—মুখে তার হাসি।

দরিদ্র প্রজারা এ সকল ব্যাপারের কিছুই জানে না। তারা রোজ যেমন আইসে, আজও তেমনি আসিয়াছে ঃ—

"তখনও তো সতী কন্যা কোন কাম করে।
অঙ্গের যত গয়না গাটি বিলায় সবাকারে।।
কর্ণের না কর্ণ-দুল, হার যে গলায়।
একে একে করে কন্যা ভিক্ষুক বিদায়।।"

একদিন মহা অনর্থ উপস্থিত হইল।

কর্ম্মপুরুষ আবার এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে উপস্থিত হইয়াছেন, অভিশাপের বার বছর প্রায় যায় যায়।

ব্রাহ্মণ ভিক্ষা চাহিল, সোণা রূপা নয়, ধান চাল নয়, পায়স পিষ্টক নয়, বাড়ী ঘর নয়।

১ ঊনা = অপূর্ণ, একদিকের পেট পূর্ণ হয়, অপর দিকের ক্ষুধা থাকিয়া যায়।

তবে কি? রাজকুমারী বলিলেন, "এই পা ধুইবার জল দিতেছি, পা ধুইয়া বিশ্রাম করুন, আমাদের ত বাবা কিছুই নাই। শেষ ক্ষুদ কণা পর্য্যন্ত গরীব প্রজাদের বিলাইয়া দিয়াছি। আমার স্বামী আসুন, তিনি কোন দিন অতিথি অভ্যাগতদিগকে নিরাশ করেন না। অবশ্য একটা ব্যবস্থা করিবেন, আপনি একটু অপেক্ষা করুন।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি সমস্ত পৃথিবী ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু আমার প্রার্থনা কেহ পূর্ণ করিতে পারেন নাই—

"কেউ দেয় ধন রত্ন, কেউ দেয় কড়ি।
কেহ বা তাড়িয়ে দেয় গালি মন্দ পাড়ি।।
আমার মনের ভিক্ষা কোথাও না পাই।
কত রাজার মুলক ঘুরি কত দেশে যাই।।

"ঐ যে রাজবাড়ী, ওইখানে ভিক্ষা মাগিতে গেলাম, তাঁহারা এই মালী-রাজার বাড়ী দেখাইয়া বলিলেন, ওখানে যাও মালী রাজা বড় দাতা।"

"হেন কালে মালী রাজা ঝাড়ু কাঁধে লইয়া।
আপন কুঁড়েতে দেখ দাখিল হৈল আসিয়া।।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমি অন্ধ, আর কিছুই চাই নাঃ—

"কড়ি তঙ্কা নাহি চাই কিম্বা অন্য ধন।
ভিক্ষুক সে দান চায় অন্ধের নয়ন।।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "বার বৎসর গেল—এই অন্ধের রাত্রি প্রভাত হইল না, যে আঁধার—সেই আঁধার। তুমি আমাকে চক্ষু দাও।" রাজা পাগলের মত চতুর্দ্দিকে চাহিলেন, তারপরে বলিলেনঃ—

"মালী রাজা কহে, শুন বলি যে তোমারে।
মানুষে প্রাণীর চক্ষু নাহি দিতে পারে।।"

"তথাপি যদি ঠাকুরের দয়া থাকে তবে চক্ষু পাইবে।" এই বলিয়া—

"কাটারি লইয়া চক্ষু উপাড়িয়া ফেলিল।
সেই চক্ষু লইয়া ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ অদৃশ্য হইল।।
ভিক্ষা পাইয়া ব্রাহ্মণ হইল বিদায়।
বড় দুঃখে রাজ-কন্যা করে হায় হায়।।
শীতল ভৃঙ্গারের জলে রক্তধার মুছে।
এত দুঃখ অভাগীর কপালেতে আছে।।
মালী রাজা কহে কন্যা হাসি মুখে রহ।
কর্ম্মপুরুষ দিলেন দুঃখ হাসি মুখে সহ।।"

সাশ্রুনেত্রা রাজকুমারীকে পুনরায় মালীরাজা বলিলেনঃ—

"দান কৈরা যেবা পাইল অন্তরেতে দুখ।
তার দান বিফল হৈল—বিধাতা বিমুখ।।
শুন গো রাজার ঝি না কর ক্রন্দন।
সুখ যদি চাও কর দুঃখের ভজন।।
সুখ যদি পাইতে চাও দুঃখ আপন কর।
সাধনের পথে চল তবে পাইবা বর।।"

এখন অন্ধ পতি কোন কাজ আর করিতে পারেন না। রাজকুমারীর সকল কাজই নিজের করিতে হয়।

সাত রাজবধূ কুমারীর কষ্ট দেখিয়া হাসে। কিন্তু কোন্ চিত্রটি বড় ও সুন্দর?—একদিকে বধূরা পরিহাস করিতেছে,—

অপর দিকে,—

"কত দুঃখ পাইল কন্যা হিয়া বিন্ধে শেল।
পরনের কাপড় নাই, শিরে নাই সে তেল।।
এক হাতে তুল্যা লয়— আবর্জ্জনার ঝুড়ি
আর এক হাতে মুছে কন্যা দু'নয়নের বারি।।"

রাণী আছেন, কিন্তু তাঁর কিছু করিবার সাধ্য নাই।

"ভাণ্ডারেতে আছে ধন—সাত ভাইএর তরে।
কাণা কড়ি কুমারীকে দিতে নাহি পারে।।
মায়ের কাঁদন দেখি বৃক্ষের পাতা ঝরে।
মায় সে জানে ঝিয়ের বেদন আর কে জান্‌তে পারে।।"

রাজপুরীতে কন্যা ঝাঁট দেয়—এটা তাহার মালী-স্বামীর কাজ—মালী-রাজা অন্ধ, সুতরাং একাজ তাকেই করিতে হয়। বধূরা মুখ টিপিয়া হাসে।

একদিন রাজবাড়ীতে ঢোল-দগরা, কাড়া-নাকাড়া বাজিয়া উঠিল; অন্ধ মালী রাজকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সকল বাদ্য-ভাণ্ড কেন?" পবনকুমারী বলিলেন—"সাত ভাই শিকারে যাইবেন, তাহারই উদ্যোগ চলিয়াছে।" অন্ধ স্বামী বলিলেন, "আমারও শিকারে যাইতে ইচ্ছা হইতেছে। বহুদিন হরিণের মাংস খাই নাই, তুমি মহারাজের কাছ থেকে একটা ধনুক ও শব্দ-ভেদী বাণ আমার জন্য লইয়া আইস।"

রাজকুমারী বলিলেন, "তুমি কি পাগল হইয়াছ? তুমি অন্ধ, অশক্ত.—কি করিয়া তুমি বনে জঙ্গলে যাইবে? বাঘ ও হরিণ তুমি চিনিবে কি করিয়া? হরিণের মাংস খাইতে চাহিতেছ—

"সাত ভাই আনিবে যত হরিণ মারিয়া,
কিছু মাংস দিব আনি চাহিয়া মাগিয়া।"

তাঁহার পা ধরিয়া কুমারী কাঁদিতে লাগিলেন—জঙ্গলে যাইতে কিছুতেই সম্মতি দিলেন নাঃ—

"বুঝাইলে প্রবোধ নাহি মানে অন্ধ রায়।
ভাবিয়া চিন্তিয়া কন্যা বাপের আগে যায়।
শুন শুন বাপ অগো কহি যে তোমারে।
অন্ধ না জামাই তব যাইবে শিকারে।।

অন্ধ জামাই তোমার কইয়া দিলা মোরে।
শব্দভেদী বাণ আর ধনু দেও তারে।।"
"কন্যারে দেখিয়া রাজা কাঁদিতে লাগিল।
এত সোহাগের কন্যার এত দুঃখ ছিল।।
রাজা দিলেন শব্দভেদী ধনু আর ছিলা[১]।
এরে লৈয়া অন্ধরাজা পন্থে বাহিরিলা।।
আগে আগে চলে বাদ্য মহারোল করি।
বাদ্য শুনে চলে রাজা বনপথ ধরি।।"

সুলারাণীকে পুনঃ প্রাপ্তি, অন্ধের চক্ষু-লাভ

সাতদিন রাজপুত্রেরা বনে বনে শিকারের জন্য ঘুরিলেন, কিন্তু এমনই দৈব, একটি শিকারও মিলিল না। রাজপুত্রেরা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন; এত ধুমধাম করিয়া শিকারে আসিয়াছেন, একটি হরিণও লইয়া যাইতে পারিলেন না। শূন্য হস্তে বাড়ী ফিরিবেন কিরূপে? কি লজ্জা!

এদিকে অন্ধ রাজা হাতড়াইতে হাতড়াইতে বনে চলিয়াছেন। পাতার উপর খস্ খস্ শব্দ শোনেন, হরিণ কি বাঘ বুঝিতে পারেন না। শব্দভেদী বাণ ছোঁড়েন; তীক্ষ্ণাগ্র বাণে পাথর পর্য্যন্ত কাটিয়া যায়, বৃক্ষের কাণ্ড কর্ত্তিত হয়, কিন্তু কই শিকার কিছুই মেলে না। হঠাৎ রাজার পা একটা কিছুর উপর ঠেকিল। একি মানুষ না কোন জানোয়ার?

যে মুহূর্ত্তে রাজার পা গায়ে ঠেকিল, সেই মুহূর্ত্তে সুলারাণীর কুড়-কুষ্ঠ দূর হইল,—তপ্ত সোণার বর্ণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, যেমন ছিল, তেমনই। এদিকে সেই মুহূর্ত্তেই রাজা চোখের দৃষ্টি ফিরিয়া পাইলেন,—তাঁহাদের দুঃখের দিন অবসান হইয়াছে; আজি অভিশাপের দ্বাদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রাজা তাঁহার প্রাণের প্রাণ সুলারাণীকে পাইয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। রাণী কাঁদিয়া সেই সদাগরকৃত লাঞ্ছনা, তাঁহার কুষ্ঠরোগ গ্রহণ প্রভৃতি বহু দিনের দুঃখের কথা বলিলেন, সেই স্বর্ণ-প্রতিমাকে আলিঙ্গন-বদ্ধ করিয়া তাঁহার চোখের জল মুছাইতে মুছাইতে রাজা তাঁহার নিজের দুঃখের কথা ভুলিয়া গেলেন।

১ ছিলা = গুণ, ধনুকের সঙ্গে যে চামড়ার দড়ি থাকে।

রাজা বলিলেন ঃ—

"শুন শুন সুলারাণী না কাঁদিও আর।
তোমারে পাইলাম যদি রাজ্যে কিবা কাজ।।
বনেতে থাকিব মোরা বনের ফল খাইয়া।
কোন জনে পায় নিধি এমনই হারাইয়া।।
কোথায় জানি কাঠুরিয়া মা বাপ কেমন জানি আছে।
একবার মনে হয় যাই তাদের কাছে।।"

চক্ষুষ্মান রাজা ৭টি হরিণ শিকার করিলেন। তারপর এক বৃহৎ দারুক গাছের মূলে তাঁহারা হর-পার্ব্বতীর মত বসিলেন।

উপসংহার

সাত ভাই তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, সেই বন আলোকিত করিয়া এক দেব ও দেবী। তাহারা বলিল, "আপনারা কে? আমরা একটি হরিণ পাই নাই—আপনারা এতগুলি হরিণ পাইলেন কোথায়?"

রাজা তিলক-বসন্ত বলিলেন, "তোমরা আমাকে চিনিতে পারিতেছ না? ভাল করিয়া নজর করিয়া দেখ।" তখন তাহারা তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া চিনিল এ যে তাহাদের মালী-রাজা। এরূপ তপ্ত-কাঞ্চনের বর্ণই বা কোথায় পাইল, এমন রাজকুমারের মত সুগঠিত, সুদর্শন মুর্ত্তিই বা কোথায় পাইল?

মালী-রাজা তাহাদিগকে সেই সাতটি হরিণ দিলেন।

কিন্তু সাত ভাই ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। "এই ব্যক্তিকে হয়ত কোন বনদেবতা কৃপা কবিয়াছেন। বাড়ী ফিরিয়া মালী নিশ্চয়ই আমাদিগকে হত্যা করিয়া আমাদের পিতৃরাজ্য দখল করিবে;আমরা উহার উপর যে সকল অত্যাচার করিয়াছি তাহা ত মনে আছে, সুতরাং উহাকে মারিয়া ফেলিয়া হরিণগুলি লইয়া বাড়ী ফিরিয়া যাওয়া যা'ক।"

তখন সাতটি ধনুক হইতে অবিরত বাণ-বৃষ্টি হইতে লাগিল। রাজা বসন্ত রায় মহাবীর, তিনি অনায়াসে শব্দভেদী বাণ দ্বারা তাহাদিগকে একবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তারপর সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়া তাহাদিগকে বাঁধিয়া ফেলিলেন, এবং নিজের আঙ্গুলের শ্রীআংটি

খুলিয়া তাহা উত্তপ্ত করিয়া শ্যালকদের প্রত্যেকের কপাল দাগিয়া দিলেন। বন্ধন খুলিয়া দিয়া তিনি সেই সাতটি হরিণ তাহাদিগকে দিয়া শ্রীআংটি খুলিয়া ফেলিলেন,—বলিলেন, "এই শ্রীআংটি তোমরা তোমাদের ভগিনীকে দিবে—ইহাতে আমার পরিচয় লিখিত আছে।"

লাঞ্ছিত ও অপমানিত ভ্রাতারা রাজধানীতে যাইয়া প্রচার করিলেন, মালী-রাজাকে জঙ্গলের বাঘে খাইয়া ফেলিয়াছে। ভগিনী পবনকুমারীকে বলিলেন, "আমাদের পিতা তোমার দুষমণ হইয়া এমন সোণার প্রতিমাকে মালীর হাতে দিয়াছিলেন, তোমার কপালে যা লেখা ছিল, তাহাই হইয়াছে, আমরা কি করিব? বাঘের মুখ হইতে আমরা "শ্রীআংটি" কাড়িয়া রাখিয়াছি; মৃত্যুকালে মালী এটি তোমাকে দিতে বলিয়া গিয়াছে—ইহাতে নাকি তাহার পরিচয় লেখা আছে। এই সকল দুঃখের জন্য পিতাই দোষী—

"এমন সোনার পদ্ম মধুতে ভরিয়া।
বর না জুটিল এক দুষ্ট গোবরিয়া।।"[১]

রাজকুমারী কতকটা শোকার্ত্তা হইয়াও ভ্রাতাদের সকল কথা বিশ্বাস করিলেন না।

তিনি শ্রীআংটির বিবরণ জানিতে পারিয়া তিলক-বসন্তের রাজধানী খুঁজিতে অনন্যমনা হইয়া বনের পথে ছুটিলেন।

প্রথমতঃ তিনি কোন্ পথে যাইবেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন, যেমন ছুটিয়া যাইবার পূর্ব্বে কাল-বৈশাখী ঝড় খানিকটা স্তম্ভিত হইয়া থাকে, "ছুটিবার কালে যেমন কাল-বৈশাখী বা;" তার পর বন, জঙ্গল, বাদাড়, লোকালয় কিছুই গ্রাহ্য করিলেন না, উন্মত্ত বেগে এক পল্লী হইতে অন্য পল্লী অতিক্রম করিয়া চলিলেন।

এই যে রাজা তিলক-বসন্তের রাজধানী! তিনি আবার আসিয়া স্বরাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। পবনকুমারী রাজবাড়ীর ধোপার বাড়ীতে যাইয়া তাহাদিগের শরণ লইলেন, তাহারা সেই অপরূপ রূপলাবণ্যসম্পন্না কন্যাকে আশ্রয় দিল। রাজ-রাণীর কাপড়গুলি পবনকুমারী স্বয়ং কাচেন। একদিন সেই ধৌত কাপড়ের ভাঁজে তিনি শ্রীআংটিটি রাখিয়া দিলেন। সুলারাণী সেই আংটিটি রাজাকে দেখাইলেন। রাজা অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, তাঁহার ধোপার বাড়ীতে "রূপে লক্ষ্মী—গুণে সরস্বতী" একটি মেয়ে আসিয়াছে। রাজ্ঞীর কাপড় সেই কাচে ও কাপড়ের ভাঁজে শ্রীআংটি সেই রাখিয়াছে।

---

১ মধুভরা এমন কোমল স্বর্ণ-পদ্ম নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহার বর নাকি একটি গোবরা পোকা হইল।

রাজা নানা মণিমাণিক্যখচিত চৌদোলা ধোপার বাড়ীতে পাঠাইলেন। মুক্ত চৌদোলায় প্রজারা দেখিতে পাইল, ইনি দ্বিতীয় সুলারাণীরই মত এক রূপের প্রতিমা। রাজা অগ্রসর হইয়া তাঁহার কাছে যাওয়া মাত্র পবনকুমারী পতির পদে লুটাইয়া পড়িলেন। রাজা তাঁহাকে আদরে হাত ধরিয়া উঠাইয়া সুলারাণীকে বলিলেন, "ইহাকে গ্রহণ কর, ইনি জীবনে তোমা অপেক্ষা কম দুঃখ পান নাই।"

"এই কথা শুনিয়া সুলা দিল আলিঙ্গন।
বইনে বইনে হ'ল এই সপত্নী মিলন।
সোনার হারেতে যেন মাণিক্য বসাইল।
দুই চাঁদে রাজপুরী উজ্জ্বল হইল।।"

যথা সময় পবনকুমারীর পিতা সমস্ত সংবাদ অবগত হইলেন। তিনি স্বীয় রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধেকাংশ রাজা বসন্তকে যৌতুক দিলেন।

আলোচনা

এই গানটি সম্বন্ধে আমি পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকার ভূমিকায় (৪র্থ খণ্ডে দ্বিতীয় সংখ্যায়) যাহা লিখিয়াছিলাম, এখন সে সম্বন্ধে কতকটা মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

আমার মনে হয়—সংগৃহীত পালাগুলির মধ্যে যেগুলি প্রাচীনতম, সেই গল্পটি তাহাদের মধ্যে অন্যতম। অবশ্য এই গল্পের মধ্যেও পরবর্ত্তী কালেরও সংযোজনা কিছু প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু প্রাচীনতম অংশগুলি অতি স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

প্রথম কথা, ভাষা ও পদ্যরচনার রীতি। এই যে স্বল্পাক্ষরা ছন্দ-রীতি, (যাহার অক্ষরের সংখ্যার কোন ঠিক নাই,' অথচ পড়িবার সময় স্বরবর্ণ ও লঘু গুরু মাত্রার উচ্চারণের দরুন--বেশ মানাইয়া যায়), পড়িতে কোন কষ্ট হয় না,—তাহা এদেশের পদ্য রচনার অতি প্রাচীন রীতি।

"বনে থাকে কাঠুরিয়া
বুক ভরা দয়া মায়া।"

এই দুটি ছত্রের প্রত্যেকটি আট অক্ষর, কিন্তু সর্ব্বদা এই নিয়ম নাই—

"কাঠ বিকায় খায়,
এক রাজার মুলুক হতে অপর রাজার মুলুকে যায়।।"

সাধারণ নিয়ম—দ্রুত ছন্দ। অল্প কয়েকটি অক্ষরেই শেষ; কিন্তু কোন কোন স্থানে পংক্তিগুলি অযথা বিলম্বিত হইয়া দীর্ঘ হইয়াছে, অথচ সুরলীলাচ্ছলে টানিয়া আনিয়া শেষে সেই বিলম্বিত পংক্তি ঠিক সময়ে গানের মতই সোমে আসিয়া পৌঁছে। তাল ভঙ্গ হয় না;—এই পদগুলিও সেইরূপ, কোন ছত্র ছোট— কোন ছত্র দীর্ঘ, কিন্তু তাহারা প্রায় সর্ব্বদাই তাল রক্ষা করিয়া চলে।

ইহাই আমাদের প্রাচীনতম পদ্য রচনার রীতি—খনা ও ডাকের বচনে এইরূপ রচনা অজস্র।

"যদি বরে আগনে,
রাজা নামেন মাগনে।
যদি নামে পোষে,
কড়ি হয় তুষে।
যদি নামে মাঘের শেষ,
ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।
যদি নামে ফাল্গুনে,
চিনা কাওন হয় দ্বিগুণে।"

ডাক্ ও খনার বচনে প্রায় সর্ব্বত্র এই রীতি অনুসৃত হইয়াছে। ছেলে-ভুলান ছড়া ও ঘুম-পাড়ানিয়া গানেরও কতকটা এই রীতিতে রচিত;—মেয়েলী ব্রতকথা ও ছড়ায় এইরূপ স্বল্পাক্ষরা রচনার অজস্র নিদর্শন পাওয়া যায়।

যথা,—

"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
নদীএ এল বান,

তিলক বসন্ত

"তবে তো তিলক রায় কোন্ কাম করে। দোলা পাঠাইয়া দিল কন্যা আনিবারে।।'

(পৃষ্ঠা ১৮৩)
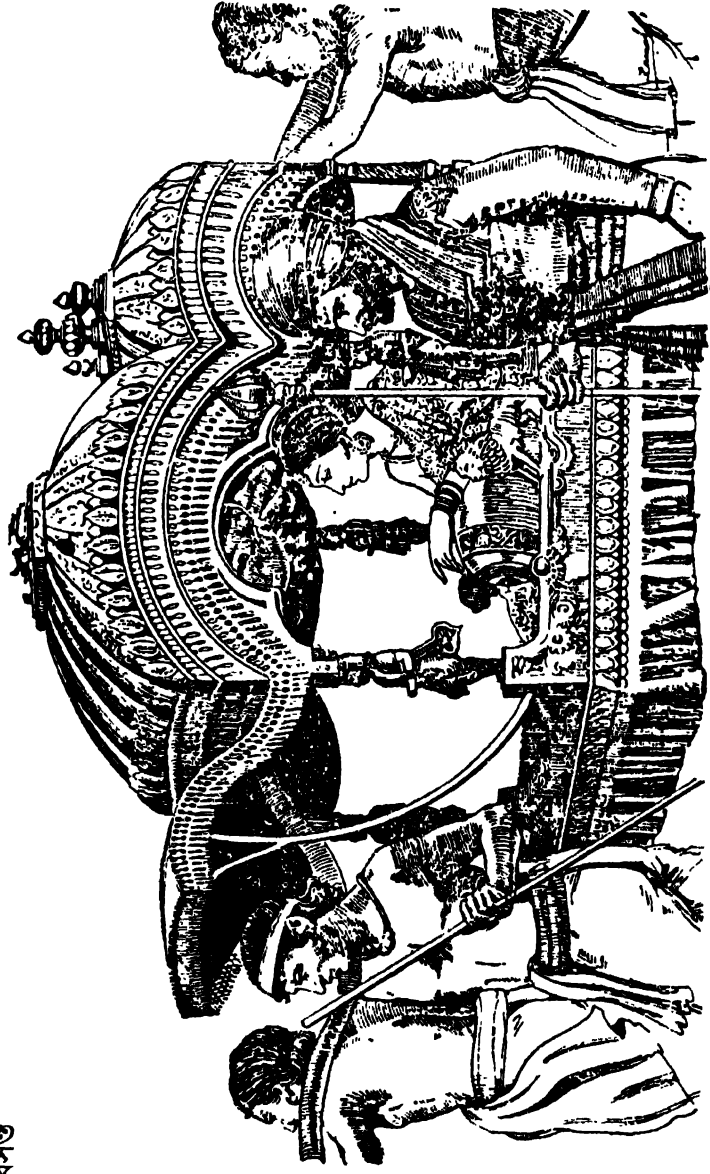
শিব ঠাকুরের বিয়ে হবে
তিনটী কন্যা আন।
এক কন্যা রাঁধেন বাড়েন
এক কন্যা খান,
এক কন্যা রাগ করে
বাপের বাড়ী যান।"
"আজ খুকির বিয়ে হবে
সঙ্গে যাবে কে?
ঘরে আছে কুনো বেড়াল
কোমর বেঁধেছে।।
আম-কাঁটালের বাগ দিব
ছায়ায় ছায়ায় যেতে।
ঘরের কাহার দেব
পাল্‌কী বহাতে।।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মেয়েদের প্রতি কথায় এরূপ ছন্দের ছড়াছড়ি। এই ভাবের দ্রুত ছন্দের কিছু কিছু পরিচয় বাঙ্গালা কুলজী পুস্তকেও দৃষ্ট হয়।

একখানি তিনশ বছরের প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথিতে সুপ্রাচীন বাঙ্গালায় এই কয়েকটি ছত্র পাইয়াছি ঃ—

"দ্যুহি বিনায়ক ত্রিপুর চাউ।
শিয়াল পন্থ থোবে কাউ।।
গৈ লইয়া কুলের বাস।
রাঢ়ে বঙ্গে সাত আট।।"

তিলক-বসন্তের গল্পটির অনেকাংশ এই ছন্দে রচিত, ইহা বঙ্গীয় পদ্যের আদি অবস্থা।

দ্বিতীয়তঃ এই গল্পের ভাবের সঙ্গে সাধারণতঃ বাঙ্গালা কবিতার প্রতিপাদ্য ভাবের সামঞ্জস্য নাই। প্রায়ই কোন ঠাকুর দেবতার নাম নাই। এই গানটির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা 'করম-পুরুষ', তাঁহার তিনটি পা, এজন্য তাঁহাকে "তেঠেঙ্গা দেবতা" বলা হইয়াছে।

বৌদ্ধগণ ঈশ্বরে বিশ্বাসী নহেন;তাঁহারা কর্ম্মকেই প্রাধান্য দিয়া থাকেন। মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে ঈশ্বর কি আর কোন কল্পিত দেবতার হাত নাই। "যেরূপ বীজ বপন কর, সেইরূপ ফল ফলিবে।" অর্থাৎ তুমি যেমন কর্ম্ম করিবে, তেমনই ফল পাইবে, তাহা কিছুতেই উল্টাইবে না। এই অলঙ্ঘ্য কর্ম্মতরুর ফলই মানুষকে জন্মে জন্মে ভোগ করিতে হয়; প্রত্যেক ঘটনাই মানুষের কর্ম্মের অধীন। এই জন্য কর্ম্মপুরুষই মানুষের ভাগ্যের নিয়ন্তা। মানুষের গুণের মধ্যে ত্যাগ, স্বার্থবর্জ্জন, আতিথ্য, পরার্থপরতা প্রভৃতিই বৌদ্ধ যুগের প্রধান ধর্ম্ম। এই সকল গুণের ব্যত্যয় হইলে তাহার ফল অবশ্যম্ভাবী। যদি কেহ অতিথিকে রিক্ত হস্তে ফিরাইয়া দেয়, আর্ত্তের সেবা না করে, তবে তাহার শাস্তি কেহ খণ্ডন করিতে পারিবে না। গল্পের সর্ব্বত্র কর্ম্মপুরুষের রাজত্ব। আতিথ্যের নিয়ম লঙ্ঘন করাতে রাজাকে বার বৎসরের জন্য নির্ব্বাসন শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল। এখানেও সেই "তেঠেঙ্গা দেবতা" শাস্তি ঘোষণা করিলেন। সুলারাণীর রূপ যখন তাঁহার ভয়ের কারণ হইল, তখন তিনি কর্ম্মপুরুষের নিকটই কুষ্ঠরোগ প্রার্থনা করিয়া সেই বর পাইলেন। দ্বাদশ বৎসরান্তে সেই কর্ম্মপুরুষই তাঁহার শাস্তির শেষ ঘোষণা করিয়া পুরস্কার দান করিলেন। সর্ব্বত্র কর্ম্মেরই জয়-জয়কার, এবং তদধিষ্ঠিত দেবতা কর্ম্মপুরুষের আবির্ভাব ও তিরোভাব।

আমরা মালঞ্চমালার গল্পে 'ধাতা-কাতা-বিধাতা'র উল্লেখ পাইয়াছি; ইহারা কে, তাহার কোন নিশ্চয় পরিচয় নাই, কিন্তু ইঁহারা যে সেই "তেঠেঙ্গা দেবতার"ই স্বগণ, তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়; এই গল্পেও সেই ধাতা-কাতা-বিধাতার উল্লেখ আছে।

এই সকল গল্প কেহ অবশ্য ইতিহাসের পর্য্যায়ে ফেলিবেন না। ইহারা নিছক গল্প, এবং সেই হিসাবেই ইহাদের মূল্য। তথাপি কাল্পনিক উপাখ্যানগুলিও সময়োচিত ভাব ও পরিবেষ্টনীর মধ্যেই পরিকল্পিত হয়। যে সময়ে ইহারা রচিত হইয়াছিল তখন নর-নারীদের দেহ সবল ও মন নৈতিক শক্তিসম্পন্ন ছিল। তাঁহারা বাতাসে হেলিয়া পড়িতেন না, দুঃখে কষ্টে ভাঙ্গিয়া পড়িতেন না, সৎকার্য্য ও আত্মদানের কোন ব্যাপারেই তাঁহারা কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। এই সকল গানের সকল স্থানেই পুরুষাকারের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আছে। গল্পের রাজা একটা সামান্য ভিক্ষুকের প্রার্থনায় নিজের চক্ষু উপড়াইয়া ফেলিতেছেন। আত্মরক্ষার জন্য নারী কুষ্ঠ রোগকে বরণ করিতেছেন, স্বীয় প্রতিশ্রুতির গৌরব রক্ষা করিয়া রাজা নিজের কন্যাকে একটা মালীর হাতে অর্পণ করিতেছেন; এ সমস্ত এক হিসাবে গাঁজাখুরী

গল্প বলা যাইতে পারে। কিন্তু দিক্‌দর্শন যন্ত্রের আর একটা দিক্‌ উল্টাইয়া ধরিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে এই গল্পগুলির ভিতরকার একটা বড় কথা আছে, তাহা লক্ষ্য করা পাঠকের উচিত। এই ধরণের যতগুলি গল্প আছে, তাহার অনেকগুলিরই প্রধান ভিত্তি আদর্শ-বাদ। শিশুর কৌতূহল নিবারণোপযোগী বাহিরের সাজ-সজ্জা, শিশু ভিন্ন অন্য কেহ যাহা বিশ্বাস করিতে পারে না, এমন সকল অলৌকিক ত্যাগ-মূলক ঘটনা, কিন্তু তাহারা একটি দিকে নিশ্চিত ভাবে ইঙ্গিত করিতেছে। 'দাতা কর্ণ' গল্পে পিতা-মাতা করাত ধরিয়া নিজেদের একমাত্র পুত্রের শির-কর্ত্তন করিতেছেন, সেই মাংসে ব্রাহ্মণ অতিথিকে তৃপ্ত করিবার জন্য। বাঙ্গালা দেশের কাঞ্চনমালা, মালঞ্চমালা প্রভৃতি এইরূপ শত শত গল্পে ত্যাগের মহিমা প্রচারিত হইয়াছে, তাহা অত্যাশ্চর্য্য, অবিশ্বাস্য ও অলৌকিক। বৌদ্ধ জাতকেও ত্যাগের সেইরূপ উদাহরণ অনেকস্থলে পাওয়া যায়। সে যুগ ছিল বৌদ্ধদিগের ত্যাগের শিলমোহর মারা। মানুষ যাহা হিত মনে করিয়াছে, যে করিয়া হউক তাহা করিবেই। আদর্শকে এত বড় করিয়া আঁকিয়াছে যে তাহার উপহাসাস্পদ বাড়াবাড়ির উপরও সে গুরুত্ব দিয়াছে, অকুণ্ঠিত ভাবে তাহা অনুসরণ করিয়াছে; এই ঘটনাগুলি মানুষকে দেবতার পংক্তিতে লইয়া যাইবার আপ্রাণ চেষ্টায় কল্পিত।

মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ তখনও এত বেশী হয় নাই যে তাহাতে ভদ্র, ধনী ও ইতর শ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবের মিলন অসম্ভব হইতে পারে। রাজা সিংহাসন ছাড়িয়া কুড়ুল কাঁধে করিয়া বনে কাঠ কাটিতে চলিতেছেন; সেই কাঠুরিয়াদের মধ্যে কাঠুরিয়ার জীবন বহন করিতেছেন, রাণীর সহচরীরাও সেই শ্রেণীর। কিন্তু এই পদমর্য্যাদার প্রভেদ মানুষকে মানুষের পর করিয়া দেয় নাই। সংস্কার, অভ্যাস এবং গর্ব্ব মানুষকে একটা পৃথক শ্রেণীর জীবে পরিণত করিতে পারে নাই—যেখানে, যে অবস্থার ফেরে ইঁহারা পড়িয়াছেন,—মানুষ মানুষই আছেন—তাঁহারা কৃত্রিম রেখা টানিয়া একেবারে লৌহ-কঠোর গণ্ডীবদ্ধ হইয়া যান নাই।

কাঠুরিয়াদের সরল জীবন ও তাহাদের মনের ভাবের যে পরিচয় আছে, তাহা অল্প কথায় কি সুন্দর ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে! রাজা ও রাণীর প্রতি তাহাদের কত দরদ, তাহাদের প্রত্যেকেই রাজা ও রাণীর তুষ্টি সাধনার্থ কোন না কোন কিছু করিতেছে,—রাজাকে হারাইয়া তাহারা "আমাদের পাগল রাজা গেল কোথাকারে" বলিয়া যে চীৎকার করিয়া

তাহা মর্ম্মভেদী। এই সরল কাঠুরিয়া জীবনের যে চিত্র কবি দিয়াছেন, তাহা বড়ই সুন্দর ও মর্ম্মান্তিক হইয়াছে।

এই রাজার বনবাস, অন্ধত্ব বরণ, রাণীর দুঃসাধ্য ব্যাধি গ্রহণ, এবং নানা অবস্থান্তরের আজগুবী ব্যাপারের মধ্যে স্বর্ণ পদ্মের মত রাজা-রাণীর যে দুইটি চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা মেঘাবৃত আকাশে তড়িৎ রেখার ন্যায় আমাদের চক্ষু ঝলসিয়া দেয়। এই গল্প যে যুগের, সে যুগে এদেশের মানুষের সাহসের অন্ত ছিল না, কষ্ট-সহিষ্ণুতার অবধি ছিল না, মহত্ত্বের ও বীর্যবত্তার শেষ ছিল না। এগুলি ঠিক রাক্ষস খোক্কোসের গল্পের মতন নহে,— ইহাদের শৌর্য্য-বীর্য্য ও চরিত্রবল কাল্পনিক সাজ-সজ্জায় উপস্থিত করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাদের ভিত্তিমূলে জাতীয় চরিত্রের মহৎ কতকগুলি গুণের উপাদান আছে, যাহা সর্ব্বকালীন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই গানটিতে যে প্রেমের সুরটি পাওয়া যায় তাহা চণ্ডীদাস-পূর্ব্ব সহজিয়াদের সুর। মনে হয়, যে খনি হইতে বৈষ্ণবদের আদি কবি তাঁহার ভাবরত্ন আহরণ করিয়াছিলেন, এই পালা গানের কবিও সেই খনির সন্ধান পাইয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের প্রেমে যে আধ্যাত্মিকতা আছে, পালা গানে তাহা নাই। পালা গানের প্রেম খুব উচ্চগ্রামের—কিন্তু তাহা বাস্তব জগতের, তাহাতে কুল-শীল-মান হইতে মানব আত্মাকে টানিয়া ঊর্ধ্বতম লোকে লইয়া যায় না;কিন্তু ইহ জগতের সার বস্তু প্রেমকে বাস্তবতার আলোকেই চিনাইয়া দেয়। উভয় শ্রেণীর কবি যে একই জাতীয় ভাণ্ডার লুট করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ অতি স্পষ্ট। চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন, "সুখ দুঃখ দু'টি ভাই, সুখের লাগিয়া যে করিবে আশ - দুঃখ যাবে তার ঠাঁই।" এই গল্পের কবি লিখিয়াছেন—

"মালী রাজা কয় কন্যা না কর ক্রন্দন।
সুখ যদি চাও কর দুঃখের ভজন।।
সুখ যদি পাইতে চাও, দুঃখ আপন কর।
সাধনের পথে চল, তবে পাইবে বর।।"[১]

এই দুইয়েরই এক সুর।

রাজকুমারী স্বামীকে বলিতেছেন, "নাই বা রইল আমার গলায় সাত ন'রী হার, তোমার দুখানি হাতই আমার গলার হারের স্থান পূরণ করিবে। তোমার কথাই আমার কর্ণের

১ পাইবে বর = দেবতার কৃপা-বর পাইবে।

অলঙ্কার হইবে, আমি কর্ণ-ভূষণ চাই না।"

"তোমার সোহাগের ডাক আমার কর্ণ-দুল।
তোমার পায়ের ধুলা অঙ্গ আভরণ।"

ইহার সঙ্গে বৈষ্ণব কবির "প্রভুর শীতল চরণ পরশিয়ে, আছে পথের ধূলি শীতল হয়ে—আমার অঙ্গে মেখে দেরে" প্রভৃতি পূর্ব্বোদ্ধৃত পদের মিল লক্ষ্য করুন।

গল্পের কবির পদঃ—

"সোতের সেওলা যেমন সোতে করে ভর।
তোমারে হারাই পাছে এই মোর ডর।।"

চণ্ডীদাসের "সোতের সেওলা যেমন ভাসিয়া বেড়াই।"

বাঙ্গলা দেশের আম্রকুঞ্জে, নীপকুঞ্জে, গ্রাম্য নদীর উপকূলে, কোকিল-করম্বিত কুঞ্জ-কুটিরে—লাজশীলা কুল-বধূরা যে সকল প্রেমালাপ করে, সর্ব্বস্ব-দেওয়া ভালবাসার কথা মৃদুস্বরে বলে, তাহা ভ্রমর গুঞ্জনের মতই মিষ্ট; শত শত বৎসর যাবৎ কত কষ্ট সহিয়া—কত তপস্যা ও সাধনা করিয়া তাহারা বাঙ্গলা ভাষার অভিধানকে কোমল শব্দ-সমৃদ্ধিতে পূর্ণ করিয়াছে, তাহা পল্লীর বাতাসকে কোমল করিয়া রাখিয়াছে, জুথিজাতি-মল্লিকার ন্যায় তাহাদের সেই ভাষা আত্মদানের সুরভি-মাখা। বৈষ্ণব কবিরা এবং গ্রাম্য গীতিকারেরা উভয়েই সে ভাণ্ডারের সন্ধান পাইয়াছিলেন,—পান নাই সংস্কৃতের পণ্ডিতেরা। তাঁহারা অমরকোষ লইয়া টানাটানি করিয়াছেন, ঘরের আসবাব-পত্র দেখেন নাই, বাড়ীর অমৃত-নির্ঝরের খোঁজ লন নাই।

চণ্ডীদাসের সময়—ভাব ও ভাষা বৌদ্ধাধিকার হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া—বৈষ্ণবের অধ্যাত্ম-লোকে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু এই সব পল্লীগাথায় বৌদ্ধাধিকারের বিলুপ্ত সমৃদ্ধির ধ্বংসাবশেষ টের পাওয়া যায়; চণ্ডীদাসের লেখায় বৌদ্ধ ত্যাগ ও করুণার ভাব অপেক্ষা সহজিয়াদের তান্ত্রিকতা ও বৈষ্ণব ভাবপ্রবণতা বেশী। সুতরাং আমার মনে হয়, তিলকবসন্ত-গীতিকা বৈষ্ণব-প্রভাবের আরও পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের নিদর্শন।

এই গল্পটি কতকটা কাশীদাসের মহাভারতের, শ্রীবৎস ও চিন্তার উপাখ্যানের মত। আমার পূর্ব্বে ধারণা ছিল যে পল্লীকবি কাশীদাস হইতে তাঁহার গল্পের বিষয়-বস্তু আহরণ

করিয়াছেন। শ্রীবৎস-চিন্তার আখ্যায়িকা কাশীদাস কোন্ পুরাণ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, স্বর্গীয় রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহা খুঁজিতে যাইয়া সংস্কৃত পুঁথিশালাগুলি আলোড়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন সন্ধান পান নাই। মোট কথা, এই গল্প সংস্কৃত কোন পুরাণের ধার ধারে না। কেতকী ও মল্লিকা ফুলের মত এই শ্রীবৎস ও চিন্তার গল্প এদেশের পল্লী-মৃত্তিকা-জাত। ইহার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বঙ্গের মাটির গন্ধ বহন করে। কাশীদাস এই পল্লী-সম্পদের অংশ-বিশেষ আহরণ করিয়াছেন, পল্লী-কবি তাঁহার নিকট ঋণী নহেন, বরং উল্টা; তিনিই পল্লী-বৃদ্ধগণের মুখে এই গল্প শুনিয়া স্বীয় মহাভারতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। পাঠক এই দুই কবির কথিত আখ্যান বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, পল্লীগাথাটি অনেকাংশে প্রাচীনতর। কাশীদাস কর্ম্ম-পুরুষের স্থলে লক্ষ্মী ও শনির প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমদানী করিয়াছেন, কুষ্ঠরোগ বরণ করিয়া লইবার জন্য সুলারাণী কর্ম্ম-পুরুষের নিকট বর প্রার্থনা করিয়াছেন—সূর্য্যদেবের শরণ লন নাই। লেখার ভাব ও ভাষা স্পষ্টই প্রাচীনতর ও পূর্ব্বতন সামাজিক অবস্থা-সূচক। শ্রীবৎস ও চিন্তার গল্পে হিন্দু দেবতাদের প্রাধান্য ও তিলক-বসন্তের গল্পে পূর্ব্ববর্ত্তী বৌদ্ধ যুগের প্রভাব দৃষ্ট হয়। এইভাবেই 'সখীসোনা' গল্পটি পল্লী-কবির হাত হইতে গ্রহণ করিয়া বর্দ্ধমানবাসী কবি ফকির রাম কবিভূষণ নবকলেবর দিয়া ষোড়শ শতাব্দীতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। যুগে যুগে পল্লী গাথার উপর পরবর্ত্তী কবিরা এইভাবে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন; যখন যে যুগে ইহারা রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহার কতকটা প্রভাব অবশ্য ইহাদের মধ্যে বর্ত্তিয়াছে।

মলুয়া

বন্যা ও দুর্ভিক্ষ

মৈমনসিংহে সূত্যা নদীর ধারে আড়ালিয়া গ্রামের নিকটবর্ত্তী বক্‌সাই নামক পল্লীতে চাঁদ-বিনোদ নামক একটি সুশ্রী তরুণ যুবক বাস করিত। তাহার একমাত্র ভগিনীর বিবাহ হইয়া গিয়াছিল, এবং পিতৃবিয়োগের পর অবস্থার বিপর্য্যয়ে সামান্য কৃষির উপর নির্ভর করিয়া মাতা ও পুত্র জীবিকা নির্ব্বাহ করিত।

সেবার আশ্বিনের ঝড়-বৃষ্টিতে পল্লীগুলি ডুবিয়া গিয়াছিল, ক্ষেত্রের শস্য সমস্তই নষ্ট হইয়াছিল। চাঁদ-বিনোদ ছিল একজন ভাল কুড়া-শিকারী, তাহা ছাড়া বাড়ী নির্ম্মাণ প্রভৃতি স্থপতি বিদ্যায় সে সুদক্ষ ছিল। ক্ষেতে বসিয়া শস্য-বপন, জল সেচন ও আগাছা তুলিয়া ক্ষেত নিড়াইতে সে ভালবাসিত না;এই জন্য মাতা তাহাকে গঞ্জনা করিতেন, তাহার ঘুম ভাঙ্গিতেই অনেক বেলা হইয়া যাইত,—সে কখন ক্ষেতে যাইবে?

সে বৎসর দুর্ভিক্ষ ও অজন্মায় লোকের বড় কষ্ট হইল; কেহ কেহ ঘর বাড়ী বিক্রয় করিল, চালের দাম এক টাকায় তিন মণ হইল; পল্লীতে পল্লীতে হাহাকার পড়িল। দুর্গোৎসবের সময় লোকে তাহাদের ছেলে বাঁধা দিয়া উদরান্নের সংস্থান করিল।

চাঁদ-বিনোদের মা কোজাগর লক্ষ্মীপূজার দিন প্রাতে ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিলেন, পূজার জন্য ঘরে এক মুষ্টি চালও নাই; তখন ক্ষেতে যাইয়া কিছু ধান সংগ্রহ করিতে পারেন কিনা, চাঁদ-বিনোদকে সেই চেষ্টা করিয়া দেখিতে বলিলেন।

অনেকক্ষণে তাহার ঘুম ভাঙ্গিল,

"পাঁচখানি বেতের ডুগুল[১] হাতেতে করিয়া।
মাঠের পানে যায় বিনোদ বারমাসী গাইয়া।।

সংসারের প্রতি উদাসীন মায়ের দুলাল এই পুত্র শিস্ দিতে দিতে এবং বারমাসি গান গাহিতে গাহিতে ক্ষেতের দিকে চলিল।

কিন্তু আশ্বিনের বন্যায় কিছুই নাই—ক্ষেত জলে ভাসিয়া গিয়াছে, একটি ধানের ছড়াও জলের উপর মাথা জাগাইয়া নাই। বিষণ্ণ চিত্তে চাঁদবিনোদ বাড়ীতে ফিরিয়া মাতাকে তাহাদের কৃষির অবস্থা জানাইল। মাতা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

আগন মাসের ফসল মাটি হইল, তবে ত "সারা বছরের ল্যাগা গেছে ঘরের ভাত।" এই বলিয়া মাতা বিলাপ করিতে লাগিলেন।

এই বিপদে বিনোদ কি করিবে? হালের গরু বেচিয়া খাইল, পাঁচখানি ক্ষেত মহাজনের নিকট বাঁধা পড়িল;এখন আর হাল নাই, ক্ষেত নাই, গরু নাই। আর সর্ষে বা কড়াই বুনিবার উপায় নাই। কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র এইভাবে ঘরের শেষ সম্বল বিক্রয় করিয়া বৃদ্ধা মাতা ও তাহার যুবক পুত্র জীবন-যাত্রা চালাইল; বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে আবার আকাশে মেঘ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। মেঘের ডাক শুনিয়া ময়ূরেরা পেখম ধরিয়া নাচিতে লাগিল ও কুড়া পাখীগুলি সেই অরণ্য-প্রদেশের দিক্ দিগন্ত কাঁপাইয়া সাড়া দিয়া উঠিল। কুড়ার ডাক শুনিয়া চাঁদ-বিনোদের রক্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কুড়াশিকার তাহার চিরকালের নেশা। চাঁদ-বিনোদ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন দেখিয়া নিজের কুড়াটির পিঞ্জরটি হাতে করিয়া শিকারের জন্য ছুটিল।

কুড়া—শিকারে যাত্রা

ঘরে ক্ষুদের কণাও নেই, বিদায়কালে মা তাঁহার আদরের পুত্রকে কি খাইতে দিবেন? মায়ের চোখের জল দেখিতে দেখিতে চাঁদ-বিনোদ বাড়ী ছাড়িয়া চলিল—

১ ডুগুল = অগ্রভাগ।

"জ্যৈষ্ঠ মাসের রবির জ্বালা পবনের নাই বা।[১]
পুত্রকে শিকারে দিয়া পাগল হৈল মা।।"

চাঁদ-বিনোদ শিকারে চলিয়াছে। তাহার নিজের ক্ষেতের ধান জলে ভাসিয়া গিয়াছে। কিন্তু আড়ালিয়া গ্রাম ছাড়িয়া সর্ব্বত্র বসুন্ধরা হাসিয়া উঠিয়াছেন, প্রকৃতি তথায় শস্যশ্যামলা।

শালী ধান পাকিয়াছে,—ধানের গাছের অগ্রভাগ রাঙ্গা, তাহা শস্যের ভারে নোয়াইয়া পড়িয়াছে, প্রকৃতির এই বিরাট আয়োজন দেখিতে দেখিতে চাঁদ-বিনোদ অদূরে তাহার ভগিনীর বাড়ীর দিকে চলিল।

"আগ-রাঙ্গা শালি ধান্য পাক্যা ভুঞে পড়ে।
পথে আছে বইনের বাড়ী যাইব মনে করে।"

বহুদিন পরে ভাই-ভগিনীর মিলন হইল। কত যত্নে ভগিনী চাঁদ-বিনোদের জন্য একটা গামছায় চিড়ার পুঁটুলী বাঁধিয়া দিল। বাড়ীর গাছের সোনার বর্ণ মর্ত্তমান কলা পাকিয়াছিল, এক ছড়া কলা নামাইয়া চাঁদ-বিনোদকে দিল। সর্ব্বশেষ পান-খয়ের-সুপুরি ও চুন সাজাইয়া চাঁদ-বিনোদকে দিয়া—কত আদরে ভাইএর চন্দ্র বদনখানি দেখিতে লাগিল।

কুড়া শিকারে চলিয়াছে চাঁদ-বিনোদ; আষাঢ়ের মেঘ রহিয়া রহিয়া ডাকিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে কুড়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছে।

"কুড়ার ডাকেতে শুনি বর্ষার নমুনা।" যতই নিবিড় বনে প্রবেশ করিতে লাগিল, ততই অস্তগমনোদ্যত সূর্য্যের তেজ কমিয়া আসিল এবং মেঘের গুরু গুরু ডাক, কেঁয়া ফুলের গন্ধ, কুড়া ও মেঘের ধ্বনির সঙ্গে মিশিয়া পল্লীগ্রামের বর্ষাকে জীবন্ত করিয়া দেখাইল।

মলুয়ার সঙ্গে প্রথম দেখা

সম্মুখে আড়ালিয়ার মাঠ, তাহা পার হইয়া চাঁদ-বিনোদ দেখিল সেওলাপূর্ণ একটা ছোট পুকুর; ফাঁকে ফাঁকে তাহার নির্ম্মল জল কাকের চক্ষের মত কালো দেখাইতেছে; পুকুরের চারিদিকে মাঁদার বন, এবং কলাগাছ;

---

১ বা = হিল্লোল।

"গায়ের পাছে আঁধা পুকুর ঝাড় জঙ্গলে ঘেরা।
চার দিকে কলার গাছ মান্দার গাছের বেড়া।।
ঘাটেতে কদম গাছে ফুল ফুট্যা আছে।
জলের শোভা দেখে বিনোদ পুষ্করিণীর পাড়ে।।"

একদিকে বাঁধা ঘাট,—ঘাটের ধারে একটি কদম গাছে অজস্র ফুল ফুটিয়াছে; পরিশ্রান্ত চাঁদ-বিনোদ সেই পুকুর পাড়ে যাইয়া বিশ্রাম করিতে বসিল। জ্যৈষ্ঠ মাসের রাত,—অতি ছোট, রাতে ঘুমাইয়া তৃপ্তি হয় নাই,—চাঁদ-বিনোদের চোখ বুজিয়া আসিল। ক্রমে নিজের অজ্ঞাতসারে সে শরীরটা পুকুরের ঘাটে প্রসারিত করিয়া দিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই গভীর নিদ্রা তাহার চক্ষু ভারাক্রান্ত করিল।

কুমারী মলুয়া সেই সন্ধ্যায় জল আনিতে আসিয়া দেখিল, অপূর্ব্ব রূপবান্ এক যুবক সানবাঁধা ঘাটে অঘোরে ঘুমাইতেছে! এই মেন্দি গাছগুলির নীচে প্রায়ই সন্ধ্যাকালে সাপ দেখা যায়। কুমারী থমকিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিল, আর দিন মা কিম্বা ভাতৃবধূরা সঙ্গে আসেন, আজ আমি একলা—সহায়হীন একা। ভিন্নদেশী এই যুবকের ঘুম কি করিয়া ভাঙ্গি? নতুবা, ইনি এই বিপজ্জনক পুকুর পাড়ে আঁধারে ঘুমাইয়া থাকিলে সঙ্কটে পড়িতে পারেন। যদি বেশী রাতে ঘুম ভাঙ্গে, তবেই বা উনি কোথায় যাইবেন? এ পাড়াগাঁয়ের রাস্তা ইনি জানেন না, বৃষ্টি বাদলার মধ্যে কোথায় যাইবেন? ইহার ঘুম কি করিয়া ভাঙ্গাই? লজ্জাবতী তরুণী নিদ্রিত যুবকের জন্য গভীর আশঙ্কা বোধ করিতে লাগিল।

অবশেষে কুমারী কলসী লইয়া জল ভরিতে গেল, কলসীর জল ফেলিয়া পুনরায় জল ভরিল—জল ভরিবার শব্দে চাঁদ-বিনোদের কুড়া ডাকিয়া উঠিল। কুড়ার ডাক, সুন্দরীর জল ভরিবার শব্দ এবং গুরু গুরু মেঘ-গর্জ্জনে চাঁদ-বিনোদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে চাহিয়া দেখিল এক পরমা সুন্দরী অপ্সরার ন্যায় নিটোল-গঠন নারী ঘাটের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহাকে অপাঙ্গ দৃষ্টিতে দেখিতেছে।

কিন্তু সেই সন্ধ্যায় লজ্জায় উভয়ে কোন আলাপ করিতে পারিল না। কিন্তু উভয়ের হৃদয়ে তোলপাড় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

"ভিন দেশী পুরুষ দেখি চাঁদের মতন,
লাজ-রক্ত হৈল কন্যার প্রথম যৌবন।"

প্রথম যৌবনের এই ব্যথা বুকে করিয়া কলসী কাঁখে লইয়া মলুয়া স্বীয় গৃহের দিকে রওনা হইল এবং চাঁদ-বিনোদও ধীর পাদক্ষেপে তাহার ভগিনীর বাড়ীর দিকে যাইতে লাগিল।

পূৰ্ব্বরাগ

চাঁদ-বিনোদ পথে যাইতে যাইতে "শুকনা কাননে যেন মহুয়ার ফুলে"র মত সেই রূপসী কন্যার কথা চিন্তা করিতে লাগিল; এই কন্যা কি বিবাহিতা, না কুমারী? যদি বিবাহিতা হইয়া থাকে— তবে আর এই পল্লীতে আসিব না, কোন ঘোর বনে চলিয়া যাইব। কুড়া! তুমি আমার মাকে জানাইও 'চাঁদ-বিনোদ আর ঘরে ফিরিবে না।' "কি সুন্দর মূর্ত্তি, জলের পদ্ম যেন ডাঙ্গায় আসিয়া ফুটিয়াছিল, সাঁঝের দীপ যেন কেহ পুকুর ঘাটে অপরাহ্নে জ্বালাইয়াছিল! আমি মুখখানি ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই, সে উত্তর দিকে মুখ ফিরাইয়াছিল; ঘাট হইতে তাই সেই নিখুঁত মুখখানির সবটা দেখিতে পাইলাম না।" চাঁদ-বিনোদের চিন্তা-ধারা এইরূপ!

এদিকে মলুয়াও বাড়ী আসিয়া সারারাত্রি ঘুমাইতে পারে নাই। এই বাদলা রাত্রিতে অন্ধকারে পথহারা পথিক কোথায় গেল?

"কালি রাত্রি পোহাইল কার বাড়ীতে থাকি।
কোথায় জানি রাখল তার সঙ্গের কুড়া পাখী।।
আসমানে থাকিয়া দেওয়া ডাক্‌ছ তুমি কারে।
ঐ না আষাঢ়ের পানি বইছে শত ধারে।।
গাঙ্গ ভাসে, নদী ভাসে, শুকনায় না ধরে পানি।
এমন রাতে কোথায় গেল কিছুই না জানি।।"

পরদিন মলুয়া ভাল করিয়া খাইল না, সারাদিন একটা জানালার পাশে বসিয়া সেই আঁধা-পুকুরের পাড়ে দৃশ্যমান কদম গাছের উপরকার ডালের ফুলগুলি দেখিয়া কাটাইল। ভ্রাতৃ-বধূরা নারী-চরিত্রে অভিজ্ঞা। তারা মলুয়ার এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল। তাহারা কাণা কাণি করিয়া কি বলিতে লাগিল; শেষে মলুয়াকে বলিল, "চল আমরা একত্রে পুকুর ঘাটে

যাইয়া স্নান করিয়া আসি, সেখানে তোমার মনের কথা শুনিব। আমরা সঙ্গে গন্ধ-তৈল ও চিরুণী লইয়া যাইব, রাত্রের এলোমেলো চুল আবের কাকুই দিয়া আঁচড়াইয়া দিব।"

"তোরে লইয়া ননদিনী যাব আমরা জলে।
মনের কথা কইব গিয়া আমরা সকলে।।"

মলুয়া বলিল, "কাল একা পুকুর ঘাটে গিয়াছিলাম, এতে কি দোষ হয়েছে? তোরা কি সব কাণাকাণি করিতেছিস্।" তারা বলিল, তুই একদিনে যেন আর এক রকমের হইয়া গিয়াছিস, "আজ যে দেখি ফোটা ফুল কাল দেখেছি কলি।" ভ্রাতৃ বধূরা মলুয়ার মানসিক পরিবর্ত্তন সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিল। মলুয়া শিরঃপীড়ার ছুতো দিয়া তাহাদের সঙ্গে গেল না।

কিন্তু দিবা-অবসানে তাহার মন আর ঘরে থাকিতে চাহিল না।

"দুপুর বেলা গেল কন্যার ভাবিয়া চিন্তিয়া।
বিকাল বেলা গেল কন্যার বিছানায় শুইয়া।।
সন্ধ্যায় কলসী কাঁখে জলের ঘাটে যায়।
পাঁচ ভাইএর বউকে কন্যা কিছু না জানায়।।
মেঘ আড়া আষাঢ়ের রোদ গায়ে বড় জ্বালা।[১]
স্নান করিতে জলের ঘাটে যায় সে একলা।।

ইহার পূর্ব্বেই বিনোদ আঁধা-পুকুরের ঘাটে কদম-গাছের নীচে আসিয়া ঘুমের ভাণ করিয়া পড়িয়া আছে। মলুয়ার পিতলের কলসীতে জল ভরিবার শব্দে সে যেন জাগিয়া উঠিল। পূর্ব্বের দিন সে লজ্জায় কোন কথা বলিতে না পারায় তাহার অনুতাপ হইয়াছিল। আজ আর সুযোগ হারাইবে না, এই স্থির করিয়া আসিয়াছিল, সে মলুয়ার কাছে নিজের পরিচয় দিল, মলুয়ারও মুখ ফুটিল, সে বলিল—

"কুড়া লইয়া তুমি কেন ঘোর বনে বনে।
কেমনে কাটাও নিশি এই মত কাননে।।

১ মেঘের অন্তরালে তীব্র রোদ গায়ে আসিয়া পড়াতে মলুয়া জ্বালা বোধ করিল।

বনে আছে বাঘ ভালুক তোমার ভয় নাই।
এমন ক'রে কেমনে তুমি ফির ঠাঁই ঠাঁই।।
আঁধুয়া পুকুর পাড়ে কাল নাগিনীর বাসা।
একবার দংশিলে যাবে পরাণের আশা।।"

আতিথ্য

তারপরে মলুয়া বলিল, "তুমি আজ রাত্রে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া অতিথি হও। এই পথ দিয়া তুমি যাইও না, ইহা আমাদের খিড়কির পথ। ঐ যে সাম্‌নে গ্রামের পথ দেখা যাইতেছে. ঐ পথে বহুলোক যাতায়াত করে, তুমি সেই পথ ধরিয়া গেলেই নিকটেই বাহিরের বড় ঘরটা দেখিতে পাইবে, তাহার বারটা দরজা—

"সামনে আছে পুষ্করিণী সানে বাঁধা ঘাট।
পূবমুখী বাড়ীখানি আয়নার কপাট।।
আগে পাছে বাগ-বাগিচা আছে সারি সারি।
পাড়া-পড়শী লোকে বলে গাঁ মোড়লের বাড়ী।।"

সন্ধ্যাকালে ভিন্নদেশীয় অতিথি আসিয়াছে। হীরাধর মোড়লের বাড়ীর পাঁচ বউ রান্না-ঘরে যাইয়া খুব ঘটা করিয়া রাঁধিতেবসিয়াছে। তারা 'পরম রাঁধুনী'—হেলে-কৈবর্ত্তের ঘরে এরূপ রন্ধন-নিপুণা বউ বড় দেখা যায় না। তারা মান-কচু ভাজা, চাল্‌তার অম্বল, কৈ মাছের চড়-চড়ি ও অপরাপর নানা প্রকার মাছের ব্যঞ্জন কালজিরার সম্ভার দিয়া ভাল করিয়া রাঁধিয়াছে।একে একে তারা ছত্রিশ ব্যঞ্জন রাঁধিয়া ফেলিল।

"পাঁচ ভাইএর সঙ্গে বিনোদ পিঁড়াতে বস্যা খায়।
এমন ভোজন বিনোদ জন্মে না সে খায়।।
শুকতা খাইল, বেগুন খাইল, আর ভাজা বড়া।
পুলি পিঠা খাইল বিনোদ, দুধের সিষায় ভরা।।
পাত পিঠা, বরা পিঠা, চিতই চন্দ্রপুলি।

মালপোয়া খাইল কত রসে ঢলি ঢলি।।
আচাইয়া চাঁদ বিনোদ উঠিল তখন।
বার দুয়ারী ঘরে গিয়া করিল শয়ন।।
বাটা-ভরা সাচি পান লং এলাচি দিয়া।
পাঁচ ভাই এর বউ দিছে পান সাজাইয়া।।
শুইতে দিছে শীতল পাটি উত্তম বিছানা।
বাতাস করিতে দিছে আমের পাঙ্খাখানা।।"

কিন্তু মলুয়া শুধু মাঝে মাঝে উঁকি মারিয়া মনের সাধ মিটাইয়াছে—এই রঙ্গমঞ্চে সে নিজে উপস্থিত হয় নাই।

গৃহে ফিরিয়া আসা, বিবাহের চেষ্টা

মলুয়ার সঙ্গে চাঁদ-বিনোদের আর দেখা নাই। পরদিন চাঁদ-বিনোদ প্রভাতে হীরাধর ও তাহার পাঁচ ছেলেকে প্রণাম করিয়া নিজের গ্রামের দিকে রওনা হইল।

বাড়ীর পথে প্রথমেই ভগিনীর বাড়ী। চাঁদ-বিনোদ চেষ্টা করিয়াও বোনের কাছে লজ্জায় মনের কথা বলিতে পারিল না। কিন্তু পাড়া-পড়শী সমবয়স্ক ছেলেরা তাহার মনের কথা জানিতে পারিয়াছিল, ভগিনীও আভাসে বুঝিয়াছিল, -কয়েক দিনের পরে চাঁদ-বিনোদের মাও সে কথা জানিতে পারিলেন এবং বিবাহের প্রস্তাব করিয়া হীরাধরের বাটীতে ঘটকী পাঠাইলেন।

মেয়ের বিবাহের বয়স হইয়াছে। হীরাধরও নিশ্চিন্ত নাই। তিনি দিনরাত মেয়ের জন্যে একটি ভাল বর কোথায় পাইবেন, সেই চিন্তা করেন।

"শাওন মাসে বিয়া দিতে দেশের মানা আছে।
এই মাসে বিয়া দিয়া বেউলা রাড়ী হৈছে।।
ভাদ্র মাসে শাস্ত্র মতে দেব-কার্য্য মানা।
এই মাসে বিয়া না হৈল, কেবল আনাগোনা।।"

আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজার হিরিক,—কার্ত্তিক মাস আশায় আশায় কাটিল। অগ্রহায়ণ মাসে সমস্ত ক্ষেতের ধান পাকিয়া রাঙ্গা হইল;একটি রাঙ্গা বরের জন্য পিতার প্রাণ আকুল হইল। মাঘ মাসে ঘটকগণ ফর্দ্দ লইয়া উপস্থিত হইল। চাঁপা-নগরের প্রস্তাবটি প্রথম বিবেচিত হইল। ছেলেটি কার্ত্তিকের মত সুন্দর,—তাহাদের অগাধ সম্পত্তি, কিন্তু বংশে তাহারা প্রথম শ্রেণীর কুলীন নহেন। দীঘলহাটির প্রস্তাবিত বরও বংশের দোষে অগ্রাহ্য করা হইল। সুসঙ্গ হইতে যে প্রস্তাব আসিল, তাহারাও খুব আঢ্য বংশ—টাকার অন্ত নাই। অনেক নৌকা ঘাটে বাঁধা, তাহাতে ব্যাপার বাণিজ্য চলে, তাহা ছাড়া নৌকা-দৌড়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য অনেক ডিঙ্গা শায়ন মাসে প্রস্তুত থাকে। চারটি বৃহদাকৃতি ষাঁড়—লড়াই করিতে অভ্যস্ত। সেই ষাঁড়ের লড়াই দেখিতে খুব জনতা হয়—কিন্তু বংশের কাহারও কোন কালে কুষ্ঠরোগ হইয়াছিল—এজন্য সে প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল।

এই সময়ে ঘটক চাঁদ-বিনোদের মাতার প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইল। তাঁহারা বরকে দেখিয়াছেন, চেহারা ভারি সুন্দর। কুল-মর্য্যাদায় চাঁদ-বিনোদের সমকক্ষ ঘর সেই আড়ালিয়া অঞ্চলে নাই। ঘরে বর দুইই উজ্জ্বল। কিন্তু ইহারা বড় দরিদ্র—লক্ষ্মীপূজার জন্য একমুষ্টি চালও ইহাদের সঞ্চয় নাই।

সুতরাং হীরাধরের ইচ্ছা সত্ত্বেও এই ঘরে কন্যার বিবাহে তিনি সম্মতি দিতে পারিলেন না। যে কন্যা কত আদরে লালিত পালিত, তাহাকে কি করিয়া এই নিরন্ন ঘরে বিবাহ দিবেন? অগ্নিপাটের শাড়ী পরিয়াও যাহার মন উঠে না, সে কি করিয়া জোলার হাতের মোটা ও ছিন্ন পাছড়া পরিবে?

ঘটক যাইয়া সকল কথা জানাইল। পুত্রের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে দৈব বাদী হইয়াছেন দেখিয়া মাতা ক্ষুণ্ণ হইলেন।

প্রবাস—যাত্রা

চাঁদ-বিনোদও সমস্ত শুনিয়াছিল; সে পরদিন মাতাকে বলিল, "পুরুষ হইয়া এরূপ ভাবে ঘরে বসিয়া দারিদ্র্য সহ্য করা উচিত নয়, আমি কুড়া শিকার করিতে আজই দূরে যাইব।" কিছু বাসি পান্তা ভাত ছিল,—কাচা লঙ্কা ও নুন দিয়া মাতা তাহাই পুত্রকে খাইতে দিলেন। চাঁদ-বিনোদ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলঃ—

"বিদেশেতে যায় যাদু যদ্দুর দেখা যায়।
পিছন থেকে চেয়ে দেখে অভাগিনী মায়।।
বাঁশের ঝাড় বন জঙ্গল পুত্রের পৃষ্ঠে পড়ে।
আঁখির পানি মুছ্যা মায় ফিরে আইল ঘরে।।"

এক বছর পরে বিনোদ বাড়ী ফিরিয়া আসিল। কুড়া শিকারে বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়া বিনোদ প্রচুর অর্থ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

"কুড়া শিকার কইরা বিনোদ পাইল জমিন বাড়ী।
ইনাম বক্‌শিস পাইল কত কইতে নাহি পারি।।
রাজ্যের রাজা দেওয়ান সাহেব সদয় হইল তারে।
কুড়ি আড়া জমিন দেওয়ান লেখ্যা দিল তারে।।"

চাঁদ-বিনোদ নিজে একজন প্রধান শিল্পী, সে তাহার বাড়ীতে একখানি আটচালা ঘর নিজ হাতে নির্ম্মাণ করিল। তাহার বাড়ী সুত্যা নদী হইতে বেশী দূরে অবস্থিত ছিল না। ঘরখানির ১২টি দরজা, সুঁদি বেতের নানা কারুকার্য্যে তাহা দেখিতে সুদৃশ্য করা হইল। বেড়াগুলি "শীতল পাটী" দিয়া মোড়ানো হইল, তাহাতে কত শিল্প কার্য্য, দূর পল্লী হইতে লোকেরা ঘরখানি দেখিতে আসিত। উলু ছনের চালের কোণায় কোণায় নানারূপ ফুল ও লতা পাতার শিল্প; ঘরখানি চাঁদের আলোর মত ঝলমল করিতে লাগিল, ময়ূরপুচ্ছ দিয়া ইহার সাজ-সজ্জা রচিত হইল এবং বাড়ীর দক্ষিণ দিকে চমৎকার এক দীঘি খনিত হইল; সেই বাড়ীখানি যেন কোন রূপসী রমণীর ন্যায় সেই পুকুরের আয়নায় নিজ মুখ দেখিয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিল।

চাঁদ—বিনোদের বিবাহ

অর্থ, প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতিতে এখন চাঁদ-বিনোদ সেই অঞ্চলে তাহাদের সমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিল।

এই সমস্ত সংবাদ শুনিয়া হীরাধর এখন মলুয়াকে চাঁদ-বিনোদের হস্তে দিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব পাঠাইল।

মলুয়া

বিদেশেতে যায় যাদু যদ্দুর দেখা যায়
পিছন থেকে চেয়ে দেখে অভাগিনী মায়।"

(পৃষ্ঠা ২০২)

মহাসমারোহে বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের রাত্রিতেই বিনোদ তাহার স্ত্রীর নূতন অপরূপ রূপ-লাবণ্য পুনরায় আবিষ্কার করিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল।

শুভরাত্রে বাসর ঘরে, একটি দীপ ঘৃতের সল্‌তায় মৃদু মৃদু জ্বলিতেছিল,

"ঘরেতে জ্বলিছে বাতি, সাঁজের যেন তারা।
শয়ান মন্দিরে মলুয়া সামনে হল খাড়া।।
কিবা মুখ, কিবা ভুরু, সুন্দর ভঙ্গিমা।
আঁধার ঘরেতে যেন জ্বলে কাঁচা সোনা।।"

প্রথম রাত্রির এই আনন্দে বিভোর হইয়া বিনোদ নানারূপ হাস্য-পরিহাস করিতে লাগিল,

"শিরে না দীঘল কেশ পড়ে কন্যার পায়।
সেই কেশ লইয়া বিনোদ 'মেঘুয়া'[১] খেলায়।।'

এইরূপ রজনীর উচ্ছ্বসিত উৎসবে তাল রাখিয়া চলা একটু কষ্টকর। মৃদুস্বরে মলুয়া বলিল ঃ—

"পাঁচ ভাইয়ের বউ তারা নিদ্রা নাহি গেছে।
বেড়ার ফাঁক দিয়া সবে তোমায় দেখিছে।।
ভূষণের রুনুঝুনি শব্দ শুনি কানে।
পরিহাস করবে তারা কালিকা বিহানে।।"

কাজির দৃষ্টি

মলুয়া শ্বশুর বাড়ী আসিয়াছে। সে একটা পুকুর ঘাটে কলসী লইয়া জল আনিতে যাইতেছিল। পথে সেই দেশের কাজি ঘোড়ার উপর হইতে তাহাকে দেখিতে পাইল। কাজি অতি দুশ্চরিত্র ছিল—মলুয়াকে দেখিয়া তাহার চোখে পলক পড়িল না,

" ঘোড়ায় সোয়ারে কাজি চাহিয়া রহিল।"

১ মেঘুয়া = চুল লইয়া এক প্রকারের খেলা।

মলুয়াকে পাইবার জন্য তাহার মন অত্যন্ত উতলা হইয়া উঠিল। নেতাই নাম্নী এক কুটনী সেই অঞ্চলে ছিল। কাজি ভাবিতে ভাবিতে যাইয়া সেই কুটনীর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। কুটনীকে সে অনেক লোভ দেখাইল এবং তাহাকে দূতি করিয়া মলুয়ার নিকট অশিষ্ট প্রস্তাব পাঠাইলঃ—

"নিকা যদি করে মোরে ভালমত চাইয়া।
আমার যত ঘরের নারী রইবে বাঁদি হৈয়া।।
সোণা দিয়া বেইড়া দিব সর্ব্বাঙ্গ শরীর।
সাত খুন মাপ তার বিচারে কাজির।।
সোণার পালঙ্ক দিব সুন্দর বিছান।
গলায় গাঁথিয়া দিব মোহরের থান।।
দিব যে কাঁখের কলসি সোণাতে বাঁধিয়া।
নাকের বেশর দিব হীরার গড়িয়া।।"

নেতা-কুটনী আত্মীয়তার ভাণ করিয়া চাঁদ-বিনোদের বাড়ীতে যাতায়াত করিতে লাগিল। তাহার মাতাকে বলিল, "তোমার পুত্র-বধূ নাকি অপ্সরার মত সুন্দরী, তাহাকে আনিয়া দেখাও।" এই ভাবে ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা করিতে লাগিল। একদিন শাশুড়ী বাড়ীতে ছিল না; মলুয়া একাকী ঘাটে জল আনিতে গিয়াছে—সেখানে সুবিধা পাইয়া কুটনী মলুয়াকে কাজির প্রস্তাব জানাইল। মলুয়া বারুদে আগুন পড়িলে যেরূপ হয়, সেইরূপ জ্বলিয়া উঠিল।

"কাজিরে কহিও কথা না শুনিব আমি।।
রাজার দোসর সেই আমার সোয়ামী।।
আমার সোয়ামী যেমন পর্ব্বতের চূড়া।
আমার সোয়ামী যেমন রণ-দৌড়ের ঘোড়া।।
আমার সোয়ামী যেমন আসমানের চাঁদ।
না হয় দুষমন কাজি পদ-নখের সমান।।
জাতে মুসলমান কাজি, তার ঘরের নারী।
মনের আপ্‌শোষ মিটাক তারা সাত নিকা করি।।"

কাজির ক্রোধ ও বিনোদের বিপদ

অপমানিত হইয়া কুটনী কাজির কাছে যাইয়া সকল কথা বলিল। কাজি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত জ্বলিয়া উঠিল।

সে দেশে "নজর মরিচা" নামক একরূপ কর ছিল,—বিবাহের পর নবাবকে এই কর দিতে হইত। পাত্রীর সৌন্দর্য্য অনুসারে এই বিবাহের কর নির্দ্দিষ্ট হইত। কাজি সেই দিনই চাঁদ-বিনোদের উপর 'নজর মরিচার' পরওয়ানা জারি করিল। তাহাকে সাত দিনের মধ্যে 'নজর মরিচা' স্বরূপ ৫০০ টাকা দিতে হইবে, নতুবা তাহার ঘর বাড়ী নিলাম করিয়া টাকা আদায় করা হইবে।

চাঁদ-বিনোদ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল, এত টাকা সে কোথা হইতে দিবে? সাত দিন বিনোদ ভাবিতে ভাবিতে কাটাইল, যেখানে ভাবনা ছাড়া উপায় নাই সেখানে না ভাবিয়া সে আর কি করিবে? সাত দিন পরে কাজির পাইক পেয়াদা আসিল, ঝাণ্ডাগাড়ি করিয়া তাহারা বিনোদের মালমাত্তা ক্রোক করিল। আট-চালা-চৌচালা ঘরগুলি বিক্রি হইয়া গেল, এত সাধের যে 'রঙ্গিলা' ঘরখানি নিজ হাতে তৈরী করিয়াছিল, যাহার শিল্প দেখিতে দূর পল্লী হইতে লোকজন আসিয়া প্রশংসা করিয়া যাইত, তাহা ছাড়িয়া দিতে বিনোদের অসহ্য কষ্ট হইল, কিন্তু কি করিবে? এত বড় বাড়ীতে মাত্র একখানি ঘর অবশিষ্ট রহিল।

ক্রমে এই ক্ষুদ্র পরিবারের দুর্গতি চরম সীমায় উপস্থিত হইল। বিনোদ হালের বলদগুলি বিক্রয় করিল এবং দুধওয়ালা গাইগুলিও ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল।

মলুয়ার দুঃখের শেষ নাই। স্বামী ও শাশুড়ীকে কি খাওয়াইবে, সারাদিন এই চিন্তা করিয়া সে কাহিল হইয়া পড়িল। এমন দিনে বিনোদ তাহাকে কিছু দিনের জন্য বাপের বাড়ীতে পাঠাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলঃ—"তুমি পাঁচ ভাইএর এক বোন, তোমার বাপের বাড়ীতে কোন অভাব নাই, তোমার গায়ে ফুলের আঘাত কোনদিন পড়ে নাই। সর্ব্বদা ভাল শাড়ী ও অলঙ্কার পড়িয়াছ, তুমি এখানে এত দুঃখ সহিয়া কিরূপে থাকিবে? তোমার পিতামাতা ও ভাইএরা আছেন—তাঁরা কত আদরে তোমাকে সেখানে রাখিবেন।"

মলুয়া গদগদ কণ্ঠে বলিল ঃ—

"ঘরে থাকি বনে থাকি গাছের তলায়।
তুমি বিনা মলুয়ার নাহিক উপায়।।

রাজার হালে থাকি যদি আমার বাপের বাড়ী।
মলুয়া নহে তো সেই সুখের আশারি[১]।।
শাক ভাত খাই যদি গাছ তলায় থাকি।
দিনের শেষে তোমার মুখ দেখিলেই সুখী।।"

মলুয়া কিছুতেই বাপের বাড়ী গেল না, সে বলিল, "আমার মায়ের পাঁচ ছেলে আছে! কিন্তু আমার শাশুড়ীর দেখিবার শুনিবার কে আছে? তাঁহাকে একাকী ফেলিয়া আমি কিরূপে যাইব? তিনি বৃদ্ধ ও অশক্ত হইয়াছেন। কে তাঁহাকে রাঁধিয়া বাড়িয়া দিবে? এই গৃহই আমার কাশী, ইহাই আমার বৃন্দাবন, আমি বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও যাইব না।"

নিদারুণ অভাবে মলুয়ার সর্ব্বাঙ্গের অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হইলঃ—

"নাকের নথ বেচি মলুয়া আষাঢ় মাস খাইল।
গলার যে মতির হার তাও বেচ্যা খাইল।।
শায়ন মাসেতে মলুয়া পায়ের খাড়ু বেচে।
এত দুঃখ মলুয়ার কপালেতে আছে।।
হাতের বাজু বাঁধা দিয়া ভাদ্র মাস খায়।
পাটের শাড়ী বেচ্যা মলুয়ার আশ্বিন মাস যায়।।
কানের ফুল বেচ্যা মলুয়া কার্ত্তিক গোঁয়াইল।
অঙ্গের যত সোনা-দানা সকলই বাঁধা দিল।।
শত গ্রন্থি অঙ্গের বাস হাতের কঙ্কন বাকি।
আর নাহি চলে দিন মুষ্টি চালের লাগি।।
ছেঁড়া কাপড়ে মলুয়ার অঙ্গ নাহি ঢাকে।
একদিন গেল মলুয়ার দুরন্ত উপোসে।।
ঘরে নাই লক্ষ্মীর দানা এক মুঠা ক্ষুদ।
দিন রাইত বাড়তে আছে মহাজনের সুদ।।"

১ আশারি = প্রত্যাশী।

আপনি শাক সিদ্ধ করিয়া খায়—তবু শাশুড়ী ও স্বামীর মুখে দুটি ভাত দেয়ঃ—

"আপনি উপোসী থেকে—পরে নাহি কয়।
সোয়ামী শাশুড়ীর দুঃখ আর কত সয়।।"

এখন বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করা বাকী। যখন অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইল, তখন বিনোদ স্ত্রী ও মাকে কিছু না বলিয়া একরাত্রে গৃহত্যাগ করিল।

বিনোদ চলিয়া গেলে কাজি আবার কুটনীকে পাঠাইল। তপ্তকাঞ্চন বর্ণ এখন আর সোনার অলঙ্কারে ঝলমল করে না।

"সর্ব্বাঙ্গ হয়েছে যেন ধুতরার ফুল।"

কুটনী নানা ছন্দে নানা বন্ধে প্রলোভন দেখাইল—

"ধান ভানা সুতা কাটা না শোভে তোমায়।
এমন অঙ্গে ছেঁড়া কাপড় শোভা নাহি পায়।।
সোণায় মুড়িয়া দিব অঙ্গ যে তোমার।
কাজিরে করিয়া সাদী ঘরে যাও তার।।"

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মত কুটনীর কথা মলুয়ার অসহ্য হইল। তাহার তেজস্বিতার এক কণাও কমে নাই, বরং যত দুঃখ পাইতেছে, ততই কাজির এই অপমান তাহাকে বেশী পীড়ন করিতেছে—

"বেঁচে থাকুন স্বামী আমার চিরজীবি হৈয়া,
থানের মোহর ভাঙ্গি কাজির, পায়ের লাথি দিয়া।।"

তারপরে মলুয়া কুটনীকে তাহার পাঁচ ভাইএর কথা বলিল, তাহারা পৃথিবীতে কাহাকেও ভয় করে না, "কাজির কথা আমি জানাইব,—তখন তাহারা এই দুষ্টকে বুঝিয়া লইবে।"

মলুয়ার অবস্থার কথা আড়ালিয়া গ্রামে তাহার মাতা শুনিলেন। তিনি আহার নিদ্রা ছাড়িলেন, তিন দিন, তিন রাত তিনি না খাইয়া না ঘুমাইয়া কাঁদিয়া কাটিয়া কাটাইলেন। পাঁচ ভাই,—মলুয়াকে আনিতে গেল। কিন্তু মলুয়া আসিল না, তাহার শাশুড়ীকে ফেলিয়া

কি করিয়া সে নিজে সুখ ভোগ করিতে বাপের বাড়ী যাইবে? তাহারা সারাদিন তাহাদের আদরের ভগিনীটিকে বুঝাইল। কিন্তু মলুয়া নিজ কপালে হাত দিয়া দেখাইল—"আমার এই অদৃষ্টের দুঃখ কে নিবারণ করিবে? বাপ মা তো ভাল ঘরে ভাল বরে বিবাহ দিয়াছিলেন। দৈব দোষে তোমাদের এত আদরের ভগিনী কষ্ট পাইতেছে, এই কষ্ট দূর করা আর তোমাদের সাধ্য নাই। সোয়ামী ঘরে নাই, শাশুড়ী প্রাণ থাকিতে নিজের ভিটা ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবেন না, আমি এখানে তাঁহাকে লইয়া পড়িয়া থাকিয়া যদি মরি, তবুও তাহা সৌভাগ্য মনে করিব। আমি এখান হইতে যাইব না, মাকে বলিও তোমাদের পাঁচ ভাইএর মুখ দেখিয়া তিনি কতক সান্ত্বনা পাইবেন, আমার শাশুড়ীর কে আছে?"

চোখের জল মুছিতে মুছিতে পাঁচ ভাই বাড়ী ফিরিয়া গেল।

"সুতা কাটে ধান ভানে শাশুড়ীরে লৈয়া।
এই মতে দিন কাটে দুঃখ যে পাইয়া।।"

ক্রমে ফাল্গুন মাস গেল, চৈত্র মাসে আমের মুকুলের গন্ধে বাতাস পূর্ণ হইল, কাকগুলি কষায় আম্রমঞ্জরী ঠোঁটে ভাঙ্গিয়া কলরব করিতে লাগিল। বিনোদ কোন্ দেশে গেছে, মলুয়া শত চিন্তা করিয়াও তাহার কিনারা পায় না।

"আইল আষাঢ় মাস মেঘের বয় ধারা।
সোয়ামীর চাঁদ মুখ না যায় পাসরা।।
মেঘ ডাকে গুরু গুরু দেওয়ায় ডাকে রৈয়া।
সোয়ামীর কথা ভাবে খালি ঘরে শুইয়া।।"

শ্রাবণ মাসে পল্লীগ্রামে মনসা দেবীর উৎসব, সর্ব্বত্র মনসা-মঙ্গল গান। সেই দেশব্যাপী-উৎসবের সময় বিনোদ দেশ-ছাড়া।

তারপরে আশ্বিন মাসে দেবী পূজা। বধূ ও শাশুড়ী কত দুঃখে দিন কাটান। কার্ত্তিক মাসে দৈব সদয় হইল, বিনোদ ঘরে ফিরিয়া আসিল। সে এবারও কুড়া-শিকার করিয়া অনেক টাকা আনিয়াছে। বাজেয়াপ্ত ভূমি খালাস করিয়া লইল, পুনরায় চৌচালা ও রঙ্গিন আট চালা ঘর উঠিল। বহুদিন পরে বিনোদের মুখে মা ডাক শুনিয়া—মায়ের প্রাণ জুড়াইল।

"মা বলিয়া কে ডাক্‌ল আজ দুঃখিনী মায়েরে।" মিলনের আনন্দে এই পরিবার এতদিন পরে আবার ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল।

"মেওয়া মিশ্রি সকল মিঠা, মিঠা গঙ্গাজল।
তার থেকে মিঠা দেখ শীতল,ডাবের জল।।
তার থেকে মিঠা দেখ দুঃখের পরে সুখ।
তার থেকে মিঠা যখন ভরে খালি বুক।।
তার থেকে মিঠা যদি পায় হারানো ধন।
সকল থেকে অধিক মিঠা বিরহে মিলন।।"

কাজি সাহেব আর একটা চক্রান্ত করিলেন। সে দেশে এক প্রবল পরাক্রমশালী জমিদার ছিলেন—তাঁহার চরিত্র দুষ্ট ছিল,—এই তরুণ জমিদার চর পাঠাইয়া পরের সুন্দরী স্ত্রী খুঁজিতেন। কাজির লোকেরা তাঁহাকে খবর দিল যে, সুত্যা নদীর পারে এক পল্লীতে চাঁদ-বিনোদের এক পরমাসুন্দরী স্ত্রী আছে। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি ষড়যন্ত্র করিয়া একটা মিথ্যা মামলায় ফেলিয়া বিনোদকে হত্যাপরাধে ধরাইয়া দিলেন। বিচারকের আদেশ অনুসারে বিনোদকে নিলক্ষার মাঠে জীয়ন্ত পুঁতিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা হইল। এদিকে জমিদারের নিযুক্ত দস্যুর দল মলুয়াকে জোর করিয়া বাড়ী হইতে জমিদারের গৃহে লইয়া গেল।

মলুয়া বিপদে পড়িয়া তাহার পোষা কুড়ার মুখে চিঠি দিয়া পিত্রালয়ে ভাইদের কাছে পাঠাইয়াছিল। সশস্ত্র পাঁচ ভাই নিলক্ষার মাঠে যাইয়া দেখিল, বিনোদকে পুঁতিয়া ফেলিবার জন্য মাটি খোঁড়া হইতেছে। এই অবস্থায় তাহারা সেই সকল উৎপীড়কদিগকে মারিয়া ধরিয়া বিনোদকে ছাড়াইয়া লইয়া আসিল, কিন্তু তখন তাহারা দেখিল মলুয়াকে জমিদারের লোকজন দস্যু সাজিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। বিনোদের মা মাটিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছেন। বিনোদ তাহার কুড়াটিকে লইয়া বনবাসী হইল।

এদিকে জমিদার মলুয়াকে অনেক প্রলোভন দেখাইলেন। সে বলিল—"আমি একটি সঙ্কল্প করিয়া ব্রত গ্রহণ করিয়াছি। তিন মাস পরে সেই ব্রতের উদ্‌যাপন হইবে। আপনি এই তিন মাস সবুর করিয়া থাকুন। এই সময় যেন কোন পুরুষের মুখ আমাকে দেখিতে না হয়। এই তিন মাস খাটের উপর শুইব না, মেঝেতে আঁচল পাতিয়া শয়ন করিব। কাহারও স্পৃষ্ট

অন্নজল খাইব না। এই তিন মাস আমার গৃহে আপনি আসিবেন না, তারপর ব্রত সমাধা করিয়া আমি আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করিব। যদি ইহার অন্যথা করা হয়—তবে জানিবেন আমি বিষ খাইয়া মরিব।"

জমিদার এই তিন মাস প্রতীক্ষা করিলেন। তিন মাস তো বসিয়া রহিল না, তাহার একদিন অন্ত হইল।

তখন জমিদার—

"মুখেতে সুগন্ধি পান অতি ধীরে ধীরে।
সোনালী রুমাল হাতে পশিলা অন্দরে।।"

মলুয়া বলিল, "আপনি জানেন, আমার স্বামী একজন ভাল কুড়াশিকারী, আমি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া কুড়া শিকার শিখিয়াছি। আমার ইচ্ছা ব্রত শেষ করিয়া আমি আপনার সঙ্গে কুড়া শিকার করিতে যাই, দেখিবেন, আমি একদিনে কতগুলি কুড়া ধরিয়া আনিতে পারি।"

জমিদার এই প্রস্তাবে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, বড় একটা ভাওয়ালিয়া নৌকা সুসজ্জিত করা হইল। সমস্ত আয়োজন-পত্র লইয়া মলুয়া ও জমিদার সেই ভাওয়ালিয়ায় উঠিলেন। ১২ দিন পরে জমিদার মলুয়াকে স্পর্শ করিবেন, এই সর্ত্ত।

এদিকে মলুয়া কুড়ার মুখে চিঠি পাঠাইয়া তাহার পাঁচ ভাইকে তাহার বিপদের কথা সমস্ত জানাইয়াছেঃ—

"পঞ্চ ভাইয়ে পত্র পাইয়া পানশী নৌকা করে।
ছল করিয়া তারা কুড়া শিকার ধরে।।
বিস্তার ধলাই বিল পদ্ম-ফুলে ভরা।
কুড়া শিকার করিতে জমিদার যায় দুপুর বেলা।।
সঙ্গেতে মলুয়া কন্যা পরমা সুন্দরী।
পানশী লৈয়া পাঁচ ভাই লইলেক ঘেরি।।
লাঠির বাড়ীতে ছিল যত দাঁড়ি মাঝি।
উবুৎ হইয়া জলে পড়ে করে, চেঁচামিচি।

পঞ্চ ভাইএর পানশী খানি দেখিতে সুন্দর।
লম্ফ দিয়া উঠে কন্যা তাহার উপর।।
অষ্ট দাঁড়ে মারে টান জ্ঞাতি বন্ধু জনে।
পঙ্খী-উড়া কৈরা পানশী ভাইঙ্গা পদ্মবনে।।
সোয়ামী সহিত মলুয়া যায় বাপের বাড়ী।
শ্রীরাম উদ্ধার করে যেন আপনার নারী।।"

মলুয়ার নুতন বিপদ

কিন্তু মলুয়াকে সংসারের যত দুঃখ যেন একত্রে পাইয়া বসিয়াছিল। সে দুঃখের হাত এড়াইবে কিরূপে?

মলুয়া বাড়ীতে আসিলে আত্মীয়েরা কাণা-ঘুষা করিতে লাগিল। তিন মাস একটা চরিত্রহীন জমিদারের বাড়ীতে সে কাটাইয়াছে, সেখানে ছত্রিশ জাতের মেলামেশা;—আচার-বিচার জাতি-বিচার এই জমিদারের নাই। বড় আম্‌লাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া কতকগুলি ব্যভিচারী কর্ম্মচারী-দ্বারা সে বেষ্টিত থাকে; সেখানে মলুয়া যে ধর্ম্ম বজায় রাখিয়াছে তাহার প্রমাণ কি? খাওয়া-দাওয়ার শুদ্ধতা যে সে পালন করিতে পারিয়াছে, তাহারই বা ঠিকানা কি? বিনোদের মাতুল হেলে-কৈবর্ত্তদের মধ্যে প্রধান কুলীন। তিনি বলিলেন, "ভাগিনেয়-বধূকে ঘরে নেওয়া যাইতে পারে না—কিছুতেই না, তবে বিনোদ প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাহার দোষ খণ্ডিতে পারে, আমরা তাকে লইয়া খাওয়া-দাওয়া করিতে পারি।" বিনোদের পিসাও একজন কুলীন, তিনি মাতুলের কথায় সায় দিলেন।

মলুয়ার পাঁচ ভাই সেইখানে ছিল, তাহারা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ভগ্নিকে পিতৃগৃহে লইয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। আঁচলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে মলুয়া বলিল, "আমি বাহিরের পরিচারিকা হইয়া এই বাড়ীর বাহিরের কাজ করিব। আমি এ বাড়ী ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না,

"গোবর ছড়া দিব আমি সকাল সন্ধ্যাবেলা।
বাহিরের কাজ সব করিব একেলা।"

অনেক চেষ্টা করিয়াও ভাইএরা তাহার মন ফিরাইতে পারিল না।

"প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বিনোদ ত্যজে ঘরের নারী।
আঁধারে লুকায়ে কাঁদে মলুয়া সুন্দরী।"

সমাজ-পরিত্যক্তা মলুয়া—ঘর ছাড়িয়া বাহিরে স্থান লইল। স্বামীর চাঁদ-মুখখানি একবার দেখাই তাহার জীবনের প্রধান কাম্য হইল এবং তাহাতেই সে তৃপ্ত হইল। কিন্তু এখানেই তাহার দুঃখের মাত্রা পূর্ণ হইল না।

সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া দিন কাটায়; এক হাতে ঝাঁটা দিয়া আঙ্গিনা সাফ্ করে, অপর হাতে চোখের জল মোছে। তাহার শাশুড়ী নিতান্ত অশক্ত, তিনি চোখে দেখেন না,—সারাদিন বিনোদ ক্ষেতে খাটিয়া আসে—কে ভাত রাঁধিয়া দেবে? চোখে না দেখিয়া শাশুড়ী যাহা রাঁধেন, তাহা মুখে তোলা যায় না। হায়রে, স্বামীকে যে দুটি ভাত রাঁধিয়া দেবে, নারীজন্মের এই সৌভাগ্য হইতেও মলুয়া বঞ্চিত। যে আসে তাহাকেই সে বিনোদের আর একটি বিবাহের জন্য চেষ্টা করিতে বলে। তাহার সোয়ামী ও শাশুড়ী না খাইয়া মারা পড়িতে বসিয়াছেন। এ বিষয়ে বিনোদের মামা ও পিসা খুব তৎপরতা দেখাইলেন। বিনোদের আর একটি বিবাহ অচিরে সুসম্পাদিত হইয়া গেল। এই নববধূটিকে মলুয়া ভগিনীর ন্যায় ভালবাসিতে লাগিল।

"বাহিরের কাজ করে মনের হরিষে।
সতীনেরে রাখে মলুয়া মনের সন্তোষে।।"

সর্পঘাত, প্রাণলাভ

একদিন প্রাতে উঠিয়া বিনোদ মায়ের কাছে ভাত চাহিল। "মা, আমি অতি শীঘ্র কুড়া শিকার করিতে যাইব, আমায় চারটি ভাত দাও।" কিন্তু চাল কাঁড়া ছিল না—দেরী সহে না। মা পান্তা ভাত বাড়িয়া আনিয়া ছেলেকে দিলেন, তাহাই তাড়াতাড়ি খাইয়া এক হাতে কুড়া ও অপর হাতে পিঞ্জর লইয়া বিনোদ অতি দ্রুত বাড়ী হইতে রওনা হইয়া গেল। পথে ভগিনীর বাড়ী, সে কিছুকালের জন্য ভগিনীর কাছে যাইয়া বসিল। মলুয়ার কথা লইয়া

আলাপ হইল, অভাগিনী মলুয়ার জন্য ভগিনী কাঁদিতে লাগিল, বিনোদ তাহার ভগিনীর অশ্রুর সঙ্গে নীরবে নিজ অশ্রু মিশাইয়া মলুয়ার কষ্টের কথা বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। সূর্য্যের তেজ বাড়ন্ত, আর অপেক্ষা করা যায় না। বিনোদ সেই গ্রাম ছাড়িয়া নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিল, চারিদিকে বড় বড় গাছ, বিরাট পুরুষের ন্যায় বন রক্ষা করিতেছে। নিম্নে প্রশস্ত দূর্ব্বাদল ধরিত্রীকে শ্যামল শোভায় মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। কুড়াকে ছাড়িয়া দিয়া বিন্না ঝোপের আড়াল হইতে বিনোদ নূতন কুড়ার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। এদিকে গুরু গুরু মেঘ-গর্জ্জনের সঙ্গে কুড়ার উল্লাস বাড়িল—তাহাদের মধ্যে কয়েকটি আসিয়া পোষা কুড়াটির সঙ্গে আলাপ জমাইতে চেষ্টা করিল। বিন্না-ঝোপের নিম্নে বিষধর সর্প ছিল, এই সময়ে অকস্মাৎ বিনোদের কনিষ্ঠ পদাঙ্গুলি দংশন করিয়া বিদ্যুৎবেগে লুকাইয়া পড়িল।

সেই নিবিড় বন-প্রদেশে আসন্ন মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া বিনোদের চক্ষের জল পড়িতে লাগিল। মায়ের জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল এবং "জন্মের মত না দেখিলাম সুন্দর মলুয়ায়" বলিয়া অস্থির হইয়া—সেই পরিত্যক্ত রমণীর জন্য তাহার বুকের ভিতরকার ব্যথা যেন মৃত্যুকালে আরও বেশী হইল।

একজন পথিক যাইতেছিল, বিনোদ হাঁফাইতে হাঁফাইতে তাহার এই অবস্থা তাহার মাকে জানাইতে বলিয়া চক্ষু বুজিল।

সন্ধ্যাকালে মা এই সংবাদ শুনিয়া পাগলিনীর মত এলোচুলে ছুটিয়া আসিলেন, হাহাকার করিতে করিতে মলুয়ার পাঁচ ভাই আসিল, তখন বিনোদের চোখের তারা ঘোলা হইয়া গিয়াছে। নিশ্বাস বন্ধ, বক্ষের স্পন্দনের কোন লক্ষণ নাই, নাড়ী ধরিয়া তাহারা মনে করিল, সব শেষ হইয়া গিয়াছে। এই বিচলিত শোকার্ত্ত পরিবারের মধ্যে একমাত্র মলুয়াই নিশ্চল; সে একখানি প্রতিমার মত স্থির হইয়া রহিল। তাহার পরে দাদাদিগকে বলিল, "এখানে বিলাপ করিয়া কোন ফল নাই, তোমরা চল, ইঁহাকে লইয়া ওঝার বাড়ীতে যাই, দেখি প্রাণের কোন আশা আছে কিনা?" যেন ঘুম হইতে উঠিয়া বিলাপকারীরা বিনোদকে লইয়া একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের বাড়ীতে গেল। মড়া কোলে লইয়া মলুয়া বেহুলার ন্যায় স্বামীর পুনর্জ্জীবন কামনা করিয়া গারুড়ী ওঝার বাড়ীতে উপস্থিত হইল। মলুয়ার

ভ্রাতারা নৌকাখানি প্রাণপণে বাহিয়া লইয়া আসিয়া সাত দিনের পথ তিন দিনে চলিয়া গেল। গারুড়ী রোগীকে দেখিয়া বলিল, "এ রোগী এখনও মরে নাই। আমি ইহাকে বাঁচাইব।"

"নাক মুখ দেইখা ওঝা মাথায় থাবা দিল।
বুকেতে আনিয়া বিষ কোমরে নামাইল।।
কোমরে আনিয়া বিষ হাঁটুতে নামাইল।
বিষ জ্বালা গেল, বিনোদ আঁখি মেইলা চাইল।।"

মলুয়ার নূতন পরীক্ষা

সূত্যা নদীর তীরে ধন্য ধন্য রব উঠিল। সতী কন্যা, সাবিত্রীর মত, বেহুলার মত, স্বামীকে স্বর্গ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছে। হেলে-কৈবর্ত্তের ঘর এই কন্যার আবির্ভাবে পবিত্র হইয়াছে। ইহাকে কে বাহিরের দাসী করিয়া বাড়ীতে রাখিয়াছে?

"মরা পতি জিয়াইয়া আনে যেই নারী।
তাহারে সমাজে লইতে কেন কর দেরী।।"

কিন্তু দেশের লোকে বলিলে কি হইবে, দশে বলিলে কি হইবে?

"বিনোদের মামা বলে হালুয়ার সর্দ্দার।
যে ঘরে তুলিয়া লবে জাতি যাইবে তার।।
বিনোদের পিসা কয় ভাবিয়া চিন্তিয়া
ঘরেতে কেমনে ল'ব, জাতি ধর্ম্ম ছাড়িয়া।।"

এদিকে সে অঞ্চলের সমস্ত লোক বলিতে লাগিলঃ—

"পান ফুল দিয়া কন্যায় তুল্যা লও ঘরে।
সতী কন্যা হৈয়া কেন দাসীর কাজ করে।।"

বিপুল তর্ক-বিতর্ক উঠিল। বিনোদের কুৎসা গাহিয়া আত্মীয়-স্বজন আন্দোলন করিতে লাগিল। মলুয়ার কলঙ্ক লইয়া বিনোদের পরিবার সমাজে আরও নিন্দিত হইল।

আত্মদান

সেই দিন বড় ঝড় উঠিয়াছে। সূত্যা নদীর ঢেউগুলি আকাশে উঠিয়া যেন বাতাসের সঙ্গে লড়াই করিতেছে, নদীর সিকতা-ভূমিতে কুঁড়ে ঘরগুলি বাতাসে থর থর কাঁপিতেছে। গৃহস্থেরা ঘরের দরজা জোর করিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, রাস্তায় লোকজন নাই।

কে ওই সুন্দরী একাকী নদীর ঘাটে চলিয়াছে? সুন্দরীর সুকোমল অঙ্গ সর্ব্ব-ভূষণ যোগ্য কিন্তু তাহা ভূষণহীন। যে দেহ নীলাম্বরী বা অগ্নিপাটের শাড়ী পরিলে মানায়, জোলার খুঞা পরিয়া এরূপ ভীষণ ঝড়ের সময় সে একা কোথায় যাইতেছে, তাহার ঝড় বৃষ্টি জ্ঞান নাই, চোখের জল বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছে। সুন্দরী ভাবিতেছে—"এত করিয়াও সোয়ামীর মুখখানি বিধাতা দেখিতে দিলেন না। আমিই তাঁহার কলঙ্কের কারণ; যতদিন আমি বাঁচিব, ততদিন তাঁহার নিস্তার নাই। আমার দোষে সকলে তাঁহাকে দুষিবে? এ ছার জীবন—তাঁহার সামাজিক নিন্দা ও কলঙ্কের কারণ।"

সুন্দরী ঘাটে আসিয়া ভাঙ্গা মন-পবন কাঠের ডিঙ্গাখানি খুলিয়া লইল, তাহাতে উঠা মাত্র নৌকাখানি ঝড়ের বেগে তৃণের মত মাঝদরিয়ায় আসিয়া পড়িল। কখনও কখনও ঝড়ের অবকাশে আকাশে অস্তোন্মুখ রৌদ্রের রেখা ফুটিয়া উঠে, সেই স্বর্ণকিরণচ্ছটায় নিমজ্জমান দেবী প্রতিমার মত মলুয়ার কপালের সিন্দূর ও রূপসী মূর্ত্তি ক্ষণতরে উজ্জ্বল দেখাইতে লাগিল।

নৌকায় জল উঠিতেছে;—মলুয়া ভাবিল, "জল আরও উঠুক, আমি অতলে ডুবিব, আমার মুখ আর কেউ দেখিতে পাইবে না, স্বামীর নিন্দা আমার জীবনের সঙ্গে অবসান হউক;—আমি স্বামীর কলঙ্ক আর সহিতে পারিতেছি না।"

বিনোদের ভগিনী সেই বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে যেন ঝড়ের বেগে উড়িতে উড়িতে পাড়ে আসিয়া দাঁড়াইল। এদিকে মাঝ গাঙ্গে জল বেগে ভাঙ্গা নৌকার বাতা বহিয়া উঠিতেছে। বিনোদের ভগিনী চীৎকার করিয়া বলিতেছে—"বধূ, একি করিতেছ, তুমি ফিরিয়া এস, আমি তোমাকে আমার বাড়ীতে লইয়া যাইব,—তুমি যেও না।" মলুয়া বলিল—"ননদিনী ফিরিয়া যাও. তোমার মুখ দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে ঃ—

উঠুক উঠুক উঠুক পানি ডুবুক ভাঙ্গা নাও।
জন্মের মত মলুয়ারে একবার দেইখা যাও।।"

শাশুড়ী আলুথালুবাসে অসম্বৃত কেশে পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "বউ—ঘরে ফিরিয়া এস, তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী—আমার ভাঙ্গা ঘরের চাঁদের আলো, আমার সাঁজের বাতি, তোমায় না দেখিলে আমি একদিন এ বাড়ীতে তিষ্ঠিতে পারিব না।"

মলুয়া বলিল—

"উঠুক উঠুক উঠুক পানি ডুবুক ভাঙ্গা না।
বিদায় দাও মা জননী ধরি তোমার পা।"

অর্দ্ধেক নৌকা জলমগ্ন হইল, পাড়ে দাঁড়াইয়া শাশুড়ী কাঁদিতে লাগিলেন।

পাঁচ ভাই আসিয়া কত সাধিলেন। সেই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে সেখানে ভিড় জমিয়া গেল। মলুয়া করজোড়ে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতে করিতে ক্রমে ডুবিয়া যাইতে লাগিল এবং বিনয়ের সহিত শত অনুরোধের উত্তরে ঘাড় নাড়িতে লাগিল ঃ—

"উঠুক উঠুক উঠুক জল ডুবুক ভাঙ্গা নাও।
মলুয়ারে ফেলে তোমরা আপন ঘরে যাও।"

বিনোদ সেই দুর্যোগের মধ্যে পাগলের মত ছুটিয়া আসিল, সে চিৎকার করিয়া বলিল ঃ— "আমার মল্লু কোথায়?"

"দৌড়িয়া আইস্যা চাঁদ-বিনোদ নদীর পারে খাড়া।
এমন কইরা জলে ডুবে আমার নয়ন তারা!
চাঁদ-সুরুজ ডুবুক আমার সংসারে কাজ নাই।
জ্ঞাতি বন্ধু জনে আমি আর ত নাহি চাই।।
তুমি যদি ডুব মল্লু, আমায় সঙ্গে নেও।
একটিবার মুখ চাইয়া প্রাণের বেদন কও।।
ঘরে তুইল্যা লইব তোমায় সমাজে কাজ নাই।
জলে না ডুবিও কন্যা, ধর্ম্মের দোহাই।।"

স্বামীকে শেষ মুহূর্ত্তে পাইয়া আজ মলুয়ার মুখ ফুটিল। সে কহিল—"অনেক দিন গত হইয়াছে,—আর বাকী জীবনের জন্য সুখ চাই না। আর সংসারে থাকিয়া তোমাকে কষ্ট দিব না—

"আমি নারী থাক্‌তে তোমার কলঙ্ক না যাবে।
জ্ঞাতি বন্ধু জনে তোমায় সদাই ঘাটিবে।।
কলঙ্কী জীবন আমি ভাসাব সায়রে।
এখান হইতে সোয়ামী মোর চলে যাও ঘরে।।
ঘরে আছে সুন্দরী নারী তার মুখ চাইয়া।
সুখে কর গৃহবাস তাহারে লইয়া।।
উঠুক উঠুক উঠুক পানি ডুবুক ভাঙ্গা নাও।
অভাগীরে রাইখা তুমি আপন ঘরে যাও।।"

আর জ্ঞাতি বন্ধু! সামাজিক গুরুগণ সেই সূত্যা নদীর পাড়ে ভীড় জমাইয়া দাঁড়াইয়া মলুয়ার মৃত্যু-দৃশ্য দেখিতেছিলেন; মলুয়া তাঁহাদিগকে ডাকিয়া বলিল—"এত দোষের দোষী আমি—আমিও চিরদিনের জন্য আসি নাই—আমি চলিলাম—আমার স্বামীর কোন অপরাধ নাই, আপনারা তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন। আমার কপালে দুঃখ ছিল, আপনারা কি করিবেন? আমি চলিয়া গেলে আর খোঁটা দেওয়ার কিছু থাকিবে না। আপনারা আমার স্বামীকে কষ্ট দিবেন নাঃ—

"কোন দোষের দোষী নয় আমার সোয়ামী।"

মলুয়া সতীনকে বলিল—

"সুখে কর গৃহ বাস স্বামীকে লইয়া।
আজি হ'তে না দেখিবে মলুয়ার মুখ।
আমার দুঃখ পাশরিবে দেইখ্যা স্বামীর মুখ।।"

এই সময় পুবদিক হইতে মেঘ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। মলুয়া কোথায় চলিল?

"এই সাগরের পার নাই, ঘাটে নাই খেওয়া।
পুবেতে গর্জ্জিল দেওয়া ছুটল বিষম বা।
কইবা গেল সুন্দর কন্যা, মন-পবনের না।।"

আলোচনা

মলুয়া চন্দ্রাবতীর রচনা। চন্দ্রাবতীর জীবন-কথা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। ইনি সুপ্রসিদ্ধ মনসা-মঙ্গল-লেখক বংশী ভট্টাচার্য্যের কন্যা; নেত্রকোণা সব-ডিভিসনে পাতুয়ার গ্রামে ইঁহাদের বাড়ী ছিল। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রাবতী পিতার মনসা-মঙ্গল কাব্যের অনেকাংশ লিখিয়াছিলেন, সেই সকল রচনার মধ্যে কেনারামের পালাটি অতি করুণ ও কবিত্বময়। একখানি মলুয়া কাব্যের পুঁথিতে চন্দ্রাবতীর ভণিতাযুক্ত বন্দনার পদ পাওয়া গিয়াছে। তরুণ বয়সে জয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য নামক এক সুদর্শন তরুণ যুবককে ইনি ভালবাসিয়াছিলেন, এবং উভয়ের বিবাহের প্রস্তাব পাকা হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু জয়চন্দ্রের বিশ্বাসঘাতকতায় এই বিবাহ হইতে পারে নাই। চন্দ্রাবতী পিতার অনুরোধ সত্ত্বেও আর বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন না, আজীবন কুমারী রহিয়া গেলেন। জয়চন্দ্র শেষে অনুতপ্ত হইয়া ফুলেশ্বরী নদীতে প্রাণ ত্যাগ করেন। চন্দ্রাবতী তাঁহার এই দশা দেখিয়া প্রাণে যে আঘাত পান, তাহা সহ্য করিতে পারেন নাই। অচিরে তিনিও পরলোক গমন করিয়াছিলেন।

জয়চন্দ্র কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরে চন্দ্রাবতী পিতার আদেশে রামায়ণের বঙ্গানুবাদ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। পিতা তাঁহাকে ফুলেশ্বরী নদীর পাড়ে একটি শিবমন্দির গঠন করিয়া দেন। কুমারী-ব্রত গ্রহণ করিয়া তিনি দিন রাতের অনেক সময়েই সেইখানে শিবারাধনায় কাটাইতেন। চন্দ্রাবতীর চরিত কথা নয়ানচাঁদ ঘোষ নামক এক কবি অনুমান ২৫০ শত বৎসর পূর্ব্বে রচনা করেন।

এই কবি সত্যের সীমা লঙ্ঘন না করিয়াও চরিতখানি কবিত্ব-মণ্ডিত করিয়াছেন। আমরা তাহার বিস্তারিত কাহিনী অন্যত্র দিয়াছি। চন্দ্রাবতী রচিত অপরাপর কাব্যেও তিনি স্বয়ং আত্মকাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন—কিন্তু জয়চন্দ্রের ব্যাপার সম্বন্ধে নিজে কিছু বলেন নাই। তাঁহার রামায়ণখানি বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি বিশেষ সম্পদ। এখনও ময়মনসিংহ অঞ্চলের মেয়েরা কোন বিবাহোপলক্ষে সেই রামায়ণ গান করিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ মাইকেল মধুসূদন চন্দ্রাবতীর রামায়ণ হইতে তাঁহার সীতা-সরমার কথোপকথনের অংশটি গ্রহণ করিয়াছেন। এই রামায়ণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অসমাপ্ত অবস্থায় প্রকাশিত হইয়াছে। রামায়ণের ভূমিকায় চন্দ্রাবতী লিখিয়াছেনঃ—

"আমি নারী থাকিতে তোমার কলঙ্ক না যাবে
জ্ঞাতি-বন্ধুজনে তোমায় সদাই ঘাটিবে।"

(পৃষ্ঠা ২১৯)

"ধারা স্রোতে ফুলেশ্বরী নদী বহি যায়।
বসতি যাদবানন্দ করেন তথায়।।
ভট্টাচার্য্য বংশে জন্ম অঞ্জনা ঘরণী।
বাঁশের পাল্লায় তাল-পাতার ছাউনী।।
ঘট বসাইয়া সদা পূজে মনসায়।
কোপ করি সেই হেতু লক্ষ্মী ছাড়ি যায়।।
দ্বিজ বংশী বড় হৈল মনসার বরে।
ভাসান গাহিয়া যিনি বিখ্যাত সংসারে।।
ঘরে নাহি ধান তার চালে নাই ছানি।
আকর ভেদিয়া পড়ে উচ্ছিলার পানি।।
ভাসান গাহিয়া পিতা বেড়ান নগরে।
চাল কড়ি যাহা পান আনি দেন ঘরে।।
বাড়াতে দরিদ্র-জ্বালা কষ্টের কাহিনী।
তার ঘরে জন্ম নিলা চন্দ্রা অভাগিনী।।
সদাই মনসা-পদ পূজি ভক্তিভরে।
চাল কড়ি কিছু পাই মনসার বরে।।
সুলোচনা মাতা বন্দি দ্বিজ বংশী পিতা।
যার কাছে শুনিয়াছি পুরাণের কথা।।
মনসা-দেবীরে বন্দি জুড়ি দুই কর।
যাহার প্রসাদে হয় সর্ব্ব দুঃখ দূর।।
মায়ের চরণে মোর কোটি নমস্কার।
যাঁহার কারণে দেখি জগৎ সংসার।।
শিব-শিবা বন্দি গাই ফুলেশ্বরী নদী।
যার জলে তৃষ্ণা দূর করি নিরবধি।।
বিধি মতে প্রণাম করি সকলের পায়।
পিতার আদেশে চন্দ্রা রামায়ণ গায়।।"

এই আত্মবিবরণের সঙ্গে নয়ান চাঁদ ঘোষের বর্ণিত কাহিনীর সমস্ত কথারই ঐক্য আছে, চন্দ্রাবতী যে জয়চন্দ্রকে ভালবাসিয়া চিরকুমারী ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, সে কথার তিনি উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তিনি যে ভাগ্যহীনা এবং পিতার গলগ্রহ স্বরূপ ছিলেন, তাহার ইঙ্গিত তিনি দিয়াছেন। পিতার আদেশে যে সাংসারিক বিষয় হইতে মন ফিরাইয়া লইয়া রামায়ণ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

মলুয়া কাব্য পড়িয়া মনে হয়, চন্দ্রাবতীর আদর্শ ছিল বাল্মীকির সীতা। চন্দ্রাবতী সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তিনি বাল্মীকির কাব্যের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই। মলুয়া কাব্যের অনেক স্থলেই সীতাকে মনে পড়িবে। মলুয়া কাজির অশিষ্ট প্রস্তাবের যেরূপ তেজগর্ভ উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা সীতার প্রত্যুত্তরের মত, অথচ তিনি বাল্মীকিকে নকল করেন নাই। সীতা চরিত্রটি তিনি প্রাণের সমস্ত করুণ বেদনা ও দরদ দিয়া বুঝিয়াছিলেন, মলুয়া সীতার প্রতিবিম্ব নহে, দ্বিতীয় সীতা—সেইরূপই মৌলিক ও স্বাভাবিক—কিন্তু তাহা নকল নহে। সমস্ত বাঙ্গালী হিন্দু যাঁহার চরিত্র-গৌরব শত শত বৎসর যাবৎ হৃদয়ে আয়ত্ব করিয়াছিল, সেই সংস্কার-পুষ্ট ধারণা হইতে এই দ্বিতীয় সীতার আবির্ভাব। ইহাতে বাল্মীকির সীতার পবিত্রতা ও তেজ আছে, এবং বাঙ্গালার আবহাওয়ার কোমলতা ও সুকুমারত্ব আছে।

হিন্দুনারীর তেজ—বীর রমণীর যোগ্য। যে মলুয়া—কাজিকে গর্ব্বিত ভাবে অসম সাহসিকতার সহিত স্পর্দ্ধিত ভাষায় অগ্রাহ্য করিয়াছিল—সে মলুয়া সামাজিক অত্যাচারে একবারে নিস্তেজ—নিস্তরঙ্গ হইয়া গিয়াছিল, যাহার ক্ষুরধার বুদ্ধিতে শত ষড়যন্ত্র বিফল হইয়াছিল সে যখন সামাজিক অনুশাসনে পরিত্যক্ত হইল, তখন একটি কথা বলিতে সাহসী হইল না। রামায়ণের সীতা সামাজিক নিগ্রহে পরীক্ষা দিয়া সতীত্ব প্রমাণ করিতে চাহিলেন না, ঘৃণায় পাতাল পুরীতে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু মলুয়া সমাজের নিতান্ত অন্যায় অনুশাসন মানিয়া লইলেন, একটিবার প্রতিবাদ করিলন না—না করিবার কারণ,—যে প্রতিবাদ স্বামীর করা কর্ত্তব্য ছিল, তাহা তিনি করেন নাই—বরং দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়া সামাজিক শাসনের অনুমোদন করিয়াছিলেন। এই অপমান ও দুঃখে মলুয়ার সমস্ত প্রতিবাদ কণ্ঠে আসিয়া ফিরিয়া গেল। তিনি কি বলিবেন, যিনি বলিবার তিনি স্ত্রীর সমস্ত অপমান গলাধঃকরণ করিলেন। মলুয়ার সমস্ত তেজস্বিতা ও দর্প ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গেল।

তিনি জানিতেন, দুঃখ সহিবার জন্যই তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, সুতরাং তিনি দুঃখকে ভয় করেন নাই। শেষে জলে ডুবিয়া মরিলেন, এই কাজ তিনি কষ্টে অসহিষ্ণু হইয়া করেন নাই।

স্বামীর প্রতি অনুরাগই তাঁহার সমস্ত কার্য্যের অনুপ্রাণনা দিয়াছিল। নিজের সমস্ত অলঙ্কার-পত্র বেচিয়া খাইয়াও তিনি স্বামীর ভিটা আঁকড়াইয়া ছিলেন। তারপরে যখন সমাজ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হন, তখনও স্বামীর গৃহে কিছু ধরিতে ছুঁইতে না পারিয়া শুধু তাঁহার মুখখানি দেখিবার লোভে সেই ভিটায় বাহিরের পরিচারিকা হইয়াছিলেন,—ইহার মধ্যে কতবার পিতৃগৃহে তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য ভ্রাতারা আসিল, কিন্তু তিনি তাহাদের সমস্ত স্নিগ্ধ আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া চূড়ান্ত কষ্টকে বরণ করিয়া লইলেন। স্বামীপ্রাণতার এই দৃষ্টান্ত সাহিত্যে বিরল। বিনোদ দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের পর তিনি সতীনকে যে আদর দেখাইয়াছিলেন—তাহা নিতান্ত অকৃত্রিম। যখন তাহার নিকট চির-বিদায় লইলেন, তখন তাহাকে বলিলেন, "তুমি আমার জন্য দুঃখ করিও না, আমাকে মনে পড়িয়া দুঃখ হইলে স্বামীর মুখ দেখিয়া ভুলিও।" তিনি অকপটে সতীনকে ভালবাসিয়াছিলেন এবং নিজে সরলভাবে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, সতীনও তাঁহাকে ভালবাসে। তাঁহার অকপট ভালবাসা এই বিশ্বাসের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং তিনি বুঝিয়াছিলেন সতীন তাঁহাকে সত্যই ভালবাসেন এবং তাঁহার মৃত্যুতে ব্যথিত হইবেন।

সেই শেষদিনকার চরম দুর্দ্দিনে যখন আকাশে মেঘ ও ঝঞ্ঝা, নিম্নে সুত্যানদীর উত্তাল তরঙ্গ, তখন ভাঙ্গা মন-পবনের ডিঙ্গায় এই অপরূপ রমণী ধীরে ধীরে জলে ডুবিতেছেন। যাঁহারা দেবী বিসর্জ্জনের দৃশ্য দেখিয়াছেন, অস্তচূড়াবলম্বী শেষ রৌদ্রের রেখায় ঝলমল প্রতিমার মাথার ডুবন্ত মুকুট দেখিয়াছেন, তিনি এই মলুয়ার শেষ-দৃশ্যের কারুণ্য এবং ভীষণ মৃত্যুর এই সুন্দর পরিণাম উপলব্ধি করিতে পারিবেন। চন্দ্রাবতী নিজে চিরদুঃখিনী ছিলেন, তিনি নিজের দুঃখ দিয়া এই দুঃখিনী মলুয়াকে গড়িয়াছিলেন, তাই মলুয়া চরিত্র এত জীবন্ত হইয়াছে।

এই গল্পটিতে যে "নজর মরিচার" কথা আছে, ইউরোপেও সেইরূপ প্রথা বিদ্যমান ছিল। মধ্য-যুগে প্রাদশিক শাসনকর্ত্তারাও তাঁহাদের অধীনস্থ প্রজাদের নিকট হইতে বিবাহ উপলক্ষে এইরূপ কর আদায় করিতেন। শুভরাত্রে কন্যার উপর অধিকার শাসনকর্ত্তার থাকিত, অভিভাবকগণ ট্যাক্স দিয়া কন্যাটির মুক্তির ব্যবস্থা করিতেন। এই ট্যাক্সের নাম ছিল "Droit de Seiginiur" (Frezer's *Folklore in the Testament* দেখুন)। তান্ত্রিক বঙ্গীয় গুরুরা (সহজিয়া) নিম্নশ্রেণীর মধ্যে "গুরু প্রসাদী" নাম দিয়া এই জঘন্য অধিকারের দাবী করিতেন।

আঁধা বঁধু

অন্ধ যুবক রাজ—দ্বারে

ভোরের আকাশে খয়ের রংএর মেঘ, মাঝে মাঝে তার সিন্দুরের ছড়া।

অন্ধ যুবক বাঁশীটি হাতে নদীর পারে দাঁড়াইয়া আছে। সম্মুখের প্রান্তরে ডালিম ফুলের লাল কলি ফুটিয়া আছে।

যুবক দাঁড়াইয়া বাঁশী বাজাইতেছে—সেই সুরে নদীর পাড় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, ঢেউগুলি চলিতে চলিতে যেন কানাকানি করিয়া কথা বলিতেছে।

অন্ধ কেবলই বাঁশী বাজাইতেছে—সেই সুরে ভাটিয়াল নদী উজান বহিতেছে।

অন্ধ নিজের বাঁশীর সুরে নিজে মত্ত, সে ভাবিতেছেঃ—

"ভোর বিয়ানে ডালিম কলি ফুট্যা ডাল ভরা।
কেমন জানি আসমান জমিন কেমন যেন তারা।।
কেমন জানি সোনার দেশ সোনার মানুষ আছে।"
কাঞ্চন পুরুষ কেন ভিক্ষা লইতে আইছে।।

এমন সুন্দর পুরুষ, রূপের তরঙ্গ যেন শরীর বাহিয়া অবনীতে লুটাইতেছে।

"দেখিতে সুন্দর রূপ রে শ্যাম শুক পাখী।
কোন পামর বিধাতা রে করিল অন্ধ দুটি আঁখি।।"

বাঁশী শুনিয়া মুগ্ধ, রূপ দেখিয়া বিস্মিত নগরের লোকেরা তাহার সম্বন্ধে কত কি বলাবলি

এই অন্ধ বাঁশী-বাদকের কথা রাজকুমারীর কানে গেল।

রাজকুমারী বিস্মিত হইয়া অন্ধ ভিখারীকে দেখিতে লাগিলেন, উজ্জ্বল চন্দ্রিকার মত তার রূপ। কি মিষ্ট সে বাঁশীর সুর—ইচ্ছা হয়, সর্ব্বস্ব দিয়া নিজেকে তাহার পদে বিকাইয়া দিতে।

কুমারী বলিলেনঃ—

"সোনার কপাট রূপার খিল গো বাপের ভাণ্ডার।
বাপের আগে কয়ে লো সই খুলে দেও দুয়ার।।"

কিন্তু অন্ধ বলিলঃ—

"ধূলা মাণিক একই কথা, দূতি লো তাতে কিবা আছে।
আগে জান কিবা দিলে অন্ধের দুঃখ ঘোচে।।"

রাজকুমারীর চোখ হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল, তিনি বলিলেন,

শুন শুন ওলো সই কই যে তোমারে।
আমার দুইটি নয়ন তুল্যা দিয়া আস তারে।।
রসিক জন কয় দিলে কি হ'বে নয়ন।
অন্ধের দুঃখ ঘুচে কন্যা যদি দিতে পার মন।।

রাজা ঘুম থেকে উঠিয়া সেই বংশী ধ্বনি শুনিলেন, যে সুরে চরাচর মুগ্ধ—সেই সুর শুনিয়া রাজা পাগল হইলেন।

সংবাদ-দাতাকে বলিলেন,

"খবরিয়া, জানিয়া আইস আগে।
কোন্ বা জনে বাজায় বাঁশী নবীন অনুরাগে।।"

খবরিয়া সংবাদ আনিল—"এমন সুন্দর তরুণ মূর্ত্তি—কার্ত্তিকের মত! কিন্তু অন্ধ, ভিক্ষা করিয়া খায়।"

রাজা তাহাকে ডাকাইয়া আনিলেন, বলিলেন, "তুমি কে? তোমার পিতামাতা কে? তুমি ভিক্ষা করিয়া খাও কেন?"

অন্ধ বলিল, "আমি এমনই দুর্ভাগা, জন্মিয়া মা বাপের মুখ দেখি নাই।"

"বিধাতায় কি দোষ দিব? কপালের দোষ আমার।
দিবা রজনী আমার কাছে সমান অন্ধকার।।"

করুণায় আর্দ্র কণ্ঠে রাজা বলিলেন, "আজ হইতে আমি তোমার মা-বাপ হইলাম। ভিক্ষার ঝুলি ছাড়িয়া তুমি আমার পুরীতে আইস।"

ভরা ভাণ্ডারের ধন দুয়ার থাক্‌বে খোলা।
গলায় পরিবে তুমি মাণিক্যের মালা।।
অঙ্গেতে পরিবা তুমি রাজার ভূষণ।
সর্ব্বাঙ্গে গাঁথিয়া দিব রত্নাদি কাঞ্চন।।

"আমার দুইটি কথা তোমাকে পালন করিতে হইবে। অতি ঊষাকালে যখন রাজবাড়ীর টিয়া, বউ-কথা-কও এবং পাপিয়া জাগে নাই—যখন চৌকিদারও শেষ-রাত্রির হাঁক দেয় নাই, তখন তুমি বাঁশী বাজাইয়া আমার ঘুম ভাঙ্গাইবে।

"ঘুম থেকে উঠে যেন বাঁশীর গান শুনি।
মধুভরা এমন বাঁশী জনমে না জানি।।"

"আর একটি কথা,—রাজকুমারীকে তোমার ঐ মধুভরা বাঁশী বাজাইতে শিখাইতে হইবে।

"শুন শুন সুন্দর পান্থ কহি যে তোমারে।
আজ হইতে কর বাস এই না রাজপুরে।।
ভিক্ষার ঝুলি ছাড় তুমি ঘরে বসি খাও।
আজ হৈতে হলাম আমি তোমার বাপ মা।।
মন্দিরে থাকিবে তুমি উত্তম বিছানে।
ঘুম থেকে জাগিব আমি তোমার বাঁশী শুনে।।
এক কন্যা আছে আমার পরাণের পরাণ।
তাহারে শিখাবে তুমি ওই না বাঁশীর গান।।
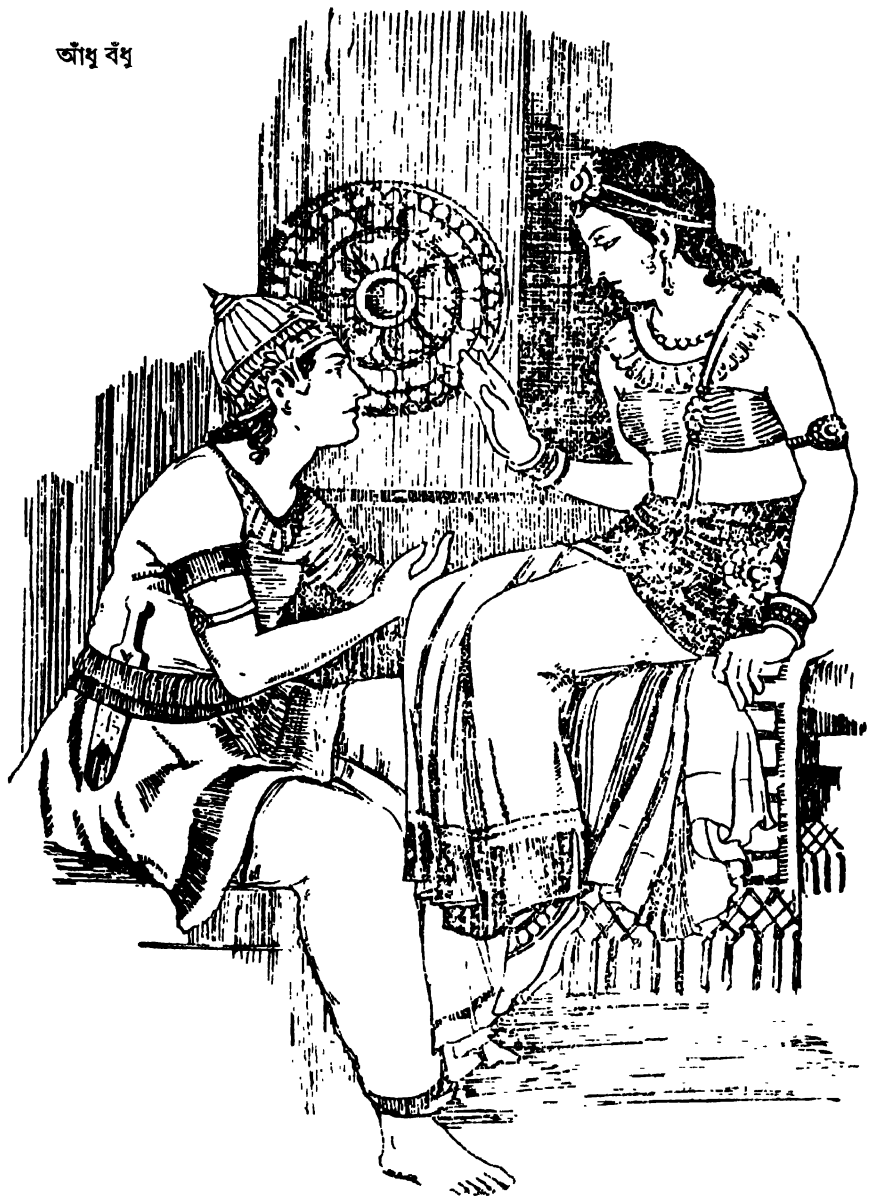
পালঙ্কে বসিয়া কন্যা চিন্তে মায়ের কথা।
এমন সময় কুমার গিয়া উপজিল তথা।।'

(পৃষ্ঠা ২৩১)

এই দুই কাজ তোমার আর কিছু না চাই।
সকল সুখ পাবে হেথা—কেবল চক্ষু দুটি নাই।।"

অন্ধ কুমারীকে বলিতেছে—"আমার কথা বারংবার কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? নদীর গর্জ্জন শুনি, কিন্তু তাহা দেখি না, আঁধারে তাহা আমার সম্মুখে বহিয়া যাইতেছে। আলো কিরূপ, কোন্ আকাশের পথে ফোটে তা জানি না। ফুলের গন্ধে আমোদিত হই, কিন্তু নিস্তব্ধ বায়ুতে ফুলের কলি কেমন করিয়া ফোটে, তাহা জানি না।"

"শব্দে শুনি তরু লতা না দেখি নয়নে।
বিধাতা করিল অন্ধ এই দুঃখী জনে।।
মানুষ যেন কেমন কন্যা, হাসি মুখের কথা।
শব্দে শুনি দেখি নাই, মনে রইল ব্যথা।।
তরু লতা পুষ্প আমার সামনে আছে খাড়া।
মাথার উপরে ফুটিয়াছে চাঁদ সুরুজ তারা।।
সবার উপর আছ তুমি অন্তরে সে পাই।
ধেয়ানেতে আছ কন্যা অন্তরেতে পাই।।"

রাজকুমারী তাহার দুঃখে বিগলিত হইয়া বলিলেন—"তোমার কোন্ দেশে জন্ম, তোমার পিতামাতা কে?

যে দেশে জনম তোমার সে দেশের লোকে।
কি নাম রাখিল তোমার, কি বলিয়া ডাকে।।"

অন্ধ বলিল, "আমার নাম নাই, পাগল বলিয়া সবাই ডাকে। বাঁশীর সুরের মত কোন্ বন, কোন্ স্থান হইতে আমি ভাসিয়া আসিয়াছি তাহা জানি না—কেহ আমায় আদর করিয়া ডাকে, তাদের কাছে থাকিতে বলে, কেহ বা দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়। কেহ ভালবাসে, কেহ গালি দেয়;আমি চোখের জলে ভাসিয়া সকলের দুয়ারে দাঁড়াই। কাহাকেও দোষ দেই না।

"পাগল আমার ডাক-নাম পাগল আমার বাঁশী।
অজানা পথে গাই গান হইয়া উদাসী।।"

রাজকুমারী অশ্রুসিক্ত চোখে অন্ধের দুঃখে বিগলিত হইয়া বলিলেন—

"বাঁশী বাজাও আঁধা বঁধু শিখাও আমায় গান।
আজ হৈতে পিয়া বঁধু পরাণের পরাণ।।
আজি হৈতে তোমায় বঁধু ছাড়িয়া না দিব।
নয়নের কাজল করি নয়ানে রাখিব।।
সে কাজল দেখিয়া যদি লোকে করে দোষী।
হিয়ায় লুকায়ে বঁধু শুনব তোমার বাঁশী।।
হিয়ায় লুকানো বঁধু লোকে যদি জানে।
পরাণ কোটরা ভরি রাখিব যতনে।।
বসন করি অঙ্গে পরব, মালা করি গলে।
সিন্দূরে মিশায়ে তোমা মাখিব কপালে।।
চন্দনে মিশায়ে তোমায় কর্‌ব দেহ শীতল।
সুখে দুঃখে কর্‌ব তোমায় দুনয়নের কাজল।।
দুই অঙ্গ ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হইব।।
বলুক বলুক লোকে মন্দ তাহা না শুনিব।।"

"তুমি অন্ধ, কিন্তু জগৎ তোমার কাছে অন্ধকার থাকিবে নাঃ—

"আমার নয়নে বঁধু দেখিবে সংসার।
এমন হ'লে ঘুচবে তোমার দুই আঁখির আঁধার।।
তোমার বুক লইয়া আমি শুন্‌ব তোমার বাঁশী।
মরণে জনমে বঁধু হইলাম দাসী।।"

অন্ধ এই কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল, বলিল, "এ সকল কথা তুমি কি বলিতেছ? তুমি রাজকন্যা, রাজ্যেশ্বরের সঙ্গে তোমার বিবাহ হইবে, তুমি পাটেশ্বরী হইবে। শত দাসী তোমার পদসেবা করিবে,—তোমার সুখের পথে আমি কাঁটা হৈয়া উপস্থিত হইয়াছি, আজই আমি এই গৃহ ছাড়িয়া যাইব। আমি অন্ধ, আমার জন্য বনে কাঁটার শয্যা, আমার আহার বন্য কষায় ফল, এই দুর্ভাগ্যের জন্য তুমি জীবনটা নষ্ট করিবে, দুর্জ্জনের চিন্তা মনে স্থান দিও না,

যদি আমার কথা না শুনঃ—

"বিদায় দেও রাজ-কন্যা আপন দেশে যাই।
রাজপুরীর সুখে আমার কোন কাজ নাই।।"

রাজকুমারী বলিলেন—"মা আমাকে বাঁশী শিখিতে মানা করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এই মানায় আমার মনের আকর্ষণ দ্বিগুণ বাড়িয়াছে।

"কিসের রাজত্বি সুখ তাতে কিবা হবে।
মনের ফরমাইস বল কেবা জোগাইবে।।
বঁধুরে আরে বঁধু—যে দিন শুনেছি তোমার বাঁশী।
কুল গেছে মান গেছে হয়েছি তোমার দাসী।।
তোমায় ছাড়িয়া না দিব।
নয়নের কাজল কৈরা বন্ধু নয়নে পরিব।।
তোমারে ছাড়িয়া বঁধু সুখ নাহি চাই।
যোগিনী সাজিয়া চল কাননেতে যাই।।
চন্দন মাখিয়া কেশে বানাইব জটা।
সংসারের সুখে বন্ধু দিয়ে যাব কাঁটা।।
বাপ রইল মা রইল সকল ছাড়িয়া যাই।
বনেতে বসতি করি বনের ফল খাই।।
বনের না পুষ্প তুলি গাঁথিব হে মালা।
ফুলের মধু আনি তোমায় খাওয়াব তিন বেলা।।
পাতার শয্যায় বঁধু পাতি দিব বুক।
না জানি ইহাতে বঁধু পাইবে কিনা সুখ।।
এতেক ছাড়িয়া বঁধু যদি চলি যাও তুমি।
আগেতে বধিয়া যাও অবলার পরাণি।।"

অন্ধ এই কথা শুনিয়া কি করিয়া এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবে, হতবুদ্ধি হইয়া তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল এবং বলিল—"তুমি কাঁটার পথে আসিয়াছ, এ পথ বড় দুর্গম,

এ পথ মরীচিকা,—সুখের আশা দিয়া ভীষণ কষ্টের দিকে লইয়া যায়—তুমি এই সকল দুঃখের পথ ছাড়, নিজেকে বিপদে ফেলিও না। এ পথ দুরূহ, এ পথ নানা বিঘ্ন ও দুঃখসঙ্কুল—

"শব্দে শুনি চণ্ডীদাস পীরিতি করিল।
ঘুঁটের আগুনে যেন দহিয়া মরিল।।
নীলমণি পীরিতি করি রাজা হৈল ত্যাগী।
যারা যারা পীরিতি করে কেবল দুঃখের ভাগী।।"

রাজকুমারীর বিবাহ

বাঁশী আর বাজে না। কন্যা বড় হইয়াছে, রাজা তাহাকে সেই সাধের বাগানে যাইতে মানা করিয়া দিয়াছেন। ফাল্গুন মাসে বাগান ভরিয়া ফুলের কলি হইল। চৈত্র মাসে কলিগুলি ফুটিয়া সুবাস ছড়াইল। বৈশাখ আসিল, বৃক্ষ হইতে পুরাতন পাতা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, অতি দারুণ গ্রীষ্মে কোকিলের কণ্ঠের স্বর থামিয়া গেল। বাঁশী আর বাজে না। নূতন বৎসর আসিয়াছে। সাগর-মন্থনের পর যে বিষ উঠিয়াছিল, রাজকুমারীর মন সেইরূপ বিষে ভরিয়া গেল। বৈশাখের ফোটা ফুলের গন্ধে বাগান ভরপুর, ভ্রমরেরা গুঞ্জন করিতে করিতে বাগানের দিকে ছুটিতেছে। রাজকুমারী সেই ভ্রমরের মত লুব্ধ চিত্তে বাগানের দিকে চাহিয়া থাকেন, কিন্তু রাজার মানা বাহিরে যাইতে পারেন না।

তারপর একদিন ঘটক আসিল। ঢোল, দগড় বাজিতে লাগিল, নটেরা নাচিতে লাগিল। সেই বাদ্যের উচ্চ কলরবের মধ্যে,—নাচ-গানের প্রমোদ-উৎসবের মধ্যে রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া এক প্রিয়দর্শন রাজকুমার ভিন্ন দেশে ভিন্ন রাজপুরীতে লইয়া গেলেন।

খেলার ঘর ভাঙ্গিয়া পড়িল, এত সাধের গাঁথা মালা বাসি হইল। রাজকুমারীর মুখের সেই পাগল-করা হাসি, যাহার চম্পক-উজ্জ্বল রূপে সকলকে মুগ্ধ করিত, সেই হাসির দিন ফুরাইল। দিনে দিনে চাঁচর সুন্দর কেশ পাটের আঁসের মত হইল, কে আর বেণী বাঁধে, কে আর গন্ধ-তৈল ও ধূপের ধোঁয়ায় তাহা সুবাসিত করে? নৃত্যগীত-বাদ্যধ্বনির মধ্যে নিস্তব্ধ একখানি পাষাণ-প্রতিমাকে যেন স্বর্ণ-চৌদোলায় করিয়া বিসর্জ্জনের জন্য লইয়া গেল।

অন্ধের গৃহত্যাগ

রাজকুমারী চলিয়া গিয়াছেন, অন্ধের বাঁশীর সুর থামিয়া গিয়াছে;পাগল বাঁশীর গান আর শোনা যায় না,—ভাটিয়াল নদী আর উজান বহে না, রাজবাড়ীর পিঞ্জরের পাখীরা শেষরাত্রে আর প্রত্যূষের পূর্ব্বে কলরব করিয়া উঠে না, গান শুনিয়া আর লোকের মিষ্ট আবেশে ঘুম ভাঙ্গে না।

অন্ধ যুবক রাজাকে যাইয়া বলিল, "মহারাজ! আমাকে বিদায় দিন্, আমি অন্যত্র যাইব।"

রাজা বলিলেন, "সে কি কথা! তোমার কোন অভাব-অভিযোগ থাকে আমাকে বল, আমি এখনই তাহা পূরণ করিব।

"আমি ভাবিয়াছি, পরমাসুন্দরী এক কন্যার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিব। আমাদের পদ্ম-দীঘির মাঝখানটায় একটা জলটুঙ্গী ঘর নির্ম্মাণ করিয়া দিব, সেখানে বহু দাস-দাসী তোমার সেবা করিবে।

"এক দুঃখ অন্ধ নয়ান দিতে না পারিব।"

"রাণী তোমাকে কত ভালবাসেন, আমি তোমাকে পিতৃতুল্য স্নেহ করি, তুমি কিসের দুঃখে এই রাজ্য ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছ!"

অন্ধ বলিল, "মহারাজ! আমি আপনার ও রাণীমার স্নেহের কথা বলিতে পারি না। আমার চক্ষু নাই, এই অবস্থায় সকল দুঃখের মধ্যে আমার প্রধান দুঃখ এই যে আমি আমার পিতৃমাতৃ-তুল্য স্নেহশীল ও পরম উপকারী আপনাদের দুইজনের মুখ দেখিতে পাইলাম না। আমার বাঁশী আমার শত্রু, কোন স্থানে বেশী দিন থাকিতে দেয় না, এ আমার অদৃষ্টের দোষ, কি করিব! যখন বাঁশী ফুকারিয়া কি এক অজানা বেদনায় কাঁদিয়া উঠে, তখন সেই সুর জোর করিয়া আমায় ঘরের বাহির করে।"

"বাঁশী আমার জীবন মরণ বাঁশী আমার প্রাণ।
মরণ-জীয়ন, ধরম-করম ঐ না বাঁশীর গান।।
আমি কি করিব আর তুমি কি করিবে।
কপালেতে সুখ নাই কিসে তাহা দিবে।।

চন্দন নহে ত রাজা বাটিয়া দিবে ভালে।
অঙ্গের বসন নয় ত রাজা-জড়িয়া দিবে শ্বালে।।
যার কপালে সুখ নাই রাজা কোথা সুখ পায়।
মূল ঘরে যার পালা নাই,[১] রাজা কি করে ঠিকায়[২]।।
রাজা বিদায় দেও মোরে।।"

অপর রাজ্যে

আবার বিজন অন্তহীন পথে সে রাজ্য হইতে দূর দূরান্তরে অন্ধের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। সেই বাঁশী শুনিয়া মানুষ, পশু পক্ষী পাগল হইল—

"বনে কাঁদে পশু পাখী সে বাঁশী শুনিয়া।
কোন অভাগীর ভাবের পাগল দিয়াছে ছাড়িয়া।।
পরাণ ডোরে পাগলে কেহ না রাখে বাঁধিয়া।
কেউ বলে বাঁশীরে আমায় সঙ্গে লৈয়া যা।।"

কর্ম্ম-ব্যস্ত, কর্ম্ম-ক্লান্ত জগৎ যেন সেই বাঁশীর সুরে কোন নূতন জগতের আভাস পাইল—সে রাজ্যে ব্যস্ততা নাই, সময়ের নির্দ্দেশ নাই, কোলাহল নাই, কর্ম্ম নাই, সেখানে অবসরের শেষ নাই, শ্রোতার ঔৎসুক্যের বিরাম নাই,—না জানি, বাঁশীর সেই দেশ কোথায়। যাহারা সেই সুর শুনিল, তাহারা ইহ-জগতের সমস্ত চিন্তা, শোক-দুঃখ, সুখ-আশা-ভরসা এবং সমস্ত কার্য্যতৎপরতা ভুলিয়া গিয়া সেই অজানা দেশের মায়ায় পড়িয়া গেল।

"বাজিতে বাজিতে বাঁশী রাজ্য ছাড়াইল।
দূরের রাজার দেশে কাঁদিয়া উঠিল।।"

১ পালা নাই = থাম নাই, পূর্ব্ববঙ্গে বাঁশের খুটিকে "পালা" বলে।
২ ঠিকা = ঝড়ের বেগ রোধ করিবার জন্য কুটিরের বাহির হইতে আল্গা 'বাঁশের ঠেকা' দেওয়া হয়, ঠেকাইয়া রাখার জন্য, ইহাকে 'ঠিকা' বা 'ঠেকা' বলে।

এক ভিন্ন দেশের রাজার মুলুক; বাঁশীর স্বর শুনিয়া সে নগরের লোকের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, গাছের পাতায় ফুলের কলি ঘুমাইয়া ছিল, বাঁশী তাহাদের ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিল, ফুলের বুকে ভ্রমর ঘুমাইতেছিল, বাঁশীর সুর সেই ভ্রমরের ঘুম ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

রাজকুমারী একটি ফুলের হারের মত রাজার বুকে শুইয়াছিলেন, তিনি সেই সুর শুনিয়া কি যেন হারানো স্বপ্নের ধন কুড়াইয়া পাইলেন। নগরের প্রান্তে নদীর পাড় ও পর্ব্বত একটা নিস্তব্ধমূর্ত্তির মত ঘুমে নিঝুম হইয়াছিল—এবার তাহাদেরও ঘুম ভাঙ্গিবার মত একটা আবেশ দেখা দিল। কেবল নদীটি জাগ্রত ছিল—সারাদিন সারারাত্রি তাহার ঘুম নাই, আর ঘুম নাই বিরহিনীদের, ইহারা গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছিল, কে তাহাদের কান্না শোনে?

এই দেশে অতি প্রত্যূষে বাঁশী বাজিয়া উঠিল। কোকিল আধ-ঘুমে সাড়া দিয়া উঠিল, ফুলের কলির বুকে ভ্রমর, ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি সেই বাঁশীর সুরে জাগিয়া কি খুঁজিতে লাগিল, এ কি বনের বাঁশী না মনের বাঁশী?

বিদেশী পথিকের বাঁশী কি সুরে বাজিয়া উঠিল, সেই সুরের সঙ্গে আকাশের গায়ে কে যেন কামনা সিন্দূর মাখিয়া দিল।

অদ্ভুত প্রতিশ্রুতি

রাজকুমারী কি ভাবিতেছেন? দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে—তিনি মনে মনে বলিতেছেন, ও সুর চিনেছি, সেই সুর যাহা নদীর স্রোতের মত টানিয়া আমাকে আমাদের সেই যুথি-জাতি-বেলা-কুন্দের বাগানে লইয়া যাইত। এ সুর পৃথিবীতে আর কেহ জানে না, এ বাঁশী আর কাহারও নয়। বাঁশী আমাকে আবার ডাকিতেছে, সেই ডাকে আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে; এ ছোটকালের শোনা বাঁশী, আমার সর্ব্বকাল ব্যাপিয়া ইহার প্রভাব রহিয়া গিয়াছে। সেই ফুলবনে বসিয়া সে বাঁশী বাজাইত, আমার সমস্ত হৃদয় সেই সুরে আবিষ্ট হইত, সে আবেশ এখনও তেমনিই আছে।

"বনের বাঁশী নয় ত ইহা মনের বাঁশী হয়।
ছোট কালের যত কথা জাগা'য়া তোলয়।।"

এই বাঁশী শুনিয়া বাগানে ফুলের কলি ফুটিত।

"এই বাঁশী শুনিয়া ফুটত কুসুমের কলি।
বঁধু মোরে শিখাইত মিঠা মিঠা বুলি।।
বাঁশী আমার জীবন যৌবন বাঁশী আমার প্রাণ।
বাঁশীর রবে মন-যমুনা বহিত উজান।।"

"আমার সে জন্ম গিয়াছে, এখানে নূতন জন্ম হইয়াছে।

"এক জনম গেছে মোর আর এক জনম হয়।
জন্মে জন্মে তোমার দাসী হইয়াছি নিশ্চয়।।
ভুলি নাই ভুলি নাই বঁধু তোমার চাঁদমুখ।
বনে গিয়া দেখাইব চিরিয়া এ বুক।।
ভুলি নাই ভুলি নাই বঁধু তোমার বাঁশীর ধ্বনি।
পরতে পরতে বুকে আঁকা আছ তুমি।।
কি করিব রাজ-ভোগে সুখ সুবিস্তরে।
বনের পাখী ভইরা রাখছে সোনার পিঞ্জরে।।"

"আমি উড়ি উড়ি করিয়া এতদিন ছিলাম, বিষ খাইয়া মরি নাই, মরিলে তো তোমার মুখ আর দেখিতে পাইব না—এইজন্য বাঁচিয়া আছি।"

রাজকুমারী নীরবে কাঁদিতেছিলেন। তরুণ রাজা ভাবিলেন রাণী ঘুমাইয়া আছেন, তিনি ডাকিয়া বলিলেন, "ওঠ—বাঁশী শোন, কে এমন মন-ভোলানো বাঁশী বাজাইতেছে, উঠিয়া দেখ। তোমার চোখের ঘুম না ভাঙ্গিয়া থাকিলে আমার অঙ্গে ভর দিয়া ওঠ। ঐ দেখ ফুলের কলি ফুটিতেছে, তোমার গলার ফুলের মালা বাসি হইয়া গেছে, ফেলিয়া দাও।"

রাজা এক পরিচারিকাকে বলিলেন, "জানিয়া আইস, বাঁশী যে বাজাইতেছে সে কি চায়?"

খানিক পরে দূতি ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "কার্ত্তিকের মত এক সুন্দর পুরুষ বাঁশী বাজাইতেছে, এমন বাঁশীর গান কখনও শুনি নাই, সে অন্ধ, কিন্তু ভাবের আবেশে বাঁশী

বাজাইয়া পথে চলিতেছে। নগরের লোক উন্মত্ত হইয়া তাহার পিছু পিছু ছুটিতেছে, পাখীগুলি কলরব করিয়া তাহার গানের সঙ্গে সুর মিশাইতেছে, পশুরা গানে আকৃষ্ট হইয়া বন ছাড়িয়া আসিতেছে, কি আশ্চর্য্য, বাঁশীর সুরে, নদী নালা উজান বহিতেছে। মনে হয় বাঁশী থামিলে চন্দ্র সুর্য্য আকাশ হইতে খসিয়া পড়িবে।"

রাজা তাঁহার রাণীকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিলেন, "কেমন ঘুমে তোমাকে ধরিয়াছে, ঐ পথে সুন্দর ভিক্ষুক বাঁশী বাজাইয়া চলিতেছে, একবারটী ওকে দেখ, এবং আমি উহাকে কি দিব, বলিয়া দাও।"

তখন রাজকন্যার চোখে মুখে অশ্রুর প্লাবন, তিনি মুখ ফিরাইয়া তাহা গোপন করিয়া বলিলেন,—সে কথা অতি ধীরে গদগদকণ্ঠে উচ্চারিত হইল—"তুমি রাজা, ভিখারীকে কি দিবে না দিবে তাহা আমায় জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন, তুমি রাজ্যের রাজা, দাসীর কাছে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই দাও।"

রাজা বলিলেন, "আমি সঙ্কল্প করিলাম, তুমি যাহা বলিবে তাহাই দিব।"

রাজকন্যা ম্লান মুখে বলিলেন, "একি কোন কাজের কথা! আমি যদি বলি, তুমি উহাকে তোমার রাজত্বটা দাও, তুমি তাহাই দিবে?"

রাজা বলিলেন, "হাঁ তাহাই দিব, প্রতিজ্ঞা করিলাম, তুমি যাহা বলিবে উহাকে তাহাই দিব।"

ম্লান মুখে ঈষৎ হাসি টানিয়া রাজকন্যা বলিলেন, "কি পাগলের মত কথা বলিতেছ! আমি যদি বলি, তোমার সমস্ত ধন ভাণ্ডার, নাগরিয়া লোকদিগের ধন সম্পত্তি, ও তোমার রাজৈশ্বর্য্য—সমস্ত ঐ অন্ধ ভিখারীকে দাও, তবে তাহাই দিবে?"

রাজা বলিলেন, "হাঁ তাহাই দিব, তুমি যাহা বলিবে তাহাই দিব।"

—"তবে তিন সত্য কর, শেষে কথা ফিরাইতে পারিবে না।"

"সত্য কর ওহে রাজা সত্য কর তুমি।
রাজা কহে "তিন সত্য" করিলাম আমি।।"

তখন ধীরে ধীরে রাজকন্যা পালঙ্কের উপর উঠিয়া বসিলেন, তাঁহার অশ্রুসিক্ত মুখখানি স্বীয় অগ্নিপাটের শাড়ীর আঁচলে মুছিয়া ধীর অবিচলিত কণ্ঠে বলিলেনঃ—

নয়ন মুছিয়া কন্যা ক'হে "যদি নহে আন
ধর্ম্মসাক্ষী ওহে রাজা আমায় কর দান,
রাজা, আমায় কর দান।।"

উভয়ের মিলন ও শেষ

বন প্রদেশে নদী উজান বহিয়া চলিয়াছে, তীরে চাঁপা ফুল ফুটিয়া আছে—সেই নদীর পাড় দিয়া বাঁশী রহিয়া রহিয়া বাজিয়া চলিয়াছে—সেই সুরে গৃহস্থ-বধূরা তাহাদের কাজে মন দিতে পারিতেছে না। উন্মনা হইয়া নদীর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

এদিকে কে এক রমণী নূপুর শিঞ্জনে বনের পথ গুঞ্জরিত করিয়া চলিয়াছে, তাহার মাথার সোণার ভ্রমরকে বাতাসে উল্টাইয়া ফেলিতেছে।

"বেণী ভাঙ্গা কেশ তার চরণে লুটায়।"

বেণী খুলিয়া গিয়াছে, দীঘল চুল খোঁপা-মুক্ত হইয়া বিলম্বিত ভঙ্গীতে পায়ের কাছে আছাড় খাইয়া লুটাইতেছে।

তাহার পায়ের নূপুর রুণু ঝুনু ধ্বনি করিয়া পিপাসিত মনে বহুদিনের স্মৃতি জাগাইয়া তুলিতেছে।

অন্ধ থমকিয়া দাঁড়াইল। সে বলিল, "ঐ নূপুরের শব্দ আমার চিরদিনের শোনা। স্বপ্নে এই ধ্বনি শুনিয়া কত রাত্রির ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এ তো সেই নূপুর, যাহা আমি পুষ্পবনে শুনিতাম এবং পাগল হইয়া বাঁশী বাজাইতাম। তখন স্বপ্নের মত কোন আনন্দ-লোকের কথা শুনাইয়া এই নূপুর বাজিতে থাকিত। তুমি কি সেই রাজ-কন্যা, আমার ত ভুল হইবার কথা নহে, এ সুর যে আমার হৃদয়ে হৃদয়ে গাঁথা।"

কন্যা বলিলেন, "বঁধু, তোমার ভুল হয় নাই আমি সেই। তোমার বাঁশীর সুর আমাকে পাগল করিয়াছে, আমি কুল-মান, রাজ্য-ধন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি।"

"ঘর ছাড়লাম বাড়ী ছাড়লাম জাতি-কুল-মান।
আর বার বাজাও বাঁশী শুনি তোমার গান।।"

আঁধা বঁধু

"বেণী ভাঙ্গা কেশ তার চরণে লুটায়........"

(পৃষ্ঠা ২৪০)

অন্ধ চমকিয়া মুখের বাঁশী হাতে লইল, বলিল, "অল্পবুদ্ধি রাজকন্যা, একি করিয়াছ? এখনও ভোরের কোকিল ডাকে নাই, নগরের লোক জাগে নাই—রাজ বাড়ীতে ফিরিয়া যাও, সোনার থালায় ভাত খাইবে, এই সোনার অদৃষ্ট ভাঙ্গিয়া ফেলিও না। তোমার নীলাম্বরী মেঘ-ডম্বরু শাড়ী বাড়ীতে ঝুলানো রহিয়াছে, বাকল কি এই অঙ্গে সাজে? আমার কড়ার সম্বল নাই, আমার সাথে কোথায় যাইবে? তোমার বাপ মা কি বলিবেন। ঘরে ফিরিয়া যাও, এমন করিয়া নিজের সুখ-সৌভাগ্য কে কবে নষ্ট করিয়াছে!"

রাজকন্যা বলিলেন,—"যে দিন আমি ঐ বাঁশী শুনিয়াছি, সেই দিন হইতে রাজ্য-ধনের আশা চলিয়া গিয়াছে, আমার কাছে এ সকলের কোন মূল্য নাই।

তুমি আছ, বাঁশী আছে, আর কিছু নাহি চাই।
তোমার সঙ্গে থাকি বঁধু যত সুখ পাই।।
বনেতে বনের ফল সুখেতে ভুঞ্জিব।
গাছের বাকল অঙ্গে টানিয়া পরিব।।
রজনীতে বৃক্ষতলে তোমায় বুকে লৈয়া।
ঘুমাইব বঁধু আমি ঐ বাঁশী শুনিয়া।।
জাগিয়া শুনিব বঁধু ঐ না তোমার বাঁশী।
কিসের রাজ্য কিসের সুখ, হয়েছি উদাসী।।"

আঁধা বঁধু আবার বলিল—"তুমি অবোধ, তুমি নিজেকে ভাঁড়াইতেছ মাত্র। যাহা সুখ মনে করিয়াছ, তাহা কয়েক দিন পরেই বিভীষিকা হইয়া দাঁড়াইবে। সোনার পালঙ্কে যাহার শুইয়া অভ্যাস, সে কেমন করিয়া কুশ কণ্টকের শয্যায় ঘুমাইতে পারিবে? সোনার থালায় যার খাওয়া অভ্যাস, বনের তিক্ত ফল কেমন করিয়া তাহার গলায় যাইবে। কটু তিক্ত বনের ফল খাইয়া শেষে কাঁদিয়া মরিবে। তোমার সোনার ঘর, দোহাই তোমার, নিজ হাতে আগুন লইয়া তাহা পোড়াইয়া ফেলিও না। এখনও সময় আছে, তুমি নিজের ঘরে ফিরিয়া যাও।"

রাজকন্যা বলিলেন—"কি করিব? তোমার বাঁশী আমায় ঘরে থাকিতে দেয় না, উহা আমাকে টানিয়া আনিয়া ঘরের বাহির করে।"

সত্য কথা প্রাণ কহি যে তোমারে
তোমার দারুণ বাঁশী আমায় থাকতে না দেয় ঘরে।।"

অন্ধ একবার চুপ করিয়া দাঁড়াইল। তাহার পদ্মের কলির মত দুইটি মুদ্রিত চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহার পর বাঁশীটি ছুঁড়িয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিল।

"শুন অল্পবুদ্ধি কন্যা কহি যে তোমারে।
বিসর্জ্জন দিলাম বাঁশী তুমি যাও ঘরে।।
আর না বাজিবে বাঁশী—কাঁদিবে না হিয়া।
ঐ দেখ যায় বাঁশী জলেতে ভাসিয়া।।"

কন্যা বলিলেন—

"বাশী নাই তুমি তো আছ আমার হৃদের রতন।
আমারে না লও সাথে লইয়া যাও মন।।
বঁধু যত সে বুঝায়।
আমার মনেরে বুঝান হৈল বড় দায়।।
সদয় যদি না হওরে বঁধু নিদয় যদি হও।
ত্যজিব এ ছার প্রাণ দাঁড়াইয়া রও।।"

অন্ধ বলিল, "অল্পবুদ্ধি রাজকন্যা, তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও। যদি না যাও, তুমি দাঁড়াইয়া দেখ, আমি এই ছার প্রাণ আর রাখিব না, বাঁশী গিয়াছে যে পথে, সেই পথে আমিও যাইব।"

"এইখানে দাঁড়াইয়া দেখ নদীতে কত পানি।
নিজ চোখে দেখি নিভাও জ্বলন্ত আগুনি।।
এতেক বলিয়া অন্ধ ঝাঁপি জলে পড়ে।
কন্যা বলে "পরাণ বন্ধু" লৈয়া যাও মোরে।।"

নদীতে জোয়ারের জল, শাপলা ফুল ভাসিয়া যাইতেছিল, তাহাদের সঙ্গে দুইজন ভাসিতে ভাসিতে সমুদ্রের দিকে চলিল।

তাহারা উভয়ে সমুদ্রের তলে স্থান পাইল, যেখানে মুক্তা হয়, যেখানে প্রবাল জন্মে—সেই সমুদ্রে,—যাহার নাম রত্নাকর।

"ভাসিতে ভাসিতে দোঁহে গেল সমুদ্দার।
কাল গরল বাঁশী না বাজিবে আর।।"

আলোচনা

এই গানটির ফরাসী ভাষায় অনুবাদ খুব সমাদর লাভ করিয়াছে। গানটি পার্ব্বত্য হাজাং জাতীর মধ্যে প্রচলিত ছিল। তাহাদের অনেকে নিম্নউপত্যকার হিন্দুসমাজের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন এবং গানটির আদত ভাষা কতকটা রূপান্তরিত করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় পরিণত করিয়া লইয়াছেন। সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে এই মন্তব্য ও তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন।

গানটি যেভাবে আমরা পাইতেছি, তাহাতে মনে হয়, ইহা চণ্ডীদাসের কিছু পরবর্ত্তী কিন্তু খুব পরবর্ত্তী নহে, তাহার প্রমাণ ভাষায়। ইহার মধ্যে যে সকল কথা ও কবিতার অংশ দৃষ্ট হয়—তাহা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রচলিত ছিল। "যেই বৃক্ষের তলায় যাইব ছায়া পাইবার দায়। সেই বৃক্ষ না আগুনে বর্ষে অন্তর পুইরা যায়।" এই পদটি প্রায় এই ভাবেই চণ্ডীদাসের একটি পদে পাইয়াছি। তাহা তিনশত বৎসর পূর্ব্বের লিখিত পদাবলীর একটি পাণ্ডুলিপিতে। "আজি হৈতে তোমায় বঁধু ছাড়িয়া না দিব, নয়নের কাজল ক'রে নয়ানে থুইব।" ইত্যাদি পদও সেই চতুর্দ্দশ পঞ্চদশ শতাব্দীর সন্ধিস্থলের পরিচিত সুর। "যোগিনী সাজিয়া চল কাননেতে যাই। চন্দন মাখিয়া কেশে বানাইব জটা।" ইত্যাদি পদ চণ্ডীদাসের, "আমি যোগিনী সাজিব" প্রভৃতি পদের প্রতিধ্বনির মত শুনায়।

এইরূপ অনেক শব্দ ও পদের অংশ আছে—তাহা চৈতন্য-পূর্ব্ব সাহিত্যের আগমনী গানের মত মনে হয়। যে সর্ব্বস্ব-দেওয়া প্রেম এই গল্পের মূল মন্ত্র, তাহা আসন্ন চৈতন্যদেবের পদের মঞ্জীর শব্দের ন্যায় কানে বাজে। প্রেম চাহিলে যে কণ্টককে বরণ করিতে হয়—তাহা

বারংবার বলা হইয়াছে। সুখ খুঁজিলে যে দুঃখকে বরণ করা অপরিহার্য্য তাহা এই কবি চণ্ডীদাসের মতই জোর করিয়া বলিয়াছেন। তথাপি মনে হয়, চণ্ডীদাসের গানে যে আধ্যাত্মিকতা আছে—স্বর্গের সন্ধান আছে—আঁধা বন্ধুর কবি তাহা দিতে পারেন নাই—চণ্ডীদাস প্রেমকেই বড় করিয়া দেখাইয়াছেন, এই কবি ত্যাগকে বড় করিয়া দেখাইয়াছেন। চণ্ডীদাস বুঝিয়াছিলেন, দুঃখের আঁধার কাটিয়া গেলে প্রেম-সিদ্ধির সৌর-লোক দেখা দিবে। আঁধা বঁধুর কবি দেখাইয়াছেন ত্যাগের কষ্টই মানুষের লক্ষ্য—তাহার পরে কিছু নাই। বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন, "আঁধার পেরিলে আলো" আঁধার রাজ্য পার হইলে আলো পাইবে, কিন্তু আঁধা বঁধুর কবি কোন আলোর সন্ধান নাই; চণ্ডীদাস বলিয়াছেন,

> "ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছয়ে যে জন, কেহ না দেখয় তারে।
> প্রেমের আরতি যে জন জানয়ে, সেই সে চিনিতে পারে।।"

এইটুকু আঁধা বঁধুতে নাই। এই জন্য বৈষ্ণব কবিদের সমস্ত উপাদানে সমৃদ্ধ হইয়া—বাঁশীর সুরের মোহিনী এমন ললিত সুন্দর কবিতায় লিখিয়াও পল্লী-গীতিকার কবি বৈষ্ণব মহাজনের পংক্তিতে স্থান পান নাই।

কিন্তু প্রেমের যে ত্যাগমূলক মহিমা তিনি কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা অধ্যাত্মবাদীর চোখে পূর্ণ চিত্র বলিয়া গৃহীত না হইলেও উহা বাস্তব-বাদীদের চরম আদর্শে পৌছিয়াছে; যাঁহারা মনে করেন—বৈষ্ণব পদ প্রহেলিকাময়, উহা সাম্প্রদায়িক, জটিল তথ্যের মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে, তাঁহারা আঁধা বঁধুর সরল পার্থিব পথ সুগম ও সহজ পন্থা বলিয়া আদর করিবেন—এই পথ স্বর্গে পৌছিবার ভরসা দেয় না; প্রেমের আনন্দও এখানে উন্নত ত্যাগের মহিমায় দুঃখকে বরণ করিয়া লইয়াছে। দুঃখের পরে সুখ—একথা ইহারা বলে নাই। এই গানে সাধনা আছে, সিদ্ধি নাই। এখানে পথ অবারিত—অবাধ, কিন্তু শুধুই পথ—পথের পরপারে কিছু নাই। আঁধা বঁধু বলিতেছে "রাজকুমারী! প্রেম করিয়া কেহ সুখী হয় নাই—এপথে কেবলই দুঃখ"। উভয়ে যখন নদীর জলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন, তখন জীবনান্তে দুঃখের অন্ত হইল; কিন্তু সমুদ্রের সেই অনির্দ্দিষ্ট পথে তাঁহারা অকূলে জীবন হারাইলেন, চণ্ডীদাসের মত বলিতে পারিলেন না, এই পথের শেষে পান্থ বাঞ্ছিতকে পাইবেন—"আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে, ভিতর দুয়ার খোলা!" সেই ভিতরের খোলা দ্বার দিয়া যে

অলৌকিক আলোর রশ্মি দেখা যায়,—যেখানে "সতী কি অসতী, তোমাতে বিদিত, ভালমন্দ নাহি জানি," তোমার চরণ পদ্মই আমার কাম্য—সেখানে পৌঁছিলেই আমার পরম শান্তি। আঁধা বঁধুর সেই কাম্য স্থান নাই। ভালবাসাই এখানে সব, সে ভালবাসা সর্ব্বস্ব-দেওয়া, তাহা দুর্দ্দমনীয়, তাহার বেগ এত প্রবল যে রাজ্যধনকুলশীল তাহার কাছে নগণ্য। অবশ্য বৈষ্ণব কবির সুরও একই রূপ। কিন্তু বৈষ্ণব কবি প্রেমাস্পদকে সর্ব্বস্ব নিবেদন করিয়া পূর্ণানন্দের পরিকল্পনা করিয়াছে, পালাগানের কবি ত্যাগ করিয়াছে—সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু আনন্দলোকে পৌঁছায় নাই।

কাজলরেখা, কাঞ্চনমালা, শ্যামরায়, আঁধা বঁধু, মহিষাল বঁধু প্রভৃতি কতকগুলি পল্লীকবিতায় বৈষ্ণব কবিতার কতকগুলি গ্রাম পাওয়া যায়, তাহা সিদ্ধির পাদপীঠে যাইয়া পৌঁছায় নাই, তপস্যার চূড়ান্ত দেখাইয়াছে। এইজন্য বৈষ্ণবগণ আসিয়া বঙ্গ সাহিত্যে এক অভিনব সামগ্রী দেখাইল—যাহাতে পল্লীগীতিকার মাদল ও করতাল নীরব হইল, এবং দেশময় কীর্ত্তনের খোল বাজিয়া উঠিল। চৈতন্য-ভগবান লীলারস দিয়া এই প্রেম জীবন্ত করিয়া দেখাইলেন। রাজ-প্রাসাদ ও পর্ণ-কুটির প্রেমের তপস্যা করিয়া বৃহত্তর স্থান খুঁজিতেছিল, সেই অচিন্তিতপূর্ব্ব ভাগবত রসের রসিক মহাপ্রভু—বাঙ্গালী জাতিকে সেই তপঃ লব্ধ প্রেমের অব্যাহত আনন্দ-লোকে লইয়া আসিলেন।

শিলা দেবী

দরবারে মুণ্ডা ভিক্ষুক

বামুন রাজা দরবারে বসিয়াছেন, এমন সময় এক জংলী মুণ্ডা আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। সে বলিল, "আমার কোন পরিচয় নাই, আমার পিতা কে, কোন মায়ের পেটে আমি জন্মিয়াছিলাম তাহা জানি না। শুনিয়াছি কোন এক ব্যক্তি আমাকে কয়েকটা কড়া মূল্য স্বরূপ লইয়া এক গৃহস্থের নিকট বিক্রয় করিয়াছিল, মহারাজ তখন আমি তরুণ যুবক, সেই প্রভু আমার উপরে যে কত অত্যাচার করিতেন, তাহা আর কি বলিব। সহিতে না পারিয়া আমি জঙ্গলে পলাইয়া গিয়াছিলাম। দশ বৎসর বনে বনে ঘুরিয়াছি, ক্ষুধায় খাদ্য পাই নাই, তৃষ্ণায় জল পাই নাই, গাছের তলে একটু শুইবার স্থান পাই নাই। কত বৃষ্টির জল আমার মাথার উপর দিয়া গিয়াছে, গ্রীষ্মকালের প্রখর রৌদ্রে আমার মাথা দগ্ধ হইয়াছে, আমি জংলী লোক, এত কষ্ট সহিয়া এখন আর দেহে কষ্ট-বোধ নাই।

"মহারাজ! আপনি রাজ্যের মালিক, আমি দীন দুঃখী ভিখারী, আপনার একটু দয়া হইলে এই নিরাশ্রয়ের সমস্ত কষ্ট দূর হয়—আপনি কৃপা করিয়া শ্রীচরণে স্থান দিন।"

মাথায় জল তৈল না পড়াতে, চুলগুলি কটা পিঙ্গলা হইয়াছে, চোখের দৃষ্টিতে পরম দৈন্য প্রকাশ পাইতেছে, তাহাকে দেখিয়া বামুন রাজার দয়া হইল। তিনি বলিলেন, "বেশ, তুমি থাক—আমি তোমাকে চাষাবাদ করিতে জমি দিব, বাড়ী দিব, তুমি আর খাওয়ার থাকার কষ্ট পাইবে না।"

"লোহার শাবল মোর হাত রে দুই খান
এ মোর বুকের পাটা পাথর সমান।"

(পৃষ্ঠা ২৫১)

মুণ্ডা বলিল—"আমি জায়গা জমি চাই না, এই রাজবাড়ীর একটুখানি জায়গায় পড়িয়া থাকিব। কোন চোর-দস্যু এই বাড়ীতে ঢুকিতে পারিবে না, আমি সারারাত্রি পাহারা দিব।

"মহারাজ আমার এই দুইখানি হাত লোহার সাবলের মত, সাবলের ঘায়ও এই হাতের হাড় ভাঙ্গিবে না।" ছেঁড়া মলিন বহির্বাসটি খুলিয়া মুণ্ডা তাহার বিশাল বক্ষ দেখাইল, "আমার বুক পাষাণের প্রাচীর, ইহার চাপে পড়িলে বনের বাঘের শ্বাস রোধ হইয়া যায়। যখন মত্ত হাতী জঙ্গলে ছুটিয়া যায়, তখন আমি শুঁড় ধরিয়া তাহাকে থামাইয়া দেই। আমি রাজ-বাড়ী পাহারা দিব, একশ লোক যাহা না পারিবে, আমি একলা তাহা করিব।"

রাজা সেই জংলী মুণ্ডার উন্মুক্ত দেহ দেখিয়া বিস্মিত এবং ভীত হইলেন, এরূপ শরীর তাঁহার শত সহস্র সৈনিক ও পালওয়ানদের মধ্যে কাহারও নাই, তাহাকে দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, এই লোকটা অস্ত্রহীন হইয়াও সশস্ত্র, বন্দুকের গুলি ইহার চামড়া ভেদ করিতে পারিবে না,—এতো মানুষের চামড়া নহে, এ যে গণ্ডারের চর্ম্ম। রাজ বাড়ীতে এই অতিকায় অসুরকে রাখিতে তাঁহার মন একটু কুণ্ঠিত হইল। তিনি বলিলেন, "বেশ, আমার কালাদীঘির পাড়ে যে বাড়ী আছে তুমি সেইখানে যাইয়া থাক, আমার ১২০০ শত কোটাল আছে, তোমাকে তাহাদের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পদ প্রদান করিলাম। তুমি রাজ বাড়ী হইতে রোজ চাল দাইলের সিদা পাইবে, আনন্দে রসুই করিয়া খাইও এবং বালাখানা বাড়ীতে দীঘির হাওয়া খাইয়া সুখে শয়ন করিও।"

"বার শত কোটাল আমার করছে খবরদারী।
তা সবার উপরে তুমি করবে ঠাকুরালী।।"

মুণ্ডার কোটালী পদ

মুণ্ডা এই আদেশে অত্যন্ত খুসী হইয়া গেল।

"এই কথা শুনিয়া মুণ্ডা হরিষ অন্তরে।
হাজার সেলাম জানায় রাজার দরবারে।।"

রাজকুমারীর যৌবন

রাজার একটি মাত্র কন্যা, তাহার বয়স ১০।১১, রাজাদের ঘরেও অমন সুন্দরী সহজে দেখা যায় না। যখন বসিয়া থাকে, তখন তাহার লম্বিত কেশপাশ মৃত্তিকা স্পর্শ করে। সে হাসিলে যেন কত পদ্ম কত চাঁপা হাসিতে থাকে, দাঁতগুলি কি সুন্দর, যেন ডালিমের দানা। পাঁচটি সহচরীর সঙ্গে সে খেলিয়া বেড়ায়।

ক্রমে কিশোরীর যৌবনাগম হইল। এই সময়টি নারী-দেহে কেমন করিয়া আসে তাহা সে নিজেই টের পায় না, অকস্মাৎ অনভ্যস্ত লজ্জায় তাহার মুক্ত অঙ্গ শিহরিয়া উঠে, ভ্রমরগুঞ্জনে প্রাণ উতলা হয়, কোকিলের ডাকে কি জানি কোন দেশের কথা মনে হয়।

একদিন কুমারী শিলা সখীদের বলিল, "আমার যদি গায়ে কোন সময় কাপড়ে ঢাকা না থাকে, তবে আমারে বলিয়া দিও, আমি শাড়ী টানিয়া তাহা ঘিরিয়া রাখিব। যদি চুল বাঁধা না থাকে, তবে বলিয়া দিও, এলো চুলে থাকিতে আমার লজ্জা হয়।"

সখীরা বলে, "এ সকল কথা, এভাবের কথা, তুমি আগে তো বল নাই, তোমার কি হইয়াছে? এই অকস্মাৎ লজ্জা এই সম্ভ্রমের ভাব তোমার কেন হইল।"

শিলা হাসিয়া বলিল, "তা তো আমি জানি না, তবে যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি আমার চারিদিকটা যেন আবার ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িতেছেন। পুরাতন সকল জিনিষের উপর দরদ চলিয়া যাইতেছে, মন কেন যে উতলা হইয়া থাকে তাহা জানি না। খেলার ঘরে আর যাইতে ইচ্ছা হয় না, মনে হয় মাটীর পুতুল, মাটীর রান্না-বাড়ীর পাত্র, ডেগ কড়াই এ সকল লইয়া কি ছেলেমি করিতেছি! চিরদিন যাহা করিয়া আসিতেছি তাহা এখন করিতে লজ্জা হয়।"

নিরালায় সখীরা বলিল, " তোমার মনের মধুকর আসিতেছে, এ সকল তাহারই সূচনা। আমাদের দেওয়া শাড়ী আর তোমার পছন্দ হইবে না, সে নূতন শাড়ী আনিয়া দিবে, আমাদের হাতের বেণী বাঁধা আর ভাল লাগিবে না, সে সোণার চিরুণী দিয়া তোমার চুল আঁচড়াইয়া নিজ হাতে নূতন ছন্দে খোপা বাঁধিয়া দিবে। হয়ত কানের এই মতির দুল খুলিয়া সে তাহার নিজ হাতের তৈরী বন-ফুলের দুল কানে পরিয়া দিবে, এই কাজল মুছিয়া নূতন কাজল চোখে আঁকিয়া দিবে। তোমার তখন সংসার ভাল লাগিবে, আমাদের আর দরকার হইবে না।"

কুমারী শিলা, বালিকার মত খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল, "কি সকল কথা বলিতেছিস, আমি তাহার এক বর্ণও বুঝিলাম না। যেন কোন বই পড়িয়া শুনাইতেছিস্, আমি তাহার অর্থ একটুও বুঝিলাম না।"

সখীরা বলিল, "বুঝিবে সকলই বুঝিবে, আমাদিগকে তাহা বুঝাইতে হইবে না, নিজেই সব বুঝিবে, কিছু কাল সবুর কর। রাজা চারদিকে ঘটক পাঠাইয়াছেন, তোমার মন-মধুকর শীঘ্র আসিয়া মনের সকল প্রশ্নের উত্তর দিবে।"

মুণ্ডার অদ্ভুত প্রার্থনা

এক দিন দুই দিন করিয়া সময় পায়ে পায়ে হাঁটে। দেখিতে দেখিতে পাঁচ ছয় বৎসর কাটিয়া গেল। একদিন দরবারে আসিয়া মুণ্ডা বলিল, "মহারাজ আমাকে বিদায় দিন, আমি ত্রিপুরা সহরে যাইব। আমি এই পাঁচ ছয় বৎসর আপনার রাজধানীতে প্রাণপণে খাটিয়াছি, আমার প্রাপ্য চুকাইয়া দিন।"

রাজা বলিলেন, "চল তোমাকে লইয়া আমার ধনাগারে যাই, তোমার সঙ্গে কোন বেতনের চুক্তি হয় নাই। কিন্তু তোমার তাহাতে কোন ক্ষতির কারণ হইবে না। তুমি যাহা চাও, তাহাই দিব, তোমার কোন ক্ষোভের কারণ না হয়—তজ্জন্য আমি দায়ী আছি।"

মুণ্ডা বলিল, "আমি বেতন চাহি না। আমি যাহা চাই, স্থির ভাবে তাহা শুনুন, অস্থির হইবেন না। আমি যে ধন চাই, তাহার কাছে অন্য ধন তুচ্ছ। মহারাজ, আপনার এক কুমারী কন্যা আছে, এই কয়েক বৎসর তাহারই আশায় এত খাটুনি খাটিয়াছি, আপনি সেই কন্যাটিকে আমায় দিন্—আমার আর কোন দাবী দাওয়া নাই,—

"একথা শুনিয়া রাজা জ্বলন্ত আগুনি যে হৈল,
যতেক কোটালে মুণ্ডারে বাঁধিতে বলিল।।
কেউ বা মারে কিল চাপড় দুহাতিয়া বাড়ী।
কেউ বা কহে দুষমনেরে আগুন দিয়া পুড়ি।।
দেউরীখানা ঘরে সবে লহে ত টানিয়া।
কেউ বলে রাজকন্যায় আয় দিব বিয়া।।

জল্লাদ আইল ধাইয়া শির লইবারে।
ভয় না পাইল মুণ্ডা ডর নাহি করে।।
রাত্রি নিশাকালে মুণ্ডা শিকল ভাঙ্গিয়া।
গেল তো জংলী মুণ্ডা জঙ্গলে পলাইয়া।।"

মুণ্ডার ষড়যন্ত্র

ক্রমে তিনটি বছর চলিয়া গেল, মুণ্ডার আর কোন খোঁজ নাই। তিন বৎসর পর এক রাত্রে নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে তাহাকে রাত্রিকালে দেখা গেল। শত শত জংলীরা বসিয়া রসুই করিয়া আহারের আয়োজন করিতেছে। মুণ্ডা তাহাদিগকে বলিতেছে—"এমন করিয়া তোরা কতদিন ক্ষুধার জ্বালায় ঘুরিয়া মরিবি? আমি একটা পরামর্শ দিতেছি, তোরা যদি তাহা করিস, তবে এক দিনের চেষ্টায় সংবৎসরের খাদ্য তোদের জুটিয়া যাইবে!—চল যাই, আমরা বামুন-রাজার বাড়ী লুঠ করিয়া আসি।

"ধন দৌলতের রাজার নাই সীমা পরিসীমা।
এক দিনের চেষ্টায় মিল্‌বে বচ্ছরের দানা।।"

একে ত জংলী লোকেরা ক্ষুধার জ্বালায় অসম সাহসিকতার কাজ করিতে স্বভাবতই প্রস্তুত, ধনের লোভে তাহারা পাগল হইয়া উঠিল। সেই রাত্রেই তারা বামুন রাজার বাড়ীর দিকে রওনা হইল।

তাহারা কাটারী, কাঁচি, অস্ত্র-শস্ত্র, বোচকায় বাঁধিয়া লইল—

"বাছিয়া লইল তারা তীর ধনুকখানি।
লুকাইয়া লইল পাছে হয় জানাজানি।।"

পথে সকলকে বলিল তাহারা মজুরের কাজ করিতে চলিয়াছে। কেহ যদি তাহাদিগকে কোন কাজ করিতে বলে উত্তরে,—

"মুণ্ডা বলে এই দেশে কাম করা দায়।
এই দেশের মানুষ যত বেগার খাটায়।।

কাম করাইয়া দেখ পয়সা নাহি মিলে।
এই দেশ ছাড়িয়া যাইব বামুন রাজার দেশে।।"

বামুন রাজার রাজধানীতে মজুরেরা এদিক সেদিক কাজ করিয়া বেড়ায়, মুণ্ডা সেদিকে যায় না,—সে দূরে লুকাইয়া থাকে। একদিন দুপ্রহর রাত্রে তাহারা সকলে তীর ধনুক লইয়া রাজবাড়ী আক্রমণ করিল। প্রহরীরা নিদ্রাভঙ্গের পর শশব্যস্ত হইয়া অস্ত্র-শস্ত্র, হাতিয়ার আনিতে যাইতেছিল, কিন্তু পথে জংলীদের বাণ খাইয়া মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া রহিল। মুণ্ডা রাজবাড়ীর অন্ধি সন্ধি পথ সকলই জানিত, সে সুবিধা বুঝিয়া পুরীতে আগুন লাগাইয়া দিল। আগুন নিভাইবার জন্য প্রহরীরা তাড়াতাড়ি সেইদিকে ছুটিল, ইহার মধ্যে মুণ্ডা ও তাহার জংলীদল রাজার ধনভাণ্ডারে ঢুকিয়া ধনরত্ন লুটিতে আরম্ভ করিল। তারপরে ঘোর চীৎকার করিতে করিতে তাহারা রাজ অন্তঃপুরীতে প্রবেশ করিল। কিন্তু তাহারা যাইয়া দেখিল, রাজা, রাণী, শিলা ও অন্তঃপুরিকারা খিড়কীর পথ দিয়া রাজপুরী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ—রাজার পলায়ন ও দেশাধিপের গৃহে আতিথ্য

অতি দীনবেশে ব্রাহ্মণ-রাজা সপরিবারে পরগণার রাজার বাড়ীতে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং সাশ্রুনেত্রে তাঁহার কাছে নিজের দুর্গতি বর্ণনা করিলেন, "মুণ্ডা এবং তাহার জংলীদল আমার বাড়ী ও রাজধানী দখল করিয়াছে, আমার দাঁড়াইবার স্থান নাই।"

পরগণার অধিপতি তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহার একটা বাড়ী বামুন রাজাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং মুণ্ডাকে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন, এই আশ্বাস দিয়া সম্মানিত অতিথিকে প্রতীক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন।

ছয় মাসকাল বামুন-রাজা অতিথি হইয়া পরগণাধিপের রাজধানীতে বাস করিলেন।

কুমারী শিলা দেবী অতি প্রত্যুষে উঠিয়া রাজ-বাগানে ফুল তুলিতে যান। সে দেশের রাজার পুত্র তরুণ বয়স্ক ও অতি সুদর্শন। রোজ তিনি শিলাকে ফুল তুলিতে দেখেন,— অনেক লজ্জা সংবরণ করিয়া তিনি এক দিন কুমারীকে তাঁহার মনের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন, "যদি তুমি দয়া করিয়া আমার ঘরে একবার পায়ের ধূলি দাও, তবে তোমাকে কয়েকটি কথা বলিব;—

"না ধরিব না ছুঁইব এই যাই গো কহিয়া।
কেবল দেখিব রূপ দূরেতে দাঁড়াইয়া।।"

"তুমি নিত্য নিত্য ফুল তোল, কার পূজার জন্য এই ফুল? তুমি অবিবাহিতা কুমারী—তুমি কি বর প্রার্থনা করিয়া পূজা কর? তুমি যদি সম্মতিসূচক ইঙ্গিত দাও, তবে রাজার আদেশ লইয়া আমি তোমাকে বিবাহ করিতে চাই।"

শিলা সজল চক্ষে বলিলেন—"রাজকুমার তোমার ঐশ্বর্য্যের অন্ত নাই। আমরা দরিদ্র, দীন-দুঃখী।"

"সোনার রাজত্বি তোমার—লক্ষ্মী বাঁধা ঘরে।
কি লাগি করিবে বিয়া ভিক্ষুক কন্যারে।।"

রাজকুমার বলিলেন,

"লোকে বলে পুরুষ জাতি কঠিন অন্তরা।
আমি বলি নারীর মন পাষাণ দিয়া গড়া।।"

শিলাদেবী বলিলেন—"আমার এত বড় আশা করিবার সাহস নাই।"

"চিত্তে ক্ষমা দিয়া কুমার শুন মন দিয়া।
মা বাপে সুন্দরী কন্যা করাইবে বিয়া।।"

কুমার বলিলেন, "যার মন যাহা চায়, তাহা না পাইলে, আর হাজার জিনিষ পাইলেও সে নিরস্ত হয় না।

"ধন দৌলত রাজত্ব তোমার দুই পায়ের ধূলি।
তোমার দুয়ারে খাড়া আছি হস্তে ভিক্ষার ঝুলি।।"

যদি তুমি আমাকে বঞ্চিত কর, তবে আমি সব ছাড়িয়া বনে চলিয়া যাইব।"

চোখের জল আঁচলে মুছিয়া শিলাদেবী বলিলেন, "এই ছয় মাস আমার পিতা যে কষ্টে আছেন, তাহা আর কি বলিব?

"চোখে নাইরে ঘুম এই ছয় মাস যায়।
কাঁদিয়া আমার বাপ রজনী পোহায়।।"

শিলা দেবী

"না কহিব না ছুঁইব এই যাই যে কহিয়া।
কেবল দেখিব রূপ দুরেতে দাঁড়াইয়া।।"

(পৃষ্ঠা ২৫৬)

"তারপর তোমার সঙ্গে মিলনের এক গুরুতর বাধা আছে।

"বাপে তো কৈরাছে পণ, কুমার, রাজ্য হারাইয়া।
যে জন আনিতে পারে মুণ্ডারে বাঁধিয়া।।
তাহার কাছেতে বাপে কন্যা দিবে বিয়া।
হাড়ি, চণ্ডাল নাই সে বিচার দুষমনের লাগিয়া।।"

পরদিন শিলা শুনিলেন সেই মুণ্ডাকে বান্ধিয়া আনিবার জন্য কুমার পিতার অনুমতি পাইয়াছেন। সঙ্গে শত শত লস্কর ও ফৌজ চলিয়াছে---মারমার করিয়া তাহারা বামুন রাজার রাজধানীর দিকে ছুটিয়াছে, তীরন্দাজ, ঘোড়সোয়ারী পালে পালে চলিয়াছে। সৈন্যের দাপটে যেন আকাশ ও জমিন কাঁপিয়া উঠিতেছে। অশ্বখুরোত্থিত ধূলি আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে।

রাজকুমারের বিদায়-দৃশ্য অতি করুণ, নিজের পিতাকে প্রণামান্তে, বামুন রাজার পায়ে পড়িয়া কুমার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন;হতভাগ্য রাজার দুইটি চক্ষুতে অশ্রু টল মল করিতে লাগিল। শিলার কাছে প্রকাশ্যভাবে বিদায় লইবার সুযোগ কুমার পাইলেন না।

"দূর হৈতে বিদায় মাগে দুটি আঁখি ঝরে।"

শিলা ভাবিলেন, কেনবা আমি কুমারকে বাবার কঠিন পণের কথা বলিতে গেলাম!

"নিজের কাণাকড়ি মোর ঘোর সায়রের জলে।
তাহারে তুলিতে হায় তুমি যাবে চলে।।
বড়ই দারুণ মুণ্ডা কি জানি কি হয়।
রণে তো পাঠাইয়া তোমা না হই নির্ভয়।।"

রাজকুমার শিলার মুখ দেখিয়া তাহার মনোভাব বুঝিলেন,—মনের খবর মন দিয়া বুঝাইলেন, প্রকাশ্যে বলিলেন, মুণ্ডাকে আমি হাতে গলায় বাঁধিয়া আনিব।

কুমারের গমনের পর সারারাত্রি শিলা কাঁদিলেন. কুমারকে তিনি সেই ভীষণ গুণ্ডা--মুণ্ডার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পাঠাইয়াছেন, সুস্থ শরীরে ফিরিয়া আসিবেন তো?

"বঁধু যদি হৈতা আমার কণক চম্পা ফুল।
সোনায় বাঁধিয়া তারে কাণে করতাম দুল।।

বঁধু যদি হৈতো আমার পরণের নীলাম্বরী।
সর্ব্বাঙ্গ ঘুরিয়া পরিতাম নাহি দিতাম ছাড়ি।।
বঁধু যদি হৈতো আমার মাথার দীঘল চুল।
ভাল কইরা বাঁধতাম খোঁপা দিয়া চম্পা ফুল।।"

এইরূপে সেই নবীনা রমণী রোজ রাত্রে কত কি চিন্তা করেন, কোন সময় তাঁহার গণ্ড বাহিয়া অশ্রু পড়ে। কোন্ সময় তিনি জয়ী হইয়া ফিরিবেন, এই আশায় পথের দিকে চাহিয়া থাকেন।

মুণ্ডা জঙ্গলী হাতীর মত দেখিতে; সে একটা ভীষণ পালওয়ান। রাজকুমারের তীর খাইয়া সে চারিদিকে অন্ধকার দেখিল। কেবল শরীরের জোরে হয় না,—কুমারের শিক্ষিত হস্তের তীক্ষ্ণ বাণ, তাঁহার নিক্ষেপের কায়দা—তীরন্দাজদের অবিরত আক্রমণ, মধুচক্রে ঢিল ছুঁড়িলে যেরূপ চারিদিকে দংশনের জ্বালা হয়—মুণ্ডা সেইভাবে কাতর হইয়া পলাইবার পথ পাইল না। তাহার জঙ্গলী দল আগেই পলাইয়া গিয়াছিল, কতক্ষণ সহ্য করিয়া মুণ্ডা আর পারিল না,—কোন গোপনীয় জংলী পথ দিয়া সে নিবিড় ঘন পত্রশাখা-আচ্ছাদিত বনস্পতিদের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। কুমারের জয়ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল, বহু ক্রোশ দূর হইতে সেই ডঙ্কার শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। রণজয়ী কুমার গৃহে ফিরিতেছেন,—সেই শব্দ আকাশে উত্থিত হইয়া দেবতাদিগকে তাঁহার জয়বার্ত্তা শুনাইয়া দিল,— দিক্-দিগন্তে এই জয়-নিনাদ ঘোষিত হইল।

অঞ্চল-শয্যা ছাড়িয়া বিরহিণী শিলাদেবী ভগবানকে কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

বিবাহের উদ্যোগ

বিবাহের বাদ্য বাজিয়া উঠিল। সখীরা চাঁপা ও বকুল ফুলের সাজি লইয়া বসিয়া কত ছন্দে মালা গাঁথিতে লাগিল। ডালে ডালে পাখীরা যেন আনন্দে মুহুর্মুহু বিবাহের গীতি গাইয়া উঠিল। বামুন-রাজার পুরীতে মেয়েরা হুলুধ্বনি করিতে লাগিল। শিলাদেবীকে বার তীর্থের জল দিয়া স্নান করান হইল। চাঁদমুখখানি মুছিয়া নির্ম্মল মুকুরের মত করা হইল, এবং সেই মুখের শোভার প্রশংসা করিয়া এক সখী অতি ধীরে একটি সিন্দুরের ফোঁটা কপালে আঁকিয়া দিল। কোন সখী মেন্দীর রস দিয়া রাঙ্গা চরণে কত চিত্র আঁকিয়া ফেলিল।

শিলা হাতে বাজুবন্ধ ও সোনার তার পরিলেন; মেঘ-ডম্বরু শাড়ীতে তাহার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ খুব মানাইল। কানে কর্ণ-ফুল ও চোখে কাজল পরিয়া যখন মঞ্জীর-চরণা আঙ্গিনায় দাঁড়াইলেন তখন তাঁহার দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া জননীর চোখ দুটি আনন্দে সজল হইল।

নানা দেশ হইতে বাজনদারের দল আসিয়া যার যার কৃতিত্ব দেখাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। একদল বংশীবাদক বহুদূর উত্তর দেশ হইতে পথ পর্য্যটনের শ্রম দূর করবার জন্য বিন্নি ধানের খই ও মুড়কি খাইতে খাইতে আসিয়াছিল। পূর্ব্বদেশের বাজনদারেরা জয়-ঢাক কাঁধে করিয়া আসিয়াছিল, সেই ঢাকের গায় করতাল বাঁধা ছিল, জয়-ডঙ্কার সঙ্গে খন্‌খন্‌ করিয়া করতাল আপনি বাজিয়া উঠিত।

পশ্চিম হইতে একটি বাদ্যকর বহু লস্কর সঙ্গে করিয়া বিবাহের আঙ্গিনায় উপস্থিত,—তাহাকে কেহ চিনিল না। কিন্তু তাহার বাদ্যের শব্দে এবং অদ্ভুত অঙ্গ-ভঙ্গীতে তাহার কাছে ভিড় জমা হইয়া গেল।

তাহারা বামুন রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আমরা বহুদূর হইতে আসিয়াছি আজ রাত্রে এমন বাজনা শুনাইয়া দিব যাহা আপনারা জন্মে ভুলিবেন না।"

মুণ্ডার অতর্কিত আক্রমণ

রাত্রি একটু গভীর হইল, বিবাহের লগ্ন আসন্ন! সেই পশ্চিম দেশের বাদ্যকর নিজ দল হইতে একটু অগ্রসর হইয়া চোখের পলকে বাদ্যকরের বেশ বদলাইয়া তীর ছুঁড়িল। সেই বিষাক্ত শর রাজকুমারের মর্ম্ম ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। মুণ্ডা এই ভাবে তাহার নিজের কাজ সারিয়া সেই ছদ্মবেশী জংলীদের লইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাইয়া গেল। কুমার শরাহত হইয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়াছেন, তখন মুণ্ডাকে আর কে পায়?

অল্প সময়ের মধ্যেই সকলে বুঝিতে পারিল শর বিষাক্ত, রাজকুমারের জীবনের আশা নাই, তখন সেই হুলুধ্বনি ক্রন্দন ধ্বনিতে পরিণত হইল। জয়ঢাক জয়ের বার্ত্তা ঘোষণা থামাইয়া বুক-ফাটা কান্নার সুর বাজাইয়া ফাটিয়া থামিয়া গেল।

কুমার তখনও জীবিত ছিলেন; তিনি আসন্ন মৃত্যু বুঝিয়া ত্বরিৎ পদে বিবাহের স্বর্ণাঙ্কিত চেলীর ধুতি ফেলিয়া রণসাজ পরিয়া নিজ ঘোড়ার উপর চড়িলেন সেই মুণ্ডার খোঁজে। কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে আবার ঘোড়া হইতে মাটীতে পড়িয়া গেলেন।

মরিবার সময় বলিয়া গেলেন,

> "বিকালের গাঁথা মালা হয় নাই বাসি।
> মাথার ফুলের মুকুট সদ্য ফুল রাশি।।
> আর না বাজাইও বাদ্য বিয়ার বাজনিয়া।
> কপাল পুড়িল আমার খড়ের আগুন দিয়া।।"

কন্যার বিলাপে আকাশ বাতাস কাঁপিয়া উঠিল। তিনি সহমরণের জন্য প্রস্তুত হইলেন, বামুন রাজা তাঁহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু কন্যার মুখ দেখিয়া তিনি কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না। কঙ্কণের আঘাতে তাঁর কপাল রক্তাক্ত, তাঁহার মুখে রক্তের লেশ নাই। জীবিত মানুষের মুখ কি কখনও এমন হয়! রাজ্যময় হায় হায় শব্দ,—সে কান্নার কলরবে লোকে যত ছোট ছোট সুখ-দুঃখ ভুলিয়া গেল। যেন বন্যার প্লাবনে সমস্ত ঘর-বাড়ী ভাসিয়া গিয়াছে, নগরের সৌধ-রাজি ও অট্টালিকা জলের তলে ডুবিয়া গিয়াছে।

বামুন রাজা সর্ব্বংসহা ধরণীর মত এই নিদারুণ শেল বুকে করিয়া একটা ক্ষিপ্রগতি ঘোড়ায় চড়িয়া ত্রিপুরার রাজদরবারে গেলেন। সেখানে তিনি কোন কথা বলিলেন না, কোন কথা বলিতে পারিলেন না, কিন্তু শত শত অগ্রদূত যাইয়া ত্রিপুরেশ্বরকে এই দুঃসংবাদ পূর্ব্বেই শুনাইয়াছিল; বামুন রাজা ত্রিপুরেশ্বরের সিংহাসনের নীচে গড়াইয়া পড়িয়া গেলেন, রাজা তাঁহাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন, "সান্ত্বনা দেওয়ার কিছু নাই—তবে আমি প্রতিশোধ লইব।" তীরন্দাজ, গোলন্দাজ, সৈন্য যার যার হাতিয়ার ঘোড়ার পিঠে বাঁধিয়া বামুন রাজার দেশে ছুটিল।

মুণ্ডার দণ্ড

মুণ্ডা এবার প্রমাদ গণিল। এত সৈন্য, এত অস্ত্র শস্ত্র দেখিয়া সে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। যেন সে বেড়া আগুনে পড়িয়াছে,—পলাইবার পথ নাই ঃ—

> "একে ত জংলী দল লড়াই নাহি জানে।
> ডাকাইতি দাগাবাজি করেছে জীবনে।।

দড়ি বেড় দিয়া সবে মুণ্ডারে ধরিয়া।
ত্রিপুরার সহরে সবে দাখিল করল গিয়া।।
রাজার হুকুমে মুণ্ডারে ময়দানে আনিল।
তিন তোপ মারিয়া শেষে শূন্যে উড়াইল।।"

কত চোর-দস্যু-বর্ব্বর মুণ্ডার মতই এরূপ স্পর্দ্ধা করিয়া নিজের বল না বুঝিয়া জগতে প্রাণ দিয়াছে। মুণ্ডার মৃত্যুতে পৃথিবীর একটা বড় আপদ খণ্ডিল। দুঃখ হয়—দুটি সুকুমার জীবনের জন্য,—যাহারা বসন্ত ঋতুর সমস্ত সম্পদ লইয়া জগতে আনন্দের স্বপ্নরাজ্য সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছিল, যাহাদের নিষ্পাপ হৃদয়ে প্রেমের হোমানল জ্বলিতেছিল, তাহাদের এই অতি দুঃখকর বিয়োগান্ত জীবন-রহস্য মানুষ সমাধান করিতে পারে না, নর-বুদ্ধির অগম্য স্বভাবের এই বিপর্য্যয়ে ভগবানের নির্ম্মম বিধানের উপর দ্বিধার ভাব আসে।

আর দুঃখ হয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজার জন্য। যিনি দয়ায় বিগলিত হইয়া মুণ্ডাকে স্থান দিয়াছিলেন, কিন্তু সেই দয়ার জন্য তাঁহার কতই না বিপদ উপস্থিত হইল! সংসারে করুণার ক্ষেত্র যদি এরূপ কণ্টক-সঙ্কুল হয়, তবে কে আর করুণা দেখাইবে, পরের দুঃখে কাতর হইয়া তাহার প্রতি সহানুভূতি দেখাইবে কে?

আলোচনা

শিলাদেবীর আর একটি গান পাওয়া গিয়াছিল। বহুদিন পূর্ব্বে ময়মনসিংহের আরতি নামক পত্রিকায় বাবু গোপালচন্দ্র বিশ্বাস সেই গানটির সারাংশ সঙ্কলন করিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন, কিন্তু সে পালাটি হারাইয়া গিয়াছে। তাহার সংক্ষিপ্ত যে বিবরণ আরতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হইতে জানা যায়, এই গানটি সেই আরতিতে প্রকাশিত গানের প্রায় সর্ব্বাংশে একরূপ, শুধু শেষের দিকে একটু পার্থক্য আছে। সেই গানটিতে বর্ণিত হইয়াছে, বামুন রাজা মুণ্ডার হস্তে লাঞ্ছিত হইয়া কোন প্রতাপশালী মুসলমান বাদসাহের শরণাপন্ন হন,—সেই মুসলমানের কনিষ্ঠ পুত্র শিলার রূপে মুগ্ধ হওয়াতে বামুন রাজা কন্যাকে লইয়া ত্রিপুর-রাজের আশ্রয় লাভ করেন। ত্রিপুরেশ্বরের এক পুত্রও শিলার অনুরক্ত হন। উভয়ে উভয়ের অনুরাগী দেখিয়া বামুন রাজা শিলাকে রাজকুমারের হস্তে সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হন। রাজপুত্র শিলার পাণিগ্রহণের পর বহু সৈন্য লইয়া মুণ্ডাকে আক্রমণ

করেন, পুরুষের বেশে শিলা অশ্বারোহণপূর্ব্বক স্বামীর সহিত ত্রিপুর-সৈন্য পরিচালনা করেন; মুণ্ডা এই বিশাল বাহিনীর হস্ত হইতে নিষ্কৃতির সম্ভাবনা নাই দেখিয়াও তাহার স্পর্দ্ধা ও সাহস হারায় নাই। সে কোন এক স্থানে গোমতী নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেয়, তখন ঘোরতর বন্যার জল উন্মত্তবেগে আসিয়া ত্রিপুর-সৈন্য এবং যুবরাজ ও শিলাদেবীকে প্লাবিত করে। সৈন্য সহ দম্পতির এইভাবে সলিল-সমাধি হয়।

অতঃপর ত্রিপুরেশ্বর নবগঠিত আর একদল সৈন্য লইয়া মুণ্ডা ও তাহার বর্ব্বর দলকে আক্রমণ করেন। জালের দড়ি দিয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়া ধরিয়া আবদ্ধ করা হয়, এবং শেষে তোপের মুখে তাহাদিগকে উড়াইয়া দেওয়া হয়। যে স্থানে মুণ্ডা এইভাবে নিহত হইয়াছিল, তাহা এখনও ত্রিপুরা জেলায় বিদ্যমান। সে স্থানটির নাম "কাঁকড়ার চর";এই স্থানে শিলাদেবী সম্বন্ধে বহু আখ্যায়িকা ও গল্প এখন পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে।

সুতরাং দুইটি গান অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রায় ঐকরূপ। বামুন রাজার দরবারে মুণ্ডার আগমন ও চাকুরী গ্রহণ। রাজকুমারীর জন্য তাহার স্পর্দ্ধিত প্রার্থনা ও রাজপুরী লুণ্ঠন। শিলাদেবীকে লইয়া রাজার পলায়ন—এ সমস্ত কথা দুইটি গানেই প্রায় একরূপ। শেষ অধ্যায়ে ত্রিপুরেশ্বরের সৈন্যদ্বারা মুণ্ডার নিধন, সে কথাও একরূপ।

কিন্তু বর্ত্তমান পালা-গানটিতে বামুন রাজা প্রথমতঃ যাহার শরণ লইয়াছিলেন তিনি পরগণার মালিক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তিনি কোন জাতি তাহা বলা হয় নাই। খুব সম্ভব মুসলমান সংশ্রব এড়াইবার জন্য এই গানটির রচয়িতা নবাবের আতিথ্যের কথা বাদ দিয়া গিয়াছেন। দেখা যায়, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পূর্ব্ববঙ্গে, বিশেষ করিয়া ময়মনসিংহ, ভাওয়াল ও সাভাব প্রভৃতি অঞ্চলে গাজিদের প্রভাব খুব বেশী হইয়াছিল। এই গানটি যে অনেকাংশে ঐতিহাসিক ঘটনামূলক, তাহার সন্দেহ নাই। মূলত এক রকম, কিন্তু কোন কোন ঘটনায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্থক্য সত্ত্বেও ঘটনাগুলির প্রবাদ এক বিস্তৃত জনপদ-ব্যাপক,—সুতরাং মূলে যে সত্য ঘটনা ভিত্তি করিয়া সেই প্রবাদ ও গল্প হইয়াছিল, এই সিদ্ধান্ত করার পক্ষে বাধা নাই। রাজমালায় গোমতী নদীর বাঁধ খুলিয়া দিয়া শত্রু সৈন্য নষ্ট করার কথা কোন কোন স্থানে উল্লিখিত আছে, মুসলমান সেনাপতি মবারক খাঁর সৈন্যগণকে ত্রিপুরেশ্বরের সেনাপতি রায়চান এইরূপে গোমতীর বাঁধ খুলিয়া দিয়া নষ্ট করিয়াছিলেন।

মুণ্ডাকে জালের দড়ি দিয়া আবদ্ধ করা এবং তোপের মুখে উড়াইয়া দেওয়ার কথা উভয় গানেই পাওয়া যায়। শিলাদেবী ও তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর আভাস উভয় গানেই আছে।

কিন্তু এই ঐতিহাসিক কাহিনীটি আর একদিক দিয়া একটু ঘোরাল হইয়া,উঠিয়াছে। বগুড়া জেলায় এবং শিলা দেবীর সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ ও কাহিনী প্রচলিত আছে, সেগুলি আমরা জানিবার সুবিধা পাই নাই। সুপণ্ডিত ডাঃ এনেমেল হক্ জানাইয়াছেন যে মধ্য এসিয়ার বল্খ দেশের রাজা ফকির হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারার্থ বগুড়ায় আসিয়া বাস করেন, তাঁহার নাম "সুলতান বল্খী," ইনি একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর লোক। ইসলাম প্রচারার্থ তিনি বগুড়া জেলার মহাস্থান নামক নগরের রাজা পরশুরাম ও তাঁহার যুদ্ধ-বিদ্যায় কৃতী কন্যা শিলাদেবীর সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সময়ের কতকটা ব্যবধান হইলেও সে ব্যবধান খুব বেশী বলিয়া মনে হয় না—এই দুই ঘটনা কোন স্থানে তাল পাকাইয়া কল্পনার লীলাস্থলীতে পরিণত হইয়াছে কিনা কে বলিবে? পল্লীগীতিকার এইরূপ জটিল গ্রন্থি মোচন করা সহজ নহে। ত্রিপুরার ইতিহাসে দৃষ্ট হয় যে, তথাকার প্রাচীন রাজারা ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের বাঙ্গালীদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনের জন্য সর্ব্বদা ব্যগ্র ছিলেন।

মুণ্ডার চিত্র পল্লীকবির হস্তে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে,—তাহার মূর্ত্তি লৌহ-কঠোর, স্পর্দ্ধা আকাশ-স্পর্শী ও সাহস দুর্জ্জয়; ষড়যন্ত্র করিয়া দল গঠন করা ও অসম সাহসিকতার সহিত উপায় উদ্ভাবনার শক্তিও তাহার অসাধারণ। কোন পরাজয়েই সে দমিবার লোক নহে। একটা বর্ব্বর নিম্নশ্রেণীর সর্দ্দার হইয়াও সে প্রকাশ্য দরবারে রাজকন্যার পাণিপ্রার্থী, তাহার প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি অগ্নিহোত্রীর অগ্নির ন্যায় অনির্ব্বাণ। একটা ছাড়িয়া উপায়ান্তর অবলম্বন করিয়া তাহার হিংসা চরিতার্থ করিতে সে জীবন-পথে প্রতিনিয়ত প্রস্তুত হইয়াছে। এই বিভীষিকাময় চরিত্র তাহার ভীষণতা ও ক্রূরতা দ্বারা আমাদিগের যেমন বিস্ময় উৎপাদন করে, তেমনই তাহার অসাধারণত্ব দ্বারা আমাদের চিত্ত কতকটা আকর্ষণ করে।

প্রেমের যে সকল ভাব ও ঘটনা ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা কতকটা পল্লীগীতিকার মামুলী কাহিনী। পল্লীগীতিকায় ধারাবাহিক-ভাবে বারমাসী-বর্ণনা খুব অল্পই পাওয়া যায়। কিন্তু ঋতু বিশেষের প্রসঙ্গে কয়েকটি মাসের প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের কবিত্বপূর্ণ উল্লেখ প্রায় সকলগুলি পালাতেই দেখা যায়; এই পল্লী-গীতিকাটিতে তাহা বাদ পড়ে নাই।

চন্দ্রকুমার দে মহাশয় ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে একজন বৈষ্ণব ও জনৈক মুসলমান ফকিরের নিকট হইতে পালাটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

মহুয়া

হোমরা বেদে

উত্তরে হিমবান পর্ব্বত, যুগ-যুগব্যাপী হিম তথায় জমিয়া আছে, সেখানে মনুষ্যবসতি নাই। জীব-জন্তুর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না—নিম্নে উপত্যকাভাগে কতকগুলি যাযাবর বেদে বাস করে, তাহারা নানারূপ খেলা দেখাইয়া পয়সা রোজগার করে। কিন্তু তাহাদের প্রধান আয়ের ব্যবসা—লুঠ-তরাজ ও ডাকাতি। সুবিধা পাইলেই তাহারা খেলাধুলা ছাড়িয়া ভীষণ দস্যুর বেশ ধারণ করে।

ধনু নদের পারে কাঞ্চনপুর একটি ক্ষুদ্র পল্লী। বেদেরা একদা সেখানে হানা দিয়াছিল। বেদের সর্দ্দারের নাম হোমরা। সেই ক্ষুদ্র পল্লীর একটি ক্ষুদ্র পাড়া হইতে হোমরা ছয়মাসের এক ব্রাহ্মণের অপোগণ্ড মেয়ে চুরি করিয়া লইয়া আসিল, সেই শিশুটির অপরূপ লাবণ্য দেখিয়া সে তাহাকে হরণ করিয়াছিল, বেদে তাহার নাম দিয়াছিল মহুয়া।

ক্রমে সেই কন্যা বড় হইয়া বেদেদের খেলা শিখিল। সে যখন দড়ি বাহিয়া বাঁশের উপর উঠিত, তখন তাহাকে দ্বিতীয় একটা সূর্য্যের মত দেখাইত। তাহার রূপ ও খেলার কসরৎ দেখিবার জন্য ভিড় জমিয়া যাইত।

একদা হোমরা বেদে তার ভাই মাণিককে বলিল, "অনেক দিন যাবৎ এই উপত্যকায় বসিয়া আছি,—এই বিরল-বসতি জনপদে কোন আয়ের সম্ভাবনা নাই, চল—নিম্নভূমিতে চলিয়া যাই, খেলা দেখাইয়া উপার্জ্জনের চেষ্টা করা যাক্।" দুই জনে পরামর্শ করিয়া শুক্রবার তাহারা যাত্রার দিন স্থির করিল।

হোমরার দলে অনেক খেলোয়াড় ছিল। সর্ব্বাগ্রে দলপতি হোমরা "গজপতি গতি" মন্থর পাদক্ষেপে চলিল—তাহার পিছনে অনুগত স্নেহের ভাই মান্‌কা। তারপর বহু লোক, বালক, বৃদ্ধ, যুবক সকলেই খেলোয়াড়। তাহারা যেন একটি ক্ষুদ্র জগৎ সৃষ্টি করিয়া চলিল। তোতা, ময়না, টিয়া, স্বর্ণচঞ্চু দয়েল,—কত পাখী, কোনটি হাতের উপর, কোন পাখী পিঞ্জরাবদ্ধ, তাহাদের সকলেই গুণী, কেউ ঠিক মানুষের মত কথা কয়, কেউ শিষ দিয়া পাগল করে, কেউ মেয়েদের সঙ্গে মেয়েদের মত নাচে, কেউ ছাড়িয়া দিলে বায়ুমণ্ডলে চক্রাকারে ঘুরিয়া পুনরায় শান্ত ছেলেটির মত নিজ পিঞ্জরে ঢোকে, তাদের বর্ণে সোনার আভা, কেহ অয়স্কান্ত মণির ন্যায় কৃষ্ণ ও উজ্জ্বল, কাহারো পাখায় যেন মরকত, কেউ যেন সবুজেগড়া। পাখী ছাড়া কত ঘোড়া! তাহাদের শিক্ষা দীক্ষা অদ্ভুত,—গাধা, শেয়াল এবং সজারু, সঙ্গে সঙ্গে এক পাল শিকারী কুকুর, আর সঙ্গে সঙ্গে দড়ি কাছি বাঁশ, তাম্বু, ধনু, কাটি ও শর। তাহারা যেন নিজেরাই একটি ছোট পল্লী লইয়া চলিয়াছে। তাহাদের প্রধান দ্রব্য, মন্ত্রসিদ্ধ চাঁড়ালের হাড়। সেই হাড় ছোঁয়াইলে মরা মানুষ বাঁচিয়া উঠে, কাটা মুণ্ড কথা বলে।

পূর্ব্বরাগ

সেই দলের স্বর্ণ-প্রতিমা মহুয়ার রূপ পথিকের প্রধান লক্ষ্য, বালক যুবকের বিস্ময়ের বস্তু। সে যেন আসমান হইতে মাটিতে পড়িয়াছে, তাহার পিছনে তাহার কাঁধে হাত দিয়া চলিয়াছে সমবয়স্কা রূপসী সখী পালঙ্ক।

হাসিয়া খেলিয়া কৌতুক করিতে করিতে তাহারা সেই উপত্যকাভূমি পরিক্রম করিয়া কয়েকদিন পরে যে গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল তাহার নাম বামুন-ডাঙ্গা।

বামুন-ডাঙ্গা পল্লীতে এক বামুন যুবরাজ ছিলেন, নাম নদের চাঁদ। তিনি তরুণ বয়স্ক ও অতি সুদর্শন। তিনি প্রাতে সভা করিয়া বসিয়া আছেন, দূত আসিয়া বলিল, "একদল বেদে এসেছে, তারা আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য তামাসা দেখাতে পারে। তাদের সঙ্গে একটি মেয়ে আছে, তার মত সুন্দরী আমরা জন্মে দেখি নাই।" যুবরাজ ভিতর বাড়ীতে যাইয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মাতা বলিলেন, "তারা খেলা দেখাতে কত চায়?" নদের চাঁদ বলিলেন, "একশত টাকা তাহারা চায়।" জননীর অনুমতি হইল, বাহির-খণ্ডে তাহাদের খেলা দেখান হউক।

রাজ-বাড়ীতে খেলা দেখান হইবে, পল্লীর সমস্ত লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল।

হোমরা বেদে ঢোলে কাটি মারিল, পাড়ার স্ত্রী পুরুষ যেখানে যে ছিল সকলে ছুটিয়া আসিল, চারদিকে ডাকাডাকি—হাকা হাঁকি, নদের চাঁদ সভা হইতে বারংবার উঠিয়া দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। মহুয়া যখন আসরে আসিল তখন নদের চাঁদ বসিয়া ছিলেন, অতিশয় কৌতুকে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার দুই চক্ষু নিশ্চল। বন্য মার্জ্জারীর মত ক্ষিপ্রপদে কলসী মাথায় মহুয়া দড়ি বাহিয়া বাঁশের ডগায় উঠিয়া নাচিতে লাগিল, সেই অদ্ভুত নৃত্য দেখিয়া কাহারও চোখে পলক পড়িল না। কিন্তু নদের চাঁদ অতিশয় দুশ্চিন্তায় বলিলেন, "এত উঁচু জায়গায় উঠেছে, আমার ভয় হয়, পাছে পড়িয়া মরে।" খেলা দেখার কৌতুক মিটিয়াছে, একান্ত আত্মীয়ের বেদনাতুর অন্তঃকরণ লইয়া তিনি মহুয়াকে দেখিতে লাগিলেন।

মহুয়া বাঁশের উপর নাচিয়া গাহিয়া পদাঙ্গুষ্ঠে মাত্র দড়ি স্পর্শ করিয়া যেন আকাশের পরীর মত উড়িতে লাগিল।

নদের চাঁদের চোখের নিমেষ নাই—মনে হয় যেন তাঁর জ্ঞান নাই, লজ্জা নাই। যখন মহুয়া নামিয়া আসিয়া গ্রীবা হেলাইয়া হাত জোড় করিয়া বক্‌সিস্ চাহিল, তখন যুবরাজ মুহূর্ত্তকাল কি দিবেন, ভাবিতে লাগিলেন—ইহাকে অদেয় কি আছে! পর মুহূর্ত্তে নিজের গায়ের হাজার টাকার শালখানি মহুয়াকে দিয়া তাহার কমলনিন্দিত মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন; এ কুমারী অপ্সরা না গন্ধর্ব্ব কন্যা, ইহার অঙ্গ-সৌষ্ঠব নিখুঁত, কণ্ঠস্বর কোকিলের পঞ্চম রাগ। মহুয়া ভাবিতেছিল, "পুরস্কার লইয়া কি হইবে, হে ঠাকুর, ইঁহার মনের এক কোণে যেন আমি স্থান পাই।"

নদের চাঁদ হুকুম দিলেন,—বামুনডাঙ্গা দক্ষিণে যে উলুকাঁদার ফুলের বাগ আছে—তথায় শীঘ্র একখানা বাড়ী তৈরী করিয়া হোমরা বেদেকে দেওয়া হউক, বাড়ীর পার্শ্বে নির্ম্মলা সলিলা দীঘি, চারদিকে শাক সব্জীর বাগ।

পছন্দসই যে ঘর কয়েকখানি তৈরী হইল, তাহাতে আয়নার কপাট দেওয়া হইল। নূতন জমিতে শাক সব্জী খুব ফলিল। হোমরা মহুয়াকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বাগের শোভা দেখাইতে লাগিল। "ঐ দেখ বেগুনের চারা পুঁতিয়াছি, এই বেগুন বেচিয়া তোমার গলার হার কিনিয়া দিব।" পাহাড়িয়া পাখী, নিম্ন ভূমির আবহাওয়া মহুয়ার সহ্য হইল না, সে জ্বরে কাঁপিতে লাগিল এবং কাঁদিতে সুরু করিয়া দিল। ধর্ম্ম-পিতা তাহাকে আদর করিয়া বলিল, "নূতন বাগানে শিম লাগাইয়াছি, ঐ দেখ মান্‌কচু কেমন বাড়িয়া উঠিয়াছে,—এই

সব্জী বিক্রী করিয়া তোমার হাতের বাজু গড়িয়া দিবঃ—

"নূতন বাগানে আমি লাগাইব কলা।
সে কলা বেচিয়া দিব তোমার গলার মালা।।"

"চারিদিকে সাদা বেল ফুল ফুটিয়াছে, রক্তকরবীর কি সুন্দর বর্ণ, টিয়া ও কপোত শিকার করিয়া আনিয়াছি মহুয়া তুমি পালঙ্ক সইকে লইয়া রান্না কর গিয়া, কালো জিরা দিয়া রাধিও, মাংস সুস্বাদু হইবে।"

তবু পাহাড়িয়া পাখী, তাহার পাহাড়ের দেশ ভুলিতে পারিল না, উত্তর দিকে চাহিয়া তাহার চোখে অবিরত জল পড়িতে লাগিল।

প্রথম আলাপ

একদিন সন্ধ্যা বেলা, তখনও গৃহস্থের ঘরে সাঁজের বাতি জ্বলে নাই। মহুয়া এক গৃহস্থের বাড়ীতে তামাসা দেখাইয়া ফিরিতেছে; সঙ্গীরা আগে চলিয়া গিয়াছে। নদের চাঁদ বলিলেন, "তুমি একটু ধীরে চল, আমি তোমার সঙ্গে দুই একটা কথা বলিব। কাল সন্ধ্যায় সূর্য্যাস্তের পর জ্যোৎস্না উঠিবে। তোমার যদি অবসর হয়, তবে তখন একবার নদীর ঘাটে যাইবে। কলসী জলে ভরা হইলে যদি তুলিতে কষ্ট হয়, তবে আমি তুলিয়া দিব।"

মাথা নীচু করিয়া মহুয়া চলিয়া গেল, কিন্তু কি ভাবিয়া পরদিন সন্ধ্যাকালে কলসী কাঁখে লইয়া সে নদীর ঘাটে আসিল।

নদের চাঁদও সেই সময় নদীর ঘাটে উপস্থিত হইলেন এবং মৃদুস্বরে মহুয়াকে বলিলেন, "তুমি নিবিষ্ট হইয়া জল ভরিতেছ, কাল তোমাকে যে কথা বলিয়াছিলাম—তা' তোমার মনে আছে কি?"

মহুয়া বলিল, "বিদেশী যুবক! আপনি কি বলিয়াছিলেন, তা আমার মনে নাই।"

নদের চাঁদ—"আশ্চর্য্য! এত অল্প বয়সে এত ভুল! এক রাত্রির মধ্যে আমার কথা ভুলিয়া গিয়াছ!"

মহুয়া—"আপনি অচেনা যুবক, আপনার সঙ্গে এই নদীর ঘাটে নির্জ্জনে কথা বলিতে বড় সরম পাই।"

নদের চাঁদ—"বেশ, জল তুলিয়া কলসী ভর্ত্তি কর! আমার জানিতে বড় সাধ হয় তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? তোমার পিতামাতা কে, এদেশে আসিবার পূর্ব্বে তুমি কোথায় ছিলে? হাসিমুখে আমার কথার উত্তর দাও। আমার সঙ্গে কেউ নাই। নিতান্ত নির্জ্জন স্থান—তোমার লজ্জার কোন কারণ নাই।"

মহুয়া -"রাজকুমার, আমাকে এ সকল প্রশ্ন করিয়া কেন কষ্ট দিতেছেন? এই দুঃখিনীর কেহ নাই। আমার মা-বাপ বা ভাই কেউ নাই, আমি স্রোতের সেওলা, নিরাশ্রয়ভাবে ভাসিয়া বেড়াইতেছি। আমার মত হতভাগিনী সংসারে নাই, এদেশে কি তেমন দরদী কেউ আছে, আমি যাঁর কাছে প্রাণ খুলিয়া মনের কথা বলিতে পারি? আমি নিজের জ্বালায় নিজে মরিতেছি। কে আমার মন বেদনা বুঝিবে? কাকেই বা বলিব? রাজকুমার! আমার দুঃখ বুঝিয়া আপনার লাভ কি? আপনি রাজ্যেশ্বর, কোন ভাগ্যবতী রাজকুমারীকে বিয়া করিয়া সুখে ঘর করিতেছেন, আপনি দুঃখিনীর কথা শুনিয়া কি করিবেন?"

নদের চাঁদ কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "মহুয়া তুমি নির্ম্মম, আমার মনে কতখানি দরদ তা' তুমি বুঝিতে চাও না। তুমি মিথ্যা কথা কেন বলিতেছ? আমি বিবাহ করি নাই।"

মহুয়া—"আপনার পিতামাতার মন কঠিন, তাঁহারা এখন পর্য্যন্ত আপনার বিবাহ দেন নাই!"

রাজকুমার বলিলেন—"মহুয়া তোমার মা বাপের মনও কম কঠিন নহে—তাঁহারাও তোমাকে এতদিন পর্য্যন্ত কুমারী করিয়া রাখিয়াছেন, বিবাহ দেন নাই!"

মহুয়া—"আপনি এখন পর্য্যন্ত বিয়া করেন নাই কেন? আপনার দুঃখ কি?"

নদের চাঁদ—"মহুয়া, তোমার মত সুন্দরী ও গুণশীলা কোন কন্যা পাইলে আমি বিবাহ করিতে রাজী হইতে পারি, আমি সেই প্রতীক্ষায় আছি!"

মহুয়া—"রাজকুমার! আপনি বড় নির্লজ্জ, আপনি আমাকে এইরূপ অশিষ্ট কথা শুনাইতেছেন, গলায় দড়ি বাঁধিয়া আপনি গঙ্গায় ডুবিয়া মরুন, ছিঃ!"

নদের চাঁদ হাসিয়া বলিলেন, "যে দাড়ি দিয়া কলসী বাঁধিব এবং যে কলসী জলে ভর্ত্তি করিয়া ডুবিয়া মরিব—সে দড়িই বা কোথায়, সে কলসীই বা কোথায়? আমার কাছে তুমি গভীর গঙ্গা—এই গঙ্গায় ডুবিয়া মরিতে সাধ যায়ঃ—

"কোথায় পাব কলসী কন্যা কোথায় পাব দড়ি।
তুমি হও গহিন গঙ্গা আমি ডুইবা মরি।।"

চন্দ্র-লেখা যেরূপ সান্ধ্যগগনে মিলাইয়া যায়, এই দুই তরুণ-তরুণীর রহস্যালাপ তেমনই সেই নদীর ঘাটে মিলাইয়া গেল। সে দিন এই পর্য্যন্ত।

পালঙ্কের কাছে মনের বেদনা প্রকাশ

আর এক দিন, মহুয়া কপালে কর ন্যস্ত করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে, পালঙ্ক সই তার চুলগুলির মধ্যে আঙ্গুল চালাইয়া ধীরে ধীরে বেণীমুক্ত করিতেছে; পালঙ্ক অতি মৃদুস্বরে বলিল—"মহুয়া—আমার প্রাণের সই, তুমি এ কয়েকদিন যাবৎ যেন কত উৎসবের কাজে আগ্রহের সহিত রোজই সন্ধ্যাকালে একা একা নদীর ঘাটে যাও কেন? আমার মনে হয়, তুমি রোজ রাত্রি কাঁদিয়া কাটাও, তোমার চোখের কোঠায় অশ্রুর দাগ। কথা বলিতে যাইয়া কখনও কখনও তোমার চোখ দুটি অশ্রুপূর্ণ হয়—আমার প্রাণের সই, বল দেখি, কিসের জন্য তোমার এত দুঃখ! প্রায়ই দেখিতে পাই, তুমি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া রাজবাড়ীর দিকে কাতর ভাবে চাহিয়া থাক। এদিকে নগরে শুনেছি, নদের চাঁদ ঠাকুর তোমার গান শুনিয়া পাগলের মত হইয়া গিয়াছেন।"

এই কথা শুনিয়া পালঙ্ক সখীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া মহুয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "পালঙ্ক, আমার উপায় বলিয়া দে! আমি মনের আগুন কেমন করিয়া নিভাইব, আমি যে কিছুতেই মনকে সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। তোরা আমাকে লইয়া চল্, এদেশ ছাড়িয়া যাই। আমি কত চেষ্টা করিয়াছি, মনকে বুঝাইতে পারিলাম না।"

পালঙ্ক—"প্রাণের সই! তুমি আমার উপদেশ মত কাজ কর। সাতদিন নদীর ঘাটে যাইও না। বাড়ীতে লুকাইয়া থাকিও। নদের ঠাকুর খুঁজিতে আসিলে আমরা তাঁহাকে বলিব, সুন্দরী মহুয়া মরিয়া গিয়াছে।"

মহুয়া বলিল—"সাতদিন তো দূরের কথা, একদণ্ড তাঁহাকে না দেখিলে মরিয়া যাইব। চন্দ্র সূর্য্যকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, ঠাকুর নদের চাঁদকে আমি আমার প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছি, তিনিই আমার প্রাণের স্বামী।

"বেদেদের সঙ্গে আমি যথা তথা যাই।
আমার মন বাঁধিয়া রাখে হেন স্থান নাই।।"

আমি এখন তোমাদের পর হইয়া গিয়াছি—

"বঁধুরে লইয়া আমি হব দেশান্তরী।
বিষ খাইয়া মরিব কিম্বা গলায় দিব দড়ি।।"

হোমরার সন্দেহ, আড়িপাতা

স্থান উলুকাঁদা—বেদেদের নূতন বাড়ী, সম্মুখে পুকুর পাড়ে সব্জী বাগান।

হোমরা তাহার কনিষ্ঠ মান্‌কা বেদেকে বলিতেছে, "এই দেশে আর আমার থাকা হইবে না, চল এদেশ ছাড়িয়া যাই। বাড়ী ঘর দিয়া কি করিব? বরং ভিক্ষা মাগিয়া খাইব, তাও ভাল। তুমি কি কানা-ঘুষা কিছু শুনিতে পাও নাই। মহুয়া রাজকুমারের জন্য পাগল হইয়াছে, এখানে কোনক্রমেই আর থাকা উচিত নহে।"

ছোট ভাই ধমক দিয়া উঠিল, তুমি কি পাগলের মত বকিয়া যাইতেছ?

"—এমন কথা না বলিও তুমি।
ইচ্ছা হয় ছেড়ে যেতে এই সোনার জমি!
সানে বাঁধা পুকুরটি গলায় গলায় জল।
পাকিয়াছে শালি ধান, সোনার ফসল।।
তা দিয়া করিব মোরা শালি ধানের চিরা।
এই দেশ না ছাড়ি যাইও—আমার মাথার কিরা।।"

ফাল্গুনের অন্ত হইয়াছে, চৈত্র মাসে ডালের উপর বসিয়া কোকিল ডাকিয়া উঠিতেছে, সেই সুরে বোঁটার উপর দাঁড়াইয়া কুন্দ ও মালতী ফুল শরাহত হরিণীর ন্যায় ঘন ঘন কাঁপিয়া উঠিতেছে; বেদেদের ক্ষেতে অপর্য্যাপ্ত শালি ধান পাকিয়া মাটির দিকে নুইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের অগ্রভাগ রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। রাত্রি নিস্তব্ধ নিথর, কেবল মাঝে মাঝে রহিয়া রহিয়া 'বউ কথা কও' ঘুরিতে ঘুরিতে আকাশে চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছে, তাহার স্বরে কোন্ অনির্দ্দিষ্ট মানিনীর মান ভাঙ্গিতেছে কে বলিবে? সেই নিবিড় নিষ্কম্প

আকাশে দাঁড়াইয়া প্রকৃতি যেন রুদ্ধশ্বাসে কোন যোগ সাধনা করিতেছে। বেদেদের নূতন বাড়ীঘর, সুস্নিগ্ধ পুকুরের তীরে বড় বড় ঘর,—বেদেরা তাহাতে বড় আরামে ঘুমাইতেছে, তাহাদের নাসিকার শব্দে গভীর সুষুপ্তি বুঝাইতেছে।

দ্বিপ্রহর রাত্রে নদের চাঁদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, শিয়রে স্বর্ণমণ্ডিত সঙ্কেত বাঁশিটি ছিল, তিনি তাহাতে ফুঁ দিলেন। বাঁশীর বিলাপ দূরস্থিত আড়াকাঁদির বাগানে এক বিরহিনীর মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া দিল। অতি ব্যস্ত সমস্ত ভাবে মহুয়া উঠিয়া কলসী কাঁখে বেদেদের কুটিরের পাশ দিয়া উন্মত্তবেগে নদীর ঘাটে ছুটিয়া আসিল। আসিয়া দেখে, নদের চাঁদ তাহার পূর্ব্বেই বিভোর হইয়া বাঁশী বাজাইতেছে। বিলম্বে অসহিষ্ণু হইয়া বাঁশী কাঁদিয়া ডাকিতেছে। আকাশের চাঁদ তাহাকে পৃথিবীর চাঁদকে দেখাইয়া দিল, তখন কি আনন্দ! দুইজনে দুইজনের আলিঙ্গনবদ্ধ, এক চক্ষু আনন্দাশ্রুপূর্ণ, আর এক চক্ষু আশঙ্কাতুর। রাজপুত্র বলিলেন, "এই ঐশ্বর্য্যের ছাই পাঁশ দিয়া আমি কি করিব, চল আমরা এখনই এই রাজ্য ছাড়িয়া যাই।" মহুয়া কাতর কণ্ঠে বলিল, "না, তাহা হইবার নয়। আমি তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। এই রাজৈশ্বর্য্য হইতে টানিয়া বনে জঙ্গলে লইয়া যাইতে পারিব না, আমি তোমার মুখখানি দেখিতে দেখিতে এই নদীতে—এই কামনা-সায়রে ডুবিয়া মরিব, যাহাতে পরজন্মে তোমায় পাই। হায়! যদি তুমি ফুল হইতে তবে তো তোমায় খোঁপায় বাঁধিয়া এখনই পলাইয়া যাইয়া বনে লুকাইয়া থাকিতে পারিতাম!

"বঁধু, আমি তোমায় কি বলিব! এই বেদের মেয়েকে দিয়া তুমি কি করিবে? এই আবর্জ্জনা তুমি এই খানে ফেলিয়া রাখিয়া ঘরে যাও, সুন্দরী দেখিয়া কোন রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া সুখী হও। আমার সঙ্গে এক ঘাটে পা দিলে তুমি নিজের রাজ্য-সম্পদ সকলই নষ্ট করিবে।" যুবরাজ তাহাকে বাহুপাশে বদ্ধ করিয়া বলিলেন, "আমার সকল রাজ্য সম্পদ হইতে এই সম্পদ বড়!"

হোমরা অলক্ষিতে তাহাদের পিছনে ছিল, খানিকটা দূরে ওৎ পাতিয়া সে ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিল, তারপরে ধীর পাদক্ষেপে আড়াকাঁদিতে নিজের শয়ন ঘরে যাইয়া নিঝুম হইয়া বসিয়া রহিল।

"অবিদিত গত যামা" রাত্রি কি ভাবে কাটিল তাহা নদের চাঁদ অথবা মহুয়া কিছুই জানিতে পারিল না,—কত অশ্রু, কত দুঃখ, কত সুখ, কত প্রলাপ, কত বিলাপ! রাত্রি

ভোর হইয়া আসিল, উষার পায়ে আলতার ছটা পড়িয়া পূর্ব্ব গগনের কয়েকখানি পাতলা মেঘ ঈষৎ রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। যুবরাজ বাড়ীতে চলিলেন, মহুয়াও অন্যমনস্ক ভাবে কলসীতে জল ভরিয়া চলিয়া গেল।

ইহার মধ্যে মহুয়া কোনরূপ একটু সুবিধা করিয়া নদের ঠাকুরের পায়ে প্রণাম করিয়া বলিল, "আমরা এদেশ ছাড়িয়া যাইব, না যাইয়া উপায় নাই, আমি কুল নারী,—কুল মানের ভয় আছে, কিন্তু তোমাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া থাকিব, কেমন করিয়া তোমাকে ছাড়া প্রাণ ধারণ করিব?

> "তোমার সঙ্গে বঁধুরে আমার এই শেষ দেখা।।
> কেমন করি থাকব আমি হইয়া অদেখা।।"

"তোমাদের দেওয়া সুন্দর বাড়ী ঘর পড়িয়া থাকিবে—তাহাতে খেদ নাই—এ সব ছাড়িয়া যাইব, কিন্তু তোমাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া থাকিব, আমার পাগল মনকে কেমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিব?

"বঁধু, বুক ফাটিয়া যাইতেছে, তোমার সঙ্কেত বাঁশীর ডাক না শুনিয়া আমি সারাদিন কেমন করিয়া কাটাইব। আজ কি মধ্য-রাত্রে আমাদের সুখ নৈশ-ভ্রমণ শেষ হইল?

> "পড়্যা রইল ঘর বাড়ী পড়্যা রৈলা তুমি।
> কেমন কৈরা পাগল মন বাঁইধা রাখব আমি।।
> আর না জাগিয়া বঁধু পোহাইব নিশি।।
> আর না শুনিব তোমার পাগল-করা বাঁশী।।

"তোমার সোণা মুখখানি ঘুম ভাঙ্গার পরে আর দেখিব না, চক্ষু দুটি কত অন্ধি সন্ধিতে সেই মুখ দেখিবার জন্য উতলা হইয়া থাকে,—হায় সকলই ফুরাইল।

"যদি কখনও মনে হয়, তবে বঁধু দূর উত্তর-দেশে হিমালয় পর্ব্বতের নিম্ন ভূমিতে চলিয়া যাইয়া আমায় একবার দেখিয়া আসিও। সেখানে প্রতি বৎসর বেদেরা কয়েকমাস বাস করিয়া থাকে, তুমি কতকদিন পরে সেইখানে যাইও। আমাদের বাড়ীতে নল খাগড়ার বেড়া ও দক্ষিণ দুয়ারী ঘর, সেইখানে আমায় পাইবে, প্রাণের অতিথিকে পাইলে আমি শালি ধানের চিড়া ও সে দেশের বড় বড় মর্ত্তমান কলা খাইতে দিব। ঘরে মৈষের দই

থাকে, তাহা তুমি নিজ হাতে হাঁড়ী হইতে লইয়া খাইবে,—আজই তোমার সঙ্গে আমার বোধ হয় শেষ দেখা, আর কি আমাদের সুখের মিলন পোড়া অদৃষ্টে লেখা আছে?"

যুবরাজ ভাবিলেন, "মহুয়া আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় রোজই কত না প্রলাপ বলে, এও সেইরূপ উক্তি। আড়াকাঁদার বাড়ী ঘর, সব্জী ও ধানের ক্ষেত সকল ছাড়িয়া হোমরা বেদে কোথায় যাইবে? এখানে যতটা সম্ভব আমি বেদেদের জন্য সুবিধার ব্যবস্থা করিয়াছি।" তিনি মহুয়াকে বলিলেন, "কেন বিচ্ছেদের বৃথা আশঙ্কা করিতেছ, আমাদের কি আর ছাড়াছাড়ি হইতে পারে? অসম্ভব।"

মহুয়া একথা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বেদেদের পলায়ন

মান্‌কাকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া দৃঢ় স্বরে হোমরা বেদে বলিল—"ভাই, এখন আর কোন দ্বিধা বা সন্দেহ নাই, আমি নিজে দেখিয়াছি। তোমার এই শালি ধান পড়িয়া থাকুক, আড়াকাঁন্দার শালি ধানের চিড়া আর খাইতে হইবে না। বোঁচ্‌কী-পুঁটলী বাঁধ, আজ রাত্রি প্রায় সবটাই আঁধার, চল এই সুযোগে পালাই, না হইলে নদেব ঠাকুরের বেড়া জালে আমাদের পড়িতে হইবে, সেখানে কারাগারে চির বন্দী হইয়া থাকিব নতুবা ইহারা আমাদিগকে মাটীর তলে পুঁতিয়া মারিবে। হউন তিনি রাজা—আমি কিছুতেই এই অনাচারের প্রশ্রয় দিব না।"

তখনই রাত্রের আঁধারে বেদে পাড়ায় সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। বাঁশ, দড়ি, তাম্বু, ধনু, ছিলা, বেদেদের ঘাড়ে স্থান পাইল, সেই নিস্তব্ধতার ভিতর দিয়া, ছাগল, ভেড়া, বানর, ঘোড়া, শেয়াল, সজারু—সকলগুলি বনের পশু, ও তোতা টিয়া প্রভৃতি পাখী সহ বেদেরা আঁধারে গা ঢাকিয়া বামুনডাঙ্গা গ্রাম ছাড়িয়া গেল। পরদিন প্রাতে নগরের লোক বিস্মিত হইয়া দেখিল, আড়াকাঁদির মস্ত মস্ত ঘর বাড়ী একবারে খালি। পাকা ধানের একটি আঁটিও তাহারা নেয় নাই। তাহাদের নিজেদের যাহা কিছু সম্বল ছিল, শুধু তাহাই লইয়া আঁধার রাতে তাহারা পলাইয়া গিয়াছে। নগরবাসীরা এ উহার মুখের দিকে চাহে, ব্যাপার কি? কেহই বলিতে পারে না—তবে একথা ঠিক, যে হোমরা, মান্‌কে ও তাহাদের দলের একটি প্রাণীও আর সেখানে নাই। ছাগলগুলি সেই প্রান্তরে আর চরিয়া বেড়ায় না, বেদেদের

পাখীর স্বরে সে অঞ্চলের বাতাস আর মুখরিত হয় না—সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা মহুয়ার মুখখানি পদ্ম-দীঘির মধ্যে আর একটি নূতন পদ্মের মত স্নানকালে ফুটিয়া উঠে না, পালঙ্কও নিরুদ্দেশ হইয়াছে, ভিটা খালি, ঘর শূন্য। বহু লোক আসিয়া সেখানে প্রভাতকালে জড় হইয়া এই রহস্য সমাধানের আলোচনায় যোগ দিতে লাগিল, যতই কলরব ও বাকবিতণ্ডা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ততই প্রশ্নটির জটিলতা বাড়িয়া চলিল।

নদের চাঁদের অবস্থা

সবে এক গ্রাস ভাত মুখে দিবেন, এমন সময় এই সংবাদ নদের চাঁদের কর্ণ-গোচর হইল। ভাতের গ্রাস মাটিতে পড়িয়া গেল। মাতা ডাকিতে লাগিলেন, পরিজনেরা ডাকিতে লাগিল, কিন্তু যুবরাজ কোন সাড়া দিলেন না, ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন; সকলে বলাবলি করিতে লাগিল—"নদের ঠাকুর পাগল হইয়াছেন।"

"যখন নাকি নদের ঠাকুর এই কথা শুনিল।
খাইতে বসি মুখের গ্রাস ভূমিতে পড়িল।।
মায় ডাকে সবে ডাকে নাহি শুনে কথা।
নদের ঠাকুর পাগল হইল শুনি যথা তথা।।"

নদের ঠাকুর ঘুরিয়া ঘুরিয়া আড়াকাঁদির সবজীবাগ ও ঘরবাড়ী দেখিতে লাগিলেন। দিনের বেলা এইভাবেই কাটে; এইখানে বসিয়া মহুয়া আমার জন্য বিনা সুতে মালা গাঁথিত, এইখানে সে বাঁশী শুনিবার জন্য নদীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত। এইরূপ ভাবনার শেষ নাই, কত কথা, কতদিনের সুখ-দুঃখের কাহিনী মনে পড়ে— সত্যই বুঝি নদের চাঁদ পাগল হইলেন।

একদিন তিনি মাকে বলিলেন, "মা আমার আর বামুনডাঙ্গা ভাল লাগিতেছে না, এ দেশে হাওয়া বর্ষাকালে বড় খারাপ হয়, সর্ব্বদা যেন শীতের শিহরণে গায় কাঁটা দেয়। মা. তুমি অনুমতি কর—আমি দূর তীর্থগুলি দেখিয়া আসি।"

মা বলিলেন. "আমি তোকে ছাড়া এই পুরীতে কি লইয়া থাকিব? রাজ্যই বা দেখে শুনে কে? মায়ের মনের কষ্ট ও দুশ্চিন্তা তোরা কি করিয়া বুঝিবি, বর্ষার রাত্রে আর্দ্র বস্ত্র, পিঠে

শুকায় না, মাঘ মাসের শীতে কতবার গা ধুইয়া কাটাইতে হইয়াছে, এক মুহূর্ত্ত তোকে কোল হইতে বিছানায় নামাই নাই। মায়ের মনের দুশ্চিন্তা তোরা কি করিয়া বুঝিবি?"

বিদেশে বেভুঁয়ে যদি ছেলে মারা যায়, ছয় মাসের পথ দূর হইতে মায়ের মন তাহা জানিতে পারে।

"বিদেশে বিপাকে যদি পুত্র মারা যায়।
দশে না জানিবার আগে জানে কেবল মায়।।"

"আমি কিছুতেই তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না, যক্ষের মত কৃপণ তার বুকের মধ্যে লুকানো টাকার থলিয়া ছাড়িয়া দিতে পারে, কিন্তু আমি তোমাকে প্রবাসে পাঠাইয়া ঘরে একা থাকিতে পারিব না।

"তোমারে না দেখ্‌লে পুত্র গলে দিব কাতি।
তুমি পুত্র বিনে নাই আমার বংশে দিতে বাতি।।
ভিক্ষা মেগে খাব আমি তোমারে লইয়া।
উরের ধন দূরে দিব, তবু না দিব ছাড়িয়া।।"

গৃহত্যাগ

এদিকে সুবিধা হইল না। নদের চাঁদ রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় ঘুম হইতে উঠিয়া উদ্দেশ্যে মাতাকে ও অপরাপর গুরুজনকে প্রণাম করিলেন, চন্দ্র সূর্য্যকে সাক্ষী করিয়া বর প্রার্থনা করিলেন "যেন আমার অভিষ্ট সিদ্ধ হয়।" শত স্নেহ-জড়িত সেই রাজগৃহ ছাড়িতে তাঁহার কষ্ট হইল না। হিমালয় পাহাড় কোথায়? নল খাগড়ার বেড়া, দক্ষিণ দুয়ারী ঘর, ও বেদে পাড়া কোথায়?—এই চিন্তা তাঁহার মনে খেলিতে লাগিল, আর কোন চিন্তা নাই।

"রাত্রি নিশাকালে ঠাকুর কি কাম করিল।
বেদের নারীর ল্যাগা ঠাকুর বিদেশে চলিল।
কিসের গয়া, কিসের কাশী, কিসের বৃন্দাবন।
বেদের কন্যার লাগি ঠাকুর ভ্রমে ত্রিভুবন।।"

এক মাস দুই মাস করিয়া তিন মাস ঘুরিল—কোথাও বেদের দলের সাক্ষাৎ মিলিল না। জৈন্তার পাহাড়-দেশ,—ঘন বিটপি সমাকীর্ণ অতি নিবিড় গহিন বন,—নানাদেশ ঘুরিয়া ছন্নমতি ঠাকুর বন হইতে বনে, পাহাড়ে হইতে পাহাড়ে ঘুরিতে লাগিলেন,—বেদের দল কোথায়? মহুয়াই বা কোথায়?

রাখাল মহিষ ও গরু চরাইয়া—গাছতলায় বসিয়া বাঁশী বাজায়; নদের ঠাকুর তাহার কাছে যাইয়া বসেন,—তাঁহার সুদর্শন মূর্ত্তি দেখিয়া রাখাল বালকেরা বিস্মিত হইয়া বাঁশী বাজান ক্ষান্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করে, "কে তুমি ঠাকুর, এমন রূপ তুচ্ছ করিতেছ কেন, মাথায় তোমার জটা, দেহ তোমার শীর্ণ, বস্ত্র তোমার ছিন্ন—ধূলি বালিতে শরীর ম্লান, তোমার কি কেউ নাই! চল আমরা ঐ নির্ঝরের জলে তোমাকে স্নান করাই, শরীর মার্জ্জনা করিয়া দেই—না খাইয়া তুমি অস্থিচর্ম্ম-সার হইয়াছ, আমরা তোমাকে গাছের মিষ্ট ফল পাড়িয়া দিব, আমাদের মায়েরা তাহা কাটিয়া দিবে, তুমি আমাদের কুঁড়ায় চল।"

নদের চাঁদ বলিলেন,—"স্নান করা, খাওয়া-দাওয়ার কথা পরে, তোমরা একদল বেদেকে কি এই পথ দিয়া যাইতে দেখিয়াছ! তোমরা কি আমার মহুয়াকে দেখিয়াছ? তাহার চুলগুলি মেঘের লহরীর মত, রাঙ্গা পা দুখানি ছুঁইবার লোভে লুটিয়া পড়ে। তোমরা কি তাকে দেখ নাই, একবার দেখিলে জন্মে তাকে আর ভুলিতে পারিবে না। সে বাঁশ ও দড়ি লইয়া খেলা দেখায়, নৃত্য করে। সে খেলা ও নৃত্য যদি দেখিতে, তবে আর তাহা জন্মে ভুলিতে পারিতে না। এই পুকুরে কি আমার জলপদ্ম ফুটিত. এই পারে কি সে স্থল-পদ্ম হইয়া ফুটিত, তবে আমি পুকুরের জলে ডুবিয়া মরিব, আমার অঙ্গ শীতল হইবে। যদি এই পথ দিয়া পুকুরে জল আনিতে যাইত, হায়রে একবারটি যদি তাহাকে দেখিতে পাইতাম, তবে আমি পৃথিবীর সকল কথা ভুলিয়া পথের পানে তাকাইয়া থাকিতাম।

"আকাশের পাখীরা দূরে উড়িয়া যাইতেছে—ইহারা বহুদূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছে। ইহারা কি আমার মহুয়াকে দেখিতে পাইতেছে?

"উইড়া যাওরে পাখী সব নজর বহুদূর।
এই পথে বেদের দল গেছে কতদূর।।
কোথায় গেলে পাব কন্যা তোমার দরশন।
তিলেক অদেখা হ'লে হইত মরণ।।"

মহুয়ার পথের চিহ্ন

এইরূপ উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে নদের ঠাকুর পথচারীদিগকে, তরুলতা ও আকাশের পাখীগুলিকে সম্বোধন করিয়া প্রলাপ বকিতে বকিতে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। বৃষ্টি বাদল মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে, হয়ত বড় বড় গাছ আছে, তাহার তলায় যাইয়া দাঁড়াইলে জল হইতে আত্মরক্ষা চলে; কিন্তু নদের চাঁদ তথায় যাইতেন না; রৌদ্রে মাথা পুড়িয়া গেলেও সে দিকে খেয়াল ছিল না। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি প্রখর ছিল, সহসা উচ্চ একটা প্রান্তর ভূমি দেখিয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন তাঁহার একমাত্র লক্ষ্যের দিকে।

তিনি দেখিলেন মাটির ডেলা দিয়া উনুন তৈরী আছে, রন্ধনের কালিমাখা সেই উনুন দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, মহুয়া তথায় বসিয়া রান্না করিয়াছে। নদের চাঁদ সেখানে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন; ঘোঁড়ার খুরের দাগ আছে,—অদূরে শ্যাম-দুর্ব্বার স্বল্পাচ্ছন্ন প্রান্তরে অর্ধভুক্ত দর্ভাঙ্কুর দেখিয়া বুঝিলেন, সেখানে বেদেদের ছাগল ঘাস খাইয়াছে, সেই সকল চিহ্ন দেখিয়া বুঝা গেল, বেদেরা ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে সেই জায়গায় ছিল।

"সেইখানে বসিয়া কন্যা করেছে রন্ধন।
তথায় বসি নদের ঠাকুর জুড়িল ক্রন্দন।।
ঘোড়ার পায়ের খুরের দাগ, ছাগলে খাইত ঘাস।
এইখানে আছিল কন্যা ফাল্গুন চৈত্র মাস।।

পথে নানা দুঃখের কথা

আষাঢ় মাসে পূবের হাওয়া পশ্চিম হইতে বহিতে লাগিল। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের জল-ঝড় মাথার উপর দিয়া গেল। দুর্গোৎসবের সময় বাড়ীতে কত ধূমধাম, বাদ্যভাণ্ড, দরিদ্রভোজন ও দীন-দুঃখীকে নব বস্ত্র দান, কিন্তু হায়! তাঁহার জন্য রাজবাড়ীর লোকেরা হাহাকার করিয়া কাটাইতেছে। মাতা মৃন্ময়ী ভগবতীর পাদপীঠে পড়িয়া মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতেছেন! আজ এই উৎসবের দিনে, নদের চাঁদের পেটে ভাত নাই, মাথায় জটা, কটীতে ছিন্ন বস্ত্র, তিনি 'মহুয়া' 'মহুয়া' বলিয়া জঙ্গলে জঙ্গলে খুঁজিতেছেন। মণি হারাইয়া গেলে

বণিক যেরূপ খোঁজে, মহুয়াকে তেমনই করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন।—কার্ত্তিক মাসে ছেলেদের মঙ্গলের জন্য মায়েরা ঘটা করিয়া কার্ত্তিক পূজা করিয়া থাকেন, এ সময়ে বুকের সোনার পুতুলের মত তাঁহাকে মাতা খুঁজিতেছেন। রাজবাড়ীর কার্ত্তিক পূজা বৃথা হইয়া গিয়াছে। মাতার দুলাল পুত্র, রাজ গৃহের একমাত্র প্রদীপ বনের কোণে ঝোপের কোণে জোনাকীর মত অজ্ঞাত বাস করিতেছেন। কোন্ দিন এই দীপ তৈল-হীন সল্‌তের মত নিবিয়া যাইবে, কে বলিবে!

অকস্মাৎ মিলন

অগ্রহায়ণ মাসে অল্প অল্প শীত পড়িয়াছে, একদিন অতি সৌভাগ্যবশে হঠাৎ নদের চাঁদ দেখিলেন কংস নদীর পুষ্পিত সৈকতে দাঁড়াইয়া মহুয়া জল ভরিতেছে।

দুইজনে দুইজনকে দেখিলেন,—অতিথি বেশে নদের চাঁদ বেদের কুটিরে উপস্থিত হইলেন।

দলের লোক বলাবলি করিতে লাগিল, মহুয়া এই ছয়মাস আঁচল পাতিয়া মাটীতে শুইয়াছিল। নিজে রাঁধে নাই, কোন খেলায় যোগ দেয় নাই। বাতের বেদনায় রাত দিন ধড়্ ফড়্ করিয়াছে, মাথার বেদনায় সারারাত্রি ঘুমাইতে পারে নাই। আজ হঠাৎ এত উৎসাহ কেন? যেন নূতন উদ্যমে কাজে লাগিয়া গেছেঃ—

"ছয় মাসের মড়া যেন উঠি হইল খাড়া।"

বারংবার জল আনিতে নদীর ঘাটে যাইতেছে, কি ফুর্ত্তি!"

হোমরা বেদে বলিল, "মান্‌কে, এই নবাগত অতিথিকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। আমার কেমন সন্দেহ হইতেছে। যাহা হউক যদি এই ব্যক্তি একান্তই আমাদের দলে খেলা শিখিতে চায়, তবে ক্ষতি কি?"

"আমার কাছে থাক ঠাকুর সুখে কর বাস।
দেশে দেশে ঘুরি ফিরি লইয়া দড়ি বাঁশ।।
যত্ন করি শিখিও খেলা থেকে মোদের পাশে।
বার মাস ঘুরে আমরা ফিরি দেশে দেশে।।"

সেদিনই—

"অতি যত্নে কন্যা তথা করিলা রন্ধন।
জাতি দিয়া নদীয়ার ঠাকুর করিলা ভোজন।।"

পলায়ন

কয়েক দিন অতীত হইয়া গিয়াছে। হোমরা বেদে সঠিক বুঝিয়াছে।

একদিন রাত্রিকালে মহুয়া ঘুমাইতেছে, পৌর্ণমাসী রাত্রি, চাঁদ আভের আড়ালে ঢাকা পড়িয়াছে। দুই একটা ক্ষীণ নক্ষত্র জ্বলিতেছে, তরল মেঘ সোনার পাতার মত তাহাদের উপর দিয়াও চলিয়া যাইতেছে, জগৎ নিস্তব্ধ, নিথর।

মহুয়া ঘুমাইতেছিল, সোনার অতিথির কথা স্বপ্নে দেখিতেছিল, তাহার মুখখানি ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিয়াও আনন্দাশ্রু গড়াইয়া গণ্ডে পড়িতেছে, এমন সময় মাথার নিকটে কি মেঘ গর্জ্জন! মহুয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেখিল, জ্বলন্ত অগ্নির মত দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া হোমরা বেদে শিয়রে বসিয়া আছে।

মহুয়া উঠিয়া বসিল। হোমরা বলিল, "এই ষোল বছর মায়ের মত তোমাকে পালন করিয়াছি, আজ আমার একটি কথা তোমাকে পালন করিতে হইবে। এই বিষ মাখানো ছুরিখানি লও, নদীর ঘাটে আমার সেই শত্রু শুইয়া আছে, তুমি তাহার বুকে এই ছুরি বিঁধাইয়া মৃত দেহটা টানিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিয়া আইস।"

ঘুমের ঘোরে কি করিতে হইবে মহুয়া ভাল করিয়া বুঝিল না। ছুরি খানি হাতে লইয়া সে নদীর ঘাটের দিকে রওনা হইল।

"পায়ে পড়ে মাথার চুল চোখে পড়ে পানি।
উপায় চিন্তিয়া কন্যা হৈল উন্মাদিনী।।"

সেই নদীর ঘাটে পাতার বিছানা, হিজল গাছের নীচে দেব-মূর্ত্তির মত নদের চাঁদ ঘুমাইয়া আছেন, মেঘ সেইক্ষণে চাঁদকে ছাড়িয়া দিয়াছে, চন্দ্রের আলো মুখখানিতে পড়িয়াছে। স্বর্গ হইতে দেবতা কি ভুলে মাটীতে আসিয়া ঘুমাইতেছেন?

মহুয়া ডাকিতেছে, "উঠ— তুমি আমার মাথার ঠাকুর, তোমাকে মারিয়া জলে ফেলিয়া দিব! তাও কি হয়, তার পূর্ব্বে এই ছুরি নিজের বুকে বিন্ধাইয়া প্রাণ দিব।" কুমারীর স্পর্শে নদের ঠাকুর জাগিয়া দেখিল, মহুয়ার চাঁদ-পানা মুখখানি জলে ভাসিতেছে, সে আত্মহত্যার জন্য উদ্যত।

ঘুমের আবেশে মহুয়ার এই মুখখানিই নদের চাঁদ দেখিতেছিল, সে মহুয়ার হাত হইতে ছুরিখানি কাড়িয়া লইল। মহুয়া বলিল, "তুমি রাজার ছেলে, বামুন—কেন আমার জন্য তোমার এত কষ্ট! হতভাগিনী তোমার পায়ের কাছে মরিয়া যাউক। তুমি বাড়ী ফিরিয়া যাও, তুমি সকলের চোখের দুলাল, একটি সুন্দরী মেয়ে বিবাহ করিয়া সুখে ঘর কর। আমি তোমার সুখের পথে কাঁটা হইয়াছি, এখানে মরিতে পারিলে সে যে আমার সুখের মরণ হইবে।"

নদের চাঁদ—"আমার ঘরে ফিরিবার সাধ নাই, সাধ্য নাই, আমি জাত দিয়াছি;মা-বাবা-বন্ধু আমার সকলই তুমি। তোমাকে ছাড়া আমি কিছু জানি না, তথাপি যদি তুমি আমায় ছাড়িয়া দাও তবে এই ছুরি গলায় বিঁধাইয়া এখনি মরিব। তোমাকে না পাইলে আমি বাড়ী-ঘর গিয়া কি করিব! এইখানেই আজ আমার শেষ।"

তখন মহুয়া দৃঢ় পাদক্ষেপে উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "তোমার এত ভালবাসা, আমি কি ইচ্ছা করিয়া আমার মাথার সোনার সিঁথি ফেলিয়া দিতে পারি? উঠ, চল আমরা দুইজনে এখান হইতে পলাইয়া যাই। বাপের বড় বড় তেজি ঘোড়া আছে—তাহার একটা লইয়া আসি।"

দুষ্ট বেদের ষড়যন্ত্র ও প্রতিশোধ

ঘোড়া উপস্থিত হইল, দুইজনে সেই ঘোড়ায় চড়িয়া ছুটিল। তখন আভে আবার চাঁদকে ঢাকিয়াছে, অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় দুইটি ঘোড় সোয়ার চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী করিয়া নদীর পাড় দিয়া ছুটিল। বহুদূর হইতে ঘোড়ার খুরের শব্দ হোমরা বেদের কানে প্রবেশ করিল, সে মহুয়ার প্রতীক্ষা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেঃ—

"চাঁদ সুরুজ যেন ঘোড়ায় চড়িল।
চাবুক খাইয়া ঘোড়া শূন্যেতে উড়িল।।"

দুই জনে নদীর পাড়ের, কোন একটা স্থানে ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িল। মহুয়া—"লাগাম ছাড়িয়া ঘোড়ার পৃষ্ঠে মারল থাবা।" ঘোড়াকে সম্বোধন করিয়া মহুয়া বলিল, "ফিরিয়া বাপের বাড়ীতে যাও, যদি কহিতে পার জানাইও, মহুয়াকে জঙ্গলের বাঘে খাইয়াছে—সে আর বেদিয়ার কুটিরে যাইবে না।"

সম্মুখে বড় নদী। পার কূল দেখা যায় না, উত্তাল তরঙ্গ,—এই নদী কি করিয়া পার হইবে? কিন্তু পার হওয়া চাই, নতুবা বেদেরা আসিয়া পড়িবে। শেষ রাত্রের শেষ যাম অতীত প্রায়, তাহারা তীরে দাঁড়াইয়া উষার পূর্ব্বাভাষ দেখিতে পাইল, নদীর একটা অংশ এবং দিগন্ত-রেখায় কে যেন আবির ছড়াইয়া দিয়াছে! উত্তাল ঢেউগুলি তটভূমিতে আঘাত করিয়া উন্মত্ত যণ্ডের বেশে আবার আক্রমণ করিতে ফিরিয়া আসিতেছে!

"কি সুন্দর পাখীগুলি, নানাবর্ণের পালকে কত বিচিত্র রং-এর খেলা দেখা যাইতেছে, মহুয়া কি করিয়া এই ঘোর সিন্ধু পার হওয়া যায়?"

"না, ঠাকুর, ওগুলি পাখীর পাখা নয়, ভাল করিয়া দেখ, খুব বড় নৌকার অনেকগুলি পালের মত দেখাইতেছে না কি! কত উঁচুতে পালগুলি উড়িতেছে, ঐ দেখ কাছে আসিয়া পড়িয়াছে!"

উভয়ে সন্তুষ্ট হইল, এই নৌকায় যদি পার হইয়া ওপারে যাইতে পারি, তবে আর ভয় নাই।

নদের ঠাকুর চীৎকার করিয়া বলিল—

"আমরা দুইজন অনাশ্রয় পথিক, নদীর ওকূলে যাইব।"

"বিস্তার পাহাড়িয়া নদী ঢেউএ মারে বাড়ি।
এমন তরঙ্গ নদীর কেমনে দিব পাড়ি।।
গহিন গম্ভীরা নদী—অলছ তলছ পানি।
পার কৈরা দিলে বাঁচে এ দুইটি পরাণী।।"

সেখান দিয়া এক সদাগর যাইতেছিল। বন্যার রূপ দেখিয়া সে মুগ্ধ হইল ঃ—

"মাঝি মাল্লায় ডাক দিয়া কয় সদাগর
'কুলেতে ভিড়াও নৌকা,—তোমরা সত্বর।'

কুলেতে ভিড়িল নৌকা উঠিল দুজন।
চলিল সাধুর নৌকা পবন গমন।।”

সদাগরের ইঙ্গিতে যে স্থানে সেই নদীর ভীষণ আবর্ত্ত, সেইখানে সহসা মাঝিরা নদের ঠাকুরকে ফেলিয়া দিয়া অতি দ্রুত নৌকা বাহিয়া চলিল।

নদের চাঁদ সেই আবর্ত্তের ঘূর্ণীপাক হইতে একবার মাথা জাগাইয়া বলিলেনঃ—

“বিদায় দেও গো কন্যা আমায়—শেষ বিদায় মাগি।
তোমার আমার শেষ দেখা এই জন্মের লাগি।।”

এই কথা বলিয়া নদের চাঁদ জলের পাকে তলাইয়া গেলেন।

কন্যা চীৎকার করিয়া বলিলঃ—

“যে ঢেউএ ভাসাইয়া নিল আমার নদের চাঁদ।
সেই ঢেউএ পড়িয়া আমি ত্যজিব পরান।।”

বিদ্যুৎবেগে মহুয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, বিদ্যুৎবেগে মাঝি মাল্লারা তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া তুলিল।

সদাগর তখন মহুয়ার কাছে অগ্রসর হইয়া বলিল—“তুমি রূপে-গুণে ধন্যা,—তোমার অভাব কি? কেন তুমি মৃত্যু কামনা করিতেছ! চল, আমাদের দেশে, আমার বাড়ী লোক-লস্কর, সৈন্য সেনাপতিতে ভরা, তুমি সকলের ঠাকুরাণী হইয়া থাকিবে।

“ তোমার শয়নগৃহ সাজাইবার জন্য, তোমার প্রসাধনের জন্য অনেক দাসী থাকিবে, তারা তোমার পা ধোয়াইয়া দিবে, তুমি স্বর্ণ-পালঙ্কে বসিয়া থাকিবে। কাঁচা সোনায় গড়িয়া তোমার কানে কর্ণ-ফুল দিব—তুমি নীলাম্বরী শাড়ী পরিবে। শীতকালে তোমার জন্য মসৃণ কোমল তুলাভরা লেপ থাকিবে,—তাহাতে যদি তোমার শীত না ভাঙ্গে তবে আমার বুকের উপর তুমি থাকিবে। আমি নিজ হাতে পানের খিলি বানাইয়া তোমার মুখে দিব, গ্রীষ্মের রাত্রিতে আমরা জোড়মন্দির ঘরে থাকিব, পদ্মের গন্ধ লইয়া শীতল বাতাস সেই ঘরে আসিবে, আমার বুকে তুমি সুখে নিদ্রা যাইবে।

“আর যখন আমি বাণিজ্যে যাইব, তোমাকে লইয়া আমি দেশ দেশান্তর দেখাইব, কত রাজ্য, কত নদ-নদী, পাহাড়-প্রান্তর, রাজার রাজধানী আমরা দেখিয়া বেড়াইব।

"চাঁদ সূরজ যেন ঘোড়ায় চড়িল।
চাবুক খাইয়া ঘোড়া শূন্যেতে উড়িল।।"

(পৃষ্ঠা ২৮২)

হীরামণি দিয়া আমি তোমার গলার হার তৈরী করিয়া দিব। সোনা ও মতি দিয়া তোমার 'কামরাঙ্গা শাঁখা' গড়াইব। তোমার বেণী বাঁধিবার জন্য হীরামণি জড়িত কত সুন্দর সোনার সূতা থাকিবে, এবং উদয়তারা, নীলাম্বরী, মেঘডুম্বুর এবং অগ্নিপাটের শাড়ীতে তোমার রূপ আরও উজ্জ্বল হইবে, এই শাড়ীগুলির এক এক খানির মূল্য লক্ষ টাকা।

"বাড়ীর কাছে শাণে বাঁধা চারি কোণা পুষ্কর্ণী।
সেই ঘাটেতে তোমার সঙ্গে সাঁতার দিব আমি।।
অন্দর মহলে আমার ফুলের বাগান।
দুইজনে তুলিব ফুল সকাল বিহান।।"
চন্দ্রহার পরাইয়া নাখে দিব নথ।
নুপুরে সোনার ঝুনঝুনি বাজ্‌বে শত শত।।"

কিছু না বলিয়া মহুয়া তখন সদাগরের জন্য পানের খিলি বানাইতে লাগিল, তাহার সুন্দর ও গম্ভীর মুখে প্রাতঃসূর্য্যের আলো পড়িয়া তাহা আরক্ত করিয়া দিল। সাধু সেই মুখ দেখিয়া এবং মহুয়ার তাহার জন্য কর্ম্মতৎপরতা দেখিয়া হাতে স্বর্গ পাইল। এদিকে বেদেদের অভ্যাসমত মহুয়ার মাথার চুলে তক্ষকের বিষ বাঁধা ছিল, চুন ও খয়ের সঙ্গে মহুয়া গোপনে সেই বিষ মিশাইল। মহুয়ার মুখে আর গাম্ভীর্য্যের কোন চিহ্ন নাই, সে সদাগরের সঙ্গে হাসিয়া কৌতুক করিতে লাগিল এবং নিজ হাতের সাজা পানের খিলি আদর করিয়া সাধুর মুখে দিল—সাধু কৃতার্থ হইল।

"তুমি আমাকে পান খাইতে দিলে, একটা নেশাব আমেজ আসিয়াছে, তোমার কাছে আমি শুইয়া একটু ঘুমাইব।"

মহুয়া মাঝি-মাল্লাদের সকলের হাতে একটি করিয়া খিলি দিল। সেই খিলি খাওয়া মাত্র তাহারা নৌকার পাটাতনের উপর ঢলিয়া পড়িল। মহুয়া এই বিষের ক্রিয়া দেখিয়া ডাইনীর মত হাসিতে লাগিল এবং কালবিলম্ব না করিয়া তাহার সঙ্গে যে ছুরিটা ছিল, তাহা দিয়া ডিঙ্গার কাছি কাটিয়া ফেলিল।

"অচৈতন্য হইয়া সাধু পড়িয়াছে নায়।
কুড়ুল মারিল কন্যা ডিঙ্গার তলায়।।

ঝাঁপ দিয়া পড়ে কন্যা জলের উপর।
ভরা সহ সাধুর ডিঙ্গি ডুবি হৈল তল।।"

এই সমস্ত ব্যাপার এরূপ সাংঘাতিক দ্রুততার সহিত সম্পাদিত হইল যে উহা কোন ঐন্দ্রজালিক ঘটনার ন্যায় প্রতীয়মান হইল।

নদীর পরপারে বন, মহুয়া নদের চাঁদকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

"এই গভীর জঙ্গলের কোন্ খনিতে মণি লুকাইয়া আছে—কোন্ বনে ফুল ফুটিয়াছে—যাহার ঘ্রাণে আমার প্রাণ মত্ত হইয়া আছে? আমাকে সেই ফুলের সন্ধান কে দিবে? সেই মণির খনির কথা কে বলিয়া দিবে? হে পাখীসকল! তোমরা ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশে উড়িতেছ, আমার বঁধু ভাসিতে ভাসিতে কোথায় গিয়াছেন, আমাকে বলিয়া দাও, আমি জন্ম দুঃখিনী! হে বাঘ-ভালুক! আমি নিজের দেহ দিয়া তোমাদের ক্ষুধা মিটাইব, কিন্তু আগে আমার বন্ধুর সন্ধান আমাকে বলিয়া দাও। হে জলের হাঙ্গর কুম্ভীর! তোমরা আমার বিদেশী বন্ধুর কথা বলিয়া আমার কর্ণ তৃপ্ত কর—

"ডালেতে বসিয়া আছ ময়ূর ময়ূরী।
তোমরা কি জান সে কথা, কহ সত্য করি।।
দরিয়ায় গলিয়া পড়ে আমার হীরার হার,
কে কহিবে কোন্ অতলে সে হার আমার।।"

ঘুরিতে ঘুরিতে মহুয়া ক্লান্ত হইল, তাহার ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, শরীরে সুখ-দুঃখ বোধ নাই। বহু বন্য বাঘ হাঁ করিয়া আসিতেছে, কিন্তু মহুয়াকে দেখিয়া অন্য পথে চলিয়া যায়। অভাগীকে কে খাইবে? বড় বড় অজগর সর্প হরিণ ধরিয়া খায়, মহুয়াকে দেখিয়া দূরে চলিয়া যায়।

"আমাকে নদী তার শীতল জলে স্থান দিল না, জমিনের পশু ও হিংস্র জীব ক্ষুধার তাড়নায় দিনরাত পাগল হইয়া ঘোরে—তাহারাও হতভাগিনীকে নিল না।"

"আমার বঁধুকে আর পাইব না, এই কথা ভাবিতেআমার বুক ফাটিয়া যায়। এত বড় রাজ্যপাট তিনি আমার জন্য সমস্ত তৃণের মত ছাড়িয়া আসিলেন। এত বড় রাজপ্রাসাদ

ছাড়িয়া নদীর কূলে হিজল গাছের মূলে আশ্রয় লইলেন। দুষমন সদাগর সেই আমার প্রাণ-বঁধুকে জলে ডুবাইয়া মারিয়া ফেলিয়াছে!"

তিনি আমার জন্য প্রাণ দিলেন, আমি কি জন্য আর বাঁচিয়া থাকিব?

"এই না নদীর জলে ডুবিয়া মরিব।
বৃক্ষ ডালে ফাঁসি দিয়া পরাণ ত্যজিব।।"

পুনর্মিলন ও সন্ন্যাসীর হাতে বিপদ

"কিন্তু আমি এখনও সমস্ত চেষ্টা নিঃশেষ করি নাই। কি জানি যদি তিনি এখনও বাঁচিয়া থাকেন, ভাল হইয়া আমাকে না পাইয়া প্রাণ দিবেন, আমি বনে বনে, নদীর কূলে পুনরায় খুঁজিব—যখন সমস্ত সন্ধান বিফল হইবে, তখনও মরণের পথ খোলা থাকিবে।"

আবার মহুয়া গভীর জঙ্গলের ঘোর বনস্পতিগণের লতায় জড়ানো গূঢ় দেশে প্রবেশ করিল, ভাঙ্গা-মন্দির হইতে ও কি ক্ষীণ কাতর ধ্বনি উঠিতেছে!—

রাত্রি হইয়া আসিয়াছে, সর্প-সঙ্কুল সেই ভাঙ্গা ইঁটের স্তূপে মহুয়া প্রবেশ করিল,—কতকগুলি পাতা-লতার মধ্যে কঙ্কাল-সার একটা মনুষ্যের দেহ দেখিয়া সে চমৎকৃত হইল।

"শুকাইয়া গেছে মাংস পড়ে আছে হাড়।
মন্দিরের মাঝে দেখে কন্যা মড়ার আকার।।
চিনিতে না পারে কন্যা সুন্দর বয়ান।
লক্ষ্যিয়া দেখিল কন্যা ঠাকুর নদের চাঁদ।।"

এই কি সেই দেববাঞ্ছিত, রূপবান তরুণ রাজকুমার, কিন্তু প্রেমের চক্ষু তাহার রত্ন আবিষ্কার করিতে পারে—আবর্জ্জনা ও ধূলিবালি তাহার দৃষ্টি লোপ করিতে পারে না;মহুয়া ভাবিল, এখন যখন তোমায় একবার পাইয়াছি, তখন যেমন করিয়া হউক, তোমায় বাঁচাইব, নতুবা দুই জনেরই গতি এক হইবে।

তখন সেখানে একটি সন্ন্যাসী উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসীর মস্তকে জটা বাঁধা, গোঁপ ও শ্মশ্রু বহুল মুখ শীর্ণ ও শুষ্ক, চুলের বর্ণ কটা-পিঙ্গল, সে মহুয়াকে জিজ্ঞাসা করিল,—

"কে গো তুমি এই রাত্রিকালে হিংস্র জন্তু-সঙ্কুল এই ঘোর অরণ্যে আসিয়াছ? তোমাকে রাজকন্যা বলিয়া মনে হইতেছে, তরুণ বয়সে তুমি কি পাপ করিয়াছিলে, যাহাতে তোমার নির্ম্মম মাতা-পিতা তোমাকে বনবাস দিয়াছেন? তাঁহাদের হৃদয় নিশ্চয়ই পাষাণে গড়া, তোমার মত রূপসী কন্যাকেএই ঘোর বনে পাঠাইয়া দিয়া তাঁহারা কেমন করিয়া বাঁচিয়া আছেন?"

মহুয়া তাঁহার পা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। আদ্যন্ত সমস্ত কথা তাঁহাকে বলিবার সময় তাহার দুইটি চক্ষের জল পড়িয়া সন্ন্যাসীর পদদ্বয় ভিজাইল, সন্ন্যাসী তাঁহার লম্বা দাড়ি ও গোঁপ ও দীর্ঘজটা লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িল। সেই মৃতপ্রায় রোগীকে পরীক্ষা করিয়া সে বলিল—

"দারুণ অকাল্য জ্বর হাড়ে লাগি আছে।
পরাণে বাঁচিয়া আছে মইরা নাহি গেছে।।"

"আমি যাহা বলি তাহা কর, তোমার স্বামী বাঁচিয়া উঠিবে। ঐ যে গাছটি দেখা যাইতেছে, নিশ্বাস বন্ধ করিয়া নদীর জলে তাহার পাতা ভিজাইয়া লইয়া আইস, ঐ পাতার রস মন্ত্রঃপূত করিয়া খাওয়াইয়া দিলে এই রোগী ভাল হইবে।"

মহুয়া সমস্ত প্রাণমন দিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল ও রীতিমত দিনে তিনবার ঔষধ দিতে লাগিল। নদের ঠাকুর চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন, আরও দুই এক দিন পরে তিনি উঠিয়া বসিতে পারিলেন এবং মহুয়ার কাছে ভাত খাইতে চাহিলেন।

রাজকুমারের কথা শুনিয়া মহুয়া কাঁদিতে লাগিল। এদিকে সন্ন্যাসীর আদেশে মহুয়া রোজই তাহার পূজার জন্য সাজি ভরিয়া ফুল আনিতে যায়, কিন্তু যে দিন নদের চাঁদ ভাত চাহিলেন, সে দিনটা মহুয়া কাঁদিয়া কাটাইল, সে দিন আর সে ফুল তুলিতে গেল না।

"কোথায় পাইব ভাত এই গহিন বনে।
ফুল নাহি তোলে কন্যা থাকে অন্যমনে।।"

এদিকে সন্ন্যাসীর সংযমের বাঁধ টুটিয়া গিয়াছে, সে মহুয়ার রূপ-যৌবন দেখিয়া ভুলিয়া গিয়াছে। সে যতই চেষ্টা করে, কিছুতেই মনকে প্রবোধ দিতে পারে না। টাট্‌কা ফুলে সাজি

ভর্ত্তি, তবুও মধ্যরাত্রে আসিয়া সে দরজায় আঘাত করিয়া মহুয়াকে জাগায়। একদিন গভীর রাত্রে সে মহুয়াকে ডাকিয়া ঘুম হইতে উঠাইল এবং বলিল—"আজ পূর্ণিমা, শনিবার, চল, গভীর জঙ্গল হইতে তোমার স্বামীর ঔষধ কুড়াইয়া লইয়া আসি।"

গভীর বন—পথে স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ ও দম্পতির নিষ্কৃতি

সেই রাত্রে গভীর বন-পথে নদীর তীরে যাইতে যাইতে সন্ন্যাসী বলিল, "কুমারী, আমি তোমার রূপের মোহে পাগল হইয়াছি, তুমি আমাকে তোমার যৌবন দান করিয়া সুখী কর। আমি তোমার পদাশ্রিত, আমার কি অপরাধ, স্রষ্টা কেন তোমাকে এত রূপের রূপসী করিয়া গড়িয়াছিলেন?"

স্বামীর সেই অবস্থায় মহুয়ার মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সে পাগলের মত হইয়া গিয়াছে। সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া তাহার মস্তকে যেন কেহ খাঁড়ার আঘাত করিল। কিন্তু সে ভয় বা আশঙ্কার কোন কথা বলিল না, অতিশয় সংযত ভাষায় ধীর কণ্ঠে বলিল, "আমার স্বামীকে আগে বাঁচাইয়া দাও, তারপরে আমি সত্য করিতেছি, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিব।"

কিন্তু তাহার কথায় সন্ন্যাসীর যে প্রত্যয় হয় নাই, তাহার বিবর্ণ মুখ দেখিয়া তাহা বুঝা গেল। সন্ন্যাসী এবার তাহার খোলস ছাড়িয়া স্পষ্ট কথায় বলিল, "আমি তোমাকে স্পষ্ট কথায় জানাইতেছি—তোমাকে দুই দিন সময় দিলাম, তুমি এই সময়ের মধ্যে বিষ খাওয়াইয়া তোমার স্বামীকে মারিয়া ফেল।"

এই কথা শুনিয়া নিরুপায় অবস্থায় মহুয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল। নদের চাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করিল। রাজকুমার কি বলিবেন? তাঁহার উঠিয়া বসিবার সাধ্য নাই। দারুণ জ্বরে তিনি একেবারে শক্তিহীন হইয়া গিয়াছেন, দাঁড়াইবার বল নাই—দু পা চলিলে হাঁটুতে হাঁটুতে লাগে।

দুদিনের জন্য সুখের সংসার

মহুয়া সেইদিন ঘোর রাত্রে তাঁহাকে কাঁধে তুলিয়া লইল, পার্ব্বত্য পথে স্বামীর দেহ কাঁধে করিয়া দেবাদিদেব শিবের মত চলিতে লাগিলঃ--

"নিশিকালে যায় কন্যা ফিরে ফিরে চায়।
দারুণ সন্ন্যাসী যদি পাছে নাগাল পায়।।"

সেই পার্ব্বত্য প্রদেশের হাওয়ায় নদের চাঁদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইল। আর ছয় মাসের মধ্যে তিনি সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিলেন। মহুয়া পর্য্যাপ্ত আনন্দে সুস্বাদু বনের ফল ও ঝরণার জল লইয়া আসে, তাহাতে নদের চাঁদ তৃপ্তি লাভ করেন।

"ঝরণার জল আনে কন্যা, আনে বনের ফল।
তা খাইয়া নদের চাঁদের গায়ে হ'ল বল।।"

এইভাবে অনেক দিন সেই দম্পতি বনে বনে কাটাইয়া দিল, তাঁহাদের ঘর বাড়ী নাই, যেখানে সেখানে রাত্রি যাপন করা হয়। যেখানে পূর্ব্ব-রাত্রি যাপন করা হইয়াছিল, বনের পক্ষীর মত ফিরিয়া আবার সেই বনের কুলায়ে উপস্থিত হয়।

একটা জায়গা দেখিয়া নদের চাঁদের ভারি পছন্দ হইল, তাঁহারা সাতারিয়া নদীর অপর পারে গেলেন,

"সামনে পাহাড়িয়া নদী সাঁতার দিয়া যায়।
বনের কোয়েলা তথা ডালে বসি গায়।।
এইখানে বাঁধ কন্যা নিজ বাসা ঘর।
এইখানে থাকিব মোরা দোঁহে নিরন্তর।।
সামনে সুন্দর নদী ঢেউএ খেলয় পানি।
এইখানে রহিব মোরা দিবস রজনী।।
চৌদিকেতে রাঙ্গা ফুল ডালে পাকা ফল।
এইখানেতে আছে কন্যা মিঠা ঝরণার জল।।"

এইখানে দম্পতি কয়েকদিন ঘর করিল। তাহাদের সে সুখ স্বর্গ হইতে যেন দেবতারাও ঈর্ষা করিতে লাগিলেন।

একদিন মাছ খাইতে যাইয়া নদের ঠাকুরের গলায় মাছের কাঁটা বিঁধিল। বেদিয়ার মেয়ে অস্থির হইয়া দেবীকে কাল ও ধবল পাঁঠা মানত করিল। আর একদিন নদের চাঁদের জ্বর হইয়া মাথার বেদনা হইল, মহুয়া সারারাত্রি শিয়রে বসিয়া তাহার স্বামীর মাথায় কোমল

হাত বুলাইতে লাগিল। কোণা-কুণি পথ ধরিয়া নদের চাঁদ হাটের পথে যায়, মহুয়া তাঁহার কণ্ঠ লগ্ন হইয়া কানাকানি বলিয়া দেয়—"আমার জন্য কিন্তু নথ আনা চাই, দে'খ ভুল না।" দুইজনে বনের ফল পাড়িয়া ও কুড়াইয়া আনে,—দুইজনে আনন্দ করিয়া খায়। আলির পদচিহ্নযুক্ত একটা মালাম পাথর সেই নিভৃত জঙ্গলে পড়িয়াছিল, তাহারা তাহাতে শুইয়া গল্প করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়ে। প্রভাতে উঠিয়া তাহারা দুইজনে বনের বহুদূর ভ্রমণ করিয়া আসে,—আসিবার সময় বনের নানাপ্রকার সুস্বাদু ফল পাড়িয়া লইয়া আসেঃ—

"বাপ ভুলে মায় ভুলে, ভুলে ঘর-বাড়ী।
দেশ ভুলে বন্ধু ভুলে স্বজন পেয়ারী।।
মনের সুখে দুইজনে কাটে দিনরাত।
শিরেতে পড়িল বাজ পুন অকস্মাৎ।।"

বজ্রাঘাত

একদিন সন্ধ্যাবেলা সেই পার্ব্বত্য দেশে রক্তবর্ণ ফুলের মধ্যে অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিম আভা খেলিতেছিল, ক্রমশঃ সূর্য্য আর দেখা যায় না, পশ্চিম আকাশের লাল রং মিলাইয়া গেল এবং ঘনীভূত মেঘ দিক্-দিগন্ত ছাইয়া ফেলিল। বন-দম্পতি দুইজনে বহুদূর পর্য্যটন করিয়া আসিয়াছিল, পরস্পরের সঙ্গ লাভ করিয়া তাহাদের পথ-শ্রান্তি বোধ হয় নাই। আনন্দের হিল্লোলে যেন দীঘির জলে দুটি নব-নলিনী ভাসিয়া বেড়াইয়াছে।

সেদিন মালাম পাথরে বসিয়া দুইজনে আলাপ করিতেছিল। নদের চাঁদ বলিলেন—"আমার একটা কৌতূহল আছে, তাহা তুমি মিটাও নাই। তুমি কাহার কন্যা, কিরূপে দস্যুদের হাতে পড়িলে এবং অতীত জীবন কি ভাবে কাটাইয়াছ, কতবার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছি, প্রতিবারেই তুমি আমার কথার উত্তর এড়াইয়া গিয়াছ,—তোমার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়াছে; তোমার মনের বেদনা বুঝিয়া আমি পীড়াপীড়ি করি নাই, আজ সেই কথা আমাকে বল! তুমি সেদিন বলিয়াছ, যখন ছয় মাসের তুমি শিশু, তখন হোমরা তোমাকে চুরি করিয়া লইয়া আসিয়াছে, ইহার অধিক কিছু বল নাই, কেবল দরবিগলিত অশ্রুতে তোমার মুখ ভাসিয়া গিয়াছে, আজ একটিবার বল—এইখানে বসিয়া তোমার অতীত ইতিহাস শুনিব।"

অদূরে নদী বহিয়া যাইতেছিল এবং মেঘ গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে নদীতরঙ্গের ক্ষুব্ধ গর্জ্জন শোনা যাইতেছিল। এমন সময় আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করিয়া কাহার বাঁশী বাজিয়া উঠিল।

সেই সুর শুনিয়া মহুয়া থরথরি কাঁপিতে লাগিল এবং নদের চাঁদের ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িল। "তোমাকে কি কোন সর্পে দংশন করিয়াছে", অতি ব্যস্তসমস্ত ভাবে রাজকুমার তাহার দেহ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

মহুয়া অতিকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া আস্তে আস্তে বলিল—"আমাকে সাপে কামড়ায় নাই কিন্তু আমাদের সুখ-নিশি প্রভাত হইয়া আসিয়াছে, কুমার, কাল যদি বাঁচিয়া থাকি, তবে আমি তোমাকে আমার অতীত ইতিহাস শুনাইব। কিন্তু আমাদের দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে। ঐ যে বাঁশীর সুর শুনিতে পাইলে, উহা আমার সই পালঙ্কের সঙ্কেত-বাঁশীর সুর। বেদেরা বহু চেষ্টায় আমাদের সন্ধান জানিতে পারিয়াছে, দলবল লইয়া আমার ধর্ম্ম-পিতা হোমরা আসিতেছে। সইএর সাবধানতা-জ্ঞাপক সঙ্কেতে আমি কি করিব? এখান হইতে পলাইবার আর উপায় নাই। আজ রাত্রি তোমার বুকে মাথা রাখিয়া শুইয়া থাকিব। আমার এমন আরামের স্থান স্বর্গেও মিলিবে না। কি করিব? বিধাতা আমাকে স্বর্গ-সুখ হইতে বঞ্চিত করিলেন!"

নদের চাঁদের গায়ে হেলিয়া মহুয়া কুটিরে প্রবেশ করিল, সাদা ও রক্ত সুগন্ধি ফুল বাসর-শয্যার এক কোণে সাজি ভরিয়া মহুয়া রাখিয়া দিয়াছিল, আজ আর সেই সুখের বাসর সাজাইতে তাহার সামর্থ্যে কুলাইল না। সে প্রাণপতিকে নিবিড়ভাবে জড়াইয়া ধরিয়া মৃত্যুর অপেক্ষা করিয়া রহিল।

রাত্রি প্রভাত হইলে তাহারা কুটির ছাড়িয়া বাহিরে পা দেওয়া মাত্র দেখিতে পাইল, বেদেদের কুকুর কুটিরখানি বেষ্টন করিয়া আছে, সম্মুখে হোমরা বেদে ও তাহার দলবল। হোমরার হাতে বিষাক্ত ছুরি, বিদ্যুতের মত চমকাইতেছে। হোমরা ছুরিখানি মহুয়ার হাতে দিয়া বলিল, "তুমি এই মুহূর্ত্তে আমার দুষমনের বুকে এই ছুরি বিঁধাইয়া দাও, এবং আমার সঙ্গে চলিয়া আইস। ছোটকাল হইতে আমি তোমাকে কত যত্নে পালন করিয়াছি এবং এই সুজন বেদেকে আমাদের সমস্ত খেলা ও কৌতুক শিখাইয়াছি। এই সুগঠিত-দেহ প্রিয়দর্শন মূর্ত্তি সুজন তোমার অনুরক্ত, ইহাকে আমি আমার কন্যা-জামাতারূপে গ্রহণ করিয়াছি।

তুমি ইহাকে গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে আমার মনে একটু সান্ত্বনা দান কর, এবং তোমার জন্য এত যে করিলাম, তাহার এই প্রতিদান দিয়া আমাকে সুখী কর এবং তুমি নিজেও সুখী হও।"

মহুয়ার মুখ এবার ফুটিল, সে এ পর্য্যন্ত হোমরার কোন আদেশ লঙ্ঘন করে নাই, তাহার কোন কথার প্রতিবাদ করে নাই। আজ হোমরার চেহারা সিন্দূরের আভাযুক্ত কালো মেঘের মত,—তাহার কাল বর্ণের উপর ক্রোধের লালিমা দেখা যাইতেছে,—চোখ দুটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত জ্বলিতেছে, এই কালবৈশাখী মেঘকে দেখিলে শত্রুর মুখ শুকাইয়া যায়। মহুয়া কিন্তু এবার ভয় পাইল না,—সে ধীর কণ্ঠে করুণ স্বরে বলিল, "বাবা, তুমি কোন্ ব্রাহ্মণের আশ্রয় হইতে, কোন্ জননীর মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদ উপেক্ষা করিয়া আমাকে তুলিয়া আনিয়াছিলে, তাহা আমি জানি না, আমি জন্মে মা বাপ কি বস্তু তাহা দেখিতে পাই নাই।

"শুন শুন ধর্ম্ম-পিতা বলি যে তোমায়।
কার বুকের ধন তোমরা আনিছিলা হায়।।
ছোট কালে মা বাপের কোল শূন্য করি।
কার কোলের ধন তোমরা করেছিলা চুরি।।
জন্মিয়া না দেখিলাম কভু বাপ-মায়।
কর্ম্ম দোষে এত দিনে প্রাণ মোর যায়।।"

পালঙ্ক সখীর দিকে চাহিয়া মহুয়া বলিল, "এই বেদেদের মধ্যে তুমিই আমার মনের বেদনা বুঝিতে পারিবে।" এই বলিয়া রাজ-কুমারকে বলিল, "তোমার পাদপদ্মে অসংখ্য প্রণাম, জন্মের মত তোমার মহুয়াকে বিদায় দেও। মহুয়ার জন্য অনেক সহিয়াছ, এবার তোমার আমার দুঃখের শেষ"—বলিতে যাইয়া চোখে জল আসিতে উদ্যত হইল। কিন্তু মহুয়া সে উদ্যত অশ্রু সম্বরণ করিল এবং হোমরাকে বলিল—

"বাবা,—আমি তোমার সুজন-খেলোয়াড়কে চাই না। তুমি কার সঙ্গে কার তুলনা করিতেছ? চন্দ্রকে পরাজয় করিয়া আমার স্বামীর কান্তি শোভা পাইতেছে, তাঁহার কাছে সুজন বাদিয়ার জোনাকীর মত ক্ষীণ আলো। আমার স্বামীকে ছাড়িয়া আমি একদিনও বাঁচিতে

"সোনার তরুয়া বন্ধু একবার দেখ,
আমার চক্ষু নিয়া তুমি একবার দেখ।"

কাল মেঘের মত হোমরা গর্জ্জন করিয়া উঠিল, এবং নদের চাঁদকে হত্যা করিতে মহুয়াকে আদেশ করিল।

তখন ধীরে ধীরে মহুয়া সেই বিষাক্ত ছুরি নিজের বুকে বিঁধাইল এবং সেইখানে ঢলিয়া পড়িল। বাদিয়ার দল তখন নদের চাঁদের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল।

সমাধির দৃশ্য, পালঙ্ক সই

ইহার পরে আর একটি দৃশ্য। হোমরা বেদের চক্ষের জল মানিল না, কাল মেঘের বর্ষণ আরম্ভ হইল, সে নিজের দলকে ডাকিয়া বলিল—"তোমরা দেশে চলিয়া যাও, মান্‌কে তোমাদের দলপতি হইবে। আমি কি লইয়া দেশে যাইব? যাহাকে ছয় মাসের শিশু-কাল হইতে বুকে করিয়া এত যত্নে পালন করিয়াছি, সেই বুকের ধন ফেলিয়া আমি কি লইয়া ঘরে যাইব? রাজকুমার মহুয়াকে ভালবাসিত, সে ভালবাসা কথার কথা নহে, মহুয়ার জন্য সে রাজ্য-ধন-জাতিকুল সব ছাড়িয়া বনবাসী হইয়াছিল। এতটা জানিলে, উভয়ের এতটা প্রগাঢ় ভালবাসার কথা জানিলে, আমি বিরোধী হইতাম না, আমি ভাবিয়াছিলাম—নদের চাঁদ চোরের মত আমার ঘরে হানা দিয়া মহুয়াকে লইয়া পলাইয়া আসিয়াছে।"

হোমরা মানিককে কহিল—

"হোমরা ডাক দিয়া বলে মানক্যা ওরে ভাই।
দেশেতে ফিরিয়া আমার কোন কার্য্য নাই।।
কবর কাটিয়া দেহ মহুয়াকে মাটি।
বাড়ী ঘর ছাইড়া ঠাকুর আইল কন্যার লাগি।
দুইজনে পাগল ছিল দুই জনের লাগি।।
হোমরার আদেশে তারা কবর কাটিল।
এক সঙ্গে দুইজনে মাটি চাপা দিল।।

"সোনার তরুয়া বঁধু একবার দেখ..." (পৃষ্ঠা ২৯৩)

বিদায় হইল সব বাদিয়ার দল।
যে যাহার স্থানে গেল শূন্য সেই স্থল।।”

বাদিয়ারা দেশে চলিয়া গেল, কোন অনির্দ্দিষ্ট পথে অনুতপ্ত বাদিয়ার দলপতি শোকভারাক্রান্ত চিত্তে ঘোর অরণ্যের দিকে চলিয়া গেল।

কেবল রহিল সেখানে পালঙ্ক সই। সে ছিল মহুয়ার সুখ-দুঃখের সাথী।

“রহিল পালঙ্ক সই সুখ-দুঃখের সাথী।
কাঁদিয়া পোহায় কন্যা যায়রে দিন রাতি।।
অঞ্চল ভরিয়া কন্যা বনের ফুল আনে।
মনের গান গায় কন্যা বইসা মনে মনে।।
চক্ষের জলেতে ভিজায় কবরের মাটি।
শোকেতে পাগল হৈয়া করে কাঁদাকাটি।।”

সে কাঁদিয়া গান করে, উঠ সই, আবার তোমরা প্রেমের খেলা খেল, সেই দৃশ্য দেখিয়া আমার চক্ষু তৃপ্ত হউক। দুরন্ত বাদিয়ার দল চিরদিনের জন্য চলিয়া গিয়াছে, তাহারা আসিবে না। আমি চিকনিয়া ফুলে তোমাদের জন্য মালা গাঁথিয়া দিব। আমরা দুই সই কাড়াকাড়ি করিয়া ফুলেব মালা গাঁথিব এবং

“দুইজনে সাজাইব ঐ না নাগর কালা”
“পালঙ্ক সইয়ের চক্ষের জলে ভিজে বসুমাতা।
এইখানে হ'ল সাঙ্গ নদের চাঁদের কথা।।”

আলোচনা

আমি যখন এম-এ ক্লাসের ছাত্রদিগকে পড়াইতাম, তখন প্রতিবৎসর নবাগত ছাত্রদিগকে এই একটি প্রশ্ন করিতাম,—“নদের চাঁদ ও মহুয়া—উভয়ে উভয়ের প্রতি অনুরক্ত ছিল,—ইহাদের মধ্যে তোমরা কাহাকে উচ্চস্থান দিতে চাও,—প্রেমের ত্যাগ হিসাবে কাহাকে বড় বলিবে।”

অধিকাংশ ছাত্রের এক উত্তর, নদের চাঁদ শ্রেষ্ঠ, বেদের মেয়ের ত্যাগ তো কিছুই নহে। এত রূপ, এত গুণ, এত ঐশ্বর্য্য, এত বড় বামুনের কুল—সে সমস্তই তো বিসর্জ্জন দিয়াছিল নদের চাঁদ—এই বেদের মেয়ের জন্য। মহুয়া আর তেমন কি করিয়াছে;এত বড়, সর্ব্ব গুণে শ্রেষ্ঠ,—তরুণ বয়স্ক প্রণয়ীকে পাইয়া তো সে কৃত-কৃতার্থ হইয়া গিয়াছে, তাহার ত্যাগ তো তুলনায় কিছুই নহে। যখন হোমরা বামুন রাজার নগর হইতে তাহাকে লইয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে তাহার বাড়ীতে লইয়া গেল, তখন সে প্রতিবাদ না করিয়া বাপের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। এদিকে রাজকুমার তাহার রাজ্যপাট ছাড়িয়া—বনে জঙ্গলে উপবাসী থাকিয়া গাছের তলায় শুইয়া থাকিত, তাহার চোখে ঘুম ছিল না, মাথার কুঞ্চিত চাঁচর কেশ জটাবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। যিনি স্বর্ণপালঙ্কে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুইতেন, পাচকেরা রাত্রি দিন যাঁহার জন্য সুখাদ্য প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত থাকিত, যাঁহার সেবার জন্য দাসদাসী চাকর নফরের অভাব ছিল না, একটু শিরঃপীড়া হইলে চিকিৎসকের মেলা বসিয়া যাইত, সেই রাজকুমার নদের চাঁদ বেদের মেয়ের জন্য যাহা সহিয়াছিলেন, তাহার তুলনা নাই। ঘুরিয়া ফিরিয়া নদের চাঁদের মহিমা কীর্ত্তনই অনেক ছাত্র করিতেন।

কিন্তু দুই একটি ছাত্র মহুয়ার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে চেষ্টিত ছিলেন।

তাহারা বলিতেন—যাহার যাহা আছে সে তাহা ত্যাগ করিলে যথেষ্ট ত্যাগ হয়, ফকির কখনও রাজ্য ত্যাগ করিতে পারে না, সে যদি তাহার ভিক্ষার ঝুলিটি ত্যাগ করে, তবেই বুঝিতে হইবে, তাহার সর্ব্বাপেক্ষা বড় ত্যাগ করিয়াছে। সুতরাং মহুয়া যদি রাজপদ ত্যাগ না করে, তবে তাহাকে ছোট বলা যায় না। এখন দেখিতে হইবে, তাহার যাহা কিছু তাহার সমস্তখানি তাহার প্রেমাস্পদের পায়ে সে দিতে পারিয়াছিল কি না। রাজপুত্র বনে যাইয়া মহুয়ার জন্য ছয়মাসকাল অকথ্য কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু এই ছয়মাস মহুয়া কি করিয়াছে তাহা দেখিতে হইবে।

এই ছয় মাস মহুয়া আঁচল পাতিয়া ভূমি শয্যায় শুইয়াছে, সারারাত্রি সে একটুও ঘুমায় নাই। মাথার ব্যথা ছুতো করিয়া সে একদিনও রান্না বাড়া করে নাই, হয়ত বন্য কোন কষায় ফল খাইয়া জীবন ধারণ করিয়াছে। সে তাহাদের দলের লোকের সঙ্গে খেলা দেখাতে যায় নাই, কোন কৌতুক করে নাই. নীরবে কাঁদিয়াছে এবং মৃতের মত ঘরের এক কোণে

পড়িয়াছিল, যেদিন নদের ঠাকুর আসিলেন সে দিন অকস্মাৎ সে সজীব ও সক্রিয় হইয়া দাঁড়াইল। সঙ্গীরা দেখিয়া বিস্মিত হইল—

"ছয় মাসের মড়া যেন সামনে হৈল খাড়া।"

তাহারা মহুয়ার আকস্মিক কর্ম্মঠতার পরিচয় পাইয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

সুতরাং নদের চাঁদ ছয়মাস বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া যে কষ্ট সহিয়াছেন, মহুয়া সেই বন্যদেশের নিভৃত কুঁড়ে ঘরে পড়িয়া তাঁহার জন্য কম কষ্ট সহে নাই।

নদের চাঁদ প্রেমের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিলেন, বড় মানুষের ছেলে আদরে লালিত। তাঁহার আবদারের অন্ত নাই। যখন তাঁহার ভালবাসা জন্মিল, তখনই সমস্ত প্রাণমন ঢালিয়া দিলেন। সেই যে দড়ির উপর কলসী লইয়া নৃত্যের সময়—তিনি বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "পড়্যা বুঝি মরে," প্রথম পরিচয়ে এই দুশ্চিন্তা তাঁহার হৃদয়ের অগ্রদূত। মহুয়াকেও প্রথম হইতেই আকৃষ্ট হইতে দেখিতে পাই। সে খেলা সাঙ্গ করিয়া অনেক কিছু পুরস্কার চাহিল, কিন্তু মনে মনে বলিল—"নদের ঠাকুরের মন যেন গো পাই" উভয়ের উভয়ের প্রতি প্রথম দর্শন হইতে আকৃষ্ট হইয়াছিল—নদের চাঁদের কোন সংযম ছিল না, তিনি প্রেমের মহাম্বুধিতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিয়া ভাসমান একটি তৃণের মত অদৃষ্টের পথে চলিয়াছিলেন। এই গতি কোথায় থামিবে, কিম্বা কোন্ লক্ষ্যে তাঁহাকে পৌঁছাইবে এ সকল তাঁহার মনে উদয়ই হয় নাই। তিনি প্রেম-দেবতার হাতের একটা পুতুলের মত হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার নিজের কোন শঙ্কা ছিল না, তিনি একবারে আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন। প্রেম ধর্ম্ম তাহাকে অপূর্ব্ব সহ্য গুণ দিয়াছিল, ভাল মন্দের বিচার, ন্যায় অন্যায়ের বিচার, ভবিষ্যতের চিন্তা, নিজ সুখ-দুঃখের জ্ঞান, বিপদের আশঙ্কা—এ সমস্তই তাঁহার লুপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং নদের চাঁদ যে প্রেমের আদর্শ হিসাবে কাহারও অপেক্ষা কোন বিষয়ে ন্যূন ছিলেন, তাহা বলা যায় না। প্রেম-দেবতার পদে সর্ব্বস্ব অর্ঘ্য দিয়া তিনি তাহার পূজারী হইয়াছিলেন। ইহার খুঁত ধবিবে কে? যে দেশেই যিনি প্রেমের বড় আদর্শ দেখাইয়াছেন, কেহই নদের চাঁদকে ডিঙ্গাইয়া যাইতে পারেন না।

কিন্তু মহুয়ার চরিত্রে প্রেম-বৃত্তি আদর্শে পৌঁছিয়াও তিনি আর কতকগুলি গুণ দেখাইয়াছেন, যাহা সাহিত্য বা সমাজে আমরা সচরাচর দেখিতে পাই না। তিনি অসংযত

অবাধ প্রেমের স্রোতে গা' ঢালিয়া দিয়াও সংযম এবং ভাবী চিন্তার প্রবৃত্তি সজাগ রাখিয়াছিলেন। তাঁহার মত উদ্ভাবনী শক্তিও মেয়েদের মধ্যে দুর্লভ।

প্রথমতঃ মহুয়া রাজকুমারের প্রেমকে খুব বিশ্বাসের চোখে দেখিতে পারেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন, বড়মানুষের দুলাল ছেলের এ একটি খেয়ালও হইতে পারে। তিনি নিজে মজিয়া কুল শীল বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নদের চাঁদকে মজাইতে প্রস্তুত হন নাই। তিনি যদি ইঙ্গিতে তাঁহাকে বুঝাইতেন, তাঁহার পিতার সঙ্গে তিনি যাইবেন না, তাহা হইলে হোমরা বেদের কি সাধ্য ছিল, মহুয়াকে লইয়া সে স্থান হইতে পলাইয়া যাইতে? কিন্তু তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার এই সাহচর্য্য কুমারের পক্ষে শুভঙ্কর হইবে না; তাঁহার মাতা এবং স্বগণ কেহই এই প্রেমের প্রশ্রয় দিবেন না, হয়ত তিনি রাজ্য-পদ, কুল শীল হারাইয়া একবারে নিঃস্ব হইবেন। তাহার পর বড় মানুষের খেয়াল; যেমন শতকরা ৯৯ জনের হয়, কতকদিন পরে যদি রাজকুমারের খেয়াল ছুটিয়া যায়, তবে তাঁহার কি গতি হইবে? তখন তিনি দেখিবেন, বেদের মেয়ের উপর তাঁহার আর অনুরাগ নাই, অথচ তাঁহার জন্য তিনি সম্পূর্ণরূপে রিক্ত হইয়া সর্ব্বস্ব বঞ্চিত হইয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন! তাঁহার এই অবস্থা মহুয়া কল্পনা করিতেও শঙ্কিত হইয়াছিল। প্রকৃত ভালবাসার ধর্ম্ম এই যে, তাহা প্রণয়ীর ইষ্ট চিন্তাকে সর্ব্বাপেক্ষা বড় করিয়া দেখে, এই প্রেরণায় মহুয়া নিজে সর্ব্বস্ব বঞ্চিত হইয়াও রাজকুমারের যাহা ইষ্ট তাহা নিজের সাময়িক সুখের প্রবৃত্তি অপেক্ষা বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন এবং এই জন্য তাঁহার বিরহে মৃত্যুকে নিঃশব্দে বরণ করিয়া লইবার জন্য স্বীয় বন্য কুটিরে হোমরার সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। প্রণয়ীর এই ভবিষ্যত ইষ্ট কামনা তাঁহার প্রেমের একটি অঙ্গ, আমরা ইহার পরে আরও পরিষ্কার করিয়া দেখাইব।

প্রতি বিপদের মুখে মহুয়া যে উদ্ভাবনী শক্তি দেখাইয়াছেন, তাহাও সচরাচর মেয়েদের মধ্যে দেখা যায় না, এজন্য কোন উপায়ই তাঁহার অগ্রাহ্য হয় নাই। কৌশলে হনন, নৌকার ভরাডুবি করিয়া ধনপ্রাণে শত্রুর সর্ব্বনাশ, এসমস্ত উপায় হিসাবে তাঁহার গ্রহণীয় হইয়াছিল। সদাগরকে তিনি ভালবাসার ভাণ দেখাইয়াছিলেন, সন্ন্যাসীকেও তিনি মিথ্যা ভরসা দিয়াছিলেন, "আমার স্বামীকে বাঁচাইয়া দাও, আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব।" মোট কথা তাঁহার প্রাণের দেবতাকে লাভ করা ও তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য যখন যে প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা তিনি করিয়াছেন। তাহাতে মিথ্যা কথা. লোক হত্যা ও পরের সর্ব্বস্ব লোপ—

এসকল কোন কার্য্য হইতে তিনি বিরত হন নাই। এই রমণীর মত সর্ব্ব-বিপদে নিজের সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিয়া রঙ্গমঞ্চে অগ্রসর হইতে কে কোন্ নারীকে দেখিয়াছে?

যখন সন্ন্যাসীর হাতে লাঞ্ছিত হইয়া স্বামীর প্রাণ-নাশের প্রচুর সম্ভাবনা তিনি দেখিলেন, তখন সম্পূর্ণরূপে অসহায় কঙ্কালসার উঠিতে বসিতে অশক্ত নদের চাঁদকে পৃষ্ঠের উপর ফেলিয়া—শিকার লইয়া পলায়ণপর বাঘিনীর মত তিনি পর্ব্বতের শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। বঙ্গনারীর এই অপূর্ব্ব দৃশ্য আর কোথায় কে দেখিয়াছে? প্রাচীন সাহিত্যে বাঙ্গালী রমণী অনেকটা সীতার ছাঁচে ঢালা; তাঁহারা সহিতে, প্রাণত্যাগ করিতে, প্রেমের জন্য যথাসাধ্য আত্মসমর্পণ এমন কি প্রাণ ত্যাগ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত! কিন্তু এই পাহাড়িয়া রমণীর বিপদের সময় অলৌকিক উদ্ভাবনী শক্তি ও আশ্চর্য্য মৌলিকতা কে কবে দেখাইয়াছে। মহুয়া চরিত্র জলে-ভাসা পদ্ম-ফুল নহে, বায়ু-চালিত তৃণ নহে, প্রেমের স্রোতে নিমজ্জমান একখানি স্বর্ণ-ডিঙ্গা নহে, এই চরিত্রের আগাগোড়া মৌলিক রহস্যাবৃত। বঙ্গ সাহিত্যে কেন, অন্য কোন সাহিত্যে ইহার জোড়া আছে বলিয়া আমরা জানি না। এজন্য অধ্যাপক ষ্টেলা ক্রমরিক বলিয়াছেন, "ভারতীয় সাহিত্য আমি যতটা পড়িয়াছি তন্মধ্যে মহুয়ার মত আর একটি চিত্র আমি দেখি নাই।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহুয়ার মনে অনেক দিন পর্য্যন্ত সন্দেহ ছিল যে, নদের ঠাকুরের ভালবাসা গভীর হইলেও তাহার স্থায়ীত্বে বিশ্বাস নাই; এই গভীর স্নেহ কিছু দিন পরে শুকাইয়া যাইতে পারে,—উহা বড় মানুষের খেয়াল, খুব ধোঁয়ার সৃষ্টি করিয়া কতক দিনের মধ্যে উবিয়া যাইতে পারে। এই আশঙ্কায় তিনি প্রথম প্রথম ইহার বেশী প্রশ্রয় দেন নাই, কুমার পাছে এই মোহে পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হন—এবং শেষে গৃহে ফিরিবার পথ না পান।

কিন্তু যে দিন মহুয়া সত্য সত্য বুঝিল, নদের চাঁদের প্রেম 'নিকষিত হেম', ইহা বড় মানুষের ছেলের একটা চলন্ত খেয়াল নহে, সেদিন সম্পূর্ণভাবে তাঁহার কাছে সে ধরা দিল। সেই চাঁদের জ্যোৎস্নায় অভ্রে বেষ্টিত আধ-আলো আধ-আঁধার রাত্রে নদীর ঘাটে হিজল গাছের মূলে সে শায়িত নদের চাঁদের পাশে বসিয়া বলিল, "তুমি মায়ের কত আদরের ছেলে, চোখের মণি! তোমার অতুল ঐশ্বর্য্য, ব্রাহ্মণ বংশের সম্মান, তুমি পাগল, এসকল কেন খোয়াইবে? তুমি ঘরে ফিরিয়া যাও। সুন্দরী দেখিয়া কোন রমণীকে বিবাহ কর। বাদিয়ার এই বালিকাকে দেখিয়া কেন চির-হতভাগ্যের জীবন বরণ করিতে চাহিতেছ?"

সেই দিন উত্তরে রাজকুমার অতি করুণ কণ্ঠে বলিলেন, "ছি মহুয়া! তুমি কি বলিতেছ! আমি তো তোমার হাতে ভাত খাইয়াছি, আমার জাতের বালাই কি আর রাখিয়াছি! আমি বাড়ী-ঘর স্বজন-বন্ধু সব ছাড়িয়া আসিয়াছি আমার ঘরে ফিরিবার আর কোন উপায় রাখি নাই, তুমি যদি আমায় প্রত্যাখ্যান কর তবে এখনই এই বিষের ছুরি বুকে বিঁধাইয়া তোমাকে দেখিতে দেখিতে প্রাণ ত্যাগ করিব, আমার ইহা ভিন্ন এখন আর কোন গতি নাই।"

এই কথা শুনিয়া মহুয়া বুঝিল, সত্যই তো কুমার জাতি দিয়াছেন, বাড়ী ফিরিবার পথ তিনি নিজে নিরোধ করিয়াছেন, তবে তো চিরদিনের জন্য ইনি আমার হইয়াছেন। আনন্দে তাহার চক্ষু প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, সে বলিল, "এখন আমার স্বগণ, ধর্ম্মপিতা—ইহাদের কেহ আর আমার স্বগণ নহে। তুমি যেখানে যাইবে, সেইখানে আমার পথ—আমার অন্য পথ নাই।"

মহুয়া ও নদের চাঁদ সেইদিন ঘোড়ায় চড়িয়া রওনা হইল, তাহা পৃথিবী ছাড়িয়া যে স্বর্গের পথ—সেখানে দুধারে কন্টকতরু থাকুক—তাহাতে প্রতি মুহূর্ত্তে প্রাণের আশঙ্কা থাকুক, সেই পথই মহুয়ার পরম ঈপ্সিত পথ। সেই দিন সে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নদের চাঁদের কাছে ধরা দিল, সে পূর্ব্বেই তাহার কাছে গোপনে মনের ভিতরে আত্মদান করিয়াছিল, আজ বিজয়ের গৌরবে উৎফুল্ল হইয়া সে প্রকাশ্যভাবে নদের চাঁদের হইয়া গেল।"

মহুয়া নদের চাঁদের কি গুণ দেখিয়া ভুলিয়াছিল? সে রূপে মুগ্ধ হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহার অনুরাগ প্রধানত রাজকুমারের ত্যাগ ও আন্তরিকতার উপর আস্থামূলক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যে দিন কংশ নদীর পাড়ে উঠিয়া সে নদের ঠাকুরকে খুঁজিয়া পাইল না সে দিন তাহার অনুরাগের কারণ বিলাপচ্ছলে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলঃ—

"রাজপুত্র হইয়া যে আমার জন্য ভিখারী হইয়াছে, এত ধন-দৌলত, এত বংশের মর্য্যাদা, বড় মানুষের ছেলের এত প্রলোভন যাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই—আমার জন্য যে সমস্ত ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুক হইয়া আসিয়াছে, তাহাকে ছাড়া আমি কেমনে থাকিব? সে যে আমার গলার হার ছিল—

"দরিয়ায় পড়ে গেছে আমার গলার হার।"

গুণ-উপলব্ধির উপর এই ভালবাসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এজন্য এই প্রেম এত দৃঢ় ছিল! ইহা চোখের নেশা নহে।

মাণিকতারা

ব্রহ্মপুত্র নদ

গল্পটি গানের ভাষায় রচনা করিয়াছেন আমির নামক এক বৃদ্ধ মুসলমান কবি। তাঁহার বাড়ী ছিল মৈমনসিংহ জেলার কোন গ্রামে; উত্তর দিকে বিশালস্রোতে ব্রহ্মপুত্র নদ বহিয়া যাইত। ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে গঞ্জের হাট নামক একটি বন্দর ছিল। এই বন্দরটি গল্পবর্ণিত ঘটনার লীলাস্থল। কবি সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মপুত্র নদের একটি প্রশস্তি গাহিয়া গঞ্জের হাটের বর্ণনা দিয়াছেন।

ব্রহ্মপুত্র নদের আবর্ত্তশীল জলরাশির অভ্যন্তরে মাঝে মাঝে প্রলয়ঙ্কর একটা ক্ষুব্ধ গর্জ্জন শোনা যাইত; লোকে বলিত, নদের গভীরতর নিম্নদেশে একটা ব্রহ্মদৈত্য বাস করে এবং সে-ই মাঝে মাঝে ওরূপ একটা ক্ষুব্ধ গর্জ্জন করিয়া উঠে। কবি এই নদের ভয়াবহ রূপ যেরূপ আঁকিয়াছেন, তেমনই আবার সেই বিরাট জলরাশির মহান্ দৃশ্য দেখিয়া বলিয়াছেনঃ—

"হায় রে গাঙ্গের কি বাহার!
ও তার এপার আছে, ওপার নাইকো,
চোখে মালুম দেয় না তার।"

এপারে থাকিয়া কবি বলিতেছেন, "এপার তো দেখিতেছি, কিন্তু ওপার নাই"—তারপরে কথাটা আর একটু শুদ্ধ করিয়া বলিতেছেন, "হয়ত ওপারও আছে, কিন্তু তাহা চোখে মালুম

হয় না।” জলের ঘূর্ণিপাক দেখিয়া তিনি অভিভূত হইয়া তাহার মধ্যেও নদের মহান্ ছবি উপলব্ধি করিয়া বলিতেছেনঃ—

“ও তার পানির তলে পাক পইড়াছে দেখতে লাগে চমৎকার।
গাঙ্গের কি বাহার।।”

কিন্তু তীরে দাঁড়াইয়া নদের ভৈরব রূপ উপভোগ করিতে যাইয়া কবি মাঝিদের আতঙ্কের কথা বিস্মৃত হন নাই, লিখিয়াছেন, যখন এই উদ্দাম জলরাশির উপর দিয়া ঝঞ্ঝা ও তুফান বাহিয়া যায়, তখন

“নাও ছাড়ে না কর্ণধার।”

কর্ণধার নৌকা ছাড়িতে সাহসী হয় না। ঝড়ের সময় নৌকার ছাদের মত উঁচু একটা ঢেউ উঠে; ঢেউএর মুখে ফেনা, যেন উচ্চৈশ্রবা তুরঙ্গ রণোন্মাদনায় ছুটিয়াছে। শিশু তিমি, হাঙ্গর প্রভৃতি জন্তু চোখে অন্ধকার দেখিয়া নদীর তলা ছাড়িয়া উপরে উঠিতে থাকে। ঝড়ের বেগে তীর হইতে সমূলে উৎপাটিত গাছগুলি জলে পড়িয়া তীরবেগে পূবের দিকে গারো পাহাড়ের অভিমুখে ছুটিয়া যায়ঃ—

“গাছ বিরক্ষী (বৃক্ষ) চুবন খাইয়া ভাইসা যায় পূব পাহাড়।
হায়রে গাঙ্গের কি বাহার।।”

এই বহুরূপ নদের দৃশ্যের মুহুর্মুহু পরিবর্ত্তন হয়, ঝড় চলিয়া গেলে দিক্‌দিগন্তব্যাপী জলরাশি একবারে স্থির একটি দৃশ্যপটের মত হয়, তখন এই গর্জ্জনশীল

“নদের মুখে নাইরে রা”—

নিঃশব্দে জল চলিয়াছে—পরিচালকের নির্দ্দেশে মূকবৎ সৈন্যরাশির মত। তখন ভাতের থালার মত—নদ পড়িয়া থাকে—বাতাস না থাকিলে তাহার ঘুম ভাঙ্গাইবে কে? আবার যখন ঝঞ্ঝা আসিবে, তখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিবে।

গঞ্জের হাট

এই ব্রহ্মপুত্রের তীরে "গঞ্জের হাট" নামক বন্দর। প্রতি সপ্তাহে তিন দিন সেখানে হাট বসে। নদের এই বাঁকে খেয়ার নৌকা ঘাটে বাঁধা, হাটের দিনে তথায় অসম্ভব লোকের ভিড় হয়। অনেকেই হাট করিতে আসিয়া সে-দিন আর বাড়ী ফিরিতে পারে না, সুতরাং জিনিষপত্র বিকি-কিনি করিয়া সেই হাটেই রসুই করিয়া খায় এবং হাটের একখানি ছোট ঘর ভাড়া লইয়া রাত্রিটা সেইখানেই কাটাইয়া দেয়। এই ঘাটে শত শত খেয়া নৌকা ও মান্দার কাঠের বড় নৌকা ভাড়াটিয়ার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। এই সকল মাঝিরা মা বাপ ও স্বগণদের কথা ভুলিয়া যায়, ঝড়-তুফান গ্রাহ্য করে না—প্রবল বাতাসের মধ্যে ভাটিয়াল গান গাহিতে গাহিতে নৌকা ছাড়িয়া দেয়—এবং অদৃষ্ট মন্দ হইলে বুদ্বুদের মত নদের আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া ডুবিয়া যায়।

এখন খেয়া নৌকার ভাড়ার কথা বলিতেছি তাহা শোন। সে এক কড়ির পাহাড় ভাড়াটিয়াকে গুণ্‌তি করিয়া দিতে হয়। হিসাব করিয়া তাহা বলিয়া দিব, তাহা শুনিলে তোমার তাক্ লাগিবে।

চার কুড়ি কড়িতে এক পোণ হয়, এইরূপ ষোল পণে এক কাহণ হয়। দশ কাহণ কড়ি মজুরা দিয়া লোকজনকে গাঙ্গ পাড়ি দিতে হয়। দশ কাহণ কড়ি—অর্থাৎ দশ টাকা—খেয়া নৌকার ভাড়া। ইহা দিলেই যে বিপদ উদ্ধার হইল, একথা বলা যায় না। দশ কাহণ কড়ি দিয়া এপার হইতে ওপারে পৌছিলে লোকজন সেরপুর গ্রাম পাইবে, এইজন্য সেরপুর অঞ্চলটার নাম "দশ কাহণিয়া" হইয়াছে। সেরপুর পৌছিয়া যাত্রী ঈশ্বরের নাম স্মরণ করেঃ—

"ব্রহ্মপুত্তুর পাড়ি দিয়া দশ কাহণ দিয়ে কড়ি।
মাটি পাইয়া লোকে কইতো আল্লা, রসুল, হরি।।"

কিন্তু সকলের ভাগ্যে নিরাপদে আসিয়া সেরপুর গ্রামে পৌছিতে পারা সহজ ছিল না। কতজনের মাঝ-দরিয়ায় সলিল-সমাধি হইত; সেই গাঙ্গে গাঙ্গ-চিলগুলির মত চোর দস্যু ইতস্ততঃ ঘুরিত, তাহাদের টাকা কড়ি, জহরত এই সকল দস্যুরা লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইত।

মাঝিরাও সকলেই নিরীহ ও সাধুপ্রকৃতির ছিল নাঃ—

"কেউবা ভাল মন্দ থাক্‌ত নায়ের মাঝি।
দিন দুপুরে মারত ছুরি হায়রে এমন পাজি।।
লুইটা নিত, কাইড়া নিত জহর পাতি যত।
ঐ বনে জঙ্গলে নিয়া নেংটা ছাইড়া দিত।।
কেউবা মাথায় কুড়াল মারে, কেউ বা কাটে গলা।
হস্ত পদ বন্ধন কইরা ফেলতো নদীর তলা।।
খুইলা নিত জহর পাতি অঙ্গে যা পৈরাছে।
ঝাঁপি, টোপলা খুইলা নিয়া দিত ওস্তাদের কাছে।।"

এই "ওস্তাদ" অর্থ চোর ডাকাইতদের সর্দ্দার। সুতরাং ব্রহ্মপুত্রের জলে যেরূপ নক্র, হাঙ্গর, কুম্ভীর ছিল, জলের উপর যে সকল মাঝি ছিল, তাহারাও ভীষণতায় কম ছিল না, তাহারা কেহ কেহ ক্রুর-প্রকৃতি নক্রবেশী, প্রভেদ এই যে তাহারা বন্ধুর ছদ্মবেশে আসিত।

বিশু নাপিত ও তাহার পরিবারবর্গ

এই সর্ব্বনেশে ব্রহ্মপুত্রের পারে একটি দরিদ্র নাপিত-পরিবার বাস করিত। বিশু নাপিতের জাত ব্যবসায়ে কোন রোজগার ছিল না, অথচ কয়েকটি শিশু-সন্তান ও স্ত্রী তাহার পোষ্য ছিল। তাহার ঘরের ছাদে ছন্ ছিল না, বর্ষার সময় মুষলধারে বৃষ্টি পড়িত এবং শিশুদের লইয়া বিশু ও তাহার স্ত্রী জলে ভিজিত। বেড়া একটুও মজবুত ছিল না; বিশু বন জঙ্গল হইতে লতা পাতা লইয়া আসিয়া কোনরূপে ঘরের বেড়ার ফাঁক ভর্ত্তি করিত; গিন্নি ও শিশু-গুলি লইয়া প্রায়ই বিশু ভিক্ষা করিয়া খাইত, কোন কোন দিন এই ক্ষুদ্র নাগা সন্ন্যাসীর দল দেখিয়া গৃহস্থ চেঁচামেচি করিয়া তাহাদিগকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিত, সে দিন তাহারা হরি-বাসর করিত। কোন দিন আবার দৈবযোগে বিশু দিন-মজুরী পাইলে সকলে মিলিয়া কিছু উপার্জ্জন করিত।

বিশুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম বাসু—সে বার বছরে পা দিয়াছে, কিন্তু দুনিয়ার অকর্ম্মা, সে কিছুই শেখে নাই। দ্বিতীয় পুত্র কুশাই----সে ব্রহ্মপুত্রে সাঁতার কাটিতে যাইয়া ডুবিয়া গেল;

প্রতিবেশীরা বহু খুঁজিয়া তাহাকে পাইল না; তৃতীয় পুত্র দাসু মায়ের সঙ্গে গাঙ্গে নাইতে গিয়াছিল, শত শত লোক স্নান করিতেছে, এমন সময় সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্য দাসুকে চিনিতে পারিয়াই যেন একটা হাঙ্গর আসিয়া তাহাকে পা ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল, কত বর্শা মারিয়া,—জাল ফেলিয়া কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল না। চতুর্থটি গাছে উঠিতে যাইয়া ডাল ভাঙ্গিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল, তদবধি সে বিছানায় পড়িয়া কয়েক মাস বুকের যন্ত্রণায় ভুগিয়া শেষে চির অব্যাহতি পাইল।

বিশু নিতান্ত. বিপদে পড়িয়া বিধাতাকে ডাকিয়া তাহার কাহিনী শুনাইল—"কতদিন তো না খাইয়া ইহাদের লইয়া উপবাস করিয়াছি, তখন ফিরিয়াও তাকাও নাই। যাহা হউক ছেলেগুলি যখন কথা বলিত, তখন তাহাদের কলরবে কর্ণে আমার মধুবৃষ্টি হইত। এত সুখই বা তোমার বুকে সহিবে কেন, একে একে সব কয়টি হরণ করিয়াছ—অবশিষ্ট এক বাসু—এক পেটি তৈলের মত, একবার একটু গড়াইয়া পড়িলেই নিঃশেষ হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করি, এই সন্তানগুলি তুমি দিলেই বা কেন? নিলেই বা কেন? আমি যে আর এত কষ্ট সহ্য করিতে পারিতেছি না। আমার প্রাণ তোমাকেই দিব, আমি আর ঘরে ফিরিব না।"

বিশু নাপিত চিৎকার করিয়া বিধাতাকে এই সকল প্রশ্ন করিতে লাগিল। কিন্তু এই সকল প্রশ্নের উত্তর তিনি দিতে পারিবেন না বলিয়াই হয়ত বিধাতা নিরুত্তর রহিলেন।

ইতস্ততঃ ঘুরিয়া শোকগ্রস্ত বিশু নাপিত নদীর একটা ভাঙ্গন পাড়ে বসিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। কতক্ষণ সে বেহুঁসের মত তথায় ছিল, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই, অলক্ষিতে একটা সুতার মত দাগ সেই নদীর বহু দূর ব্যাপিয়া দেখা দিল, নদ যে একটা গণ্ডী আঁকিয়া তাহা স্বীয় গর্ভস্থ করিতেছে, বিশু তাহা খেয়াল করে নাই; অকস্মাৎ সেই চাপ ভাঙ্গিয়া মহাশব্দে জলের মধ্যে পড়িয়া গেল। চারিদিকে উর্ম্মিরাশি থৈ থৈ করিয়া সেই স্থানে একটা কোলাহলের সৃষ্টি করিল, বাসুর মা ছুটিয়া আসিয়া দেখিল সেই উত্তাল ঢেউ রাশির মধ্যে একটা মাথা তাহার কুটিরের দিকে ক্ষণেকের জন্য দৃষ্টিপাত করিয়া অতলে ডুবিয়া গেল। স্বামীর এই শোচনীয় মৃত্যু দেখিয়া বাসুর মা মাটীতে পড়িয়া লুটাপুটি করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

"আমার আর এ জগতে কে আছে, চরণের দাসীকে একাকী ফেলিয়া কোথায় গেলে?" এই বলিতে বলিতে বাসুর মা জীবন ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইল। একবার ভাবিল, গলায়

শাড়ীর আঁচল বাঁধিয়া কোন গাছের ডালে আত্মহত্যা করে, আবার ভাবিল বাসুকে কেমনে মানুষ করিব, তাহাকে লইয়া একা ঘরে কেমন করিয়া থাকিব? তখন বুকে ছুরি বিন্ধাইয়া প্রাণ ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিল, কিন্তু শেষে স্থির করিল, যেখানে তাহার একাধিক পুত্র ডুবিয়া মরিয়াছে, স্বামী যেথায় চোখের সামনে গেলেন, ব্রহ্মপুত্রের সেই শীতল জলই তাহার শেষ আশ্রয়! তখন সে ছুটিয়া সেই নদের দিকে চলিল, ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য। এমন সময় পিছু হইতে বাসু 'মা মা' বলিয়া ডাকিল। ফিরিয়া চাহিয়া মাতা পুত্রের 'সোনামুখ'খানি দেখিতে পাইল, তাহার মন বাৎসল্যে ভরিয়া গেল।

"ভুলি গেল পতির কথা আর মনের জ্বালা।
আমির কয় আর মরবা কেন চক্ষু মুইছা ফেলা।।"

আর মরা হৈল না। বাসুকে লইয়া তাহার মাতা স্বীয় জীর্ণ কুটিরে প্রবেশ করিল; প্রতিবেশীদের মধ্যে যাহারা দয়ার্দ্র ছিল—তাহাদের সাহায্যে বাসু ও তাহার মাতা কষ্টে সৃষ্টে দিন গুজরান করিতে লাগিল। বাসুর মা কিছুতেই স্বামীর কুঁড়ে ঘরখানি ছাড়িল না। বাসুকে বুকে করিয়া পাখী যেমন তাহার শাবকটিকে পাখার তলে রাখিয়া দিনরাত পাহারা দেয়, তেমনই ভাবে তাহাকে পালন করিতে লাগিল।

বাসু তরুণ বয়সে

সে পাড়ায় বাসুর মায়ের ইষ্ট কুটুম্ব কেহ ছিল না; তাহার মা বাপ অথবা আপনার বলিতে অন্য কেহ ছিল না; পাড়া পড়শীর মধ্যে কয়েক ঘর জেলে ও এক ঘর কোচ ছিল। যে অনাথ, তাহার ভার বিধাতা লয়েন, কুচনী পরিবারের কানুর মা—বাসুর মার অন্তরঙ্গ হইল; তাহারা উভয়ে সখিত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইল—এই অনাত্মীয়ের আত্মীয়তায় বাসুর মা যেন হাতে স্বর্গ পাইল।

কানুর বয়স বিশ, সবে তাহার গোঁফের রেখা দেখা দিয়াছে, বাসু তাহার তিন বছরের ছোট—সে সর্ব্বদা কানুর পিছনে পিছনে থাকে। কানুর প্রকৃতিটি বড় উদাস, তাহার সঙ্গে বাসুর এইরূপ সর্ব্বদা ঘোরা-ফেরা তাহার মাতা পছন্দ করিত না। অথচ এরূপ উপকারী বন্ধুর পুত্র, সে এ সম্বন্ধে মুখ ফুটিয়া কানুকে নিষেধ করিতেও পারিত না। কানুর মার মনটি

দরদে ভরপুর। রোজই কিছু না কিছু সে বাসুদের বাড়ীতে লইয়া আসিত,—কোনও দিন গামছায় বাঁধিয়া কিছু চাল-ডাল, ও এক পেটী তৈল আনিয়া বাসুর মাকে উপহার দিত,—কোনও দিন বা কানুদের বাড়ীর পিছনে যে মহিষের বাথান ছিল,—সেইস্থান হইতে সে চুঙ্গা ভরিয়া বাসুর জন্য দুধ আনিয়া দিত, কোন কোন দিন নিজ বাগানের সদ্য-ভাঙ্গা বেগুন, কাঁচা লঙ্কা ও বাড়ীর গাছের বেল—সইকে দিয়া হাসিমুখে তাহার সঙ্গে কথা কহিয়া দুই দণ্ড কাটাইয়া দিত।

বাসুর মা নিজেও কর্ম্মঠ, কোন দিন বসিয়া থাকে নাই, আজ এই বিপদের দিনে সে নিশ্চেষ্ট ছিল না, জেলেদের বাড়ীতে যাইয়া সে সূতা কাটিত, তাহাদের ধান ভানিত—পারিশ্রমিক হিসাবে সে বাসুর জন্য কিছু মাছ ও ক্ষুদ কুঁড়া যাহা পাইত, তাহাই সন্তুষ্টচিত্তে বাড়ীতে লইয়া আসিত। সে ভাবিত, কবে বাসু বড় হইয়া জাত ব্যবসা আরম্ভ করিবে, এবং কবেই বা তাহার এই দুর্দ্দিন ঘুচিবে!

বাসু যৌবনে—কানুর সাকরেদ

এদিকে দেখিতে দেখিতে বাসু নাপিতের বয়স বাড়িয়া চলিল;তাহার বয়স বিশ বৎসর পূর্ণ হইল।

> "বিশ বছইরা জোয়ান হৈল সেই বাসু ছোঁড়া।
> পাড়ায় পাড়ায় ঝোপ জঙ্গলে লাফায় যেন ঘোড়া।।
> সাকরেদ হৈল বাসু নাপিত ওস্তাদ কানু কোচ।
> মানুষ গরু কেউ মানে না ফুলাইয়া ফিরে মোচ।।"

বাসুদের বাড়ীর পিছনে মস্ত বড় একটা বটের গাছ আছে। বহু দিনের পুরাণো গাছ, লোকে তাহাকে "দেও বিরিক্ষী" (দেব-বৃক্ষ) বলিত, সকলের বিশ্বাস, বৃক্ষটি দেবাশ্রিত। এজন্য কেহ তাহার কাছে বড় একটা ঘেঁসিত না। একদিন রাত্রি-বেলায় বাসুর মা বাসুকে লইয়া তাহাদের কুঁড়ে ঘরখানিতে শুইয়া আছে, এমন সময় সেই গাছ হইতে মানুষের স্বরে কেহ যেন কথা বলিতেছে, শুনিতে পাইল। বাসুর মা স্পষ্ট এই কথাগুলি শুনিতে পাইল—

"বাসুর মা, নিশ্চিন্ত মনে শুইয়া আছ, ঘরের চালে নূতন ছণ লাগাইয়াছ, খুঁটিগুলিও নূতন, বেড়াতে নূতন পাতা, কিন্তু আকাশের কোণে কি ঘোর করিয়া মেঘ উঠিয়াছে, বাহিরে আসিয়া তাহা চাহিয়া দেখ; এখনই ঝড় উঠিলে তোমার কুঁড়ে ঘরখানি উড়াইয়া লইয়া যাইবে—তখন তোমাদের মাথা গুঁজিবারও জায়গা থাকিবে না।"

বাসুর মা একটু ভয় পাইয়া বাসুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "কে তুমি! আমার বাড়ীতে বসিয়া এই গভীর রাত্রে আমাকে ভয় দেখাইতেছ? আমি পতি-পুত্রহীনা, একমাত্র বাসুকে লইয়া একলা ঘরে পড়িয়া আছি, আমার কুঁড়ে ঘরটা যদি মাটিতে পড়িয়া যায়—আমি যদি দুর্য্যোগে পড়িয়া মরি, তবেই বা কি? তুমি আমার গাছটার উপর থাকিয়া আমাকে ভয় দেখাইয়া তামাসা করিতেছ!"

বৃক্ষারোহী বলিল, "মাসীমা, আমি যে তোমার সইএর ছেলে—আমার নাম কানু, বাসু আমার অতি স্নেহের বন্ধু। তুমি কি আমাকে চিনিতে পারিলে না, আমি কি তোমাকে তামাসা করিতে পারি? বাসু আমাকে দাদা বলিয়া ডাকে, আমি কিছু খাবার জিনিষ পাইয়াছি, দুই ভাই একত্রে বসিয়া খাইব। মাসীমা, তুমি বাসুকে জাগাইয়া দাও—ঐ দেখ, অল্প ঝড় হইয়া মেঘ উড়িয়া গিয়াছে, এবার আর তোমার কুঁড়ে ঘরে হাওয়া লাগিবে না, বাসুকে জাগাইয়া দাও।"

বাসুর মা অত্যন্ত লজ্জিত হইল, এ যে কানু, তাহার সইএর ছেলে, ইহা সে ভাবে নাই। সে বলিল, "কানু আমি তোমায় না চিনিয়া মন্দ কথা বলিয়াছি, আমাকে মাপ কর। এই নিশাকালে আমি বাসুকে ছাড়িয়া দিতে পারিব না—

"এক বাসু যে কলিজা আমার অন্ধলের লাঠি।
ঐ সোণার চাঁদ বদন দেইখা পথে পথে হাঁটি।।"

আজ রাতটা পোহাইলে কাল সকালে আসিয়া বাসুকে লইয়া যাইও। রাতে আমার বুকের ধনকে বুক ছাড়া করিব না।"

ইহার মধ্যে বাসু জাগিয়া উঠিয়াছে—সে তাহার মাকে জিজ্ঞাসা করিল, এত রাত্রে মা তুমি কার সঙ্গে কথা বলিতেছ? মায়ের কাছে কানুর আসার কথা শুনিয়া বাসুর মনে আনন্দ আর ধরে না।

"লম্ফ দিয়া উঠে বাসু মায়ের হাত ঠেইলা।
ঘরের কোণে বাহির হৈল ঘরের কেওয়ার খুইলা।।
ছুটিয়া যেয়ে বাসু ধরে দাদা কানুর গলা।
এত রাত্রে কি কারযে দাদা আমার বাড়ী আইলা।।"

কানু বলিল, "তোমাকে দিয়া কিছু দরকার ছিল, তা তোমার মা এত রাতে আমার কাছে, তোমাকে আসিতে দিতে ভয় করেন? তাই মুস্কিলে পড়িয়াছি।"

কানু বলিল, "মায়ের কথায় কি হইবে, আমি তোমার সঙ্গে এখনই যাইতেছি,—তুমি কি আনিয়াছ, দুই ভাই একত্র বসিয়া খাইব।"

"মায়েরে কৈল উইঠা মাগো ঘরের কেওয়ার মার।
ভাইএর সঙ্গে ভাই চলেছে চিন্তা কেন বা কর?"

বাসু আর কানু চলিয়া গেলে বুড়া মা একা ঘরে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার গাঁয়ের যত দেবতা ছিল, তাহাদিগকে ডাকিয়া মানত করিতে লাগিল।

বাসুর মার মানত

"দোহাই দেই বুড় ঠাক্রুন্, আমার বাসুকে ভাল রাখুন,
ভাইজা দিমু ছাতু গুড়া চাইল।
দোহাই মাগো সুবচনী, বাসু ভাল থাকে জানি,
গুয়া পান দিমু তোরে কাইল।।
পেঁচার ডাক শুইনা নারী, অমনই কয় তাড়াতাড়ি
ডাইকো নারে কাল পেঁচা আর।
বোয়াল মাছ ভাইজা দিমু, শৈল মাছ পুইড়া দিমু,
বুকের সোণা বুকে দাও আমার।।"

এইরূপ দুশ্চিন্তায় ও মানত করিতে করিতে রাত পোহাইয়া গেল, "কাল নিশি পোহাইল, কাহা কাহা কাক ডাকিল," কিন্তু বাসুর মা আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

বাসুর প্রথম ডাকাতি

কিছুদূর হাঁটিয়া যাইয়া এক গাছ-তলায় বসিয়া কানু বাসুকে বলিল, "আজ এক বুড়া বামুন ও তাহার বামনী, গাঙ্গের ওপারে যাইবে। সোনা মাঝির নৌকায় রাত থাকিতে আমায় তাহাদিগকে পার করিয়া দিতে হইবে। তুমি কি আমার সঙ্গে যাইতে পারিবে?"

বাসু বলিল—

"সোনা মাঝি আপন ভাড়া রাইখা।
তোমাকে দিল নৌকাখানি কোন্ সুবিধা দেইখা।।"

কানু বলিল, "তুমি বুঝি জান না, এই চার পাঁচ দিন সোনা মাঝি জ্বরে বেহুঁস, তার নৌকা ঘাটে বাঁধা আছে। আমরা তাহার নৌকাখানিতে ঠাকুর ঠাক্রুণকে তুলিয়া লইয়া গঞ্জের ঘাটের ভীষণ আবর্ত্তের মধ্যে নৌকাখানি ডুবাইয়া দিব। বুড়া বামুনের যে সকল টাকা মোহর এবং জহরত আছে—তাহা আর কি বলিব, তাহা এক রাজার ঐশ্বর্য্য! কাল সন্ধ্যাবেলা আমি তাহা দেখিয়াছি।"

বাসু বলিল, "দাদা, তুমি ঠাকুর-ঠাক্রুণকে ব্রহ্মপুত্রের ঘূর্ণীপাকে ডুবাইবে কিন্তু নৌকাখানি ডুবিলে সেই ভয়ানক ঘূর্ণীপাক হইতে আমরা কি ভাবে উদ্ধার পাইব? সে বড় বিষম স্থান, তাহার মধ্যে পড়িলে কেউ রক্ষা পায় না, আমরা দু'জনে কি ভাবে রক্ষা পাইব?"

কানু বলিল, "ভাই, আমি কি আগে না বুঝিয়া কোন কাজে হাত দেই? তুমি ভেবনা, আমি শম্ভুজেলের কাছ থেকে একটা খুব লম্বা দড়ি চাহিয়া আনিয়াছি—সে দড়িটা এত লম্বা যে তুমি তাহা ধারণাই করিতে পারিবে না। সেই দড়িটার একটা দিক গাঙ্গের পাড়ের বড় শিমুল গাছটার সঙ্গে বাঁধা থাকিবে, আর একটা দিক একটা ভূরার সঙ্গে আট্কাইয়া রাখিব, ভূরাটা একটা খুব আল্গা দড়ির জোরে নৌকার সঙ্গে সঙ্গে চলিবে, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে আমরা সেই ভূরায় চড়িয়া অনায়াসে বাড়ীতে ফিরিতে পারিব। যত জহরত, টাকা ও মোহর আছে, তা লইয়া আমরা নৌকার তলে কুড়ুলের ঘা মারিয়া উহা জলে ডুবাইয়া দিব":—

"দাইড়া ঠাকুর নাড়বে দাড়ী ছাগল যেমন নাড়ে।
ভূরার দড়ি টাইনা আমরা আস্বো নদীর পারে।।

ঠাকুর ঠাকরাইন মইরা গেলে আর কি মনে ভয়।
কাছি দিমু শম্ভুর বাড়ী কোন বেটা কি কয়।।
মনের মত বেশাত দিমু মায়ের হস্তে নিয়া।
সেই বেশাতে দুই ভাই মিলা পরে করমু বিয়া।।"

যেমন কথা তেমনই কাজ। যখন কার্য্য সমাধা করিয়া বাসু ও কানু বাড়ী ফিরিল, তখন পূর্ব্বদিকে আকাশ রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে—তখন "চিল, কাক এবং আর আর পাখীরা" ডাকিয়া উঠিয়াছে। বাসু ডাকিয়া তাহার মাকে ঘুম হইতে উঠাইয়া বলিল, "মা উঠ জাগ, আজ হইতে তোমার সমস্ত দুঃখ দূরে গেল, এখন হইতে গতর খাটাইয়া আর হাড় ভাঙ্গা খাটুনী খাটিতে হইবে না,—আর দিন রাত চোখের জল ফেলিতে হইবে না।"

বাসুর মা উঠিয়া বসিল এবং বলিল—"বাছা কি আনিয়াছ, একদিন খাইলে তো আর সম্বৎসরের ক্ষুধা মিটিবে না।"

বাসুর মার জ্বর

বাসু তাহার হাতে সেই বামুনের টোপলা দিয়া বলিল—"দেখিলে কি আনিয়াছি।"

"কথা শুনি বাসুর মা টোপলা যে খুলিল।
আঁধার ঘর আলো হৈয়া চক্ষু ভইরা গেল।।
বেশর আছে, ঝুম্‌কা আছে, আর নারিকেল ফুল।
চিক রইয়াছে, সিঁথি আছে, আর কর্ণফুল।।
সোণার মালা—বাজু আছে আর আছে বুকের পাটা।
সোণার হাঁসা গাঁথা আছে, কান খোঁচানী কাঁটা।।
নথে আছে চুনি মণি আর মুক্তা ঝুল মুল।
গোণ্ডা বাইশেক তাবিজ আছে আর যে বকফুল।।
চন্দ্রহার, সুরুজহার, রূপার বাক্‌খাড়ু।
চরণ পদ্মে বাঁধা আছে গুজরী দুই গাছ সরু।।

সুলতানী মোহর আছে, বাদসাই গোরে টাকা।
আর আছে ছোট বড় সোণা রূপার চাকা।।
খইরকা মুষ্টি আর আছিল আগুন পাটের সাড়ী।
সোণার বাটী, আভের কাঁকুই, সোণার আছাড়ি।।"

বাসুর মা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ সব কি, এ রাজা বাদ্‌সাহের বেশাতি তুমি কোথায় পাইলে?"

বাসু তখন গর্ব্বের সহিত তাহার ও কানুদার বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল; সেই সমস্ত কথা শুনিয়া, বাসুর মা থর থর কাঁপিতে লাগিল, এবং বলিল,

"কি কর্ম্ম করেছ বাপু হইল সর্ব্বনাশ।
ব্রহ্মবধ কৈরা তুই বাড়ালি তরাস।।
চোখে আর দেখমু নারে বউ কুটুম নারী।
ব্রহ্মশাপে কেউ না থাকিবে বংশে দিতে বাতি।।
হৈয়া ক্যানে না মরিলি, হৈত না এত জ্বালা।
এমন দুষমনের হায়রে ডুইবা মরা ভালা।।"

যে বাসু তাহার নয়নের মণি ছিল, অহোরাত্র একবার যার মুখখানি না দেখিলে বাসুর মা পাগল হইয়া যাইত, স্বামী বিয়োগের পর আত্মহত্যা করিতে যাইয়া বাসুর মা যাহার মুখের মা ডাক শুনিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছিল, আজ সে সেই প্রাণ-প্রতিম পুত্রের মৃত্যু কামনা করিতেছে!

একদিকে বাসুর মা কাঁদিতেছে ও চোখের জল মুছিতেছে—অন্য দিকে বাসু তখন 'বেশাতি' লইয়া মাটীর নীচে রাখিতেছে। সারাদিন বাসুর মা একবিন্দু জল পান করিল না, রাগ করিয়া বাসুর সঙ্গে কথা কহিল না—এবং তাহার মুখের দিকে তাকাইল না। প্রভাতে দেখা গেল, বাসুর মার চক্ষু দুটি বিবর্ণ হইয়াছে এবং অত্যন্ত শীত করিয়া জ্বর আসিয়াছে। এই ভাবে চার-পাঁচ দিন বিঘোর অজ্ঞান অবস্থায় সে বিছানায় পড়িয়া রহিল! প্রতিবেশীদের দুশ্চিন্তার কারণ হইল, বাসুর মুখ শুকাইয়া গেল। সকলে মিলিয়া বাসুকে বলিল, "বাসু তোমার মা বড় দুঃখী,—সে যে মরিতে বসিয়াছে, তার চিকিৎসার ব্যবস্থা কর।"
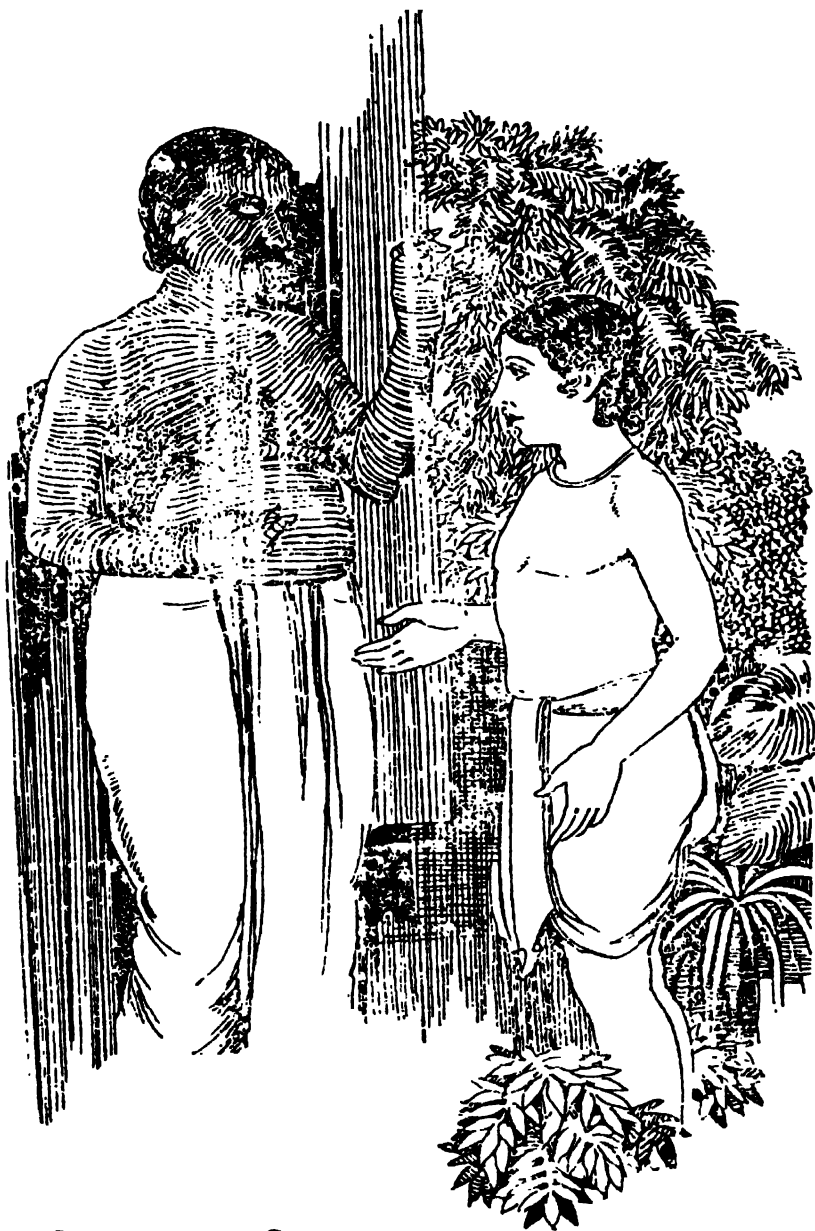
" হাঁক ছাড়িয়া ডাকে বাসু— কবিরাজ ম'শয়।
আমার মা যে যখন তখন তোমাকে যাইতে হয়।।" (পৃষ্ঠা ৩১৯)

তিনকড়ি কবিরাজের চিকিৎসা

"প্রহর তিনেক হাট্যা বাসু যায় যে ত্বরাতরি।
তিনকড়ি যে মস্ত বৈদ্য পাইল তার বাড়ী।।
হাঁক ছাড়িয়া ডাকে বাসু কবিরাজ ম'শয়।
আমার মা যে অখন তখন,—তোমাকে যাইতে হয়।।
তিনকড়ি কবিরাজ শুইনা ধুতি চাদর লইল।।
চাদরের খুটির মধ্যে দাওয়াই বান্ধিয়া লইল।।
হাতে নিল বাঘা-লাঠি, কাঁধে লইল ছাতি।
তুলসী তলায় যাইয়া বৈদ্য ঠেকাইল তার মাথি।।
কিষ্ট বর্ণ দেহ খানি, তেল-তেলা তার গা।
খাটা খুটা লাফা গোফা, ফাটা ফাটা পা।।
কুত কুতিয়া চায় কবিরাজ গুর গুরিয়া খায়।
পাছে পাছে বাসু নাপিত উল্টা হোঁচট খায়।।
বাসুর বাড়ী যাইয়া বলে বৈদ্য তিনকড়ি।
তোমার মা যে ভাল হবে খাইলে তিন বড়ি।।
আজকা দিও বেলের ছাল ও নিমের পাতার ঝোল।
কাল্‌কা দিও গরম কৈরা সজ ভিজানো জল।।
পরশু দিবা লাল বড়িটা কাঞ্জি দিয়া গুইলা।
তর্শু দিবা নীল বড়িটা কুয়ার পানি তুইলা।।
শেষাশেষি দিবা বাসু এই না ধলা বড়ি।
আরাম হইবে তোমার মা থাকবে না জ্বর জারি।।
চাকুল ধানের ভাত খিলাইও, শরীরে ঢাইল জল।
ধলা বড়ি খাওয়াইলে দিও, তেতুঁলের অম্বল।।
কবিরাজের কথা শুইনা বাসু নিল বড়ি।
"বিদায় হবার সময় হয় যে," কইল তিনকড়ি।।

এক কুলা চাল দিল, দাল একডালা।
গাছের থেকে তুইলা দিল বেগুন, লঙ্কা, কলা।।
হলদি দিল, লবণ দিল, পেটি ভইরা তেল।
বিদায় পেয়ে—কবিরাজ ম'শায় হাস্‌তে হাস্‌তে গেল।।
সন্ধ্যা বেলা বাসুর মা যে চক্ষু মেইলা চাইল।
জন্মের মত বাসুকে থুইয়া স্বর্গে চইলা গেল।"

বিবাহের চেষ্টা

মায়ের মুখে আগুন দিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে ব্রহ্মপুত্রের জলে ভাসাইয়া দিয়া বাসু দিন কয়েক আর ঘরের বাহির হইল না। মনে মনে ভাবিতেলাগিল—"আমার দোষেই মা মরিয়া গেল, এ দুঃখ কি করিয়া সহ্য করিব? এ দেশ ছাড়িয়া অন্য কোনখানে যাইয়া ভিক্ষা করিয়া খাইব। সারাদিন পরে সন্ধ্যাকালে বাসু হাত পোড়াইয়া নিজে একবার রাঁধিয়া খায়। কানু ও তাহার মা তাহাকে কত সান্ত্বনা দেয়, ৪।৫ দিন সে তাহাদের কথা শুনিয়াও কোনই উত্তর দেয় না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে পুনরায় তাহার অভ্যাস আবার প্রবল হইল, কানুর সঙ্গ সে ছাড়িতে পারিল না এবং আবার দুই জনে মিলিয়া নিরীহ পথিকদের উপর রাহাজানি করিতে লাগিল।

কানুর মা বাসুকে বলিল, "নিজে একবেলা কি ছাই পাশ রান্না কর, মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে, কলিজার হাড়গুলি দেখা যাইতেছে। তোমার ঘরে কেহ নাই। দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ কর—না হইলে এমনভাবে দিন গুজরান হইবে কিরূপে? এইখান থেকে তিন ক্রোশ দূরে মাইন্দা গ্রাম, সেখানে সাধুশীল নামক তোমাদের জাতির একটি ভাল লোক আছে, শুনিয়াছি তার একটি সুন্দরী মেয়ে আছে তুমি সেখানে যাইয়া বিবাহের প্রস্তাব কর। নির্ব্বন্ধ থাকিলে তোমার ভাগ্যে একটি ভাল বউ জুটিয়া যাইতে পারে।"

এই কথাগুলি বাসুর মন্দ বোধ হইল না। পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া সে চাদরখানি লইয়া মাইন্দা গ্রামের দিকে রওনা হইয়া গেল। চৈত্র মাসের মাথা-ফাটা রোদ,—বাসু তাহার চাদরখানি ভাল করিয়া মাথায় বাঁধিয়া লইল। বেলা প্রায় তিন প্রহরের সময় সে মাইন্দা গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল। সম্মুখে বালুখালির টল-টল জল—বাসুর বড়ই তৃষ্ণা পাইয়াছিল,

তাহার মনে হইতেছিল, সেই খালের জল প্রাণ ভরিয়া অঞ্জলিতে করিয়া খাইয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে।

খালের এপারে কোন বসতি নাই, একটা বড় শিমুল গাছে টক্‌টকে লাল ফুল ফুটিয়া আছে, ওপারে ঘন বসতি, সারি সারি বাড়িঘর এবং সেখান হইতে মেয়েরা কলসী কাঁখে জল লইতে আসিতেছে—এবং জল ভরা হইলে মৃদুমন্থর গতিতে বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছে। হঠাৎ বাসু দেখিল, একটি পরমা রূপসী কন্যা ওপারের এক বাড়ী হইতে খালের দিকে আসিতেছে, বাসু সেই সময় খালে নামিয়া জল খাইতে লাগিল, সেই সুন্দরী রমণী চক্ষু মাটির দিকে নত করিয়া আসিতেছিল—সে বাসুকে দেখিতে পাইল না। তাহার বুকে শ্যামলী রঙ্গের একখানি গামছা—আর—"ছাঁড়িয়া দিছে চুল। সেই চুলে পায়ের পাতা পাইয়াছে নাগুল।" সেই অপ্‌সরার মত রূপসী কন্যাকে দেখিয়া বাসু স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। "বাসু ছিল সোণার কান্তি রূপ মনোহর।" মেয়েটি চোখ মেলিয়া চাহিতেই তাহাকে দেখিতে পাইল। কুমারী বাসুকে দেখিয়া খুব সুন্দর মনে করিল। এই প্রথম দর্শনেই উভয়ে উভয়ের রূপে মুগ্ধ হইল! বালুখালি খুব ছোট খাল, এপার হইতে কথা বলিলে তাহা বেশ শোনা যায়। বাসু খালের পাড়ে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে যাহা বলিল, তাহা সেই খালের কিম্বা তাহার রূপের প্রশস্তি, মেয়েটির কানে সে সকল কথা ভালই লাগিল।

মাণিকতারার সঙ্গে প্রথম আলাপ

বাসু বলিল,—

"বালুখালির টল-টলা জল, আঁচল ধরি টানে।
অঙ্গের বর্ণ দেখি—লৌ ছুটে জানে।।
সার্থক জনম তোর বালি-খালির জল।
এমন চাঁদ বুকে করি পাইয়াছ বল।।"

কিন্তু তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি কতকটা পরিচয় পাইয়াছি। তোমার সুন্দর মুখখানি আমার চেনা। এইবার লইয়া আমি দুইবার তোমাকে দেখিলাম। মনে হয় বহুদিন পূর্ব্বে তোমাকে একবার গঞ্জের হাটে দেখিয়াছিলাম।"

কন্যা বলিল—"তোমার ঠিকই মনে আছে, আমি শৈশবে বাবা-মায়ের সঙ্গে গঞ্জের হাটে একবার গিয়াছিলাম।"

"বাপ মায়ের সঙ্গে আমি যাইয়া তোমার ঘরে।
পথ চলিতে দেখিলাম তুমি রইছ ঘরে।।
ফুলবাতাসা দিয়া খাইলাম বিন্নি ধানের খই।
তোমার মা যে আইনা দিল সিকায় তোলা দই।।
তোমার মা কহিল হাস্যা আমায় কোলে লইয়া।
"আমার ঘরে আইস মা" ঘরের লক্ষ্মী হৈয়া।।"

বালিকাকালের এই সকল কথা তরুণীর এখনও মনে আছে; মেয়েদের কাঁচা মনে যে দাগ পড়ে, তাহা সহজে মিলাইয়া যায় না। বালিকা বলিল, "আমার নাম মাণিকতারা—বাবার নাম সাধুশীল, পুবের দিকের ঘাটের পারে আমাদের বাড়ী"—শেষে অতি স্বল্পাক্ষরা কথায় একটা ইঙ্গিত দিয়া চুপ করিল; সে কথা কয়টি এই—"কুটুম্বিতা হবার পারে খুসী থাকলে দিল"—অর্থাৎ আমার বাবার মন প্রসন্ন হইলে কুটুম্বিতা হইতে পারিবে। বালিকা ঘাটেই রহিয়া গেল, বাসু পুব ঘাটের দিকে যাইয়া সাধুশীলের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। সাধু তখন সবে স্নান করিয়া অন্দর বাড়ীতে ঢুকিবে, এমন সময় বাসুর ডাক শুনিয়া আবার বাহিরে আসিল। বাসু তাহাকে প্রণাম করিলে সে বলিলঃ—

"—তোমাকে বাপু চিনবার পার্লাম না।
কার বা বেটা, কিবা নাম, কোথায় আস্তানা।।"

বাসু বলিল, সে গঞ্জের ঘাটের বিশু নাপিতের ছেলে—তাহার কেহ নাই, মা বাপ ভাই সকলেই মরিয়া গিয়াছে। তখন সাধুশীল আদর করিয়া তাহাকে চণ্ডীমণ্ডপ ঘরে বসাইল এবং অন্দরে যাইয়া গিন্নিকে বলিল, "গঞ্জের ঘাটের বিশু নাপিতের ছেলে বাসু আসিয়াছে।" গিন্নি বলিল, "কি প্রয়োজন?" সাধু বলিল, "তাহা ত এখনও শুনি নাই";এই বলিয়া একটা বালিস হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বাসুর তথায় আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। বাসু অতি বিনীতভাবে চোখ দুটি মাটীর দিকে নত করিয়া বলিল, "আমার ঘরে কেহ নাই, আমি এক্‌লা,—ঘরের লোক খুঁজিতে বাহির হইয়াছি, শুনিয়াছি—আপনার একটি বিবাহযোগ্যা

কন্যা আছে, যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের পরিবারের সঙ্গে কুটুম্বিতা করেন, তবে আমি চিরদিন আপনার অনুগত সেবক হইয়া থাকিব।" তাহার কথায় কোন জড়তা বা অস্পষ্টতা ছিল না। সাধুশীল এই যুবকটিকে দেখিয়া মনে মনে খুসী হইল এবং পুনরায় অন্দরে যাইয়া গিন্নিকে হাসিতে হাসিতে বলিল, "মাণিকতারার বর তো নিজেই আমাদের চণ্ডীমণ্ডপ ঘরে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছে।" গিন্নি বলিল, "সে ভাল, আমি বেড়ার ফাঁক দিয়া বাসুকে দেখিয়া লইয়াছি, বেশ বর। এখন দুপুর বেলা হেলিয়া পড়িয়াছে, এমন অতিথিকে তো ভাল করিয়া খাওয়াইতে হয়। তুমি যাও, আমি উনান জ্বালিবার উদ্যোগ করি।"

সাধুর তিনটি পুত্রের একজনও বাড়ীতে নাই। বড় ছেলেটি মাছ ধরিতে বাহির হইয়াছে; একা সাধু কোন্ দিকসামলাইবে, এজন্য একটু চিন্তিত হইল। গিন্নি বলিল, "মেজ বউ তুমি রান্না কর গিয়ে।" অপর পুত্রবধূকে জোগান দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করিয়া রান্না ঘরে পাঠাইয়া দিল। বেলা অনেক হইয়াছে,—বাসুকে স্নান করিবার জন্য অন্দর হইতে তৈল পাঠাইয়া দেওয়া হইল;—বাসু তেল মাখিয়া নদীর ঘাটে স্নান করিতে চলিয়া গেল।

এমন সময়ে বড় ছেলে মস্ত বড় একটা রুই মাছ লইয়া আসিল এবং তার পরেই দ্বিতীয়টি কতকগুলি খৈলসা, পুঁটি ও কৈ মাছ ধরিয়া আনিল। ছোট ছেলে মোটা মোটা কতকগুলি চই এবং অন্যান্য শাক লইয়া আসিয়াছে। বাসু স্নান করিয়া আসিলে টাটকা ভাজা মুড়ি তৈল নুনে মাখিয়া তাহাকে খাবার দেওয়া হইল। মুড়ির পরে আর এক দফা গুড়ের বাতাসা ও চিঁড়ার মোয়া আসিল, বড় বড় পাকা ডউয়া ফল ভাঙ্গিয়া তাহার মস্ত মস্ত কোয়া, মর্ত্তমান কলা ও তিলের নাড়ু দিয়া আর এক পাত্র সাজান হইল। ইহার পরে ঘন দুধ একবাটি ও শর্করার লাড্ডু দেওয়া হইল। জলখাবার হিসাবে খাওয়াটি বেশ উপাদেয় হইল—বাসু উদরপূর্ত্তি করিয়া খাইয়া চণ্ডীমণ্ডপ ঘরে যাইয়া বেশ আরামে ঘুমাইয়া পড়িল।

আতিথ্য—রান্না ও পরিবেশন

এদিকে মেজ বউ ডালে কাঁটা দিয়া কড়াইতে চড়াইয়া দিয়াছে, ডাল কিছুতেই গলে না; বড় বউ মাছ ধুইতে পুকুর ঘাটে গেলে কৈ মাছের কাঁটা আঙ্গুলে বিঁধিয়াছে, তাহার যন্ত্রণা দেখিয়া শ্বাশুড়ী সেই কাঁটা-বিঁধা যায়গায় বাটা লঙ্কা দিয়া তাপ্পি মারিয়াছেন। মেজ বউ

কিছুতেই ডাল গলাইতে পারিতেছে না। নূতন আত্মীয় অতিথি—তাহার পাতে এই ডাল কি করিয়া দেওয়া যায়?

"ব্যস্ত হৈয়া মেজ বউ ডালে মারে ঘা।
চরকা যেমুন ঘ্যানর ঘ্যানর করতে লইল রা।"

রান্নার দেরি দেখিয়া—

"ভাসুরে করে কিচির মিচির দেওরে করে রাগ।
ফোঁটা তিলক কাইটা শ্বশুর সাজ্যা আছে বাঘ।।
ক্ষিধার জ্বালায় জ্বল্যা মৈল অঙ্গ কুটি কুটি।
সোয়ামী আইসা রাগ কর্য্যা ধ'ল্ল চুলের মুঠি।।
মায় আস্যা বউ ছাড়ালো নিল হাতে ধর্য্যা।
জল পান করিতে দিল তিন ছেলেরে বাড়্যা।।"

যাহা হউক, রান্নার পর্ব্ব শেষ হইয়া গেল, বড় ঘরের আঙ্গিনায় পাঁচ খানা পিঁড়ি পড়িল। পাঁচ থালা সাজাইয়া তিন পুত্র সহ সাধুশীল ও নবাগত বাসুকে দেওয়া হইলঃ—

"পঞ্চ জনের সম্মুখেতে দিল পঞ্চ থাল।
বাসুর থাল চাইয়া দেখ্যা সাধুর চক্ষু হৈল লাল।।"

তাহার রাগের কারণ এই যে, বাসুর পাতে কেন ভাজাপোড়া দেওয়া হইয়াছে? এই উপলক্ষ্যে সাধু তাহার গিন্নির উপর রাগ করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিল; সে বলিল, "তোমরা মেয়েমানুষ হইয়া সংসারের রীতি জান না, অনাচারে আমার গৃহ ছারখারে যাইবে। প্রথমবার কি বরকে ভাজাপোড়া দিতে আছে? তাহা হইলে যে আমার এত আদরের মেয়ে শ্বশুর বাড়ীতে যাইয়া শুকাইয়া আধমরা হইবে। শ্বাশুড়ী দিনরাত্র তাহাকে ভাজিবে অর্থাৎ গালি মন্দ দিবে, নন্দাইরা ভাজিবে এবং দেবরেরা কথায় কথায় রাগ করিয়া নূতন বউটিকে জ্বালাতন করিয়া মারিবে—এ সকল কথা তো গৃহস্থ মাত্রেই জানে।" এরূপ অকাট্য শাস্ত্র-বচন স্বামীর মুখে শুনিয়া বাসুর থালায় যে সকল ভাজাপোড়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহা গিন্নি উঠাইয়া লইল। কিন্তু বাসু ইহাতে খুব সন্তুষ্ট হইল না;—

মানিক তারা

'আপনার ঘরে আছে কন্যা শুইনাছি লোক মুখে।
সেই কারণে দেখতে আইলাম সাহস বাঁধিয়া বুকে।। (পৃষ্ঠা ৩২২)

"বাসু ভাবে হায় কি হৈল এই না কৰ্ম্মে ছিল।
মস্ত বড় কই মাছ ভাজা আর বেগুন পোড়া গেল।
আলু ভাজা, বেগুন ভাজা, ভাজা তিলের বড়া।
বেসন দিয়া উচ্ছি ভাজা চাপ্‌টি কড়া কড়া।।"

এই সকল মনের মত দ্রব্য পাইয়া সে খাইতে পাইল না। কিন্তু দুঃখের মধ্যে একটা সান্ত্বনার কথা ছিল; সে যে এই বাড়ীর ভাবী জামাই হইবে, তাহার ইঙ্গিত শ্বশুর ম'শায় দিয়াছেন।

ছোট বউ আসিয়া কলাই শাক দিয়া রান্নাকরা কৈ মাছের মুড়িঘণ্ট অনেকখানি দিয়া গেল। শুক্তানি দিয়া বাসু অনেকটা ভাত খাইয়া ফেলিল। তারপর খইলসা পুঁটির চচ্চড়ি আসিল, বাসু তাহার প্রতি যথেষ্ট ন্যায় বিচার করিল। মেজো বউ কিছুতেই ডাল গলাইতে পারে নাই, সেই আধাগলা ডাল বাটিতে পড়িয়া রহিল, বাসু তাহা স্পর্শ করিল না। কিন্তু বোয়ালের পেটি দিয়া মুগ ডালের যে ঘণ্ট রান্না হইয়াছিল, তাহা বাসু খুব তৃপ্তির সঙ্গে খাইল, তবে সেই ঘণ্টে কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় লঙ্কা পড়াতে তাহা টক্‌টকে লাল বর্ণ হইয়াছিল, খাইতে বেশ মুখ-রোচক হইয়াছিল, সুতরাং নাকের জল চোখের জলে মিশাইয়াও বাসু তাহার পুরো একবাটি খাইতে ছাড়িল না। রুই মাছের ঝোল সে সাবাড় করিয়া পুনরায় শূন্য বাটিটার উপর দৃষ্টিপাত করিল, এক বউ আসিয়া বাটিটা আবার ভর্ত্তি করিয়া দিল। একবাটি আমসীর অম্বল সে এক চুমুকে খাইয়া ফেলিল এবং উপসংহারে এক বাটি ঘন দুধ ও এক বাটি দই খাইয়া সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। সাধুশীল বাসুর খাওয়া দেখিয়া খুসী হইলঃ—

"বাসুর খাওয়া দেখ্যা সাধু খুসী হৈল মনে।
এই ছেলে পরাণে বাচ্যা থাক্‌বে অধিক দিনে।।"

সাধু তাহার তিন পুত্র লইয়া বালুখালে মুখ ধুইতে গেল, কিন্তু বাসু আচমন-শালায় যাইয়া মুখ ধুইয়া আসিল।

ভোজনান্তে তিন পুত্র ও বাসুকে লইয়া গিয়া সাধুশীল চণ্ডীমণ্ডপ ঘরে বসিল। সেখানে সে বাসুকে মন খুলিয়া সোজাসুজি ভাবেই কয়েকটি কথা বলিলঃ—"আমার মাণিক যেমন রূপসী, তেমনই গুণশীলা। সে একা সংসারের কাজ এতটা করিতে পারে যে তা দেখিলে

পুরুষ মানুষেরও তাক্ লাগিয়া যাইবে, কিন্তু মেজাজটি একটু কড়া, অযথা হস্তক্ষেপ বা সরদারী করিতে আসিলে, তাহার নাক কাটিয়া রাখে—এই যা একটু দুর্দ্দান্ত প্রকৃতি। তোমার ঘরে যাইবে, সে ভাল কথা; কিন্তু তোমায় একটি কথা জিজ্ঞাসা করি—তোমার মা বাপ নাই, ঘরে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, মাণিক কেমন করিয়া এই অল্প বয়সে ঘরের কাজ একলা করিবে, যোগান দেওয়ার পর্য্যন্ত লোক নাই। কাহার সঙ্গেই বা দু'দণ্ড আলাপ করিয়া জুড়াইবে? আর তুমি পুরুষ ছেলে, রাত বিরাতে যদি কোন সময় বাড়ীতে না থাক, তবে একলা ঘরে সে কি করিয়া থাকিবে?"

বিবাহের দিন স্থির

তিন ভাইয়েরই বাসুকে দেখিয়া পছন্দ হইয়াছে, তাহাদের একজন বলিল, "কেন বাবা, আমাদের বোনের মেয়ে পঞ্চু তো সম্প্রতি বিধবা হইয়াছে, সে সর্ব্বদা খাওয়া পরার কথা ভাবে...." বাসু তখনই বলিল, "বেশ তো আমি তাহাকে আদর করিয়া নিজ বাটীতে লইয়া যাইব, সে যতদিন বাঁচিবে, আমি তাহাকে যত্নপূর্ব্বক অন্ন বস্ত্র দিয়া পালন করিব।"

সাধুশীল এবার আর অমত করিল না। বউ তিন জন ও গিন্নি, তাহারা সকলেই অনুকুল মত প্রকাশ করিল।

বিবাহের দিন বৈশাখ মাসের প্রথমভাগেই হইবে নির্দ্দিষ্ট হইলঃ—

"বিকাল বেলা খাইল বাসু দুগ্ধ আর চিড়া।
ধুতি চাদর লৈয়া বাসু বাড়ীতে আইল ফিরা।।"

বাসু গণক দিয়া পঞ্জিকা দেখাইয়া ৫ই বৈশাখ বিবাহের দিন স্থির করিল। সে ৩০০ টাকা পণ স্বরূপ সাধুশীলকে দিল। যথারীতি বিবাহ হইয়া গেল।

"বিয়ার রাতে তিন বউ আর পাড়ার যত মাইয়া।
মনের মত আমোদ করে নানা গান গাইয়া।।"

স্ত্রী-আচার সমস্ত সুসম্পাদিত হইল। মাতা চোখ মুছিতে মুছিতে কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিল। অন্যান্য আচারের পরে মাকে প্রণাম করিয়া মাণিকতারা তাহার হাতে কিছু ইন্দুরের মাটি দিল—এই মাটি দেওয়ার মন্ত্রটি উচ্চারণ করিতেও সে ভুলিল নাঃ—

"এত দিন যা খাইয়াছিলাম মা ফিরাইয়া দিলাম তাই।
জন্মের মত ঋণ শোধ হইল এখন আমি যাই।।"

এই মন্ত্রটি লইয়া মুসলমান কবি একটু শ্লেষ করিয়া বলিয়াছেনঃ—

"সেক বয়াতি জামাৎ উল্লা হাসি হাসি কয়।
কথা শুনি দুঃখে মরি এই ব্যা কি আর হয়।।
মায়ের বুকের এক ফোঁটা দুধ হয় যে মহা ঋণ।
দুনিয়ার কেউ শুধিবারে নারে সেই ঋণ।।
হেন্দুর শাস্ত্র মহাশাস্ত্র এই কথা কি খাঁটি।
বেবাক ঋণ শুইধা গেল দিয়া ইন্দুর মাটি।।"

যাওয়ার সময় মাণিকতারা ছল ছল চোখে তাহার মাতাকে বলিয়া গেল, যেন পঞ্চুকে শীঘ্র পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

হরিকেল পাখী খাওয়ার সাধ

বর ও কনে বাড়ী ফিরিয়াছে। কানুর মা পড়শী লইয়া আসিয়া বউকে দেখিয়া খুব খুসী, তারা বলাবলি করিতে লাগিল, যৌটক অতি চমৎকার হইয়াছে। বাসু আর ঘর হইতে বড় বাহির হয় না।

একদিন দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়ার পরে বাসু খুব গরম বোধ করিল। গ্রীষ্মকাল—সে ঘরে থাকিতে পারিল না, বাহির হইয়া বাগানের গাছ পালা দেখিতে লাগিল, সেই সকল গাছের নূতন পাতা জন্মিয়াছে, তাহাদের স্পর্শে শীতল হইয়া বায়ু তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিল, সে কতকটা সোয়াস্তি বোধ করিল এবং দূর আকাশে যেখানে কতকগুলি পাখী উড়িতেছিল—সেই দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

এদিকে মাণিকতারা স্বামীর খাওয়ার পর নিজেও আহার শেষ করিয়া পান সাজিয়া নিজে একটা খিলি খাইয়া পানের বাটা হাতে করিয়া স্বামীকে খুঁজিতে লাগিল। খুঁজিয়া খুঁজিয়া সে হয়রাণ হইল, কোথাও বাসু নাই। তারপরে গাছগুলির ফাঁক দিয়া দেখিতে পাইল, একটা দূর গাছের নীচে দাঁড়াইয়া বাসু আসমানের দিকে চাহিয়া কি দেখিতেছে।

তাড়াতাড়ি স্বামীর কাছে যাইয়া সে বলিল, "আমি সারাবাড়ী তোমাকে খুঁজিয়া মরিতেছি, তুমি কোথায় ছিলে বল তো? এই গাছ তলায় দাঁড়াইয়া ঊর্ধ্বমুখে কাহার চিন্তা করিতেছ? আমাকে এই কয়েক দিনের মধ্যেই মন হইতে বিদায় করিয়া দিয়াছ?"

বাসু বলিল,

"তুমি আমার কলিজার হাড় চোখের কাজল।
কিবা কথা কইলি তারা, হইলা কি পাগল।।"

মাণিকতারা বলিল, "তবে আকাশের দিকে এমন ধারা ধ্যানস্থ হইয়া কি দেখিতেছিলে?"

বাসু বলিল, "এই গাছটার উপর হরিকেল পাখী বাসা করিয়াছে, আমি হরিকেল পাখীর মাংস বড় ভালবাসি, কিন্তু পাখীগুলি টুঁ শব্দটি হইলে উড়িয়া আকাশের উপরে—খুব উঁচুতে উড়িয়া যায়। এগুলি ধরিবার কোন উপায় দেখিতে পাই না।"

মাণিকতারা স্বামীকে আদর করিয়া বলিল, "এই কথা! তুমি হরিকেল পাখীর মাংস ভালবাস, আমাকে আগে বল নাই কেন? আমি এই পাখী ধরিবার কৌশল জানি। তুমি এখনই আমার বাপের বাড়ী চলিয়া যাও, সন্ধ্যার আগে ফিরিয়া আসা চাই। সেখানে বলিও, মাণিকতাবা তাহার বাঁটুলি ও ধনুকটা চাহিয়াছে।"

বাসু চলিয়া গেল। এই অবসরে মাণিকতারা কতকগুলি মাটীর গুলি ও তীর ঘরে বসিয়া তৈরী করিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাঁটুলি ও ধনুক লইয়া বাসু বাড়ী ফিরিল এবং স্ত্রীর হাতে দিয়া বলিল, "এসকল তো পাইলে, এখন বাঁটুলি ও ধনুক চালাইবে কে?" উত্তরে তাহার স্ত্রী বলিল, "কেন আমার ধনুক ও আমার বাঁটুলি আমিই চালাইব, ইহা আবার চালাইবে কে? এখন তুমি বল কয়টা হরিকেল পাখী তুমি চাও?"

বাসু বলিল, "আজকার জন্য দুইটি মার, তোমার ওস্তাদির পরিচয় পাইলে কাল হইতে রোজ এক এক গণ্ডা করিয়া আমায় দিও।"

মাণিকতারা দুইটি গুলি লইয়া সন্ধান করিল। দেখিতে দেখিতে দুইটা পাখী তাহাদের পায়ের কাছে পড়িয়া আছাড়ি বিছাড়ি করিতে লাগিল।

বাসু কহিল, "ধন্যি মেয়ে, একেবারে দুইটিকে শিকার করিয়াছ? তোমার হাত এত পাকা, তুমি যে আমায় চমকাইয়া দিয়াছ?"

তাহার স্ত্রী বলিল, "আমি তীর দিয়া একবারে চারিটি মারিতে পারি ও বাঁটুলী দিয়া একসঙ্গে পাঁচটি শিকার করিয়াছি। আমাদিগের অঞ্চলে রাজবাড়ীতে দারু ও সুমারু নামে কোচ জাতীয় দুইজন ধানুকী কাজ করিত। তারা এমনই তীরন্দাজ ছিল যে, তারা এক একজন একশত শত্রু ঘাল করিতে পারিত। আমি এই দুই ওস্তাদের কাছে তীর চালনা শিখিয়াছি।

যদি একশ শত্রু আমার কাছে দাঁড়ায় ও আমার হাতে তীর-ধনুক থাকে, তবে সেই একশ লোককে আমি হটাইয়া দিতে পারি।"

বাসু নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, "এমন স্ত্রী যদি আমার সঙ্গী হয়, তবে আমি রাজা হইয়া সিংহাসনে বসিতে পারি।"

স্বামীর মনের কষ্ট

কিন্তু মাণিকতারা দেখিতে পায়, তাহার স্বামী যেন সর্ব্বদা বসিয়া বসিয়া কি ভাবে। সে কাছে গেলে তাহার দিকে চাহিতে লজ্জা পায়; কি যেন একটা গোপন ব্যথা সে ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করে, তাহার পূর্ব্বের প্রফুল্লভাব আর নাই, এমন কি তাহারও সঙ্গ ছাড়িয়া সে এক্‌লা থাকিতে ভালবাসে।

মাণিকতারা ভাবিয়া পায় না তাহার স্বামীর কি হইয়াছে, অথচ সে নিজে না বলিলে উপযাচিকা হইয়া তাহার মনের কথা জিজ্ঞাসা করিতে সে সঙ্কোচ বোধ করে। অথচ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি একটা সরল ভাব না থাকে— তবে দাম্পত্য জীবন সুখের হয় না। মাণিকতারা ভাবিয়া ভাবিয়া কৃশ হইয়া গেল।

কিন্তু একদিন সে মরিয়া হইয়া স্বামীর কাছে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার সোনামুখের এরূপ বিবর্ণতা আমি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। বল, তোমার কি হইয়াছে? আমাকে দেখিয়া তুমি পলাইয়া ফের কেন; এভাবে কি সংসারের শান্তি থাকিতে পারে? বলত প্রাণের স্বামী; তোমার কি হইয়াছে, তোমার পায়ে যদি কুশ-কন্টক বিঁধে তাহা উঠাইয়া ফেলিতে আমি যে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারি, তাহা কি তুমি জান না?" বলিতে বলিতে মাণিকতারা আসিয়া বাসুর হাত দুটি ধরিয়া সজল চোখে মিনতির সুরে বলিল,

"আমারে না শুনাইলে কথা, খাইব না আর ভাত।"
"সেই কথাটি কওনা পতি আমি তোমার দাসী।
আমারে কহিতে ডরাও আমি কি অবিশ্বাসী।।"

বাসু বলিল, "তুমি আমার গোপন কথার মালিক। আমি অবশ্য তোমাকে সকল কথা খুলিয়া বলিব, কিন্তু তারা, বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, তুমি যাইয়া ভাল করিয়া রান্না কর। আমি তোমার সঙ্গে খাওয়ার পরে মনের সমস্ত কথা তোমাকে খুলিয়া বলিব।" মাণিকতারা খুব রসাল করিয়া হরিকেল পাখীর মাংস রান্না করিল। উভয়ে তৃপ্তির সঙ্গে খাইয়া শয়ন ঘরে আসিয়া বসিল।

বাসু মাটি খুঁড়িয়া সেই অলঙ্কার ও মোহরের হাঁড়িটি বাহির করিল। জহরত ও অলঙ্কারের সেই বিশাল পোঁটলাটি দেখিয়া তারা বিষম বিস্মিত হইলঃ—

"স্বপ্ন দেইখা মানুষ যেমন উঠেরে চমকি।"
"মাণিক তেমনই উঠল চক্ষু দুইটি মেইলা।।
পতির দিকে চাহি কহে এসব কোথা পাইলা।।"

বাসু বলিল সেই কথা তোমাকে জানাইতে ভয় হয়, এই জন্য আমি খুব আতঙ্কিত। তোমার প্রাণে পাছে ব্যথা দেই, এই ভয়ে আমি তাহা বলিতে পারি নাই। কানু দাদা ও তাহার মা—আমাদের বড় দুঃখ-বিপদের দিনে যে উপকার করিয়াছে—তাহা বলিবার নহে। শৈশবে কানু দাদার সঙ্গে বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া আমি কত ফল চুরি করিয়া খাইয়াছি। আমার মার অবস্থা অতি খারাপ ছিল, কানু দাদার মা আমাকে একরূপ প্রতিপালন করিয়াছে, ইহাদের ঋণ আমি জীবনে শোধ করিতে পারিব না। বড় হইলে কানু দাদা আমাকে চুরি ডাকাতি শিখাইয়াছে, মানুষের মাথায় বাড়ি দিয়া লুট তরাজ করা আমাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। এই সকল কথা শুনিলে তোমার যদি আমার প্রতি ঘৃণা হয়—আমার উপর পাছে তুমি বিরূপ হও—এই আশঙ্কায় আমি মনে মনে বড় কষ্ট পাইতেছি। এই বিশ পঁচিশ দিন আমি অর্থের চেষ্টায় কানুদার সঙ্গে বাহির হইতে পারি নাই। তোমার চাঁদ-মুখখানি যদি আমার প্রতি ঘৃণায় ফিরাইয়া লও, তবে আমি কোথায় যাইব? আমার পায়ের তলের মাটি যে সরিয়া যাইবে।"

স্ত্রীর ভরসা দেওয়া

এই কথা শুনিয়া তারা হাসিতে হাসিতে বলিল ঃ—

"এই কারণে প্রাণপতি তোমার এত ডর।
সব কাজে আমি হব তোমার দোসর।।
নারীর ইষ্ট দেখ হৈল পতি মহাজন।
বিনা কথায় নারী করবে তার পথে গমন।।
কুকাজ করিয়া যদি দিতে বসে প্রাণ।
ঘরের নারী রাখ্‌বে দিয়া আপন জান।।
আমি হব তোমার দাসী ভাবনা লজ্জা নাই।
আমার কাছে আছে যা জানেন গোসাঞি।।"

বাসু নিজ স্ত্রীর কথা শুনিয়া খুব উৎসাহিত হইল, তাহার দেহে যেন নূতন বল সঞ্চারিত হইল। সে তখন খুলিয়া সমস্ত কথা তারার নিকট ব্যক্ত করিল—"আমি আর কানুদা ডাকাতি করি, কিন্তু আমাদের এক প্রধান শত্রু খমরার কালু সর্দ্দার, তাহারও একটি দল আছে। তাহার সঙ্গে আমরা কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারি না, কতবার তাহার দ্বারা ধৃত হইয়া যে কত লাঞ্ছনা পাইয়াছি ও বিপদে পড়িয়াছি—তাহা বলিবার নহে, কেবল প্রাণটা রাখিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। যা'ক সে কথা, কাল একটা খুব মস্ত সুযোগ হইবে। লাটের কিস্তি লইয়া কতকগুলি লোক বেল পাহাড়ী দিয়া চলিয়া যাইবে, তাহারা যখন রাখালরাজার দীঘির পথে আসিবে, তখনই আমরা তাহাদের থলিয়াগুলি লুট করিব। কানু দাদার সঙ্গে এই পরামর্শ পাকা হইয়া আছে, কিন্তু রাত্রে আমি গেলে তুমি একলাটি কি করিয়া থাকিবে, তাই ভাবিয়া আমি কিছু ঠিক করিতে পারিতেছি না, কোন বিপদে আসিলে তোমাকে সাহায্য করিবার কোন লোক নাই।"

মাণিকতারা বলিল, "তুমি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থেক, জানিও আমি মেয়ে মানুষ হইলেও কুড়িটা পুরুষকে ঘাল করিতে পারি, আমি আর পঞ্চু থাকিব; তুমি সচ্ছন্দে চলিয়া যাও।" পরম সন্তোষ সহকারে বাসু যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। সেই গুপ্ত অলঙ্কারের ভাণ্ড তুলিয়া আনিয়া মাণিকতারাকে সে নিজ হাতে সাজাইল। তারা সেই সকল গয়না পরিয়া অপ্সরার

ন্যায় ঝলমল করিয়া উঠিল। বাসু তাহার এই পরীর মত সুন্দরী স্ত্রীকে আজ কত সোহাগ ও আদর করিতে লাগিল। স্বামীর আদরে মাণিকতারা যেন হাতে স্বর্গ পাইল।

"নারীর কাছে পতি যেমন অন্ধের নয়ন।
পতি হৈল চাকের মধু, বৃক্ষেতে যেমন।।
পতির ভালবাসা পাইলে জুড়ায় নারীর বুক।
পতির কাছে আদর পাইলে নারীর যে কত সুখ।।
গয়না গাটি পইরা তারা মনে সুখ পাইল।
বাসুর চরণের ধূলা মাথায় লইল।।

ছয় তোড়া টাকা

গাছের অগ্রভাগে রোদ দেখা যাইতেছে, বেলা প্রায় শেষ। কানু-বাসুর দলে বিশ জন বলিষ্ঠ লোক, তাদের হাতে ঢাল, সড়কী ও লাঠি। কানু ও বাসুর হাতে এক একখানি ছেঁড়া মাদুর। পলাশবাড়ীর কাছে যাইয়া তাহারা প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। কানু ও বাসু ছেঁড়া মাদুর পাতিয়া বসিয়া কতকগুলি চিড়া ও "চিনি চাম্পা" কলা খাইয়া পেট ভরাইল। অদুরে রাখালরাজার দীঘি, জল অতি নির্ম্মল স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। সেই জল অঞ্জলি ভরিয়া পান করিয়া কানু দলের লোকদিগকে বলিল, "তারা টাকার খলিয়া লইয়া এই দীঘির পাড় দিয়া যাইবে। আজ ভাগ্যে শুক্রবার, কালু আজ আর বাহির হইবে না, জুম্বাবারে তারা দারু খায় না, সুতরাং এটা মস্ত বড় সুযোগ, তোরা এখানে বসিয়া থাক্। তোড়া লুটিয়া চলিয়া যাইবি, আর শত্রু পক্ষীয় কাহাকে পাইলে দরকার হইলে এই দীঘিতে কাটিয়া ফেলিয়া কালোজল লাল করিয়া ছাড়বি।"

অল্পক্ষণ মধ্যেই দূর হইতে গরুর গাড়ীর "ঘ্যার ঘ্যারানি" শব্দ শোনা গেল। কানু বলিল, "ওই আসিতেছে, তোরা ঠিক হইয়া লাঠি হাতে দাঁড়া।" ইহার মধ্যেই হুম হুম করিয়া ছয় জন জোয়ান মর্দ্দ ছয়টা বড় টাকার তোড়া মাথায় করিয়া আসিয়া পড়িল, একজন ঘোড় সোয়ার, তাহাদের অগ্রবর্ত্তী পাহারা। হঠাৎ ঘোড়ার পায়ে ধুপ করিয়া লাঠির বাড়ি পড়িল এবং ঘোড় সোয়ারের মুণ্ডটা সেইখানে গড়াইয়া পড়িল। ছয়টি বাহকের মৃতদেহ পরক্ষণেই

দীঘির পাড়ে পড়িয়া রহিল এবং তাহাদের মাথার টাকার তোড়া অদৃশ্য হইল। কানু সেই টাকার তোড়াসহ কয়েকজন লোক ও বাসুকে গঞ্জের হাটে বাড়ীতে পাঠাইয়া দিল। কিন্তু ইহার মধ্যে রাখালরাজার দীঘির পাড়ে একটা ধ্বস্তাধস্তি কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে। কালু সর্দ্দার কোন ক্রমে সংবাদ পাইয়াছে যে তাহার মুখের শিকার কানু ও তাহার দলে লইয়া গিয়াছে। অবিলম্বে কালু সর্দ্দার পঞ্চাশ জন লোক লইয়া কানু ও তাহার দলকে অনুসরণ করিল। কানু ও তাহার দলের পাঁচ জন লোক বন্দী হইল।

কালুর হুকুম

কালু সর্দ্দার হুকুম দিল—"ঐ শালা কানুকে বাঁধ নায়ের গুড়া দিয়া।" পাঁচ জন লোককে পিঠ মোড়া করিয়া হাত বাঁধিয়া তাহারা নৌকায় উঠাইল। কালু হুকুম করিল, "কাল সকালে ইহাদের বিচার হইবে। ইহাদের সকলকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিব। আজ বিশ্রাম করা যা'ক। তোমাদের মধ্যে যাহাদের অবসর আছে, তাহারা মুরগী রসুই কর এবং খিচুড়ি রান্না কর। আজ রাত্রে খাইয়া দাইয়া বিশ্রাম করা যা'ক। কাল ইহাদিগকে হত্যা করিয়া টাকার তোড়ার সন্ধান করা যাইবে।"

ইহার মধ্যে ছয় তোড়া টাকা লইয়া বাসু আসিয়া কানুর মার বাড়ীতে পৌঁছিল। কানুর মা বলিল, "সে কি বাসু টাকা তো আসিল কিন্তু আমার কানুকে কোথায় রাখিয়া আসিলে?"

বাসু বলিল, "মাসীমা, ভয় নাই, কানুর সঙ্গে আমার দলের লোক আছে, আমি টাকার তোড়া কয়েকজন বাহকের কাঁধে চড়াইয়া দিয়া শীঘ্র শীঘ্র আসিয়াছি, কানুদা এখনই আসিয়া পড়িবে।"

এমন সময় ৪।৫ জন লোক ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বাসুকে একটা নিরালা জায়গায় লইয়া গিয়া সমস্ত অবস্থা জানাইল। কানু ও তাহাদের দলের কয়েকটি লোককে যে কালু সর্দ্দার ধরিয়া লইয়া গিয়াছে এবং পরদিন তাহাদিগকে কাটিয়া ফেলিবে এবং এখানে বাড়ী লুট করিতে আসিবে, এই সমস্ত সংবাদ বাসুকে দিল। বাসু এই সংবাদে অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়া মাণিকতারার কাছে সমস্ত অবস্থা জানাইল এবং কানুদাকে উদ্ধার করিতে যে সে এখনই যাইবে তাহাও বলিল।

মাণিকতারাকে একা বাড়ীতে রাখিয়া বাসু রওনা হইয়া গেল, সে পথে সংবাদ পাইল কালু সর্দ্দার আজ আর তাহার বাড়ীতে ফিরিবে না, খালের ঘাটে তাহার নৌকা বাঁধা ও সে এবং তাহার দলের লোকেরা আহারাদির পরে বেশ ঘুমাইতেছে।

কিন্তু বাসু সেই নৌকা আক্রমণ করিতে সাহস পাইল না। সুবিধার প্রতীক্ষায় সে একটা ঝোপের মুখে লুকাইয়া রহিল।

নর্ত্তকী সাজা ও দুলুকে বাঁধিয়া ফেলা

মাণিকতারা কানুকে কিরূপে উদ্ধার করিবে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া সে তাহাদের ভাল নানা রংএর সুন্দর নৌকাখানি সাজাইতে হুকুম দিল। এবং স্বামীর অনুরক্ত কয়েক জন খুব বলিষ্ঠ ডাকাইতকে নৌকাতে উঠিতে বলিল। এদিকে ঘরে আসিয়া পঞ্চুকে নানারূপ অলঙ্কারে দেবী প্রতিমার মত করিয়া সাজাইল এবং নিজেও সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া নৌকায় উঠিল। নৌকা খয়রা খালের উপর দিয়া হেলিয়া দুলিয়া চলিল। সে জানিতে পারিয়াছিল যে আজ কালু সর্দ্দার বাড়ীতে নাই, সুতরাং সেই বাড়ীর দিকে নৌকাখানি বাহিয়া লইয়া যাইতে আদেশ দিল। পঞ্চু খেম্‌টা সাজিয়া ঝুমুর ঝুমুর শব্দে নূপুর বাজাইয়া নাচিতে লাগিল এবং মাণিকতারা তাল রাখিয়া গান করিতে লাগিল, দলের লোকেরা খুব হাস্য-পরিহাস করিয়া দোহার করিতে লাগিল।

কালু সর্দ্দার বাড়ী ছিল না, কিন্তু তাহার লম্পট শিরোমণি যুবক পুত্র দুলু বাড়ীতেই ছিল। সে দেখিল—একখানি সুন্দর রঙ্গীন নৌকা তাহাদের খাল দিয়া চলিয়াছে, তাহাতে বহু দীপ জ্বলিতেছে, সেই দীপালোকে নানা অলঙ্কারে ভূষিতা এক ষোড়শী রমণী নাচিতেছে এবং আর একটি সুন্দরী যুবতী অতি মিষ্ট স্বরে গান করিতেছে। সঙ্গীদের কলহাস্যে এবং পরিহাস রসিকতায় নৌকাখানি যেন পাখীর মত উড়িয়া চলিয়াছে। কালু সর্দ্দারের উপযুক্ত পুত্র দুলুই সেখ চিৎকার করিয়া বলিল,

"সুন্দর নৌকাতে চৈড়া নাচ তোমরা কে?
ভাল চাস্ তো কালুর ঘরে পরিচয় দে।।"

তাহার আদেশে মাঝিরা নৌকাখানি কালু সর্দ্দারের ঘাটে লাগাইল। মাণিকতারা বলিল, "আমরা কাজি সাহেবের লোক। তিনি চরের উপর তাঁবু খাটাইয়া আছেন, আজ বাকী রাতটুকু আর আমাদের দিয়া তাঁহার কোন কাজ নাই; আমরা এই সুযোগে একটু আমোদ প্রমোদ করিতে বাহির হইয়া পড়িয়াছি।"

"এই সময়ে আমরা কিছু দারু খাইয়া নাচি।
পাইলে বিদেশে বঁধু বুকে করে রাখি।।
আপনার কাছে আসছি দারু কর দান।
নৌকাতে আসিয়া বৈস ঠাণ্ডা কর প্রাণ।।"

দুলু সেখ মহানন্দে দারুর ভাঁড় লইয়া নৌকাতে আসিয়া বসিল। মাণিকতারার ইঙ্গিতে মাঝিরা খুব দ্রুতবেগে বাড়ীর দিকে নৌকা চালাইয়া গঞ্জের হাটে পৌঁছিল। দারুপানে উন্মত্ত দুলু সেখের অন্য কোন দিকে খেয়াল ছিল না।

বাড়ীতে আনিয়া তারা দুলুকে একটা লোহার শিকল দিয়া থামে বাঁধিল এবং দূত মুখে কালু সর্দ্দারের নিকট খবর পাঠাইল যে কানুকে খালাস দিলে তবেই দুলুর প্রাণের আশা থাকিবে,—কালু যদি কানুর কোন অনিষ্ট করে, তবে—

"মাণিকতারার হাতে যাবে দুলু চোরার মাথা"।

এইরূপে মাণিকতারার কৌশলে ও সাহসে বাসু ও কানু বিপদ-মুক্ত হইল।

আলোচনা

স্বর্গীয় বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক এই পালাটি সংগৃহীত হইয়াছিল। তিনি পালাটি আমাকে পাঠাইয়া দিবার পরে হঠাৎ পরলোক গমন করেন। অবশ্য তিনি বহুদিন হইতে ম্যালেরিয়া রোগে ভুগিতেছিলেন, কিন্তু তথাপি আমরা তাঁহার এই আকস্মিক মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। আরও দুঃখের বিষয় এই পালাটি তিনভাগে বিভক্ত, তাহার প্রথমাংশ বিহারী বাবু সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। তিনি কাহার নিকট হইতে এই অংশ পাইয়াছিলেন এবং অপর দুই ভাগ কোথায় পাওয়া যাইবে, তাহার কোন সন্ধানই আমাকে দিয়া যাইতে

পারেন নাই। শেষ পত্রে তিনি কেবল এই লিখিয়াছিলেন যে, পালাটি দীর্ঘ এবং একজন গায়েন সমস্ত পালাটি জানে না, যাহারা বাকী দুইভাগ জানে—তাহাদের বাড়ী কতকটা দূরে; সুতরাং সমগ্র পালাটি সংগ্রহ করিতে একটু বিলম্ব হইবে। কিন্তু এই বিলম্ব চিরদিবসের বিলম্বে পরিণত হইল। পালার বর্ণিত স্থানগুলি ঘটনাটির লীলাস্থল, ব্রহ্মপুত্র নদ, গঞ্জের হাট, খড়াইএর খাল, বইলা খালি, দশকাহণিয়া, সেরপুর প্রভৃতির উল্লেখ দ্বারা স্পষ্টই মনে হয় যে সেরপুর অঞ্চল খোঁজ করিলে হয়ত এই গানের অবশিষ্টাংশ মিলিয়া যাইতে পারে, আমি এতদর্থে চেষ্টার ত্রুটী করি নাই। প্রথমতঃ চন্দ্রকুমার দে মহাশয়কে পাঠাইয়াছিলাম। তিনি এই গানের কিছু কিছু ভগ্নাংশ সংগ্রহ করিলেও বাকী অংশ উদ্ধার করিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এবং কবি জসিমুদ্দিন সেরপুরে যাইয়া বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। বিহারী বাবুর বাড়ীতে পরিত্যক্ত কাগজপত্র হইতে এই গানটির কোন হদিস পাওয়া গেল না, তথাপি আমি এসম্বন্ধে নিরাশ হই নাই—ভাবিয়াছিলাম একদিন না একদিন আমার চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইবেই। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে কাজ হইতে অবসর দেওয়াতে আমার যে সুযোগ সুবিধা ছিল, তাহা চলিয়া গেল। তাহার পরেও আমি চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু এই পল্লী-গীতিকা সংগ্রহ করিতে যে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার দরকার হয়—তাহা সময় সাপেক্ষ। কিছুদিন সেই স্থানে থাকিয়া নানাজনের দ্বারা চেষ্টা না করিলে সে কাজ সিদ্ধ হইবার নহে।

ভণিতায় দুইজন কবির নাম পাওয়া গিয়াছে। একজনের নাম আমির, পালার বন্দনাগীতিটি তিনিই লিখিয়াছেন, তিনি বলিতেছেন, "আমি অতি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, তার উপর বিদ্যা বুদ্ধি অতি সামান্য, আসরে আমার মত নির্গুণকে আপনারা আদর করিয়া থাকেন, ইহাই আমার জোর।" এই সকল কথায় মনে হয়, তিনি শিক্ষিত না হইলেও পালাগান রচনা করিয়া সে অঞ্চলে তাঁহার বেশ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। গানটি আদ্যন্ত পড়িয়া দেখিবেন, তিনি সরস্বতীর বর-পুত্র না হইলেও প্রকৃতির বর- পুত্র; তাঁহার মুখে কবিতা অনর্গল আসিয়াছে, ঘটনা নিয়ন্ত্রণ ও বিষয় বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখার তাঁহার ক্ষমতা অদ্ভুত। এই গানের যে সকল স্থান আমি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার ভাষা কতক কতক আমি বদলাইয়া দিয়াছি, তাহা না হইলে তাহা একেবারে দুর্ব্বোধ্য হইত। মূল গল্পটি পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকায় পাইবেন। সেখানে

"সোন্দর নৌকাতে চৈড়া ভাল চাস তো কালুর ঘরে (পৃষ্ঠা ৩৩৬)

দেখিবেন—ভাষার রূপ একবারে প্রাকৃত। "নাটের খতি" অর্থ যে লাটের কিস্তি তাহা সহজে কে বুঝিবে?

এই আশ্চর্য্য কবি যখন ব্রহ্মপুত্রের বর্ণনা করিয়াছেন তখন সেই মহান ও ভৈরব জল প্রবাহের দর্শনে কবির স্বাভাবিক বিস্ময় যেন ফুটিয়া বাহির হইয়াছে;ইহার বাণী স্বল্পাক্ষরা; বাসুর মায়ের মৃত্যু ও কবিরাজের চিকিৎসা দুইটি পৃষ্ঠার মধ্যে যে ভাবে চিত্রিত হইয়াছে, তাহা অদ্ভুত শক্তির পরিচায়ক। এই বর্ণনার একদিকে করুণরস, অপরদিকে ব্যঙ্গ। চিকিৎসক জাতির প্রতি কবির একটা অশ্রদ্ধা হৃদয়ের খুব নিভৃতে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তাহা অতিমাত্র পরিহাস-রসিকতা বা অত্যধিক করুণরস দ্বারা আচ্ছন্ন করেন নাই। বর্ণনাগুলি যথাযথ, কিন্তু তাহার মধ্যে অতি সংগোপনে ফল্গুনদীর প্রবাহের মত একটা ব্যঙ্গের রসধারা বহিয়া যাইতেছে, এই ব্যঙ্গের এতটা প্রকাশ হয় নাই যে, মৃত্যুর কক্ষের নিস্তব্ধ পবিত্রতার হানি হয়, শেষ পর্য্যন্ত পড়িলে বরং বাসুর মার জন্য শোকেই পাঠকের মন আর্দ্র হইয়া যায়। এত অল্প কথায় বাসুর মার আমরণ যে ছবিখানি অঙ্কিত হইয়াছে তাহাতে এই কুটিরবাসিনী দরিদ্র বিধবার দুঃখে মন বিগলিত হইয়া যায় এবং তাঁহার চিত্তের বিশুদ্ধতা ও ধর্ম্মভীরুতা পাঠকের শ্রদ্ধা উৎপাদন করে। এই কবি হয়ত বাঁশ বা খাগের কলম দিয়া এই চরিত্রের রেখাঙ্কন করিয়াছেন কিন্তু তদঙ্কিত চিত্রখানি দেখিলে মনে হয় যেন আমরা সভা করিয়া কবিকে সোনার কলম দিয়া সংবর্দ্ধনা করি। গালিয়াখালির পাড়ে মাণিকতারা ও বাসুর প্রথম দর্শনে নিতান্ত প্রকৃত কৃষকজনোচিত কথার মধ্যেও যেন বৈষ্ণব মহাজনদিগের পূর্ব্বরাগের পদ ঝংকৃত হইয়াছে।

সাধুশীলের গৃহে রন্ধনের বর্ণনা, বউদের রান্না, শ্বশুর শ্বাশুড়ীর কথাবার্ত্তা, পুরাতন ডাল চড়াইয়া দিয়া তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য কড়াইএর উপর কাঁটা দিয়া ঘাঁটাঘাঁটি,—মেজ ছেলের ক্ষুধার জ্বালায় স্ত্রীর চুলের মুঠি ধরিয়া প্রহারের চেষ্টা এবং গিন্নি আসিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া নিরস্ত করা—ইত্যাদি দৃশ্য খুব রহস্যজনক ও উপাদেয় হইয়াছে! বাসুর শ্বশুর গৃহে প্রথম ভোজন ব্যাপারটাও অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ভাষায় চিত্রিত হইয়াছে। বাসুর স্ত্রীর কাছে নিজের ডাকাতি-বৃত্তির কথা সংগোপন করার চেষ্টা, মাণিকতারার পাখী শিকার প্রভৃতি অপরূপ কবিত্বচ্ছটায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মোট কথা, এই পুস্তকখানি পাইয়া প্রথমে আমার মনে হইয়াছিল যে আমি একটি স্বর্ণখনির আবিষ্কার করিলাম, সেই মূল্যবান

ধাতু নানা আবর্জ্জনা ও ধূলি-বালু মিশ্রিত কিন্তু তাহাতে তাহার প্রকৃত মূল্য কমিয়া যায় নাই।

গ্রন্থভাগে যে হরিকেল পাখীর কথা আছে, এই পাখীটির নাম হইতেছে কি প্রাচীন কালে বাঙ্গলার নাম হরিকেল হইয়াছিল?

এই গানে অমার্জ্জিত ভাষার আধিক্য দেখিয়া মনে হইতে পারে যে ইহা খুব প্রাচীন কিন্তু ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীর অধিক প্রাচীন নহে। চাষাকবির ভাষা প্রাকৃত-জনোচিত হইলেও ইহার পয়ার ছন্দ অনেকটা নির্দ্দোষ। প্রাচীন কবিতায় এই ছন্দই প্রধানতঃ সময়-নির্দ্দেশক।

দ্বিতীয়তঃ ডাকাতির যে সকল বর্ণনা আছে তাহা মোগল রাজ্যের অবসানে এবং বৃটিশদের অধিকার পুরোপুরি স্থাপনের পূর্ব্ব সময়ের বলিয়া মনে হয়, সেই সময় এই দেশ অরাজকতাপূর্ণ ছিল এবং পল্লীতে পল্লীতে বিশেষতঃ নদীগর্ভে ডাকাতি ও নির্ম্মম লুণ্ঠন কার্য্য এই ভাবেই অনুষ্ঠিত হইত; কিন্তু সেরপুর অঞ্চলে তখনও টাকার প্রচলন বেশী ছিল না। নতুবা কড়ির স্তূপ দিয়া কেহই খেওয়া পার হইত না।

এই গল্পটির নাম মাণিকতারা। এই ভাগে তাহার ছবিটি কেবল বিকাশ পাইতে সুরু করিয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় যখন ঘটনাগুলি ক্রমশঃ নিবিড়তর হইয়া পাঠকের কৌতূহল ও উৎসাহ বৃদ্ধি করিতেছিল, যখন মাণিকতারা দশভুজার মত নানা প্রহরণধারিণী হইয়া দনুজদলনে সবে মাত্র নামিয়াছেন—সেই ঘনীভূত কৌতূহলের মুখে পালা শেষ হইয়া গিয়াছে। এই পালাটি উদ্ধার করিবার কাহারও চেষ্টা নাই। বিদ্যালয়ের ছেলেরা শেলির সম্বন্ধে গুরুতর থিসিস লিখিয়া জগতের মহাকার্য্য সম্পাদন করিবেন; গেঁয়ো ভূতের এই সকল আবর্জ্জনা ঘাঁটাঘুঁটি করিয়া তাহাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করিবার কি অবকাশ আছে?

সোনাই

শৈশবাবস্থা

সোনাই যে রূপসী হইবে, অতি শৈশব হইতেই তাহা বুঝা গিয়াছিল। বসন্তের হাওয়া মাঘের শেষ হইতে বহে—সেই স্নিগ্ধ হাওয়া গায় লাগিলেই বুঝা যায়, ঋতুপতি অসিতেছেন, ফাল্গুন-চৈত্র আসন্ন। সোনাই যখন দ্রুত হামাগুড়ি দিয়া মায়ের কোলে উঠে,—চঞ্চলা মেয়ে দণ্ডেক কাল একস্থানে থাকিবার নহে, অমনি হাসিতে হাসিতে মাটিতে নামিয়া হামাগুড়ি দেয়—তখন মনে হয় কুটিরের আঙ্গিনায় হীরা-মতি লইয়া প্রকৃতিদেবী খেলা করিতেছেন। হাসিয়া খেলিয়া সারা আঙ্গিনাময় আছাড় খাইতে খাইতে সে ঘুরিয়া রূপের লহরী বিলাইয়া দেয়।

যখন সোনাই সাত বছরে পড়িল, তখন আর অত ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায় না। মায়ের কোলে বসিয়া, মায়ের কাঁধে হাত রাখিয়া সে মৃদু মৃদু হাসিতে থাকে, মনে হয় যেন পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় বামুনদের আঙ্গিনা ভরিয়া গিয়াছে। আট বছর বয়সে সোনাইএর কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো লম্বা কালো চুল, পদ্মফুলের চারিপাশে শৈবালের মত মুখের চারিদিকে দুলিতে থাকে—কি সুন্দর সেই কালো চাঁচর কেশপাশ, কি সুন্দর সেই চাঁপা ফুলের মত মুখখানি। নবম বৎসরে কন্যা কিশোরী হইয়া উঠিল, তখন ছুটাছুটি ও চাঞ্চল্য কমিয়াছে, স্বভাব সংযত ও সুন্দর হইয়াছে, সাঁজের দীপটির মত সোনাই রূপের প্রতিমা হইয়া বসিয়া থাকে, সেই প্রদীপের জ্যোতিতে শুধু গৃহখানি নয়, বাড়ীশুদ্ধ সমস্ত স্থান রূপে ঝলমল করিয়া উঠে। এইভাবে দশম ও একাদশ বর্ষ পার হইল। এগারো বছর বয়সে সোনাই তাহার বাপকে হারাইল। সেই পল্লীতে তাহাকে ও তাহার মাকে দেখিবার কেহ রহিল না। বৃক্ষ

শুকাইয়া গেলে লতা যেমন পত্রপুষ্প লইয়া আলগা হইয়া পড়ে, লতা মরিয়া গেলে তার ফুল পাতা যেরূপ ঝরিয়া পড়ে, পিতৃহীন গৃহে কন্যা ও মাতার অবস্থা তেমনই হইল।

এদিকে সোনাইএর বয়স বাড়িয়া চলিল। চতুর্দ্দশীর চাঁদ যেন পূর্ণিমার চাঁদ হইল। একলা ঘরে এই পরম রূপবতী কন্যাকে লইয়া বিধবা মাতা কিরূপে থাকিবেন,—সোনাইএর রূপের খ্যাতি চারিদিকে প্রচার হইয়াছে, কোন্ দিন কোন্ বিপদ ঘটে,—মা তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

মায়ের কুঞ্চিত কপাল দেখিয়া সোনাই তাঁহার দুর্ভাবনার কথা বুঝিতে পারিত। সে একলা ঘরে বসিয়া কেবল কাঁদিত। এই কান্না ছাড়া তাহার আর কিই বা অবলম্বন আছে।

মাতুলালয়ে গমন ও পতি সন্দর্শন

দীঘলহাটি গ্রামে সোনাইএর মামার বাড়ী; মা ও মেয়ে যুক্তি করিয়া, নিজ ভদ্রাসন ছাড়িয়া সোনাইএর মা তাঁহার ভাইএর বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। ভাইএর নাম ভাটুক ঠাকুর—তাঁহার পেশা যজমানী। বেশী আয় নাই, কিন্তু যজমানী করিয়া তিনি যাহা উপার্জ্জন করেন, তাহাই ভাটুক ঠাকুরের পক্ষে যথেষ্ট, কারণ তাঁহার সন্তানাদি কিছু নাই। সোনাইএর মামা ও মামী তাহাদিগকে পাইয়া খুসিই হইলেন; সোনাইএর মুখখানি চাঁপাফুলের মত, তার দীঘল চুল পায়ের তলায় যাইয়া পড়িয়াছে। মামা তাহাকে একখানি দামী নীলাম্বরী শাড়ী কিনিয়া দিলেন, সেই শাড়ী পরিয়া মেয়ে যখন নদীর ঘাটে যায়, তখন চারিদিকের লোক চাহিয়া থাকে। এমন সুন্দরী মেয়ে সে তল্লাটে নাই।

বাড়ীতে ভাই ভগিনী দিনরাত্রি পরামর্শ করেন, এ মেয়ে কার হাতে দেওয়া যায়। এমন রূপসী কন্যাকে বিবাহ করিতে অনেকের ইচ্ছা, ঘটক রোজই আসে যায়। কিন্তু সোনাইএর মার মনটি বড় খুঁৎখুঁতে, কিছুতেই তাঁর মন উঠে না। একদিন ঘটক একটি বরের সংবাদ দিল,—ধনে, জনে, বিদ্যায় সে বর খুবই ভাল। কিন্তু তাহার বর্ণটি একটু কালো। "এমন সোনার প্রতিমাকে আমি কি করিয়া একটি কালো ছেলের হাতে দেই", সকলের আগ্রহ সত্ত্বেও মাতা ঘটককে ফিরাইয়া দিলন। মা ঘটকদিগকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিলেন, "দেখুন আমার মেয়ের মত আর একটি মেয়ে এ অঞ্চলে পাবেন না, যোগ্যবরে একে দিব, ইহাই

আমার ইচ্ছা,—কার এরূপ ইচ্ছা না হয়? সুতরাং আমি যদি একটু বেশী প্রত্যাশা করি, তবে আপনারা আমাকে দোষ দিতে পারেন না।"

"যেমন সুন্দর কন্যা গো তেমনই হবে বর।
তার মধ্যে থাকবে জামাইর বার-বাংলার ঘর।।
সোনার কার্ত্তিক হইবে জামাই গো যেমন চাঁদের ছটা।
কুলে শীলে বংশে ভাল, জমিদারের বেটা।।
যতেক সম্বন্ধ আসল, সোনাইর মা নাহি বাসে।
এহি মতে আইল ঘটক প্রতি মাসে মাসে।।"

রোজই সোনাই জল আনিতে নদীর ঘাটে যায়—আষাড়িয়া স্রোতে একখানি সুন্দর ডিঙ্গির মত সে রূপের হিল্লোল তুলিয়া চলিয়া যায়, পাড়াপড়সিরা কানাঘুষা করে, এ দুর্গা-প্রতিমার যোগ্য বর আমাদের দেশে কোথায় পাওয়া যাইবে?

সেই নদীর ঘাটের পথ দিয়া এক তরুণ শিকারী রোজই আনাগোনা করে। কি সুন্দর বর্ণ! কি সুন্দর তার চোখ মুখের গড়ন, সেই পথে ফুলের গাছ শত শত, ফুলগুলি নদীতীর আলো করিয়া ফুটিয়া থাকে, যুবক প্রতি সন্ধ্যাকালে পোষা ঘুঘু হাতে লইয়া এই পথে যায় আসে। একটা থলিয়ার মধ্যে কতকগুলি খাগের শর, সে পাখী-শিকারী।

"দেখিতে সোনার নাগর গো চাঁদের সমান।
সুবর্ণ কার্ত্তিক যেন হাতে ধনুকবাণ।।"

সোনাইএর মা যেমন বরটি চাহিয়াছিলেন, এ যেন ঠিক তেমনটি।

নদীর পারে বর্ষাকালে সারি সারি কেয়া বন। কেয়া ফুলের গন্ধে নদীতীর সুবাসিত। এইখানে উভয়ের চারি চক্ষের মিলন হইল, উভয়ে ভাবিল, কোন বিধাতা তাহাদের মনের মানুষকে আনিয়া এ ভাবে পথে দেখাইলেন!

কন্যা মনে মনে এই বরের জন্য বিধাতার নিকট প্রার্থনা জানাইল।

"পক্ষী হইলে সোনার বঁধুরে রাখিতাম পিঞ্জরে।
পুষ্প হইলে প্রাণের বঁধুরে খোঁপায় রাখতাম তোরে।।

কাজল হইলে রাখতাম বঁধুরে নয়ান ভরিয়া।
তোমার সঙ্গে যাইতাম দেশান্তরী হইয়া।।”

নব-যৌবনের নবরাগ এমনই দুর্জ্জয় শক্তি বহন করে, লাজশীলার লাজের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেয়, ঘরের বউকে কুলের বাহির করে, যাহার মুখে কথাটি নাই, তাহার মুখ হইতে সুধাবৃষ্টির মত অজস্র কথা বাহির করে।

যুবক একদিন সোনাইকে অতি ভয়ে ভয়ে অতি সন্তর্পণে বলিলেন, “কাল পদ্মদলের মধ্যে লিখিয়া যে চিঠিখানি তোমার সইয়ের হাতে দিয়াছি, তা' কি তুমি দয়া করিয়া পড়িয়া দেখিয়াছ?”

সে চিঠি সোনাই পাইয়াছিল, বারংবার চোখের জলে ভিজিয়া চিঠিখানি পড়িয়াছিল, চিঠির অনেকগুলি আখর তাহার অশ্রুতে মুছিয়া গিয়াছিল। চিঠিতে লেখা ছিলঃ—

“আমার নাম মাধব, আমি বাপ মায়ের এক ছেলে। আমার বাবার “লাখের জমিদারী” আছে, তুমি সম্মত হইলে কেয়াবনে সন্ধ্যাকালে থাকিও, সেখানে তুমি কাহার জন্য মালা গাঁথ? যাহা হউক আমি সেখানে যাইয়া তোমার কাছে দুটি মনের কথা বলিব। তুমি কি তাহা শুনিবে না? তোমার গায়ের রং পদ্ম-ফুলের মত, আমি তোমাকে অগ্নিপাটের শাড়ী দিব, তাহা পরিলে তোমাকে বেশ মানাইবে। আমার বাড়ীর পাছে বড় একটা ফুলের বাগান আছে, মালী গাছের পাতা দিয়া ‘টোপা’ বানাইয়া দিবে, আমি তোমার জন্য সেই টোপা ভরিয়া ফুল তুলিব। ফুলবাগানের কাছে যে দীঘিটা আছে, তাহার কালো জল কেমন নির্ম্মল, তোমার ইচ্ছা হইলে আমরা দুজনে দীঘিতে সাঁতার কাটিব, দীঘিতে জলটুঙ্গী ঘর আছে, পদ্মগন্ধ-বাসিত হাওয়া সেই ঘরে আসিয়া আমাদের শরীর জুড়াইবে। আমার “কামটুঙ্গী” বৈঠকখানা ঘর। তুমি আমি দুইজনে সেখানে নিরালা রাত্রে পাশা খেলিব। আমার আরও কত সাধ আছে, তাহা কি লিখিব, লক্ষ্মী! তুমি কি তাহা পূরণ করিবে না?”

“বাহুতে পরাইয়া দিব বাজু-বন্ধ তাড়।
হীরা মতি দিয়া দিব তোমার গলার হার।।
কত ছন্দে কত সাজে তোমারে সাজাইব।
জোনাকীর মালা আনি তোমার গলায় দিব।।”

"দেখিতে সোনার নাগর গো চাঁদের সমান।
সুবর্ণ কার্ত্তিক যেমন গো হাতে ধনুকবাণ।।"

(পৃষ্ঠা ৩৪৫)

এই পত্র পাইয়া কন্যা তাহার উত্তর লিখিলঃ—সে উত্তরে সকল কথা স্পষ্ট করিয়া লিখিতে তাহার বাধিল না—

"যে দিন তোমায় দেখিয়াছি, সেই দিনই আমি ভুলিয়াছি।"

"ফুল হইয়া ফুটিতাম বঁধুরে যদি কেওয়া বনে।
নিতি নিতি হৈত বঁধু দেখা তোমার সনে।।
তুমি যদি হৈতারে বঁধু আসমানের চান।
রাত্র নিশা চাহিয়া রৈতাম খুলিয়া নয়ান।।
তুমি যদি হৈতা বঁধু ঐ না নদীর পানী।
তোমারে যাচিয়া দিতাম তাপিত পরাণি।।"

"কিন্তু এগুলি তো আমার মনের কথা; বনে যেমন ফুল ফুটিয়া শুকাইয়া মাটিতে পড়ে, মনের কথাও তেমনই মনে উদিত হইয়া ঝরিয়া বিলীন হইয়া যায়।

"আমার মা ও মামা আমার কর্ত্তা, তাঁহারা দিনরাত্রি আমার জন্য ভাল বরের খোঁজ করিতেছেন, আমি কি বলিয়া তাঁহাদের কাছে তোমার কথা বলিব? আমি কিছুতেই উপায় খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমার সই তোমার সঙ্গে দেখা করিবে, চিঠিখানি চন্দন-বাসিত ও ফুলের মালা-জড়িত, তুমি ইহাই আমার মনের ভাবের স্নিগ্ধ নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করিও এবং আমাদের মিলনের যদি কোন উপায় থাকে, তবে সইএর কাছে বলিয়া দিও।"

দুর্জ্জন বাঘরা

সেই দীঘল-হাটি গ্রামে বাঘরা নামক এক অতি দুর্জ্জন লোক ছিল,—সে সিন্দুরের ব্যবসা করিয়া খুব প্রতাপশালী হইয়াছিল। বড়লোক, বিশেষ মুসলমান রাজপুরুষদিগকে সুন্দরী কুলবধূর সন্ধান দিত—এবং এই কার্য্যের জন্য বিশেষ পুরস্কার পাইত। বাঘরা সামান্য লোক ছিল না, এখনও নেত্রকোণা অঞ্চলে একটা প্রকাণ্ড জমি "বাঘরার দাওর" নামে পরিচিত; এই বিলা জমিটা বাঘরা নিশ্চয় তাহার কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ পাইয়াছিল। এই জমি বর্ষায় ডুবিয়া যায়, তখন ইহা একটা বিশাল বিলে পরিণত হয়। গ্রীষ্মকালে জল শুকাইয়া যায়, কিন্তু মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় থাকে।

বাঘরা যাইয়া দেওয়ান সাহেব ভাবনাকে বলিল, "হুজুর আপনার জমীদারীর মধ্যে এই দীঘল-হাটি পল্লীতেই ভাটুক বামুনের এক পরমা-সুন্দরী ভাগিনী আসিয়াছে। তাহার রূপের কথা কি বলিব! আপনি অবশ্য অনেক রূপসী দেখিয়াছেন, কিন্তু এমন রূপসী দেখেন নাই। যদি আপনি বলেন তবে আপনার জন্য মেয়েটিকে সংগ্রহ করিতে পারি।"

বাঘরাকে তখনই দেওয়ান সাহেব একটা কুলায় মাপিয়া স্বর্ণ মুদ্রা দিলেন এবং বলিলেন, "এ কাজটি তোমার করা চাই-ই।"

বাঘরা গোপনে ভাটুক ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিয়া বলিল—"মেয়েটিকে দেওয়ান সাহেবকে দাও—পরম সুখে সে তাঁহার রাজপুরীতে থাকিবে, তাঁহার যতগুলি নিকার স্ত্রী আছে তাহারা সোনাইএর বাঁদি হইয়া থাকিবে, হীরামণি জহরতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা থাকিবে,—সুতরাং সোনাই আজীবন সুখে কাটাইবে, ইহাতে তিল মাত্র সন্দেহ নাই।

"আর তোমারও যে এবিষয়ে লাভ না আছে, তাহা নহে। তোমার বাড়ীর কাছে দেওয়ান ভাবনা দীঘি কাটাইয়া দিবেন, তাহার চার পাড়ে চারটি সান-বাঁধা ঘাট থাকিবে। তোমাকে বাহান্ন পুরা জমি তিনি দিবেন, তোমার আর পেটের ধান্দা করিতে হইবে না। নৌকায় তিনি জল-বিহার করিতে আসিয়াছিলেন,—সেই সময় সোনাইকে দেখিয়াছেন। তিনি মেয়ের জন্য একেবারে পাগল হইয়া গিয়াছেন।"

"একে ত ভাটুক ঠাকুর যজমানী ব্রাহ্মণ।
সেইতে আবার পাইল জমির লোভন।।
সম্মতি জানাইল ভাটুক দুর্জ্জনা বাঘরায়।
জাতি মারি বিয়া দিব মনেতে গুছায়।।
মায়ে না জানিল কথা না জানে কন্যায়।
কানাকানি হানাহানি শব্দে শুনা যায়।।"

মুক্তির ষড়যন্ত্র

কাণাঘুষায় সোনাই সকল কথাই শুনিল। অতি ব্যস্ত হইয়া সে মাধবকে একখানা চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়া দিল। চিঠিতে লেখা ছিল, "আজই সন্ধ্যাবেলা ভাবনা আমাকে ধরিয়া

লইয়া যাইয়া বিবাহ করিবে। আমার গুণের মামা সকল ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। বঁধু, তুমি আমাকে এই ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা কর। আজ যদি তুমি আমায় না লইয়া যাও, তবে জন্মের শোধ তোমার মুখখানি আর আমার দেখা হইবে না। আর আমাকে সংসারে কেউ না দেখিতে পায়—তাহার ব্যবস্থা আমি নিজেই করিব।"

দূতির মারফৎ মাধব জানাইলেন, "ঠিক সন্ধ্যার সময় নদীর ঘাটে অপেক্ষা করিয়া থাকিও, আমি তোমাকে সেখান হইতে লইয়া যাইব।"

প্রাতঃকাল হইতে সোনাইএর মন কেমন ভারাক্রান্ত হইয়াছিল। সে রাত্রে একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছিল, এজন্য সন্ধ্যায় নদীর ঘাটে যাইতে তাহার পা উঠিতেছিল না। যখন সে খালি কলসী লইয়া নদীর ঘাটে যাইতে উদ্যত হইল, সেই মুহূর্ত্তে আকাশে কাকগুলি 'কা' 'কা' করিয়া উঠিল, শুকনা ডালে পেঁচার বিকট রব শোনা গেল। সোনাই তার সখী সল্লাকে বলিল, অকারণে আমার বুকে ভয় ঠেলিয়া উঠিতেছে—পা দুটি চলিতেছে না। কি বিপদে পড়িব কে জানে, আজ না হয় না গেলাম। আজ রাত্রি মার বুকে মাথা গুঁজিয়া লুকাইয়া থাকি।"

একটু খানি পরে সোনাই পুনরায় সইকে বলিল, তখন তাহার চোখে একবিন্দু অশ্রু, "আজ সন্ধ্যায় না গেলে প্রাণের বঁধুকে হয়ত আর দেখিতে পাইব না। তিনি হয়ত আমাকে না পাইয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইবেন,—আর কি কখন তিনি আসিবেন? হয়ত জন্মের মত তাঁহাকে হারাইব। আমার যে বিপদই হউক না কেন, আমি না যাইয়া পারিব না।" এই বলিয়া সোনাই কলসীটি কাঁখে লইয়া তাহার সইএর সঙ্গে নদীর ঘাটে রওনা হইয়া গেল।

অপহরণ

ঘাটে আসিয়া দেখিল, মাধব তাহাকে লইবার জন্য আসেন নাই, কিন্তু আর একখানি ডিঙ্গি নদীর ধারে কেয়া বনের কাছে বাঁধা—তাহা দেওয়ান ভাবনার লোকজনে ভর্ত্তি। সোনাইকে দেখা মাত্র কয়েকজন গুণ্ডা আসিয়া তাহাকে জোর করিয়া পানসীতে উঠাইল। শূন্য কলসীটি নদীর জলে ভাসিতে লাগিল। রোরুদ্যমানা সোনাই ক্ষীণ স্বরে সখীকে ডাকিয়া বলিল—"আমার মামাকে কহিও,—৫২ পুরা জমির লোভে তিনি আমার এই সর্ব্বনাশ করিলেন, তাঁহার ভাল হউক। মামীকে বলিও তাঁহার বাড়ীর কলসীটি নদীর জলে ভাসিয়া

চলিয়াছে, তাহা তাঁহারা লইয়া যাউন। আমার মাকে বলিও, দেওয়ান ভাবনার লোক তাঁহার দাদার সাহায্যে আমাকে লইয়া গেল। এই কলঙ্কিত জীবন আমি রাখিব না, আমি আমার মাতা-পিতার গ্লানিকর কোন কাজ করিব না। বিদায় কালে তাঁহার চরণে আমার শত প্রণাম দিও। আমার প্রাণের বঁধুর সঙ্গে কি তোমার দেখা হইবে, দেখা হইলে আমার অবস্থা তাঁহাকে জানাইও। আমি তাঁহার জন্যই আসিয়াছিলাম, তা না হইলে যজ্ঞের ঘি কি কুকুরে লেহন করিতে সাহসী হয়? আমি কলসী ও দড়ির সাহায্যে জলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিব, নতুবা আগুনে পুড়িয়া মরিব। বড় দুঃখ রহিল, আমি তাঁহার চন্দ্রমুখখানি আর একটিবার দেখিতে পাইলাম না। চন্দ্র, সূর্য্য, দিবা-রাত্রি, তোমরা সকলে সাক্ষী,—বঁধু কোথায়—তাহা তোমরা দেখিতেছ! আমার কথা তাঁহাকে বলিও। ওই আকাশে পাখীর ঝাঁক, তোমরা কোথায় উড়িয়া যাইতেছ? তোমাদের দৃষ্টি বহু দূর প্রসারিত, তোমরা অবশ্যই আমার প্রাণের বঁধুকে দেখিতে পাইবে, তোমরা দয়া করিয়া তাঁহার চরণে আমার কথাগুলি বলিবে। হে কেয়া ফুলের ঝাড়, হিজল গাছের নূতন পাতা, যদি বঁধু এখানে আসেন, তবে তোমাদের মর্ম্মর শব্দে তাঁহাকে দুঃখিনীর দুঃখের কথা জানাইও।"

এই বলিতে বলিতে দেওয়ানের ডিঙ্গিতে হস্তপদবদ্ধা বন্দীর বেশে রূপসী কন্যা অদৃশ্য হইল।

কিন্তু এই দুঃখের মধ্যে একটা প্রবল আশঙ্কা তাহার মনে হইতেছিল। "মাধব আসিবেন বলিয়া দূতিকে বলিয়া গিয়াছিলেন, বিপন্নাকে আশ্বাস দিয়া তিনি আসিলেন না কেন? তবে কি তাঁহার কোন বিপদ হইয়াছে? ঝড় উঠিয়াছে, নদীর ঢেউগুলি তোলপাড় করিতেছে, বঁধুর নৌকায় তো কোন বিপদ হয় নাই। তিনি কেন আসিলেন না।" সোনাই আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

উদ্ধার ও বিবাহ

সহসা সেই ঝড়ের রব ছাপাইয়া একটা উচ্চ চীৎকার শুনিতে পাওয়া গেল। এক যুবক পান্সী নৌকার মাঝিদিগকে ডাকিয়া বলিতেছিল—"তোমাদের পান্সী কোথায় যাইবে, নৌকার মধ্যে এক আর্ত্ত রমণীর ক্রন্দন শোনা যাইতেছে—ইনি কে? তোমরা কোন্ নারীকে জোর করিয়া লইয়া যাইতেছ?"

মাধবের কণ্ঠস্বর বুঝিতে পারিয়া সোনাই আরও তীব্রস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। মাধব বুঝিতে পারিলেন, তিনি যাহাকে উদ্ধার করিতে যাইতেছেন, ইনিই সেই বিপন্না রমণী।

দুই দলে সেই অন্ধকারে, মেঘাচ্ছন্ন রাত্রে, নদীর বক্ষে ভয়ানক দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হইল। মাধব অগ্রসর হইয়া ভীম পরাক্রমে দেওয়ানের পান্সী আক্রমণ করিলেন। তিনি সোনাইকে উদ্ধার করিবার জন্য লড়াই আশঙ্কা করিয়াই সৈন্য সহ গিয়াছিলেন, দেওয়ানের লোকজন অতর্কিত ও সম্পূর্ণরূপে নির্ভয় ও অপ্রস্তুত অবস্থায় ছিল। মাধবের লোকেরা ময়ূরপঙ্খীর গলুই ভাঙ্গিয়া ফেলিল ও লোকজন মাঝিদের নৌকাসহ জলের নীচে ডুবাইয়া দিয়া সোনাইকে উদ্ধার করিয়া মাধবদের বাড়ীর দিকে চলিল।

আজি মাধবের পুরীতে বিপুল বাদ্যভাণ্ড, সমারোহপূর্ণ মিছিল। বহির্বাটীতে ও অন্তঃপুরে কলরবপূর্ণ উৎসব। কত মল্লবীর খেলা দেখাইতেছে, বাজীকর বাজি ছুটাইতেছে, কত দোলা, চতুর্দ্দোলা, যান বাহন। নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের শুভাগমনে রাজ-প্রাসাদ সরগরম, মেয়েরা কেহ শাঁখ বাজাইতেছে, কেহ জোগাড় দিতেছে, কেহ কেহ দল বাঁধিয়া নদীতে জল আনিতে যাইতেছে, কেহ পুষ্প চয়নে ও কেহ মালা গাঁথায় ব্যস্ত, কেহ চন্দন ঘসিতেছে। নাগরিকেরা নূতন পরিচ্ছদ পরিয়া রাজবাড়ীতে নৃত্যগীতোৎসব দেখিতে আসিতেছে। আজ মাধব ও সোনাইএর বিবাহ। চন্দন-চর্চ্চিত ললাটে, বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া রক্তপট্টাম্বরে স্বর্ণ প্রতিমার ন্যায় ঝলমল করিতেছে। বিবাহের রক্তোত্তরীয় ও পটবাস পরিহিত শুভ্র উপবীত ও তিলক পরিয়া কুমার মাধব কার্ত্তিকের মত সুন্দর হইয়াছেন, আজ কি শুভদিন!

শয়তান দেওয়ান

বিবাহ হইয়া গেছে, অকস্মাৎ পুরীতে ক্রন্দনের কলরব! কি হইয়াছে? সর্ব্বনাশ হইয়াছে, মাধবের পিতাকে দেওয়ান ভাবনার লোকেরা আসিয়া বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে। মাসকালব্যাপী উৎসব অর্দ্ধপথে থামিয়া গিয়াছে। মাধব তখনি একটা বড় ভাওয়ালিয়া সাজাইতে হুকুম দিয়া বিবাহের বেশ ছাড়িয়া দরবারী পোষাক পরিয়া ভাবনার রাজধানী অভিমুখে চলিলেন,—ধনপতি সদাগরকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তরুণ শ্রীমন্ত যেরূপ সমুদ্র যাত্রা করিয়াছিলেন,

মাণিক চাকলাদারকে উদ্ধার করিবার জন্য বালক সুধন যেমন ছুটিয়াছিলেন,—তেমনই মাধব তাঁহার পিতাকে উদ্ধার করিতে রওনা হইলেন।

কয়েকদিন পরে বিষণ্ণমুখে, সাক্ষাৎ শোকের মূর্ত্তি শীর্ণ দেহে, কুঞ্চিত ললাটে বৃদ্ধ নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিলে, তিনি কাহাকেও কিছু বলিলেন না। এক নিভৃত কক্ষে সোনাইকে ডাকিয়া আনিয়া চোখের জলে প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে বধূকে বলিলেন, "আমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত, তোমাকে সে কথা বলিতে আমার প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, আমি সে নির্ঘাত কথা বলিতে পারিতেছি না, অথচ তাহা বলিতেই হইবে, না বলিলে উপায় নাই। মাধব দরবারে যাওয়া মাত্র দেওয়ান সাহেব আমাকে বন্দীশালা হইতে ডাকাইয়া আনিলেন এবং বলিলেন,—"তোমাকে মুক্তি দিলাম, তোমার জায়গায় এই তরুণ কুমার এখানে নজর বন্দী রহিল। তুমি গৃহে ফিরিয়া যাইয়া নববধূকে এখানে পাঠাইয়া দাও। আমি প্রতিশ্রুতি দিতেছি, বধূ এখানে আসা মাত্র আমি তোমার পুত্রকে সসম্মানে মুক্তি দিব এবং সে বাড়ীতে ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু যদি তোমার বধূ না আসেন কিম্বা তুমি তাঁহাকে পাঠাইতে অযথা বিলম্ব কর, তবে মাধবের শির দ্বিখণ্ডিত করিয়া তাহার রক্তে বধ্যভূমি রঞ্জিত করিব।" দ্বিরুক্তি করিতে অবসর না দিয়া দেওয়ান আমাকে মুক্তি দিলেন এবং মাধব তাঁহার হুকুমে বন্দীশালায় গেল।"

"এখন মা, আমি তোমার কাছে কি বলিব? সে কথা বলিতে কণ্ঠ রুদ্ধ হইতেছে, মাধব আমার একমাত্র পুত্র—বংশের প্রদীপ, তাহার অভাবে এই বংশ নির্ব্বংশ হইবে। এই পিতৃপিতামহাধিষ্ঠিত বহু পুরুষের রাজধানী অন্ধকার হইবে। তোমাকে আমি আর কি বলিব? তুমি আমার পুত্রের প্রাণ রক্ষা করিতে পার। তাহাকে রক্ষা করার যদি অন্য কোন উপায় আমি উদ্ভাবন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে এই নিতান্ত হীন প্রস্তাব লইয়া তোমার কাছে উপস্থিত হইতাম না।"

"শুন শুন বধূ যদি কৃপা নাহি কর।
অকালে আমার পুত্র যাবে যম ঘর।।
দুরন্ত দুর্জ্জন ভাবনা প্রতিজ্ঞা যে করে।
তোমারে পাইলে ছাড়ি দিবে মাধবেরে।।
বংশের নিদান পুত্র এক বিনা নাই।
তোমারে ছাড়িয়া যদি প্রাণ-পুত্রে পাই।।"

নিজ প্রাণ দিয়া পতির উদ্ধার

শ্বশুরের এই কথা শুনিয়া সোনাইএর চক্ষু হইতে অজস্র অশ্রুবিন্দু পড়িতে লাগিল। কিন্তু বধূ দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে পরক্ষণেই চোখের জল মুছিয়া ফেলিল, নিজের হাতে অসংস্কৃত কেশ পাশ বাঁধিয়া শ্বশুরকে ভাওয়ালিয়া সাজাইতে আদেশ দিতে বলিল এবং একটি কৌটায় জহর বিষের কয়েকটি বটিকা লইয়া স্বামী উদ্ধার করিতে রওনা হইল। দেওয়ান ভাবনা দরবারে বসিয়া ছিলেন, যে মুহূর্ত্তে শুনিলেন, সোনাই রাজধানীতে পৌঁছিয়াছে, সেই মুহূর্ত্তে তিনি তাহার ভাওয়ালিয়াতে গিয়া সোনাইএর সঙ্গে দেখা করিলেন,— তিনি দেখিলেন, এ মনুষ্য-মূর্ত্তি নহে, দৈবশাপে কোন দেবী ধরাতলে অবতীর্ণা হইয়াছেন। এই অপূর্ব্ব সুন্দরীকে দেখিয়া দেওয়ান একেবারে জ্ঞানহারা হইলেন।

সোনাই স্থির কণ্ঠে বলিল, "আমার নির্দ্দোষ স্বামীকে আপনি বন্দীশালায় রাখিয়াছেন। তাহা যাহাই হউক, আমি যে এখানে আসিয়াছি, তাহা তাঁহাকে জানিতে দিবেন না, তাঁহাকে অবিলম্বে মুক্তি দিন্ এবং আপনার গৃহে আমার আগমন সংবাদ যাহাতে এদেশে কেহ না জানে তাহার ব্যবস্থা করুন। মোট কথা, এ কথা একান্তভাবে গোপন থাকিবে, এই সর্ত্ত পালন করিলে আমি আপনার নির্দ্দেশ পালন করিব।"

বন্দীশালায় মাধবের হস্ত পদ হইতে শৃঙ্খল খুলিয়া ফেলা হইল, তাহার বুকের উপরে একখানি পাথর চাপা দেওয়া হইয়াছিল—তাহা সরাইয়া ফেলা হইল। তারপর যে ভাওয়ালিয়ায় চড়িয়া সোনাই আসিয়াছিল, সেই ভাওয়ালিয়াতেই মাধব বাড়ীতে ফিরিবার অনুমতি পাইলেন।

রাত্রি ঘোর অন্ধকার। তমসা যেন প্রেতরূপ ধরিয়া চতুর্দ্দিক হইতে হি হি করিয়া হাসিতেছে—কখন একবার বিদ্যুৎ দেখা যাইতেছে। বারবাঙ্গলার একখানি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে দুগ্ধ-ফেন-নিভ শয্যায় নিরুপমা সুন্দরী শুইয়া আছে, গৃহের চারিদিকে প্রহরী, তাহারা ঘন ঘন গোঁপ মোচড়াইতেছে এবং ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের আলোকে তাহাদের উন্মুক্ত কিরিচজ্বলিয়া উঠিতেছে। সোনাই এই ঘোর নিশাকালে তাহার মাকে স্মরণ করিয়া হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, মায়ের মুখখানি মনে পড়িতে তাহার বুকে শত দুঃখ জাগিয়া উঠিল, তাহার পর মাধবকে স্মরণ করিল, এত দুঃখেও যে সে তাহার জাগ্রত প্রত্যক্ষ দেবতা স্বামীকে মুক্তি দিতে পারিয়াছে, এই ভাবিয়া গৌরব বোধ করিল, তারপরে মা বনদুর্গার

পায়ে সহস্র প্রণতি জানাইল, "জীবনে মাকে হারাইয়াছি কিন্তু তুমি আমার সর্ব্বকালের মা, সন্তানকে পায়ে স্থান দিও।"

পিতা তাহার অল্পবয়সে মারা গিয়াছেন, তাঁহার কথা ভাল করিয়া মনে নাই। কতদিন তাঁহার মুখখানি মনে করিতে চেষ্টা পাইয়াছে কিন্তু পায় নাই। আজ এই ঘোর দুর্দ্দিনে এই অপার সিন্ধু তুল্য দুঃখের অতল তলে মুমূর্ষু পিতার মুখখানি যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল। তাহার পিতার মৃত্যুর রাত্রে সমস্ত জগতের দুঃখ তাহাদের ভাঙ্গা কুটিরখানি গ্রাস করিয়াছিল, আজ তেমনই আর একটা দুঃখের দিন। সেই অমানিশার বিকট অন্ধকারে চারিদিক হইতে সে অন্ধকারের ডাক শুনিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বিষের কৌটাটি খুলিয়া বিষবড়ি খাইয়া সে শয্যায় পড়িয়া রহিল। অব্যবহিত পরে দেওয়ান সেই ঘরে প্রবেশ করিল—তখন আর সোনাইএর দেহে প্রাণ নাই।

"না দেখিল অভাগী মারে, আপন বন্ধুজনে।
কোথায় রইল প্রাণের বঁধু আজ এ দুর্দ্দিনে।।
কোথায় রইল শ্বাশুড়ী কোথায় সল্লা দুতি।
নিদান কালে কাছে না রইল প্রাণ পতি।।
দুর্জ্জন দুষমন ভাবনার আশা না পুরিল।
প্রাণ বঁধুরে বাঁচাইতে সোনাই পরাণে মরিল।।"

আলোচনা

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোগল রাজত্ব অবসানের মুখে বঙ্গদেশে চোর ডাকাতের উপদ্রব খুব বাড়িয়া গিয়াছিল, পূর্ব্ব সীমান্ত হইতে হার্ম্মাদ (পর্ত্তুগীজ জলদস্যু) মগ এবং দুর্দ্দান্ত বিদেশী বণিকেরা অকস্মাৎ প্লাবনের মত নিম্ন বঙ্গের পল্লীগুলির উপর পড়িয়া লুঠতরাজ করিত, কেবল ধন সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া তাহারা গৃহস্থকে রেহাই দিত না;যদি কেহ এই লুণ্ঠন ব্যাপারে বাধা দিত তবে তাহার ঘরে আগুন ধরাইয়া দিত। কিন্তু তাহাদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল—সুন্দরী রমণীদের উপর, তাহাদিগকে তাহারা জোর করিয়া লইয়া যাইত এবং দক্ষিণাপথের হাটে বিক্রয় করিত। রমণীদের উপর এই অত্যাচার এদেশবাসী চিরকাল

"দুর্জ্জন দুষমণ ভাবনার আশা না পুরিল। প্রাণবঁধুরে বাঁচাইতে সোনাই পরাণে মরিল।।" (পৃষ্ঠা — ৩৫৬)

সহিয়া আসিয়াছে, যখন খৃষ্ট-পূর্ব্ব যুগে গ্রীকেরা আসিয়াছিল, তখনও তাহারা রূপসী ললনাকুল ছাড়িয়া দেয় নাই, শিল্পী-স্থপতী এবং স্ত্রীলোকদিগকে তাহারা হত্যা করিত না, ব্রাহ্মণেরা তাহাদের ধর্ম্ম মানিত না এবং ক্ষত্রিয়েরা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিত, এই দুই শ্রেণীকে তাহারা হত্যা করিয়া নির্ম্মূল করিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু সেই ইতিহাস-পূর্ব্ব যুগ হইতে ভারতের শিল্পী জগতের সেরা স্থান অধিকার করিয়াছিল, এবং ভারতীয় ললনাদের নানা অসামান্য গুণ ও রূপের খ্যাতি দেশ বিদেশে প্রচারিত ছিল। পারস্য দেশের বাজারে ও এ্যালেকজেণ্ড্রিয়ার হাটে এই রমণীরা এবং শিল্পীরা বিক্রীত হইত। হ্যাভেল সাহেব লিখিয়াছেন, ভারতীয় স্থপতী ও শিল্পীরা ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কলা-শিল্প ও মঠ-মন্দিরাদি নির্ম্মাণ-রীতি জগতে প্রচলিত করিয়াছিলেন। মন্দিরাদিতে গম্বুজ লাগাইয়া—দেবমূর্ত্তির স্থলে লতা পাতা ফুল পুষ্প ও কলার অত্যাশ্চর্য্য সূক্ষ্ম কর্ম্মের আদর্শ দান করিয়া তাঁহারা শুধু এসিয়ায় নহে, ইউরোপেরও নানা স্থানে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচলন করিয়াছেন, ভারতীয় কত রমণী বিদেশে নীত হইয়া তদ্দেশীয় নাম, উপাধি ও ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বিদেশীয়দের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন—তাহারও সীমা সংখ্যা নাই। বিদেশী পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, মধ্য যুগে ইউরোপীয় গল্প সাহিত্যে ভারতবর্ষই ইউরোপীয়দিগকে হাতে খড়ি দিয়াছেন। পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, কথা-সরিৎ সাগর প্রভৃতি মাগধ গল্প-সাহিত্য এবং বৌদ্ধ-জাতক গল্প ও পূর্ব্ব ভারতের অতুলনীয় কথা-সাহিত্য হইতে ইউরোপ প্রেরণা পাইয়াছিল। পূর্ব্ব ভারতের তান্ত্রিক উপাখ্যানগুলিও ড্রুইড পুরোহিতেরা উত্তর ইউরোপে চালাইয়াছিলেন। উইলসন, ম্যাকডোনাল্ড, হেনস এণ্ডারসন ও গ্রীস ভ্রাতৃদ্বয় এবং অন্যান্য বহু পণ্ডিত ভারতের নিকট ইউরোপের এই ঋণের কথা স্বীকার করিয়াছেন। কে জানে যে বিদেশগতা রমণীরা আরবে, পারস্যে ও ইউরোপে এই কথা সাহিত্যের বিস্তারের পক্ষে কতকটা সাহায্য করিয়াছেন কিনা?

মুসলমান আবির্ভাবের পূর্ব্বেও হিন্দু রাজত্ব কালে এই প্রকার রমণী নির্য্যাতন প্রচলিত ছিল। পল্লীর গল্প-সাহিত্য পর্য্যালোচনা করিলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীবৎস ও চিন্তার গল্পে, রাজা তিলক-বসন্তের আখ্যানে এবং মহিষাল বঁধুর গল্পে, মলুয়া চরিত্রে এবং ভেলুয়ার উপাখ্যানে রমণীদের প্রতি এইরূপ উৎপীড়নের কথা পাওয়া যায়। মেয়েরা পল্লীর নিভৃত পুরীতে পাতা ঢাকা ফুলের মত লুক্কায়িত থাকেন। কিন্তু তাঁহারা নদীর ঘাটে জল লইতে

এবং স্নান করিতে কখন কখনও আসিতেন। সেই সুযোগে দুর্বৃত্ত বণিকেরা তাহাদের ডিঙ্গা থামাইয়া এই অসহায় অবলাদিগকে তুলিয়া লইয়া যাইত। এই গৃহ-হারা স্বামী-সঙ্গ বঞ্চিতা দেবী-কল্পা রমণীরা যে কত বিলাপ করিতে করিতে স্বীয় গ্রাম ছাড়িয়া বল-পূর্ব্বক অপহৃতা হইয়া চলিয়া যাইতেন, তাহা এখনও প্রাচীন করুণ গীতগুলির সুরে আমাদের কানে ভাসিয়া আসে।

সুতরাং এই লুণ্ঠন শুধু মুসলমানদের দ্বারা হইত না। দেওয়ান ভাবনা—সেই রমণীর রূপ-লোলুপ দুর্বৃত্ত, বড় লোকদের একজন ছিলেন, অনেক হিন্দু ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী অত্যাচারী যুবকেরা চিরকাল হিন্দু রমণীদের প্রতি এই দুর্ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন।

সোনাই বাল্যকাল হইতে রূপের খ্যাতি পাইয়া আসিয়াছিল। তাহার পিতৃবিয়োগের পরে দুঃখে কষ্টে লালিত পালিত হইয়া এই রূপের প্রতিমা সমাজের আদরে বঞ্চিতা ছিল না। এই ছোট কাব্যখানি আদ্যন্ত একটি কুসুম-ভূষণা পল্লীর চিত্রের মত। বর্ষাকালের কেয়া ফুলের গন্ধ, কদম্বের শিহরণ এবং দদ্রুরের কলরবের মধ্যে কুমার মাধব নল খাগড়ার শর লইয়া এক হস্তে পোষা ঘুঘুটি স্থাপন পূর্ব্বক বন বাদাড়ে শিকার করিয়া বেড়াইতেন।

মাধব যখন সোনাইকে দেখিল এবং সোনাই যখন মাধবকে দেখিল, তখনই তাহারা কন্দর্প দেবের অর্ঘ্য সাজাইয়া—তাঁহার পূজার মন্দির রচনা করিল। এমন সময় সোনাইএর মামা ভাটুক ঠাকুরের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া দেওয়ান ভাবনা নদীর ঘাট হইতে লোকজনদ্বারা সোনাইকে অপহরণ করিতে চেষ্টা পাইল। কিন্তু মাধব তাহাকে উদ্ধার করিয়া নিজগৃহে লইয়া আসিল। কাব্যখানিতে যেন বঙ্গদেশের ষড় ঋতু হাসিতেছে, কোনও সময়ে আম্র মুকুলের গন্ধ, কোনও সময়ে বকুল ও কদম্বের চারিদিকে ভ্রমরের সমারোহ, কোথাও বর্ষার ঝর ঝর ধারা—এই বিচিত্রতা-প্রাপ্ত মনোরম দৃশ্যাবলির মধ্যে সোনাই মাতুলদত্ত নীলাম্বরী-খানি পড়িয়া নদীর ঘাটে আনাগোনা করিতেছে এবং সখী সল্লার নিকট তাহার মনের কথাগুলি কহিতেছে, কোনও সময় পদ্ম-দলে প্রেম পত্র লিখিতেছে; এই রূপের প্রতিমাকে ভোরের সময় জাগাইবার জন্য ডাহুক ও কোকিল ডাকিতেছে ও কুমার মাধব সাক্ষাৎ মন্মথের ন্যায় তাঁহার পুষ্প ধনুতে জ্যা আরোপন করিযা আছেন।

কিন্তু যে বিধাতা সোনার তুলি দিয়া নানা কুসুম খচিত সৌরকরোজ্জ্বল এই জগতের বিচিত্র চিত্র অঙ্কন করেন, তিনি আবার সন্ধ্যায় একটা পাত্র হইতে সমস্ত কালিমা ঢালিয়া

সেই সুন্দর দৃশ্যগুলি মুছিয়া ফেলেন। ইহাই ভগবানের লীলা। যিনি সৌন্দর্য্যের চরম পরিকল্পনা করিতে পারেন, তাঁহার এই চরম নির্ম্মমতা কোন কথায় ব্যাখ্যা করা যায় না— হিন্দু কবি তাই তাহাকে 'লীলা আখ্যা' দিয়াছেন।

যে রাত্রিতে সোনাই বিষ খাইবে—সে রাত্রি কি ভীষণ। অমানিশার অন্ধকারে জগত নিমজ্জিত—একাকী নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে সোনাই শায়িতা। ঝিল্লি রবে, ডাহুকের চিৎকারে, নানা পাখীর আর্ত্তরবে—চারিদিক মুখরিত। মৃত্যু সম্মুখে করিয়া সোনাই বসিয়া আছে, তাহার মাতাকে মনে পড়িল এবং অবিরল ধারায় অশ্রু পড়িতে লাগিল। অতি শৈশবে সে পিতাকে হারাইয়াছিল, পিতার মূর্ত্তি তাহার মনে ছিল না। আজ এই ঘোর দুর্দ্দিনে সে যেন তাহার মৃতকল্প পিতার মুখখানি দেখিতে পাইল। যত দুঃখ সে জীবনে পাইয়াছে, আজ সকলে মিলিয়া আসিয়া তাহার সাক্ষাৎ করিল। আজ একটি সোনার পুতুল খেলিতে খেলিতে ভাঙ্গিয়া পড়িল, আঙ্গিনার ধূলি বালির সঙ্গে সোনার রেণু মিশাইয়া গেল।

আজ সে বুঝাইয়া গেল, হিন্দু রমণী সতত হাস্যময়ী লীলাপরায়ণা, বনকুসুমের মত নির্ম্মল ও প্রফুল্ল;সে যেন চিরবসন্তের একটি চিত্রপট—সোনার তুলিতে আঁকা স্বর্ণ- লেখা—কিন্তু সে দুঃখের সময় ভাঙ্গিয়া পড়ে না। তাহার চরিত্রের দার্ঢ্য ও একনিষ্ঠ ব্রত বিস্ময়কর। সে কুসুমের মত মৃদু কিন্তু হঠাৎ প্রয়োজন হইলে সে বজ্রবৎ কঠিন হইতেও পারে।

কবি লিখিয়াছেন; সে মাধবকে হৃদয়ের প্রেম জানাইয়া যে সকল কাব্য কথা বলিয়াছিল—তাহা শুধুই মুখের কথা নহে।

"প্রাণ বঁধুকেই বাঁচাইতে সোনাই পরাণে মরিল।"

এই কাব্যের আদ্যন্ত বসন্ত ঋতুর ভ্রমর ও কোকিলের সুরে গাঁথা, ইহা একখানি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য, বিয়োগান্ত নাট্য হিসাবেও ইহার তুলনা নাই।

দেওয়ান ভাবনা—ইসাখাঁর কোন দূর বংশধর ছিলেন বলিয়া মনে হয়, এই বংশ "নজর মরিচার" দৌলতে এত হিন্দু রমণীর গর্ভজাত সন্তানদ্বারা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল যে, ইহাদের মধ্যে অনেক বাহিরের লোক প্রবেশ করিয়া বংশাবলীকে জটিল করিয়া তুলিয়াছিল। দেওয়ানের মধ্যে বিবাহের ফলে হউক, বা অন্য কোনরূপে কিছু সংশ্রব থাকিলে জনসাধারণের সৌজন্যে সকল সন্তান "দেওয়ান" নামেই পরিচিত হইতেন।

উড়িষ্যায় এককালে যাঁহারা সচীব ছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণ এখন দীনদশাগ্রস্ত হইয়া "মহাপাত্র' ইত্যাদি উপাধি তাঁহাদের নামের পাছে বজায় রাখিয়াছেন। এই সকল দেওয়ান গোষ্ঠীর কোন্ শাখা বিশুদ্ধ এবং কোন্ শাখার সেরূপ গৌরব নাই—তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ১৯২২ খৃঃ ২২শে সেপ্টেম্বর এই গানটি ময়মনসিংহ জেলার কেন্দুয়ার সন্নিকটবর্ত্তী পল্লীবাসী মাঝিদের দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছিল। সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে। আমি গানটি কতকগুলি অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া সুশৃঙ্খল করিতে চেষ্টা পাইয়াছি।

লীলা

অপয়া কঙ্ক

মৈমনসিংহ জেলার বিপ্রপুর গ্রামে গুণরাজ নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম 'বসুমতী'। এই দুইটি প্রাণী বহু কষ্টে কোন রকমে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ব্রাহ্মণ সারাদিন ভিক্ষা করিয়া সন্ধ্যাকালে মুষ্টি ভিক্ষা লইয়া গৃহে ফিরিতেন, তাহাতে স্বামী স্ত্রীর এক বেলার কোন রকমে অন্নের সংস্থান হইত।

ইহার মধ্যে বাড়ীতে এক নূতন অতিথির আবির্ভাব হইল। ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পত্নী কোনদিন পুত্র কামনা করেন নাই, নিজেরাই খাইতে পান না—ছেলেকে খাওয়াইবেন কি? কিন্তু যে পুত্র চাহে না, সে পুত্র পায়, এবং যে চাহে, সে পায় না—সংসারের এই দুর্জ্ঞেয় রীতি অনুসারে গুণরাজ ও তাঁহার পত্নী একটি পুত্র লাভ করিলেন। ষষ্ঠীর দিন ব্রাহ্মণ তালপাতায় লিখিয়া তাহার নাম রাখিলেন 'কঙ্ক'।

তাঁহারা বহু কষ্টে শিশুটিকে পালন করিতে লাগিলেন, কিন্তু শিশুটি অতি দুর্ভাগা। যখন তাহার দুই বৎসর বয়স, তখন মাতা বসুমতী হঠাৎ জ্বররোগে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

এখন কেই বা শিশুটিকে দেখে, কেই বা ভিক্ষা করিতে যায়। গভীর শোকে-দুঃখে পাগলের মত হইয়া স্ত্রীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে গুণরাজও পরলোকে গমন করিলেন।

"অপয়া" বলিয়া সেই শিশুকে কেহ স্পর্শ করিল না। দুই দিন দুই রাত্রি সে আঙ্গিনায় ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িল, ঘুম ভাঙ্গিলে পুনরায় ক্ষীণতর স্বরে কাঁদিতে লাগিল। এই আপদকে যে স্পর্শ করিবে—তাহারই অদৃষ্টে ঘোর বিপদ হইবে, এই সংস্কার বশতঃ ভদ্র সমাজের কেহ তাহার ছায়া মাড়াইল না।

প্রতিবেশীদের মধ্যে মুরারি নামে এক চণ্ডাল ছিল, তাহার স্ত্রীর নাম কৌশল্যা। ইহারা নিঃসন্তান ছিল। সেই শিশুর নিঃসহায় অবস্থা দেখিয়া তাহাদের মনে দয়ার উদ্রেক হইল। চণ্ডাল ব্রাহ্মণ বাড়ীতে যাইয়া সেই পরিত্যক্ত বালককে কোলে করিয়া লইয়া আসিয়া তাহার স্ত্রীকে দিল। কৌশল্যা যেন হারানো মাণিক পাইয়া তাহাকে বুকে করিয়া "গোপাল" নাম দিয়া আদর করিতে লাগিল।

এই অপোগণ্ড শিশুর কাছে চাঁড়ালই বা কি ব্রাহ্মণই বা কি? অনাথ শিশু পিতামাতা পাইল, এবং নিঃসন্তান পিতামাতার মন্ বাৎসল্যরসে পূর্ণ হইয়া গেল।

কঙ্কের বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন তাহার ধর্ম্ম-পিতা মুরারি ত্রিদোষ ক্ষেত্রের জ্বরে আক্রান্ত হইয়া একদিনের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিল। তাহার স্ত্রী কৌশল্যা স্বামীর শোকে পাগলের মত হইয়া অন্নজল ত্যাগ করিয়া অব্যবহিত পরেই শুকাইয়া মারা পড়িল। চণ্ডালের শ্মশানে অনাথ কঙ্কধর ছাই-পাঁশের উপর পড়িয়া রহিল। বিশ্বে তাহার এমন কেহ নাই, যে তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে। সে নিজের অবস্থা কিছুই বুঝিল না। বজ্রাহতের ন্যায় শ্মশানঘাটে পড়িয়া রহিল, কেহ তাহাকে আশ্রয় দিল না। পরিত্যক্ত, অশুভকর এবং সর্ব্বলোকের বর্জ্জনীয় শিশু পৃথিবীতে কাহারও কোন কৃপা পাইল না।

ক্রীড়া-সহচর

সেই বিপ্রপুর গ্রামে গর্গ নামে একজন ঋষিতুল্য প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। সে অঞ্চলের লোকেরা এই মহামেহোপাধ্যায় নির্ম্মলচরিত্র ব্রাহ্মণকে দেবতা জ্ঞানে মনে মনে পূজা করিত। নদীতে স্নান আহ্নিক সারিয়া তিনি গৃহে ফিরিতেছিলেন, শ্মশানে পতিত, বালককে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় অনুকম্পায় পূর্ণ হইল;তিনি অতি যত্নপূর্ব্বক কঙ্ককে নিজের নামাবলী দিয়া মোছাইয়া কোলে তুলিয়া লইলেন, এবং নানা মিষ্ট কথায় আদর করিতে করিতে তাহাকে স্বগৃহে আনিয়া তাঁহার পত্নী গায়ত্রীদেবীর হস্তে সমর্পণ করিলেন।

ব্রাহ্মণ যেরূপ উদার ছিলেন, গায়ত্রী দেবীও তাঁহার যোগ্যা ছিলেন। তাঁহার লীলা নাম্নী একটি দুই বৎসর বয়স্কা ছোট কন্যা ছিল,—গায়ত্রী দেবী এই পাঁচ বছরের বালককে তাহার ক্রীড়া-সঙ্গী করিয়া দিয়া কত স্নেহ ও আদরে তাহাদের খেলা দেখিতে লাগিলেন।

তাঁহারা দেখিলেন বালকটি অতিশয় মেধাবী। গর্গ তাহাকে মুখে মুখে নানা শ্লোক শিখাইলেন এবং দশম বর্ষ বয়সে তাহার হাতে খড়ি দিয়া ক্রমে ক্রমে পুরাণ সংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রে পণ্ডিত করিয়া তুলিলেন। টোলে কঙ্ক ফরমাইসী গান রচনা করিতে শিখিল এবং কত যে বারমাসী বাঙ্গলা গান সে মুখস্থ করিল, তাহার ইয়ত্তা নাই।

যখন লীলার আট বৎসর বয়স, তখন গায়ত্রী দেবী মৃত্যু মুখে পতিত হইলেন। গায়ত্রী দেবীকেও কঙ্ক মা বলিয়া জানিত। এই তৃতীয়বার কঙ্ক মাতৃ শূন্য হইল। লীলা ও কঙ্ক উভয়েই সেই গৃহে মাতৃহারা। কঙ্ক চির-দুঃখী। মাতৃহারা হইয়া লীলা বেশী করিয়া কঙ্কের দুঃখ বুঝিল।

"অষ্ট বছরের লীলা মায়ে হারাইয়া।
বুঝিল কঙ্কের দুঃখ নিজ দুঃখ দিয়া।।"

লীলা এক দণ্ডও কঙ্কের সঙ্গ ছাড়ে না! যখন লীলা কাঁদিতে থাকে, তখন কঙ্ক তাহাকে সান্ত্বনা দেয়। উভয়ে সহোদর সহাদরার মত পরস্পরের সমদুঃখী হইয়া একত্র থাকে।

গর্গের সুরভি নাম্নী একটি গাভী ছিল, সে গাভীর একটি বৎস ছিল—তাহার নাম ছিল পাটলী। দুপুর বেলা আতপ তাপে ক্লান্ত, বাঁশী ও পাঁচনবাড়ী হাতে কঙ্ক গরু চরাইতে প্রান্তরে যাইত। লীলা তাহাকে রৌদ্রের মধ্যে মাঠে মাঠে ঘুরিতে নিষেধ করিত। সে মাঠে গেলে লীলা ঘরে আসিয়া একবার শয্যায় শুইত, তারপর উঠিত ও বসিত;দরজার কাছে যাইয়া দূর প্রান্তরের দিকে তাকাইয়া কঙ্কের জন্য অপেক্ষা করিত;কখন কখন সেই বাঁশীর সুর শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া থাকিত।

সারাদিন রৌদ্রের তাপে মুখখানি লাল করিয়া কঙ্ক যখন বাড়ী ফিরিত, তখন এই ভগিনী-তুল্যা স্নেহ-প্রতিমা কত আদরে তাহাকে তালের পাখা দিয়া বাতাস করিত, কত যত্নে তাহাকে খাইতে দিত এবং যখন সে খাইত, তখন এটুকু খাও, ওটুকু খাও, এইভাবে আদর করিয়া খাইতে অনুরোধ করিত!

সহসা আষাড়িয়া প্রবাহের যেমন জল নামে, তেমনই লীলার দেহে যৌবন আসিয়া পড়িল। দেহে এই অতর্কিত যৌবনের সমাগমে লীলা বিস্মিত হইয়া গেল, দেখিতে দেখিতে চাঁপা ফুলের বর্ণে দেহখানি যেন উজ্জ্বল হইল। ডালিমের ফুলের মত অধর রঞ্জিত হইয়া উঠিল। শ্রাবণে নদীর জলের মত লীলার রূপ কূলে কূলে ভর্ত্তি হইয়া গেল। সে যখন

কলসী কক্ষে লইয়া নদীর ঘাটে যায়, তখন সেই অপরূপ রূপের প্রতিমাখানি দেখিবার জন্য সাধুদের নৌকায় লোকের ভিড় হয়।

"নদীর কিনারে কন্যা গো কলসী লইয়া।
চাহিল নদীর জলে আঁখি ফিরাইয়া।।
হেরি সে সুন্দর রূপ চমকে সুন্দরী।
শীঘ্রগতি ঘরে ফিরে লইয়া গাগরী।।"

নিজের কাছে সে নিজে ধরা পড়িল—এই আবিষ্কারে তাহার নিকট জগৎ নূতন রূপ ধারণ করিল। গোষ্ঠ হইতে ফিরিয়া আসিয়া কঙ্ক গৃহের আঙ্গিনায় শুইয়া পড়ে, সুরভি ও পাটলীকে লীলা জল খাওয়ায়, কঙ্কের পার্শ্বে লীলা একখানি তালের পাখা রাখিয়া তাহার আতপক্লিষ্ট মুখখানি দেখিয়া দুঃখ অনুভব করে।

গুণমুগ্ধ পীর ও ভক্ত কঙ্ক

এই সময়ে বিপ্রপুর গ্রামে একজন ফকির পঞ্চশিষ্য লইয়া আগমন করিলেন। একটা বড় বট গাছের তলা চাঁচিয়া তথায় তাঁহার আস্তানা স্থাপন করিলেন। নামডাকের সাধু—তিনি অনেক অলৌকিক কাণ্ড করিয়া সেখানকার লোকদিগের মনে বিস্ময় জন্মাইলেন, তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য বহু লোক আসিয়া তাঁহার দরগায় ভিড় করিতে লাগিল; এমনই তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা যে তিনি কোন ঔষধ পত্র না দিয়া ধূলিপড়া দিয়া কঠিন কঠিন রোগ সারাইতে লাগিলেন। কোন লোক কাছে আসিলে তিনি তাহাকে মনের কথা বলিবার কোন অবকাশ দিতেন না। তাহার মুখ-চোখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া সে কিজন্য আসিয়াছে, তাহার বেদনা কোথায়—সকল বিবরণ নিজে বলিয়া দিয়া প্রতিকারের উপায় বলিয়া দিতেন। ধূলা দিয়া মোয়া তৈরী করিয়া শিশুদিগের হাতে দিতেন—তাহার অমৃত আস্বাদে, তাহারা বিস্মিত হইয়া যাইত। শত শত লোক তাঁহার দরগায় আসিত এবং যে যাহা মনে করিয়া আসিত, তাহার বাসনা সিদ্ধ হইত। নানা দিক্ হইতে স্তূপে স্তূপে চাউল, কলা, বাতাসা, মোরগ, ছাগল, পায়রা—তাঁহার কাছে লোকে সিন্নি দিত, কিন্তু পীর তাহার কোনটির কণা মাত্রও খাইতেন না, সমস্ত খাদ্য দরিদ্রদিগকে বিলাইয়া দিতেন।

গুণমুগ্ধ পীরু ও ভক্ত কঙ্ক (পৃষ্ঠা ৩৬৬

মাঠে গাভী ছাড়িয়া দিয়া অপরাপর রাখাল বালকের সঙ্গে কঙ্ক গান গাহিত; কখনও বাঁশী বাজাইত, সেই বাঁশীর সুর ও সুমিষ্ট গান—ডালে বসিয়া কোকিল শুনিত, তাহার পঞ্চম স্বর থামিয়া যাইত। পোষা জন্তুগুলি ঘাস খাওয়া ভুলিয়া সেই বাঁশী শুনিয়া তাহার কাছে আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। কুলবধূরা জল ভরিতে যাইয়া নদীর তীরে কলসী নামাইয়া রাখিয়া সেই বাঁশী শুনিত।

পীর কঙ্কের গান শুনিলেন, তাহার বাঁশীর সুরে তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু নামিয়া আসিল। কি মিষ্ট সেই বাঁশীর সুর। কি মিষ্ট তাহার গলা। তিনি কঙ্ককে ডাকিয়া আনিয়া তাহার সহিত আলাপ করিলেন, ধর্ম্ম-বিষয়ক যে সব আলোচনা হইল, পীর দেখিলেন, তরুণ বয়সে সেই সকল বিষয়ে তাহার আশ্চর্য্য অধিকার। এই অল্প বয়সে কঙ্ক "মলয়ার বারমাসী" নামক একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিল। পীর সেই কাব্যের আবৃত্তি কবির নিজের মুখে শুনিয়া তাহার অসাধারণ কবিত্বশক্তি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন, তিনি দেখিলেন অল্পবয়সে কঙ্ক যে দরদ লইয়া জন্মিয়াছে, তাহা দুর্ল্লভ। কঙ্ক কাব্যগুলি গান করিয়া শুনাইত ও পীর ক্রমাগত চক্ষু মুছিতেন।

পীর যেমন কঙ্কের গুণ-মুগ্ধ হইল, কঙ্কও তেমনই তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্ত হইয়া দাঁড়াইল। কঙ্ক জাতি বিচার রাখিল না, ভক্তি-ভরে পীরের পায়ে মাথা লুটাইয়া প্রণাম করিত। তাহা ছাড়া পীরের উচ্ছিষ্ট খাদ্য অমৃত জ্ঞানে প্রসাদ বলিয়া খাইত। পীরের নিকট কঙ্ক মুখে মুখে কলমা শিখিল এবং তাঁহার উপদেশ বেদের মত জ্ঞান করিয়া হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধা দ্বারা তাহা মনে গাঁথিয়া রাখিত। কিন্তু সে অতি গোপনে ফকিরের কাছে যাতায়াত করিত, গর্গ এই বিষয়ের বিন্দুমাত্রও জানিতেন না।

পীর কঙ্কের অদ্ভুত কবিত্ব শক্তি দেখিয়া তাহাকে একখানি সত্যপীরের পাঁচালী লিখিতে আদেশ করিলেন। আদেশ প্রদানের অব্যবহিত পরেই তিনি বিপ্রপুর গ্রাম ত্যাগ করিয়া কোন দূর দেশে প্রস্থান করিলেন।

সত্যপীরের পাঁচালী

কঙ্ক গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সত্যপীরের কাব্য লিখিয়া ফেলিল। সেই মণ্ডলে এই পাঁচালীখানির খুব আদর হইল।

"গুরুর আদেশ মানি, লিখিয়া পাঁচালীখানি,
পাঠাইলা দেশ আর বিদেশে।
কঙ্কের লিখন কথা, ব্যক্ত হৈল যথা তথা,
দেশ পূর্ণ হৈল তার যশে।।
কঙ্ক আর রাখাল নহে, কবি কঙ্ক সবে কহে,
শুনি গর্গ ভাবে চমৎকার।
হিন্দু আর মুসলমানে, সত্যপীরে উভে মানে,
পাঁচালীর হৈল সমাদর।।
যেই পূজে সত্যপীরে, কঙ্কের পাঁচালী পড়ে,
দেশে দেশে কঙ্কের গুণ গায়।
বুঝি কঙ্কের দিন ফিরে, রঘুসুত কহে ফেরে,
দুঃখিতের দুঃখ নাহি যায়।।"

সামাজিকগণের গোঁড়ামি ও ষড়যন্ত্র

এই অপূর্ব্ব মেধাবী বালকের জন্য স্বভাবতঃ দয়ার্দ্র গর্গের মন দয়াতে ভরিয়া গেল। তিনি দেখিলেন, কঙ্ক মেধাবী, বিনয়ী ও ধার্ম্মিক, তাঁহার নিকট সংস্কৃত ও বাঙ্গলা পড়িয়া সে যাহা শিখিয়াছে, তাহা লইয়া তিনি গৌরব করিতেন—খুব অল্প ছাত্রের মধ্যেই এইরূপ প্রতিভা দৃষ্ট হয়। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন কঙ্ককে জাতিতে তুলিতে হইবে।

তিনি নিজ গৃহে বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদের এক সভা করিয়া প্রস্তাব করিলেন, কঙ্ককে জাতে তোলা হউক। তিনি বলিলেন, "এই কঙ্ক বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সে যে অবস্থায় চণ্ডালের অন্ন খাইয়াছে, তাহাতে তাহার কোন দোষ দেওয়া যায় না, সে তখন অপোগণ্ড শিশু ছিল। নিতান্ত অবোধ, সহায়-সম্পদহীন ও নিঃসম্বল অবস্থায় শিশু যাহা করিয়াছে, তাহার উপর তাহার কোন হাত ছিল না।"

সামাজিকগণ একত্র হইয়া বিচারে বসিলেন, কিন্তু গর্গ ছিলেন মহাপণ্ডিত, তাঁহার হৃদয় ছিল উদার ও মহানুভব, তাঁহার সঙ্গে কোন পণ্ডিতই বিচারে আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না।

গোঁড়া দলের নেতা নন্দ পণ্ডিত ও তাঁহার দল বিচারের দিক দিয়া গেলেন না,—তাঁহারা বলিলেন, "এই কঙ্ক চণ্ডাল-গৃহে চণ্ডালের অন্নে পালিত, ইহাকে আমরা কিছুতেই সমাজে লইতে প্রস্তুত নহি।" কোন যুক্তি-তর্ক নাই, শুধুই ঘাড় নাড়িয়া তাঁহারা অসম্মতি জানাইলেন। শেষে এই বলিয়া চলিয়া গেলেন, "গর্গ পণ্ডিত ইচ্ছা করিলে কঙ্ককে লইয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু তাহা হইলে তিনি আর আমাদের পাংক্তেয় হইবেন না। যে ব্যক্তি জন্মের পরেই চণ্ডালের অন্ন খাইয়াছে—তাহাকে সমাজে গ্রহণ করার প্রস্তাব যে করে, সেও ব্রাহ্মণ নহে। অনাচারে জাতি, কুল নষ্ট হইয়া যায়, মাটীতে ফুল পড়িয়া গেলে তাহা দিয়া দেবতা পূজা হয় না।"

সেই ক্ষুদ্র পল্লীতে হাটে, মাঠে, ঘাটে, আর কোন কথা নাই, কঙ্ক নাকি সমাজে উঠিবে! সকলের মুখে এই একই কথা। কোন কোন উদার চরিত্র লোক গর্গের কার্য্য শাস্ত্রসঙ্গত মনে করিলেন, অন্য সকলে বিদ্রূপ ও কটূক্তি করিতে লাগিলেন; কেহ কেহ গর্গের সম্মুখে উদারতার ভান করিয়া তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধনে তৎপর হইলেন, কিন্তু আড়ালে যাইয়া ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেন। সমাজের বহু লোক গর্গের মতের বিরোধী হইলেন।

"কত তর্ক যুক্তি গর্গ সকলে দেখায়।
তবু না সে বিধি দিল পণ্ডিত সভায়।।
কেহ বলে তুলি ঘরে, কেহ বলে নয়।
এই মতে নানা স্থানে বহু তর্ক হয়।।"

ষড়যন্ত্রকারীরা ক্রমশঃ ঘোঁট পাকাইতে লাগিল। তাহারা প্রচার করিল, কঙ্ক শুধু চণ্ডালের গৃহে পালিত নহে; সে দস্তুর মত কলমা পড়িয়া মুসলমান পীরের নিকট দীক্ষিত হইয়াছে। সে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। জোর হাওয়ায় আগুনের শিখা যেরূপ অল্প সময়ের মধ্যে দিক্‌দিগন্তে ব্যাপ্ত হয়—বিরুদ্ধবাদীদের চক্রান্তে এই কথা সেইরূপ সমস্ত পল্লীসমাজে প্রচারিত হইয়া পড়িল ঃ—

"রটে কঙ্ক নহে শুধু চণ্ডালের পুত।
মুসলমান পীরের কাছে হয়েছে দীক্ষিত।।

হিন্দু যত সবে কঙ্কে মুসলমান বলি।
কেহ ছিঁড়ে কেহ পোড়ায় সত্যের পাঁচালী।।
জাতি গেল মুসলমানের পুঁথি লৈয়া ঘরে।
যথাবিধি সবে মিলে প্রায়শ্চিত্ত করে।।"

কিন্তু এখানেই শেষ নহে। জনসাধারণ যখন কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তখন তাহারা সহজে নিরস্ত হয় না, একেবারে চূড়ান্ত করিয়া ছাড়ে। কঙ্কের আরও নানা শত্রু জুটিয়া প্রচার করিল—সে লীলার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত।

"একে ত কুমারী কন্যা অতি শুদ্ধ মতি।
কলঙ্ক রটাইল তার যত দুষ্ট মতি।।"

গর্গের মতিভ্রম

"দশ চক্রে ভগবান্ ভূত"—জনরব নানা দিক হইতে গর্গের কানে পৌঁছিল। এমন যে শুদ্ধ শান্ত ধীর পুরুষ, নানা মিথ্যা প্রমাণ, ও কল্পিত যুক্তিতর্কে তাঁহার মন বিষাক্ত হইয়া গেল। তিনি কঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযোগ বিশ্বাস করিলেন। ঘড়ির দোলন-দণ্ডের ন্যায় তাঁহার মন এক দিক হইতে অপর দিকে অতি দ্রুত চলিতে লাগিল। তিনি তাঁহার স্নেহশীলা কন্যার কলঙ্কের কথা শুনিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। এ মহাপাপ হইতে তাঁহার গৃহ ও গৃহাধিষ্ঠিত দেবতাকে কিরূপে রক্ষা করা যায়!—মাথায় আগুন, তখন সুবুদ্ধি কোথায় থাকিবে!—স্থির করিলেন, কঙ্ককে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেই এই কলঙ্কের মোচন হইবে না, তিনি তাহাকে হত্যা করিবেন। তারপরে লীলাকেও সেই পথে প্রেরণ করিয়া নিজে অগ্নিতে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবেন।

লীলা তাঁহার মনের ভাব লক্ষ্য করিল, যে মন প্রশান্ত এবং নিষ্কম্প দীপ-শিখার ন্যায় ছিল, তাহা যেন ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার বর্ণ বিবর্ণ হইয়াছে, চোখের কোণ রক্তিমা-জড়িত ও উগ্র, সে পিতাকে কোন দিন এমন দেখে নাই। গর্গ দেবমন্দিরের কাছে যাইয়া উন্মত্তের ন্যায় চাহিয়া আছেন, লীলাকে দেখিয়া বলিলেন—

লীলা

"কেহ বলে তুলি ঘরে, কেহ বলে নয় এই মতো নানা স্থানে বহু তর্ক হয়।" (পৃষ্ঠা ৩৭১)

"শীঘ্র নদীতে যাও, কলসী ভরিয়া জল লইয়া আইস। দেবতার মস্তকের তুলসীতে কুকুরে মুখ দিয়া বিগ্রহ অপবিত্র করিয়াছে। আমি এই মন্দির, শালগ্রাম ও সিংহাসন সমস্ত নদীর জল দিয়া ভাল করিয়া মার্জ্জনা করিব, তুমি শীঘ্র জল লইয়া আইস।"

তাঁহার স্বরে চির অভ্যস্ত স্নেহের একটি বিন্দু নাই, বরং ভাষা কঠোর ও নির্ম্মম—লীলার চোখ দুটি জলে ভরিয়া আসিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে কলসী-কক্ষে জল আনিতে গেল। সে ভাবিতে লাগিল, তাহার জগতে কে আছে। পিতা বিরূপ হইলে সে আর কাহার মুখ দেখিয়া মনে শান্তিলাভ করিবে!

এমন সময়ে পিতার গুরুগম্ভীর মেঘ-গর্জ্জনের মত স্বর শুনিয়া লীলা ঘাটের পথে থমকিয়া দাঁড়াইল। গর্গ বিরক্তি ও ক্রোধ-মিশ্রিত স্বরে বলিলেন, "তোমাকে আর জল আনিতে হইবে না, আমি নিজে জল লইয়া যাইব, তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও।" এই বলিয় ক্ষিপ্তের মত পাদক্ষেপে গর্গ কলসী জলে পূর্ণ করিয়া দেব-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। লীলার হাতের তোলা সমস্ত ফুল মন্দির হইতে ঝাঁট দিয়া ফেলিলেন; তাহার হাতের বেলপাতাগুলি ও ঘসা চন্দন দূর করিয়া ফেলিয়া নিজ হাতের আনা নদীর জলে তাম্রকুণ্ড, সিংহাসন ও শালগ্রাম ধুইলেন, মন্দিরটি স্বহস্তে মার্জ্জনা করিলেন, তবুও মন শান্ত হইল না। প্রতিদিন যে একাগ্রতা লইয়া পূজা করিতে বসেন, সেদিন আর সে একাগ্রতা ফিরিয়া পাইলেন না।

এদিক সেদিক চাহিয়া কোনরূপে পূজা সারিয়া একা যাইয়া খাইতে বসিলেন। অন্য দিন লীলাকে ডাকিয়া তাঁহার নিকটে বসিতে বলেন, লীলা পরিবেশন করে এবং তিনি কত স্নেহের কথায় আদর করেন, আজ লীলাকে ডাকিলেন না, খুঁজিলেন না। কোনরূপে আহার শেষ করিয়া রান্না-ঘরের বাহিরে যাইয়া একদৃষ্টে আকাশের একটা কোণ দেখিতে লাগিলেন। ঘরের দেয়ালের রন্ধ্র দিয়া লীলা সকলই দেখিতেছিল, তাহাকে খাওয়ার সময় একটিবার পিতা ডাকেন নাই, এই অভিমানে তাহার গণ্ড বাহিয়া অশ্রু পড়িতেছিল। সে ভয়ে তাহার পিতার মুখের দিকে চাহিতে পারে নাই। উদ্দাম ঝড়ের মুখে তরণীখানি বাঁধা ঘাটে যেরূপ কাঁপিতে থাকে,—লীলা অজানিত আশঙ্কায় ঘরে বসিয়া তেমনই কাঁপিতেছিল।

পিতার আহার করার পর, লীলা কঙ্কের জন্য ভাত তরকারী পরিচ্ছন্নভাবে সাজাইয়া একটা ঢাকনি দিয়া ঢাকিয়া সিকায় ঝুলাইয়া রাখিল, এবং রন্ধনশালা ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিল।

এদিকে গর্গ দেখিলেন, রান্না ঘরে জন-প্রাণী নাই। তখন একটা কৌটা হইতে হলাহল বিষ বাহির করিলেন, এবং চোরের মত মৃদু পাদক্ষেপে ঘরে ঢুকিয়া সেই অন্ন ব্যঞ্জনের থালা বিষ মিশ্রিত করিয়া দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। লীলা গর্গের প্রতি স্থির লক্ষ্য বদ্ধ করিয়াছিল। গর্গের অগোচরে সে তাঁহার এই অমানুষিক নির্ম্মম কাণ্ড দেখিতে পাইয়া একবারে সংজ্ঞাশূন্যের মত রান্নাঘরের দ্বারে বসিয়া পড়িল।

কঙ্কের গৃহত্যাগ

সন্ধ্যায় সুরভি ও পাটলীকে লইয়া কঙ্ক গৃহে ফিরিল। কঙ্ক দেখিল, বিমনা হইয়া লীলা অন্ন-ব্যঞ্জনের থালাখানি সম্মুখে রাখিয়া বসিয়া আছে। সে লীলাকে বলিল—"আজ তোমার মুখ এরূপ মলিন কেন লীলা দেবী? আমি বাড়ী ফিরিবার পথে পিতাকে দেখিলাম, অন্য দিন আমার শ্রমক্লান্ত শরীর দেখিয়া তিনি কত আদরের সঙ্গে কথা বলেন, আজ আমাকে দেখিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন, একটি স্নেহের কথা বলিলেন না। আর তোমায় দেখিয়া কত আনন্দ পাই। কিন্তু তোমার মুখে কে যেন কালিমা ছড়াইয়া দিয়াছে! ওকি! কাঁদিতেছ কেন? অনেক দিন তো তোমার চোখে জল দেখি নাই! আমার কাছে সকল কথা খুলিয়া বল।"

লীলা বলিল, "কঙ্ক তুমি এখনই এ গৃহ ত্যাগ কর—যে দেশে আত্মীয় বান্ধব কি পরিচিত কেহ নাই, যে দেশ একেবারে জনবিরল ও নির্ব্বান্ধব—তুমি সেইখানে যাও—আজই যাও—এখনই যাও।"—বলিতে বলিতে লীলা একটি সোনার পুতুলের ন্যায় ভাঙ্গিয়া পড়িল—তাহার মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না। শেষে বলিল—"আমি রাক্ষসী, বিষ-মাখা ভাত খাওয়াইয়া তোমাকে মারিতে বসিয়া আছি!"

কিছুকাল পরে লীলা নিজেকে কতকটা সংবরণ করিয়া লইল এবং দুষ্ট লোকের কথায় গর্গ কিরূপ বিচলিত হইয়া ক্ষিপ্তের মত হইয়া গিয়াছেন, তাহা কঙ্ককে জানাইল। কঙ্ককে বধ করিবার জন্য যে গর্গ অন্ন-ব্যঞ্জনে বিষ মিশাইয়াছেন, তাহা বলিতে যাইয়া লীলার বুক ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল; দুই হাতে অঞ্চল চিয়া চক্ষু মুছিয়া লীলা ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কঙ্ক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কোন বৃক্ষের উপর বজ্রাঘাত হইলে প্রাণহীন তরু যেরূপ স্থির হইয়া মাটীর উপর ক্ষণকালের জন্য দাঁড়াইয়া থাকে, কঙ্ক সেইরূপ খানিকটা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল; তারপর দুঃখার্ত্ত স্বরে বলিল, "লীলা, ভগবান্ জানেন আমার কোনও অপরাধ নাই। চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষ্য দিবেন, দিবারাত্রি সাক্ষ্য দিবেন। পিতা মহাজ্ঞানী ব্যক্তি, কুলোকের কথায় তাঁহার বুদ্ধি ক্ষণকালের জন্য মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে। কিন্তু এই মোহের ভাব বেশী সময় থাকিবে না; আমি আপাততঃ কোন তীর্থস্থানে যাইতেছি; পিতার এই ভাব কাটিয়া গেলে আবার আমি আসিব। আর লীলা, পিতার প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইও না, তিনি তোমার আমার পরম গুরু—ক্ষণতরে তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে।"

লীলা বলিল, "তুমি যাও, আমি এই বিষাক্ত অন্নব্যঞ্জন খাইয়া প্রাণ ত্যাগ করি, সংসারে আমার আর কোন আকর্ষণ নাই।"

কঙ্ক তাহাকে অনেক রকমে বুঝাইল—"আজ কোন দুর্ঘটনার পূর্ব্বাভাস পাইয়া সুরভি ও পাটলি তৃণ কি ঘাস খায় নাই, এই বাড়ীর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়াছিল; ইহারা আমার অভাব বিশেষ করিয়া অনুভব করিবে, তুমি ইহাদের দেহে হাত বুলাইয়া দিও। তোমার নিকট বিদায় চাহিতেছি, যদি অজ্ঞাতসারে কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তবে আমায় ক্ষমা করিও।"

কঙ্কের গদ্গদ কণ্ঠ শোকাবেগে ক্ষণতরে থামিয়া গেল। পুনরায় সে বলিতে লাগিলঃ—

"ঘরে আছে পোষা পাখী হীরামণ শারী।
তাহারে ডাকিও লীলা কঙ্ক নাম ধরি।।
নাহি পিতা নাহি মাতা নাহি বন্ধু ভাই।
যে দিকে কপাল নিবে যাব সেই ঠাঁই।।
রইল রইল লীলা তোমার তোতা শারী।
ক্ষীর সর দিয়া তারে পালিও যত্ন করি।।
রইল রইল রে লীলা পুষ্প তরু যত।
জল সেচন দিয়া পালিও অবিরত।।
রইল রইল রে লীলা মান্দতির লতা।

আজি হৈতে রইল পড়ি তোমার মালাগাঁথা।।
সুরভি পাটলি রইল প্রাণের দোসর।
তৃণ জল দিয়া সবে করিও আদর।।"

"গৃহ-দেবতা শালগ্রাম আছেন; পিতা যতদিন ক্ষিপ্তভাবে থাকিবেন, ততদিন যেন পূজার কোন ত্রুটি না হয়।"

"তোমার আমার গুরু রে লীলা রইলেন পিতা।
জীবন মরণে তিনি সাক্ষাৎ দেবতা।।
অত্যাচার করেন যদি লইও শির পাতি।
নারায়ণে স্মরিও লীলা অগতির গতি।।
দুঃখ না করিও লীলা আমার লাগিয়া।
আবার হইবে দেখা, আসিলে বাঁচিয়া।।"

গর্গ পাগল হইয়া ছুটাছুটি করিয়া একবার ঘর একবার বাহির হইতেছেন। চক্ষু দুটি জবা ফুলের মত টক্‌টকে লাল। "আজ হতভাগ্য কঙ্ককে শেষ করিয়া দিয়াছি, কিন্তু এখানেই শেষ নহে। যে পাষাণী কন্যাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া সংসার পাতিয়াছিলাম,—গৃহহারা হইয়া তো বিবাগী হইয়া কবে চলিয়া যাইতাম; যাহার মায়ায় আটকা পড়িয়াছি, যাহার মুখ দেখিলে পাষাণের প্রাণেও দয়ার উদ্রেক হয়—চির শত্রুও যাহার মুখ দেখিয়া ভালবাসিতে চায়—সেই স্নেহের পুতুলকে আজই জলে ডুবাইয়া মারিব, এবং ঘর-বাড়ী-মন্দিরে আগুন ধরাইয়া সেই জ্বলন্ত আগুনে প্রাণ ত্যাগ করিব।" গর্গ একদিকে যেমন সাধু যেমন সরল—অপরদিকে তেমনই বজ্রের মত কঠোর ও নিষ্ঠুর।

কঙ্ক ঘরে আসিয়া বসিল—সে আজই এই প্রিয়স্থান ত্যাগ করিয়া যাইবে। গায়ত্রী দেবীকে মনে পড়াতে চক্ষে অবিরল জলবিন্দু পড়িতে লাগিল—"কোথায় যাইব—যেখানে জন-মানব নাই, যেস্থান হিংস্র পশু-সঙ্কুল—আমি তাহাদের খাদ্য হইব।" গণ্ডে হস্ত স্থাপন করিয়া কঙ্ক সেই দূর অজ্ঞাত প্রবাস-যাত্রার কথা ভাবিতেছে—এমন সময় পাগলের মত চিৎকার করিয়া লীলা তথায় উপস্থিত হইয়া বলিল—"সুরভিকে সাপে কাটিয়াছে, তুমি শীঘ্র ওঝা ডাকিতে চলিয়া যাও, আমি সুরভির কাছে যাই।" স্খলিত পদে চঞ্চল চরণে

নিদারুণ মনোবেদনায় লীলা এই বলিয়া চলিয়া গেল;কঙ্ক তাহাকে দ্রুতপদে অনুসরণ করিয়া যাইয়া দেখিল সুরভি দারুণ বিষে পিঙ্গলবর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং অন্তিম নিঃশ্বাস টানিতেছে। সে লীলাকে জিজ্ঞাসা করিল, সেই বিষাক্ত অন্নব্যঞ্জন কোথায় ফেলিয়াছিল? সহসা লীলার কাছে সব কথা পরিষ্কার হইয়া গেল। সে বলিল ওই জায়গাটায় তো সুরভি গিয়াছিল। কঙ্ক বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! ঐ ভাত-ব্যঞ্জন খাইয়া আমি মরিলে কি আর ক্ষতি হইত! ব্রাহ্মণের বাড়ীতে ঠাকুরের মন্দিরের কাছে গো-হত্যা হইল! কি সর্ব্বনাশ!" কঙ্ক দেখিল, সুরভির বৎস পাটলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া মৃতা মায়ের শবের কাছে যাইতেছে—সেই করুণ দৃশ্য দেখিয়া সে সেখানে তিষ্ঠিতে পারিল না। লীলা আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। রান্নাঘরে যাইয়া সে ভূমিতে আঁচল পাতিয়া শয়ন করিল।

আড়াই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত কঙ্ক বাহিরের ঘরে বসিয়াছিল, তারপরে উঠিয়া গিয়া একটা নিমগাছের নীচে ঘুমাইয়া পড়িল। তাহার ঘুম হইল না, তন্দ্রায় দেখিতে পাইল, চার দিকে ভয়াল মূর্ত্তি প্রেতের দল ঘুরিতেছে। তাহারা ছায়ার ন্যায় আসিয়া কঙ্ককে ধরিয়া চিতার আগুনে দগ্ধ করিতে লাগিল। কঙ্ক যন্ত্রণায় চিৎকার করিতে লাগিল, "কে আছ আমায় পরিত্রাণ কর।"

সেই বিপদের মুহূর্ত্তে সে স্পষ্ট দেখিল,—ইহা ঘুমের স্বপ্ন নহে, তন্দ্রার আবেশ নহে, আরক্ত গৌরবর্ণ এক যুবক তাহার শীতল করপদ্মদ্বারা তাহাকে সেই চিতা হইতে উদ্ধার করিলেন এবং বলিলেন, "আয়, আমার কাছে আয়, যদি জুড়াবি তবে আমার কাছে আয়।"

কঙ্ক চাহিয়া আর দেখিল না, বুঝিল সেস্থান পদ্মগন্ধময়, গৌরাঙ্গ অদৃশ্য হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার গায়ের পদ্মগন্ধ সেখানে ফেলিয়া গিয়াছেন।

"রক্ত গৌর তনু তাঁর কাঞ্চনের কায়া।
আগুন হইতে কঙ্কে দিল বাঁচাইয়া।।
স্বপনে আদেশ তাঁর পাইয়া কঙ্কধর।
প্রভাতে গৌরাঙ্গ বলি ত্যজিলেক ঘর।।"

প্রত্যূষে কোকিল ও কাকের রবে মুখরিত বিপ্রপুর-পল্লীর ছায়া-শীতল নিবিড় তরুতলে কঙ্ককে আর কেহ দেখিতে পাইল না।

প্রাতে আলুলায়িতকেশা, অসম্বৃত-বসনা লীলা হঠাৎ উঠিয়াই কঙ্কের ঘরে গমন করিল—শূন্য শয্যা, কঙ্ক নাই। তারপর গোয়াল ঘরে যাইয়া শুনিল, পাটলির হাম্বারব থামে নাই। সারারাত্রি সে অবিরাম চিৎকার করিয়াছে, কঙ্ক সেখানে নাই।

"নয়নেতে নিদ্রা নাই, পেটে নাই অন্ন
সর্ব্ব স্থানে খোঁজে লীলা করি তন্ন তন্ন।"

হেমন্তের নদী উজান স্রোতে চলিয়াছে—তাহার পাড় ধরিয়া লীলা কঙ্ককে খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু কঙ্ক কোথাও নাই।

"এক স্থানে শতবার করে বিচরণ।
কোথা কঙ্ক বলি লীলা ডাকে ঘন ঘন।।
পোষমানা পাখীরে লীলা কাঁদিয়া শুধায়।
তোমরা কি দেখেছ কঙ্ক গিয়াছে কোথায়।।
উড়িয়া ভ্রমর বইসে মালতীর ফুলে।
তাহারে জিজ্ঞাসে কন্যা ভাসি আঁখিজলে।।
যাইবার আগে মোরে নাহি দিলে দেখা।
এই ছিল অভাগীর কপালের লেখা।।"

গর্গের অনুতাপ ও দেবতার প্রত্যাদেশ

সারা রাত্রি গর্গ বনে বাদাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইলেন,—আহার নাই, ক্লান্তি নাই, যেন এক ঘোর উন্মাদ। আকাশে শাচান ও গাং চিল উড়িতেছে, ঘোর রব করিয়া দিবাভাগে শৃগাল ডাকিতেছে। প্রকৃতির এই দুর্লক্ষণ দেখিয়া আশঙ্কায় গর্গের মুখ শুকাইয়া গেল। প্রভাতে তিনি বাড়ী ফিরিলেন, দেখেন বাড়ী শূন্য, সমস্ত দরজায় খিল দেওয়া—এত বেলা কিন্তু প্রাতঃকালের ঘণ্টা মন্দিরে বাজিতেছে না, কাল রাত্রে আরতি হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না।

শত শত মালতী ফুল মাটীতে ঝরিয়া পড়িয়াছে। কেহ ফুল তোলে নাই, কেহ মালা গাঁথে নাই, তাহাদের পাশ কাটিয়া ভ্রমর উড়িয়া যাইতেছে, ফুলের উপর বসিতেছে না।

তাঁহার পাদক্ষেপ শুনিয়া হাম্বা হাম্বা রব করিয়া পাটলি ছুটিয়া আসিল, তাহার মৃতা মাতা আঙ্গিনায় পড়িয়া রহিয়াছে। পাটলি এক একবার আসিয়া গর্গের পদতলে লুটাইতেছে,—সে দৃশ্য দেখিয়া গর্গের বুক বিদীর্ণ হইল। তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিয়া খিল লাগাইলেন। সেইখানে দেবতার ঘরে তিনি প্রাণ দিবেন—পূজার আর কোন উপচার নাই—শুধু অশ্রুজল।

দুই দিন চলিয়া গেল, শিষ্যেরা আসিয়া ফিরিয়া গেল, ঠাকুর দোর খোলেন নাই। সহরে বাজারে সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইল গর্গ ঠাকুর ঘরে হত্যা দিয়া আছেন। অনাহার অনিদ্রা ও নিদারুণ দুঃখে ঠাকুরের নিকট শুধু অশ্রু নিবেদন; কোন মন্ত্র পড়িলেন না, কোন অনুষ্ঠান করিলেন না, পূজা, জপ, গায়ত্রী পাঠ ভুলিয়া গেলেন, ঠাকুরের উদ্দেশে, শিশু যেমন মায়ের জন্য কাঁদে—কথা বলিতে শিখে নাই, কি চাহে তাহা সে জানে না,—তেমনি দুঃখভারাক্রান্ত চিত্তে, তেমনি নিঃসহায় ভাবে মর্ম্মবেদনায় গর্গ কাঁদিতে লাগিলেন। দুই দিন পরে তাঁহার আত্মা নির্ম্মল হইল। তিনি স্পষ্ট ভাষায় দেবতার আদেশ শুনিতে পাইলেন।—

"গর্গ, তুমি নির্দ্দোষী সরলা নিজ কন্যাকে অবিশ্বাস করিয়া মারিতে সঙ্কল্প করিয়াছ, যে নিরাশ্রয় যুবক তোমাকে ভিন্ন জানে না, যাহার প্রকৃতি সরল ও মধুর, যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ এবং তোমার একান্ত আশ্রিত—তাহাকে তুমি মারিতে তাহার ভাতে বিষ মাখাইয়া দিয়াছ, সেই অন্ন খাইয়া সুরভি মরিয়াছে—এজন্য দেবতা তোমার উপর বিরূপ হইয়াছেন—"

"আপন কন্যায় যে মারিতে যুক্তি করে।
পালিত জনারে যেবা বিষ দিয়া মারে।।
এই না কারণে তোমার এতেক সর্ব্বনাশ।
সেই বিষে সুরভির হৈল প্রাণনাশ।।"

অনুতাপে গর্গ দগ্ধ হইতে লাগিলেন, "স্বর্গের কুসুমের ন্যায় মাতৃহীনা নিজ কন্যা, পুত্রের অধিক প্রিয় সরল সচ্চরিত্র বালক—ইহাদিগকে মারিতে চেষ্টা করিয়াছি! সুরভিকে আমি মারিয়া ফেলিয়াছি।—পরের কথা বিশ্বাস করিয়া আপন জনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছি। হায়! আমার গতি কি হইবে!" এই বলিয়া গর্গ কিছুকাল মোহগ্রস্ত হইয়া ঠাকুর-ঘরে পড়িয়া রহিলেন। নিজে প্রাণ ত্যাগ করিয়া এই ঘোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন এই সঙ্কল্প তাঁহার মনে দৃঢ় হইল। কি ভাবে প্রাণ দিলে আমার মত নারকীর উদ্ধার হইতে পারে! এই ভাবিতে ভাবিতে গর্গ শালগ্রাম শিলার কাছে আবার হত্যা দিলেন।

আরও দুই দিন কাটিয়া গেল। গর্গ ঠাকুর ঘরের খিল খুলিলেন না। শিষ্যেরা চিন্তিত হইয়া পড়িল। চতুর্থ দিন শেষ রাত্রে গর্গ আবার আদেশ শুনিলেন, সেই আদেশ কঠোর হইলেও অতি মধুর; মায়ের কথার মত গঞ্জনাময় ও মায়ের কথার মত স্নেহ-মাখা। যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের তাপ জুড়াইয়া গেল। কে যেন তীব্র ঔষধ দিয়া তাঁহার উৎকট ব্যাধি প্রশমিত করিয়া গেল। গর্গ শুনিলেনঃ—

"তুমি যে ফুল মন্দির হইতে ঝাঁট দিয়া ফেলিয়া দিয়াছ, তোমার কন্যার তোলা সেই ফুল ও দুর্ব্বাদলে ঠাকুর পূজা কর—তোমার কৃত গোহত্যার পাপের ইহাই প্রায়শ্চিত্ত।"

গর্গ যাহা শুদ্ধ মনে করিয়াছিলেন, নিজের হাতে তোলা সেই কলঙ্কিত ফুলগুলি মন্দির হইতে ফেলিয়া দিলেন; মন্দিরের বাহির হইতে লীলার তোলা বাসি ও শুষ্ক ফুলগুলি মাথায় ঠেকাইয়া আবার পূজার আসনে বসিলেন। সারারাত্রি যোগাসনে বসিয়া গর্গ দেবতার কাছে মার্জ্জনা চাহিলেন, তাঁহার চক্ষু দুটি কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফুলিয়া গিয়াছে।

পঞ্চম দিন প্রাতে গর্গ মন্দিরের দরজা খুলিলেন। তাঁর অশ্রুপ্লাবিত মুখে স্বর্গীয় জ্যোতি। বিচিত্র এবং মাধব নামে দুই শিষ্য দ্বারে দণ্ডায়মান ছিল—গুরুদেব বলিলেন, "দুষ্ট লোকের ষড়যন্ত্রে পড়িয়া আমার প্রাণের কঙ্ককে আমি বিষ খাওয়াইতে গিয়াছিলাম। চির দিন যাহাকে পুত্র বলিয়া স্নেহ করিয়াছি সে আমার ঘোর পাপে বিবাগী হইয়া চলিয়া গিয়াছে, যাহাকে আমি তোতা পাখীর মত মুখে মুখে আবৃত্তি করিয়া শ্লোক শিখাইয়াছিলাম, আমার সে তোতা পাখী কোথায় গেল? তাহার চরিত্রগুণে তোমরা তাহাকে প্রাণের মত ভালবাসিয়াছ, সে শুধু তোমাদের বন্ধু ছিল না—সহোদরের মত ছিল। তোমরা তাহাকে খুঁজিয়া আন; তোমরা তাহার দেখা পাইলে বলিও—আমার মাথার দিব্য সে যেন ফিরিয়া আসে, তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে সাধিয়া আনিও; পাটলিকে তৃণ জল দিবার কেহ নাই। হীরামণ পাখী কঙ্ক কঙ্ক বলিয়া ডাকিয়া ক্ষান্ত হইয়া গিয়াছে; সে আর কিছু আহার করে না। কঙ্কের দেখা পাইলে বলিও—তাহার উপর আমার আর কোন সন্দেহ নাই। সে যেন আমাকে ক্ষমা করিয়া আশ্রমে আসে, সে ছাড়া আশ্রম শূন্য হইয়া গিয়াছে—আমি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতেছি। আমি এই ঠাকুর ঘরে তার প্রতীক্ষায় রহিলাম, যতদিন সে ফিরিয়া না আসে ততদিন অন্ন জল না খাইয়া শুকাইয়া থাকিব। সে না আসিলে এই আসনেই আমি প্রাণ দিব।"

"আর যদি দেখা পাও কইও করে ধরি।
অপরাধ করিয়াছি, ক্ষমা ভিক্ষা করি।।"

লীলা, বিচিত্র ও মাধবের কঙ্কের উদ্দেশ্যে বিদেশে যাত্রার কথা শুনিল। —সে ঘরে ঢুকিয়া আঁচল পাতিয়া শয্যা তৈরী করিল ও অনাহারে অনিদ্রায় দিন রাত্রি যাপন করিতে লাগিল। সে আর কাহাকে কি বলিবে। আকাশের সূর্য্য ও চন্দ্রকে সে নিজ মনোবেদনা জানাইল। "পৃথিবীর সর্ব্বস্থান তোমাদের বিদিত, জগতের এমন কোন আঁধার কোণ নাই যেখানে তোমাদের আলোক রশ্মি প্রবেশ না করে, তোমরা নিশ্চয়ই কঙ্কের সন্ধান জান,

"নাগাল পাইলে তারে আমার কথা কইও।
আলোকে চিনাইয়া পথ দেশেতে আনিও।।"

নৌকাগুলি পালের জোরে তরঙ্গ ভেদ করিয়া চলিয়াছে—লীলা তাহাদিগকে বলিল, "তোমাদের গতিবিধি সর্ব্বত্র, তোমরা যদি কঙ্কের সন্ধান পাও, তবে তাহাকে ধরিয়া আনিও।"

এই ভাবে লীলা নক্ষত্র, তারা, চন্দ্র, সূর্য্য, প্রভাতী বায়ু, ঊষা, নব-মুঞ্জরিত লতা, পুষ্প-বিতান, ফল ফুলে ভার নত ডাল, নানা বর্ণের নানা পাখী, বিশ্বের যাহাকে দেখিতে পায়—বিমনা হইয়া তাহাকেই কঙ্কের সন্ধান জিজ্ঞাসা করে। প্রকৃতির সঙ্গে ব্যথিত মনের এই নিবিড় সম্পর্ক ঋতুভেদে বিচ্ছেদ কাতর মনের ক্ষোভ, আশা ও আশা-ভঙ্গ পৃথিবীতে চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে। এই নারীর হৃদয়ের দুঃখ মুখ ফুটিয়া বলিবার সুযোগ নাই। এইজন্য প্রকৃতির সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর ও নিবিড়তর। কবি যত কিছু বারমাসীতে লিখেন, তাহা তাঁহার কল্পনা নহে; গাঢ় অনুভূতি ও নিষ্কাম নিঃস্বার্থ প্রেমে তাঁহার মন "পততি পত্রে, বিচলিত পত্রে"—প্রিয়ের পাদক্ষেপের পরিকল্পনা মনে জাগাইয়া তোলে।

এইভাবে শৈশবের সঙ্গী, কৈশোরের সখা— যৌবনের প্রিয় কঙ্কের জন্য লীলার মনে হাহাকার ধ্বনি উঠিল। তাহার আহার নিদ্রা চলিয়া গেল। যে দিকে চায়—যাহাকে দেখে,—অমনই তাহার চক্ষু অশ্রুতে ভিজিয়া উঠে। গায়ত্রীর মৃত্যুর পর সমস্ত সহোদরের স্নেহ কঙ্ক তাহাকে দিয়াছিল, শত শত ক্ষুদ্র ঘটনায়—কঙ্কের সরল মধুর ব্যবহারে তাহার মন কঙ্কময় হইয়া গিয়াছিল। তাহারই জন্য মিথ্যা কলঙ্কের ভাজন হইয়া পিতার ক্রোধের পাত্র হইয়া

নির্দ্দোষ, নিরপরাধ কঙ্ক কত কষ্ট পাইয়াছে! আজ প্রতি ক্ষুদ্র কথা মনে পড়িয়া তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সে শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে। তাহার সে বিদ্যুতের মত রূপের জ্যোতি আর নাই। সে দিন-রাত্রি আঁচল পাতিয়া বাম বাহু শিথান করিয়া চক্ষের জলে ভাসে এবং সম্মুখে মৃত্যুর ছায়া দেখিয়া শিহরিয়া উঠে।

ফাল্গুন মাসে গাছের ডাল ভরিয়া লাল ফুল ফুটিল, কঙ্ক যে মালতীলতা পুঁতিয়া গিয়াছিল, এইবার তাহার ডালে প্রথম ফুল ফুটিয়াছে, কঙ্ক থাকিলে আজ সে একটা উৎসব করিত। ভ্রমরগুলি সেই ফুলের কাছে আসিলে লীলা কহিতে থাকে—

"কৈও কৈও কঙ্কের কাছে শুন অলিকুল।
মালতীর গাছে তার ফুটিয়াছে ফুল।।"

চৈত্র মাসে বাগান ভরিয়া প্রস্ফুট ফুলের বাহার—লীলা সেই ফুল লক্ষ্য করিয়া—

"মালঞ্চে ফুটিয়া ফুল হৈয়া গেল বাসি"

বলিয়া আক্ষেপ করে।

আবার সন্ধান

ছয় মাস পরে বিচিত্র ও মাধব ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিল। কঙ্ককে কোথাও পাওয়া যায় নাই। লীলার অবস্থা দেখিয়া তাহারা শঙ্কিত হইয়া বলিল, "শুন ভগিনী লীলা, আমরা কঙ্কের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। বৃহৎ বনস্পতি-সঙ্কুল, লতাজাল-আবদ্ধ গারো প্রদেশের যেস্থান সিংহ, ব্যাঘ্র ও ভল্লুকের লীলাভূমি সেই ঘোর অরণ্যানিতে আমরা প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া কঙ্ককে খুঁজিয়াছি। পূর্ব্বদিকে শ্রীহট্ট অঞ্চল—খরস্রোতা সুরমা নদী ও পার্ব্বত্য-পথ অতিক্রম করিয়া কামরূপে যাইয়া কামাখ্যা দেবীর দর্শন করিলাম—তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান করিলাম. কোথাও কঙ্ক নাই। পশ্চিম দিকে কাশী বৃন্দাবন ঘুরিয়া নবদ্বীপ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি, কাহারও কাছে কঙ্কের কোন সংবাদ পাই নাই।"

"শৈশব সুহৃদ মোদের প্রাণের বন্ধু ভাই।
প্রাণ দিতে পারি যদি তারে খুঁজে পাই।।

কত যে খুঁজিনু তারে নাহি লেখা জোখা।
নিখোঁজ হইল বুঝি, না পাইলাম দেখা।।"

গর্গ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া দুইজনের হাত ধরিয়া বলিলেন ঃ—

"যেরূপেতে পার বাছা কঙ্কে আন ঘরে।"

"কঙ্কেরে আনিয়া তোমরা দেও দুই জনে।
লোকালয় ছাড়ি মোরা যাব ঘোর বনে।।"

এই হিংস্র, ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রকারী মনুষ্যসমাজে আমি আর থাকিতে চাই না।"

"নগর ছাড়িয়া মোরা হব বনবাসী।
ব্যাঘ্র ভল্লুক হবে পাড়া-প্রতিবেশী।।
গুরুর দক্ষিণা দেও কঙ্কেরে আনিয়া।
পরাণে মরিব নৈলে তাহারে ছাড়িয়া।।
মহাযাত্রার আর নাই বেশী দিন বাকী।
সুখেতে মরিব যদি কঙ্কে সামনে দেখি।।"

গুরুর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে বিচিত্র ও মাধব ক্ষণতরে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহারা কোথায় কোন্ পথে যাইবে চিন্তা করিতে লাগিল। গুরুর কাতরতা দেখিয়া তাহারা মনে করিল, প্রাণও যদি যায়—তবুও তাহারা সে আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিবে না।
ধীরে ধীরে গর্গ বলিলেন,—

"শুন শুন বিচিত্র আর মাধব সুন্দর।
আজি হ'তে পুনঃ তোমরা যাবে দেশান্তর।।
কিন্তু এক কথা মোর শুন দিয়া মন।
গৌরাঙ্গের পূর্ণ ভক্ত হয় সেই জন।।
যে দেশে বাজিছে গৌর চরণ নূপুর।

সেই পথ ধরি তোমরা যাও কতদূর ।।
যে দেশেতে বাজে প্রভুর খোল করতাল।
হরিনামে কাঁপাইয়া আকাশ পাতাল ।।
সেই দেশে কঙ্কেরে করিবে অন্বেষণ।
অবশ্য গৌরাঙ্গ ভক্তে পাবে দরশন ।।
যে দেশে গাছের পাখী গায় হরিনাম।
নাম সঙ্কীর্ত্তনে নদী বহয় উজান ।।
শিষ্য পদধূলি মেখে ছাইছে পবন।
সে দেশে অবশ্য প্রভুর পাবে দরশন ।।"

আবার তাহারা কঙ্কের সন্ধানে চলিয়া গেল।

লীলার দেহত্যাগ

এদিকে বিপ্রপুর গ্রামে একটা জনরব শোনা গেল যে কঙ্ক জলে ডুবিয়া মরিয়াছে, এই জনশ্রুতির মূল কোথায় কেহ বলিতে পারিল না। কাহাকে এবিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে সে নিরুত্তর হয়, বলে আমি জানি না, অথচ না জিজ্ঞাসা করিয়া সময়ে সময়ে এই কথাটা শোনা যায়—

"বলা কওয়া করে লোকে এই মাত্র শুনি
শুধাইলে উত্তর নাই, না শুধালে শুনি।"

লীলার কানে একথা পৌঁছিল, কিন্তু কেহ ঠিক করিয়া কিছু বলিতে পারিল না। লীলার বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠে।

"কাণে কাণে কহে কেউ যেন কঙ্ক নাই।
কাহারে শুধালে বল কঙ্কের খবর পাই ।।"

একদিন লীলা স্বপ্নে দেখিল, দুর্য্যোগের মধ্যে উত্তাল ঢেউএর উপর কঙ্ক জলে ভাসিতেছে। লীলা সেদিন আর একবিন্দু জলও খাইল না।

কিছু দিন পরে মাধব ফিরিয়া আসিল। কিন্তু তাহার সঙ্গে কঙ্ক নাই। লীলার সঙ্গে মাধব দেখা করিল, আকুল প্রশ্নের উত্তরে মাধব আস্তে আস্তে বলিল, "বহিন গো, তোমার বুকের ব্যথা আমি বুঝি, গুরুদেবের সঙ্গেই বা আমি কি বলিয়া দেখা করিব! কত কষ্টে কত জায়গা অন্বেষণ করিয়াছি, কেহই কঙ্কের সন্ধান দিতে পারিল না।"

লীলা জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই বল তো তুমি কঙ্কের সম্বন্ধে কোন কথা শুনিয়াছ কি?"

দ্বিধাভাবে মাধব আস্তে আস্তে বলিল,—"প্রবল গুজব যে কঙ্ক গৌরাঙ্গের দর্শনাভিলাষী হইয়া চলিয়া গিয়াছিল, ঝড়ের মুখে তরণী ডুবিয়া যায়—জলে পড়িয়া কঙ্ক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।"

"জনরব এই মাত্র লোক মুখে শুনি।
জলেতে ডুবিয়া কঙ্ক ত্যজিয়াছে প্রাণী।
বিদায় লইয়া কঙ্ক আমাদের স্থানে।
সংসার ত্যজিয়া যায়—গৌর অন্বেষণে।।
আঁধারে পাগল নদী খর ধারে বয়।
অকস্মাৎ কাল মেঘ গগনে উদয়।।
ঝড় তুফানেতে ডুবে সাধুর তরণী।
জলেতে ডুবিয়া কঙ্ক ত্যজিছে পরাণী।।"

"প্রাণের অধিক,—সহোদরের অধিক,—ভাই আমার জলে ডুবিয়া মরিল; একবার মৃত্যুকালে তাহাকে দেখিলাম না! জীবন ভরিয়া কত দুঃখ পাইলে; কোন দুঃখে তোমার চিত্ত দমাইতে পারে নাই, অবশেষে মিথ্যা কলঙ্কে জর্জ্জরিত হইয়া পিতার স্নেহে বঞ্চিত হইয়া বিদেশে বেভূঞে তুমি সলিল-সমাধি লাভ করিলে, এমন সোণার ভাই হারা হইয়া আমি কোন সাধে বাঁচিব।"

সেই দিন হইতে লীলার আহার নিদ্রা সমস্তই গেল। হেমন্তের নীহারে যেরূপ পদ্মবন শুকাইয়া যায়, লীলার শরীরের যৌবন-সুষমা সেইরূপ লুপ্ত হইল। যে কেশ গঙ্গার তরঙ্গ ভঙ্গে পৃষ্ঠের উপর দুলিয়া দুলিয়া শোভা পাইত, তাহা ছিন্ন ভিন্ন পাটের আঁশের

মত হইয়া গেল। তাহার যে নধর কান্তি পদ্মলতার পেলব মত ছিল, তাহা ইক্ষুর পাতার মত বিশীর্ণ ও শুষ্ক হইল। এইভাবে লীলা একদিন চিরকালের জন্য পৃথিবী হইতে বিদায় হইল। গর্গের আশ্রমে তাহার সুমিষ্ট কলরব আর শোনা গেল না।

কঙ্কের আগমন

গর্গ এই শোক সহিতে পারিলেন না। তিনি কাঁদিয়া মৃতা কন্যার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "আমি কাহাকে লইয়া দেবতার আরতি করিব! কে আমার সাঁঝের ঘরে বাতি জ্বালাইবে? কে আমার পূজার ফুল তুলিবে? লীলা, দেখ এসে, তোমার জলের কলসী পড়িয়া রহিয়াছে, তোমার পোষা পাখীরা অনাহারে শুকাইয়া গিয়াছে।

"পড়িয়া রহিল আমার মনের যত আশা।
সর্ব্বস্ব ত্যজিয়া হৈল নদীর কূলে বাসা।।"

বিচিত্রের সহিত কঙ্কের দেখা হইয়াছিল, তাহার মৃত্যু হয় নাই, সে সতীর্থের মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া পাগলের মত আশ্রমে ছুটিয়া আসিল। কঙ্ক বাড়ী আসিয়া শুনিল, গর্গ তাঁহার প্রাণ-প্রতিম কন্যাকে শ্মশানে লইয়া গিয়াছেন। আশ্রম আলোক শূন্য—চতুর্দ্দিক অন্ধকার—সে সেখানকার বাতাসের তীব্র দাহন সহ্য করিতে পারিল না। দ্রুতগতি শ্মশানে যাইয়া গর্গের সহিত মিলিত হইল ঃ—

"বজ্রাঘাতে বৃক্ষ যেমন জ্বলিয়া উঠিল।
হাহাকার করি গর্গ কঙ্কেরে ধরিল।।
হায় কঙ্ক এতকাল কোথা তুমি ছিলে।
তোমারে ডাকিছে কন্যা মরণের কালে।।
কিসের সংসার ঘর কি হবে আমার।
মায়ের বিহনে আমার সব অন্ধকার।।
পঞ্চ বছরের শিশু মা গেল ছাড়ি।
এতকাল পালিলাম কোলে কাঁখে করি।।

বোধনে প্রতিমা আমার ডুবাইলাম জলে।
কি কব এ কর্ম্মফল আছিল কপালে।।
আর না ফিরিব ঘরে তোমরা সবে যাও।
শালগ্রাম শীলা যত সায়রে ভাসাও।।
আগুন জ্বালিয়া মোর পোড়াও গৃহ বাসা।
আজি হ'তে সাঙ্গ মোর সংসারের আশা।।
আকাশে দেবতা কাঁদে গর্গের কাঁদনে।
ভাটিয়ালে কাঁদে নদী না বহে উজানে।।
গর্গের কাঁদনে দেখ পাথর হয় জল।
বনের পাখী ডালে বসি ফেলে অশ্রুজল।।
অনলে তাপিত হৃদি করিতে শীতল।
কঙ্কের সহিত মুনি যায় নীলাচল।।
সঙ্গে চলে অনুগত শিষ্য পঞ্চজন।
সংসার তেয়াগি গেল জম্মের মতন।।"

আলোচনা

এই কঙ্ক ও লীলার পালাটি ঐতিহাসিক। লীলার ভালবাসা ও কঙ্কের জন্য তাহার ব্যাকুলতায় কবি-কল্পনার ছটা পড়িয়াছে। কিন্তু বাকী সকল অংশই ইতিহাস-তথ্যমূলক। কঙ্কের নিবাস ময়মনসিংহ জেলায় নেত্রকোণা সব-ডিভিসনের মধ্যে কেন্দুয়া থানার অন্তর্গত বিপ্রপুর গ্রামে। তাঁহার পিতা গুণরাজ ও মাতা বসুমতী অতি দরিদ্র ছিলেন। কঙ্ক শৈশবে বিপ্রবর্গ বা বিপ্রপুর গ্রামে পণ্ডিতপ্রবর গর্গের বাড়ীতে থাকিয়া লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। এই গ্রাম রাজেশ্বরী বা রাজী নদীর তীরে অবস্থিত। যেখানে পীর আসিয়া আস্তানা স্থাপন করিয়াছিলেন, সেখানে এখনও একখানি পাথর আছে, লোকে তাহা "পীরের পাথর" নামে অভিহিত করে। হিন্দু মুসলমান সকলেই সেই স্থানটিকে তীর্থের মত শ্রদ্ধা করে।

কঙ্ক যেমন রূপবান তেমনই গুণশালী ছিলেন। তাঁহার কবিত্ব প্রতিভাও শীঘ্র শীঘ্র পল্লী সমাজে প্রচার হইয়া পড়িয়াছিল। তৎকৃত মলয়ার বারমাসী তাঁহার কিশোর বয়সের রচনা। সেই ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ বৎসরের বালক এই কাব্যখানি এমন সুললিত ছন্দে ও অপূর্ব্ব কাব্য কথায় রচনা করিয়াছিলেন যে উহা পল্লীর বালক বৃদ্ধের সকলেরই কণ্ঠে কণ্ঠে আবৃত্তি হইত। সেই বয়সে তিনি গর্গের বাড়ীতে থাকিয়া সুরভি ও পাটলি নামক গাভীদ্বয়কে গোচারণের মাঠে চরাইতেন এবং বাঁশী বাজাইয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতেন।

সেই বয়সেই—

"কঙ্ক আর রাখাল নহে, কবি-কঙ্ক সবে কহে,"

সকলে তাঁহাকে কবি কঙ্ক বলিয়া ডাকিত। পীরের আদেশে কঙ্ক আর-একখানি পুস্তক রচনা করেন, তাহার নাম "সত্যপীরের পাঁচালী"—এই পুস্তকের অপর নাম বিদ্যাসুন্দর। বঙ্গদেশে কৃষ্ণ-রামের বিদ্যাসুন্দর, রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর, ভারত চন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর ও প্রাণারাম চক্রবর্ত্তীর বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি পাঁচ ছয়খানি বিদ্যাসুন্দর আছে কিন্তু কবিকঙ্কের বিদ্যাসুন্দরের মত কোনখানিই এত প্রাচীন নহে। কঙ্ক চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন; সুতরাং প্রায় ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার বিদ্যাসুন্দর রচিত হয়। এই কাব্যের আর একটি বৈশিষ্ট এই যে ইহার উদ্দিষ্ট দেবতা কালিকা দেবী বা অন্নপূর্ণা নহেন। পীরের আদেশে এই পুস্তক রচিত হয়—এবং ইহার উদ্দিষ্ট দেবতা 'সত্যপীর' হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই পূজ্য।

পৃথিবীতে যতপ্রকার দুঃখ আছে, শৈশবে কঙ্ক তাহার সমস্তই সহিয়া ছিলেন। বিনা দোষে সামাজিক গ্লানি ও কলঙ্কের ভাজন হইয়া তাঁহাকে কতই না লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়। অবশেষে শত্রু ও ব্রাহ্মণ গোঁড়াদের ষড়যন্ত্রে পড়িয়া তিনি গৃহ-হারা ও সুখ-শান্তিহারা হইয়া বনে বনে ও নানা পল্লীতে পর্য্যটন করিয়াছিলেন। এই দুঃখের মধ্যে পড়িয়া তাঁহার মন পরদুঃখকাতর, দয়ার্দ্র ও উদার হইয়াছিল। তিনি গর্গকে যেরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন মুসলমান পীরকেও তদ্রূপ ভক্তির সহিত দেখিতেন। আহারে বিহারে তাঁহার আদৌ গোঁড়ামি ছিল না। যে ব্যক্তি জন্মিয়াই চণ্ডালের অন্নে পালিত, তাহার আবার বৃথা আচার নিষ্ঠার বাড়াবাড়ি থাকিবে কিরূপে! তিনি চণ্ডাল-জননীকে যেভাবে বন্দনা করিয়াছেন এভাবে কোন ব্রাহ্মণ-কবি হীন জাতিয়া রমণীকে শ্রদ্ধা দেখাইতে পারিতেন না। সংসারের নানা

বিরুদ্ধ অবস্থায় নিপতিত হইয়া তিনি যে উদারতা ও ভ্রাতৃভাব শিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার চরিত্র সাধারণ মানব-সমাজের বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিল। তাঁহার জীবন-আখ্যায়িকা, রঘুসুত, দামোদর, নয়ানচাঁদ ঘোষ ও শ্রীনাথ বানিয়া এই চারিজন কবি লিখিয়াছেন। তাঁহারা সত্যের ক্ষুরধার সীমার মধ্যে তাঁহার কাহিনী যথাসম্ভব সতর্কতার সহিত আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, কেবল লীলার বিরহ ও প্রেম-কথার মধ্যে তাঁহারা কিছু কাব্যলীলা দেখাইয়াছেন, কিন্তু সাংসারিক জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটিই তাঁহারা বাস্তব জীবন হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহারা হৃদয় দিয়া, মনের দরদ দিয়া কবির জীবন-কাহিনী এমনই সহানুভূতির সঙ্গে লিখিয়াছেন যে মনে হয়—তাঁহাদের নির্ম্মল ও আন্তরিকতাপূর্ণ হৃদয়ে কঙ্কের জীবন যথাযথ ভাবেই প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। গর্গের চরিত্র অতি বিশাল—পাণ্ডিত্যে, আদর্শের উচ্চতায়, জপ তপের প্রভায় ও সহানুভূতিতে তাহা মৈনাক বা গৌরীশৃঙ্গের ন্যায় আমাদের চক্ষে নভস্পর্শী হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু তরুণ বয়সে কঙ্ক যে বুদ্ধিমত্তা, ধৈর্য্য ও সংযমের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব। যে ধর্ম্মপিতা তাঁহাকে বিনাদোষে বিষ মিশ্রিত অন্ন খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তাঁহার উপর তাঁর কি উদার ক্ষমাশীলতা! কঙ্ক গর্গের চরিত্রের পরিচয় যেমন পাইয়াছিলেন, লীলাও তাহা পায় নাই। কঙ্ক বলিয়াছিলেন—"পিতা অতি মহান ব্যক্তি, তিনি শত্রুদের ষড়যন্ত্রে পড়িয়া মুহূর্ত্তের জন্য জ্ঞান হারাইয়াছেন, কিন্তু তিনি অতি ধর্ম্মপ্রাণ এবং বুদ্ধিমান—তাঁহার এই মোহাচ্ছন্ন ভাব কিছুতেই বেশীকাল স্থায়ী হইতে পারে না, তুমি ইঁহার প্রতি শ্রদ্ধা হারাইও না, তিনি তোমার ও আমার উভয়ের পূজ্য, যদি মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া তিনি কোনরূপ অত্যাচার করেন, তবে সহিষ্ণু হইয়া তাহা সহ্য করিয়া লইও।" তরুণ বয়সে কঙ্ক পরিণত বুদ্ধি ও সংযম দেখাইতে পারিয়াছিলেন! এই জন্য বলিতেছি, তিনি গর্গের মত প্রবীন বয়স্ক না হইয়াও তাঁহার ধর্ম্ম-পিতার অপেক্ষাও পরিণত বিচারশক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

বিদায় কালে তাঁহার উক্তি কি মর্ম্মস্পর্শী,—গৌরাঙ্গকে স্বপ্ন দেখার কথাটা কবি চারটি ছত্রের মধ্যে কি আন্তরিকতা ও ভক্তি দিয়া দেখাইয়াছেন। দুটি ছত্রে অপরূপ রূপলাবণ্য ও স্বর্গীয় জ্যোতি লইয়া গৌরাঙ্গ যেন ফুটিয়া উঠিয়াছেন।

লীলার চরিত্র অনন্ত মধুর। লীলা ও কঙ্ক শৈশবের সঙ্গী, উভয়ে মাতৃহারা ও পরস্পরের সান্ত্বনা-দায়ী ও অনন্য-শরণ—এ যেন একটি বন্তের দুইটি ফুল। লীলার হৃদয় সুকোমল

ভাবে পূর্ণ, কঙ্ক তাহার সহোদর না হইয়াও সহোদর প্রতিম। লীলা তিলমাত্র কঙ্কের সঙ্গ বিচ্যুত হইলে ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে। তিনি গোষ্ঠে যাইলে সন্ধ্যার প্রাক্কালে সে পথে যাইয়া দাঁড়াইয়া থাকে ও তাঁহার প্রতীক্ষা করে। কঙ্ক বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে গাভী ও তাহার বৎসটি লইয়া যখন বাড়ী ফিরিতে থাকেন, সেই বাঁশীর সুর শোনা মাত্র আনন্দে লীলা চঞ্চল হইয়া ওঠে।

কিন্তু যখন সে দেখিল, পল্লীবাসীরা তাহাকে ও কঙ্ককে লইয়া মিথ্যা অপরাধের চেষ্টা করিয়া ষড়যন্ত্র করিতেছে তখন তাহার কঙ্কের প্রতি অনুরাগ আরও বাড়িয়া গেল। সে জানিত, কঙ্ক ও সে নন্দন বনের দুইটি ফুলের কুঁড়ির ন্যায় নির্ম্মল, পরস্পরের প্রতি তাহাদের অনুরাগ অকৃত্রিম, তাহা সুচির সাহচর্য্য ও সহানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত—তাহা দেব মন্দিরের পূজার ফুলের ন্যায় ভগবানে সমর্পিত, অথচ তাহাই লইয়া কত বিশ্রী আলোচনা চলিতেছে, এমন কি তাহার ঋষিতুল্য জনকও জন-অপবাদের জালে পড়িয়া কঙ্ককে বিষ খাওয়াইয়া মারিতে চেষ্টা করিতেছেন—তখন তাহার নিজের এই নিরাশ্রয় ও অসহ্য দুর্দ্দশায় ও কঙ্কের জীবনের আশঙ্কায়—সে একেবারে উন্মত্তা হইয়া গেল। এই সৌভ্রাত্র, কবিদের হস্তে পড়িয়া কতকটা প্রেমের ছন্দ ও ভাষা অবলম্বন করিয়াছে, তাহা কোন দোষের না হইলেও সেই অনুরাগের কিছুটা বাড়াবাড়ি আছে, কবিরা তাহাতে পূর্ব্বরাগের ছন্দ দিয়াছেন। বাঙ্গালী কবি বসন্তকালে কোকিলের কুহু ও বর্ষায় কেতকী কদম্বের সুঘ্রাণ এবং গ্রীষ্মে মলয় সমীরের সুখ স্পর্শ পাইলে তাহার মাত্রা ঠিক রাখা একটু কঠিন হইয়া পড়ে। এই জন্য লীলার বারমাসী ও বিরহে কতকটা বৈষ্ণব পদের তরল মোহ আসিয়া পড়িয়াছে কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একটু অতিরিক্ত মাত্রায় লালিত্য ও মাধুর্য্যের পরশ থাকিলেও তাহা দোষের হয় নাই। কঙ্ক ও লীলা আদ্যন্ত আমাদের চক্ষে দেব-আঙ্গিনার দুইটি ক্রীড়াশীল পুতুল। দুঃখের বিষয় তাহাদের খেলা শেষ হইবার পূর্ব্বেই নিষ্ঠুর দৈব সে খেলা ভাঙ্গিয়া দিল। লীলা সে আঘাত সহ্য করিতে পারিল না, তদপেক্ষা সংযত ও কঠিন স্নায়ু-বল সম্পন্ন কঙ্ক তাঁহার সংসারের সমস্ত আশা বিসর্জ্জন দিয়া তীর্থবাসী হইলেন।

এই চারিটি কবি আখ্যানটিকে যে ভাবে লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তাঁহারা একই আসরে গাহিতেন এবং একে অন্যের দোহার করিতেন। তাঁহাদের সুর এক, ছন্দ এক,

এমনকি কবিত্বও এক ছন্দে ঢালা। সে কবিত্বের শেষ নাই—বর্ষা, শরৎ, গ্রীষ্ম, বসন্ত প্রভৃতি ঋতু ভেদে কবিদের চক্ষে প্রকৃতি যেরূপ ধরা দেন, তাহাতে মনে হয় যে তাঁহাদের অঙ্কিত চিত্রগুলি এক হস্তেরই শিল-মোহর মারা; একই প্রকারের দরদ ও অন্তরঙ্গতার সহিত লেখা।

কঙ্ক ও লীলার লেখক দামোদর, রঘুসুত, নয়ান চাঁদ ঘোষ ও শ্রীনাথ বানিয়া—ইঁহাদের মধ্যে রঘুসুত ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। ইঁহারা জাতিতে ছিলেন পাটুণী। বহু পুরুষ যাবৎ ইহারা পালাগান গাহিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেন, এজন্য ইঁহাদের উপাধি হইয়াছিল, "গায়েন"। রঘুসুতের নিম্নতম বংশধর শিবু গায়েন এই পালা গানটি খুব চমৎকার ভাবে গাহিতে পারিতেন, অথচ বন্দনায় তিনি জানাইয়াছেন যে তিনি একবারে নিরক্ষর ছিলেন। শিবু গায়েন ৩০।৩৫ বৎসর হইল মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ময়মনসিংহ গৌরপুরের জমিদারগণ ইঁহার অপূর্ব্ব গান গাহিবার শক্তির পুরস্কার স্বরূপ ২০।২৫ বিঘা জমি ইঁহাকে দান করিয়াছিলেন। শিবু গায়েনের বাড়ী ছিল নেত্রকোণার অন্তর্গত আত্তাজিয়া গ্রামে।

শ্রীনাথ বানিয়ার নাম আরও কয়েকটি পালা গানের ভূমিকায় আমরা পাইয়াছি। পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকায় প্রকাশিত 'শান্তি' নামক ক্ষুদ্র গানটির ভণিতায় শ্রীনাথ বানিয়ার নাম পাওয়া যায়।

এই সকল কবি একবারে স্বভাবের শিশু। কঙ্কের বিরহে যখন লীলা বাগানে বাগানে ঘুরিয়া ভ্রমরের নিকট কঙ্কের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছে, তখন কবি লিখিয়াছেন, যে ভ্রমরটি আজ জিজ্ঞাসিত হইয়া চলিয়া গেল, কাল আর সে বাগানে আসিল না, সুতরাং সংবাদ দিবে কে?

> "নিত্য আসে নব পাখী নূতন ভ্রমর।
> কাঁদিয়া শুধালে কেহ না দেয় উত্তর।।"

বর্ষাকালের সেই নবনীল জলদকান্তি, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের চমক। রঘুসুত কবি এই ষড়ঋতুর যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহাতে মনে হয় যেন প্রকৃতির সম্মুখে বসিয়া তিনি দৃশ্যের পর দৃশ্য নকল করিয়া গিয়াছেন।

পৃথিবীর জ্বালাময় বুকে শীতল জল ঢালিবার জন্য বর্ষা-রাণী আসিতেছেন—কবি গাহিতেছেন—

"হাতেতে সোনার ঝারি বর্ষা নেমে আসে।"

এই সোনার ঝারি বিদ্যুৎ;স্বর্ণখচিত ঝারির ন্যায় সবিদ্যুৎ মেঘ—জলবিন্দু ঢালিতেছেন, বর্ষারাণীর এই রূপ পল্লীকবিরা যাহা দেখেন, আমরা সহরবাসীরা সে রূপ দেখিতে পাই না।

বর্ষার আর একটি বর্ণনা কবি রঘুসুত যাহা দিয়াছেন, তাহা নিরুপমঃ—

"শ্রাবণ আসিল মাথে জলের পশরা।
পাথর ভাসায়ে বহে শাঙনের ধারা।।
জলেতে কমল ফোটে আর নদী-কূল।
গন্ধে আমোদিত করে ফোটে কেয়া ফুল।।
শাওনিয়া ধারা শিরে বজ্র ধরি মাথে।
'বউ কথা কও' বলি কাঁদি ফিরে পথে।।"

কি দুর্য্যোগ, শ্রাবণের বৃষ্টিতে সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত, মাথার উপর বজ্রের ভীষণ গর্জ্জন, কখন মাথায় পড়িবে—তাহার ঠিকানা নাই, তবু একটা ক্ষুদ্র পাখী বিপদ গ্রাহ্য না করিয়া বধুর মান ভাঙ্গিবার জন্য পথে পথে "বউ কথা কও" বলিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছে!

কবি কঙ্ক "সত্যপীরের পাঁচালীতে" যে আত্মপরিচয় দিয়া আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা পড়িলে পাঠক বুঝিবেন, রঘুসুত প্রভৃতি কবিরা তাঁহার জীবন-আখ্যায়িকা যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই বিবৃতির অনুগত। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি শুধু লীলার ভাবোচ্ছ্বাস বর্ণনায় পূর্ব্বোক্ত কবিরা তাঁহাদের কবিত্বশক্তির পরিচয় দেওয়ার ব্যপদেশে এদেশের প্রথা অনুযায়ী বারমাসীর ভঙ্গীটি অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু অন্য সমস্ত স্থলেই ইতিহাসের পিছন পিছন গিয়াছেন। কবি কঙ্কের প্রদত্ত আত্মপরিচয়টি এইরূপ ঃ—

পিতা বন্দি গুণরাজ মাতা বসুমতী।
যার ঘরে জন্ম নিলাম আমি অল্প মতি।।

শিশুকালে বাপ মইল মা গেল ছাড়ি।
পালিল চণ্ডাল পিতা মোরে যত্ন করি।।
জ্ঞানমানে খাই অন্ন চণ্ডালের ঘরে।
চণ্ডালিনী মাতা মোরে পালিলা আদরে।।
গঙ্গা র সমান তার পবিত্র অন্তর।
সেও ত রাখিলা মোর নাম কঙ্কধর।।
জনম অবধি নাহি দেখি বাপ মায়।
শিশু থুয়ে মোরে তারা স্বর্গপুরে যায়।।
মুরারি চণ্ডাল পিতা পালে অন্ন দিয়া।
পালিলা কৌশল্যা মাতা স্তন্য দুগ্ধ দিয়া।।
মুরারি আমার পিতা ভক্তির ভাজন।
বারে বারে বন্দি গাই তাঁহার চরণ।।
গর্গ পণ্ডিতে বন্দি পরম গেয়ানী।
যাঁর আশ্রমে থাকি ধেনু চরাইতাম আমি।।
পুনঃ পুনঃ বন্দি আমি গর্গের চরণ।
যাঁর সম জ্ঞানী নাই—এ তিন ভুবন।।
বেদ-পুরাণ-সার কণ্ঠে যাঁর গাঁথা।
সাধনার ঘরে বাঁধা সরস্বতী মাতা।।
বেদ-বিধি শাস্ত্রে যাঁর ক্ষমতা অপার।
আর বার বন্দি গাই চরণ তাঁহার।।
শ্মশানের বন্ধু মোর দুঃসময় পাইয়া।
জীবন করিলা দান পদে স্থান দিয়া।।
দুই দিন নাহি খাই অন্ন আর পানি।
হাতে ধরি আশ্রমে লইলা মোরে মুনি।।
ক্ষীর সর দিলা মোরে গায়ত্রী জননী।

মরিবার কালে মোর বাঁচাইলা প্রাণী।।
কাঁদিয়া কহিছে কঙ্ক সবার চরণে।
শোধিতে মায়ের ঋণ না পারি জীবনে।।
নদী মধ্যে বন্দি গাই রাজরাজেশ্বরী।
তিয়াস লাগিলে যার পান করি বারি।।
তাহার পারেতে বইসা সুন্দর গেরাম।
জন্মভূমি বন্দি গাই নাম বিপ্রপুর গ্রাম।।

এই বন্দনায় কোন দেব-দেবীর নাম নাই, কোন তীর্থস্থানের উদ্দেশ্যে প্রণাম নাই, নির্ভীক সত্যবাদী কবি তাঁহার চণ্ডাল জননীকে "গঙ্গার সমান যার পবিত্র অন্তর" বলিয়া করযোড়ে প্রণাম করিয়াছেন। কঙ্ক ভিন্ন আর কোন ব্রাহ্মণ তনয় কি এইভাবে চণ্ডালিনীকে বন্দনা করিতে পারিত? তাঁহার স্বগ্রাম এবং গ্রামের প্রান্তবাহী রাজরাজেশ্বরী নদী,—তাঁহার চক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তীর্থ। এই প্রত্যক্ষবাদী, সত্যভাষী কবি অপর কোন তীর্থের নাম করেন নাই। রাজী নদী ও বিপ্রপুর গ্রাম তাঁহার চক্ষে প্রধান তীর্থ, এই দুই তীর্থের মহিমা তিনি নিজে উপলব্ধি করিয়া তাহাদের স্তুতি গান করিয়া বন্দনাটি পরিসমাপ্ত করিয়াছেন।

শ্যাম রায়

প্রেম নিবেদন, উত্তর-প্রত্যুত্তর

সানবাঁধা ঘাটে ডোমের ষোড়শী কন্যা রোজ কলসী ভরিয়া জল আনিতে যায়, তাহার বক্রান্ত সুদীর্ঘ কেশ ও লাবণ্যময় গঠন ও অপ্সরার মত সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া রাজ্যের লোক পাগল হইয়া যায়।

সে দেশের তরুণ বয়স্ক রাজকুমার শ্যাম রায় তাহার রংমহাল হইতে প্রত্যহ এই সুন্দরীকে দেখিতে পায়—দেখিয়া চক্ষুর তৃপ্তি হয় না, সে রোজ এই নারীর রূপমাধুরী পান করে। অবশেষে সে ডোম-নারীকে সংবাদ পাঠাইল, "তুমি কি আমাকে ভালবাসিয়া আত্ম সমর্পণ করিবে? তাহা হইলে সমাজ-বিধি যাহাই থাকুক না কেন, আমি তোমায় বিবাহ করিয়া তোমার মাথার কোঁকড়ান কোঁকড়ান চূর্ণকুন্তল সোনার ঝুরি দিয়া বাঁধিয়া দিতাম। হাতীর দাঁতের শীতলপাটী সোনার পালঙ্কের উপর পাতিয়া তোমার সুখ-শয্যা তৈরী করিয়া দিতাম, ঐ পাটের খুঞা ফেলিয়া দিয়া দিব্য নীলাম্বরী শাড়ী তোমায় পরিতে দিতাম এবং কাঁচপোকার মালার পরিবর্ত্তে গজমুক্তার হারে তোমার কণ্ঠ পরিশোভিত করিতাম। তোমার হাতে বাজুবন্ধ এবং গলায় সোনার মাদুলি দিয়া তোমাকে একখানি প্রতিমার মত সাজাইতাম এবং নিজ হাতে তোমার ঐ দুটি পাগল-করা চোখে কাজল পরাইয়া দিতাম ও সারারাত্রি ঘিয়ের বাতি জ্বালাইয়া তোমার চন্দ্র-মুখখানি দেখিতাম। তুমি যদি আমাকে ভালবাসিতে, তবে আমার সুখের অবধি থাকিত না।"

দূতির নিকট ডোমের মেয়ে বলিয়া পাঠাইল, "কি করিয়া তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা হইবে! দিনরাত শাশুড়ী আমার পাহারা দিতেছেন। সন্ধ্যাবেলা ঘরে আলো থাকে না, পশরা লইয়া স্বামী কখন ঘরে ফিরেন তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই, ভাদ্র মাসে বাড়ীর অতি নিকটে বর্ষার গাঙ্গের জল থৈ থৈ করিতেছে। আমার অদৃষ্টে সুখের নদীতে চড়া পড়িয়াছে। আমি কোন্ ছুতোয় কলসী লইয়া জল আনিতে যাইব? এখন তো স্নানের সময় নয় যে, ভরা কলসীর জল ফেলিয়া পুনরায় জল আনিতে যাইয়া বঁধুর সঙ্গে মিলিতে পারিব।

"দূতি, আমি বেণে নই যে, পশরা মাথায় করিয়া সেই ছুতোয় বন্ধুকে একবার দেখিয়া আসিব, আমি রাখাল নই যে, গোষ্ঠে যাইবার ছলে রাজ বাড়ীর দুয়ারের পথ দিয়া যাইব। আমি মালীর ঘরের মালিনী নই যে, মালা লইয়া বঁধুর কাছে বিক্রয় করিতে যাইব, ধুবনী নই যে কাপড়ের বস্তা লইয়া রাজবাড়ীতে যাইব। তুমি আমার দুটি চোখের জল দেখিয়া যাও, আমার বুকের ভিতর কত দুঃখ জমিয়া আছে, একবারটি তাঁহাকে জানাইও।

"দূতি, আমি যদি শুক শারী হইতাম, তবে শূন্যে উড়িয়া যাইয়া বঁধুকে দেখিয়া আসিতাম। আমি জোড়ের পায়রা নই যে, খাদ্য কুড়াইবার ছলে তাঁহার কাছে যাইব। আমি যদি ডালের পুষ্প হইতাম, তবে নিজেকে মালায় গাঁথিয়া দিতাম, তুমি সেই মালা লইয়া যাইয়া বঁধুর হাতে দিতে। আমি ছোট সুগন্ধি ফুল নই যে, ফুরফুরে হাওয়ায় উড়িয়া যাইয়া বঁধুর হাতে পড়িব। আমি ডাব কি ডালিম নই যে তাঁহার পাত্র ভরিয়া পিয়াসা মিটাইব। পলান্ন বা পরমান্ন নই যে, বাটী ভরিয়া তাঁহাকে পরিবেশন করিব। আমার যৌবন, গাঙ্গের পানি নয় যে বঁধুর চরণ যুগল ধুইবার জন্য লোটা ভরিয়া লইয়া যাইব। আমি বনের কোকিল নই, পুষ্পের ভ্রমরী নই যে, মধু আনিবার ছলে উড়িয়া তাঁহার কাছে যাইব। ধাই দাসী নই যে তাঁহার পাদপদ্ম ধোয়াইব।"

"নয়ত গাঙ্গের পানি দূতি এ মোর যৌবন।
লোটায় ভরিয়া দিতাম ধোয়াতে চরণ।।
বনের কুইলা হইতাম যদি পুষ্পের ভ্রমরী।
মধু না আনিবার ছলে যাইতাম উড়ি।"

ডোমকন্যা আরও বলিল,—এই দুঃখ সহিতে পারি না।

"এমতি নিদানে কেন না হয় মরণ।"

কবি নিতাই চাঁদ বলিতেছেন, "নারী-জীবনের যৌবনকাল একটা রহস্য,—এই আশ্চর্য্য ভুবনবিজয়ী জিনিষ বিধাতা কোন্ উপাদানে গড়িয়াছেন?"

কবি নিতাই চাঁদে বলে—"ভুবন ছিনিয়া।
যৌবন গড়িল বিধি কোন্ চিজ্ দিয়া।।"

ডোম নারী দূতিকে বিদায়ের কালে বলিল—

"বাঁশের বাঁশী হইতাম দূতি লো পাইতাম সুখ।
বাজনের ছলে দিতাম বঁধুর মুখে মুখ।।"

"আমার সাঁজের বাতি নিবু নিবু। তাহা তৈল দিয়া জ্বালাইতে হইবে। আজ ঘরে যাও—তাঁহার সঙ্গে আজ দেখা হইবে না—আমার এই নিবেদন তাঁহাকে জানাইও।"

দূতি ফিরিয়া যাইয়া পুনরায় আসিয়া বলিল—"তুমি নিবিষ্ট হইয়া ঘরের কাজ করিতেছ, আমায় আবার শ্যাম রায় পাঠাইয়া দিলেন। তিনি গাঙ্গের ঘাটে তোমার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন, দয়া করিয়া একবারটি যদি আসিতে!"

নদীতীরের দৃশ্য

ডোমের মেয়ে বলিতেছে,—"কুমার পথ ছাড়, বেলা যায়। আমি ডোমের মেয়ে—আমার গায় হাত দিও না। তুমি অতি বড়, আমি অতি ছোট। আমার সঙ্গে ভাব করিলে তোমারই জাতি যাইবে। তুমি বাগানের সেরা ফুল—আমি কাঁটার মত পথ আগলাইয়া আছি। আমার সঙ্গে তোমার মিলন হইলে সকলে তোমাকে খোঁটা দিবে। তুমি বঁধু, রাজার ছেলে—আমি সামান্যা ডোম নারী। আমার সঙ্গে ভাব করিয়া সুখ পাইবে না। তুমি সাগর ও সমুদ্রের যাত্রী,—এই শুকনো ডাঙ্গায় নৌকা বাহিয়া কেন বিড়ম্বিত হইতে চাও—

"রাজার ছাওয়াল তুমি পুন্নমাসী চাঁদ।
আসমান ছাড়িয়া কেন জমিনে বিছান।।"

"তোমার বাড়ীতে খাট-পালঙ্ক আছে, কঠিন মাটির শয্যায় তোমার কষ্ট হইবে। এই অসময়ে নদীর ঘাটে আসিয়া তুমি কেন বিপদ ঘটাইতেছ? তোমাকেই বা কি বলিব। আমার দুটি চক্ষু ত আমার শত্রু—

"কোথা থেকে দুষমন চক্ষু উঁকি মারি দেখে।"

"বঁধু, তুমি আম খাইবে বলিয়া আমড়া গাছের তলায় আসিয়াছ। ময়ুর হইয়া তুমি কদাকার ভেউরা পাখীর পেখম পরিতে চাহিতেছ। তুমি খঞ্জন—চড়ুই পাখীর কাছে নাচ শিখিতে আসিয়াছ! মণি মুক্তা ফেলিয়া তুমি কড়ির থলি হাতড়াইতেছ। মহামূল্য হার ফেলিয়া গলায় দড়ি বাঁধিতেছ। সমুদ্র ছাড়িয়া কুয়ার জল চাহিতেছ এবং গজমতির হার ফেলিয়া হাড়ের মালা বাছিয়া লইতেছ, আবির কুঙ্কুম ছাড়িয়া গায়ে ধুলি মাখিতেছ, চন্দন ফেলিয়া মাথায় ছাই দিয়া তিলক রচনা করিতেছ।"

"আমড়া খাইলে বুঝিবে কি বঁধু আমের সুস্বাদ।
ঘোলে কি পাইবে বন্ধু দধির আস্বাদ।।
ময়ুরা হইয়া কেন ভেউরের পেখম।
খঞ্জনা হইয়া কেন চড়ুই নাচন।।
মণি মুক্তা থুইয়া কেন বাছ্যা তুলছ কড়ি।
হার রাখিয়া কেন বঁধু গলায় বাঁধছ দড়ি।।
হীন জাতি ডোমনী আমি, বঁধুরে নাই সে বুঝ দায়।
সায়র থুইয়া কুয়ার পানি কেন গাব রে খায়।।
গজমতি থুইয়া রে বঁধু পর হাড়ের মালা।
আবির কুঙ্কুম থুইয়া বঁধু অঙ্গে মাখ ধুলা।।
বিধি বিড়ম্বিল তোমা করতে পার খাই।
চন্দন থুইয়া বঁধু কেন অঙ্গে মাখ ছাই।।
তুমি তো রাজার বেটা বঁধুরে আমি তো ডোমনী।
পাথর নিংড়াইয়া বঁধু পাইতে চাও কি পানি।।"

"রাজার ছাওয়াল তুমি পুন্নমাসী চাঁদ
আসমান ছাড়িয়া কেন জমিনে বিছান।"

(পৃষ্ঠা ৩৭১)

রাজকুমার শ্যাম রায়ের প্রেম, লৌকিক আচার ও সমাজ বিধি এ সকলের উপরে, তিনি বলিতেছেনঃ—"হউক কলঙ্ক— সেই কালি আমি কাজল করিয়া চোখে পরিব। শত্রুরা যদি নিন্দা করে, তাহাতে আমি তোমাকে ছাড়িতে পারিব না। প্রেম তো ধূলি মাটি নয় যে, লোকের কথায় আমি ছাড়িয়া দিব, জাতি অতি অকিঞ্চিৎকর; প্রেমের মূল্যের সঙ্গে তাহার তুলনা হয় না। এই রাজ্য ছাড়িয়া আমি আর এক রাজ্যের রাজা হইব। জঙ্গলে বৃক্ষতলে আমি বাড়ী করিব, গজমতি ফেলিয়া দিয়া হাড়ের মালা পরিব, সুগন্ধি চন্দন ফেলিয়া আমি গায় ছাই মাখিব এবং দধি দুগ্ধ ছাড়িয়া বনের ফল খাইয়া তৃপ্ত হইব। তোমায় যদি পাই তবে এসকল কষ্ট আমার সুখের কারণ হইবে—জীবন সার্থক হইবে, উত্তম পরিচ্ছদের বদলে বাকল পরিয়া সুখী হইব—

"সায়রের লোনা পানি মুখ হৈল তিতা।
তা হইতে কুয়ার পানি শতগুণে মিঠা।।
থাকুক কলঙ্ক লো কন্যা লোক অপযশ।
পাথর নিংড়াইয়া দেখি পাই কিনা রস।।"

ডোম কন্যা শেষে বলিল, "সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে, আমার কুঁড়ে ঘরে এখনও সাঁজের বাতি জ্বালা হয় নাই, কাঁখের কলসী কাঁখে রহিয়াছে এখনও তাহাতে জল ভরা হয় নাই। আমার শাশুড়ীর বড় কোপন স্বভাব, গালি মন্দ দিবেন। আজ তুমি চলিয়া যাও। ঐ দেখ, সন্ধ্যার আকাশে পাখীগুলি অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে, আমি একা আঁধার পথে কি করিয়া যাইব। কাল আমার স্বামী বাঁশ কাটিবার জন্য যাইবে।"

কুমার বলিল, "আমি জলের ঘাটে তোমার কলসী ভরিয়া দিব!"

"কিন্তু তুমি পরপুরুষ, আমি একলা নারী, ইহা কেমন করিয়া হয়!"

রাজকুমার—"আমি তোমাকে তোমার কুঁড়েতে পৌঁছাইয়া দিব।"

"তা হ'লে তোমার কলঙ্ক পাড়াময় প্রচারিত হইবে।"

রাজকুমার—"চল তাহা হইলে আমরা দুজনে পলাইয়া অন্য দেশে যাই।"

"তাহা হইলে কলঙ্কের অবধি থাকিবে না, এবং আমিই বা কদাকার জংলী লতা হইয়া কোন্ সাহসে চন্দন-তরুকে বেড়িয়া ধরিব। আজকার দিন ক্ষান্ত দাও। কাল আমার স্বামী বাড়ীতে থাকিবে না। শাশুড়ীর অপ্রত্যক্ষে খিড়কীর দুয়ার খোলা রাখিবঃ—

"আজকার রাত্রি বঁধু চিত্তে ক্ষমা দিও।
কালিকা নিশিতে বঁধু আমার বাড়ী যাইও।।
ভাঙ্গা ঘরে তোমার লাগি থাকিব একেলা।
শাশুড়ির অপরখে রাখব পাছের দুয়ার খোলা।।"

মিলন

শ্যাম রায় এবং ডোম নারীর মিলন হইল। কিন্তু রমণী গৃহ-ত্যাগিণী হইবে, অনেক জ্বালা-যন্ত্রণা পাইবে—তাহাতে তাহার অনুতাপ নাই। সে বলিতেছেঃ—

"যে দিন খাইয়াছি বঁধু পীরিতি গাছের ফল।
কলঙ্ক মরণ দূর—জীবন সফল।।"

"এই অপার আনন্দে, সুখ-দুঃখ, কলঙ্ক ও মৃত্যু—দূর হইয়াছে। আমার কোন ভয় নাই—জীবন সার্থক হইয়াছে। আমার খাট পালঙ্ক নাই। সামান্য ছেঁড়া মাদুরে কেমন করিয়া শুইবে"—

"এই না ভাবে শুইয়া বঁধু পাও যদি ক্লেশ।
মেজেতে বিছায়ে দিব চাঁচর চিকুর কেশ।।
কেশের বিছানা যদি সুখ নাহি পাও।
অবলার বুকে শুইয়া নিরালা ঘুমাও।।
চক্ষের জলে ধুইয়া রে পা বঁধু কেশেতে মুছাব।
শিথানের সিন্দুর দিয়া চরণ রাঙ্গাইব।।"

কন্যা আবার বলিল, "আলো নিবাইয়া ফেলিয়াছি।—আঁধারে তোমার চাঁদমুখ দেখিতে পাইতেছি না।"

"হাত বুলাইয়া বঁধু তোমার মুখ দেখি।"
"একটু খানি রও রে বন্ধু একটু খানি রও।

মুখেতে রাখিয়া মুখ মনের কথা কও।।
আমি যে অবলা নারী আর বা কারে দোষী।
বুকেতে আঁকিয়া রাখি তোমার মুখের হাসি।।
নিশি বুঝি যায়রে বঁধু ঘুমেতে কাতর।
গাছেতে কুইল ডাকে পুষ্পেতে ভ্রমর।।
সোয়ামী গেছে নল কাটিতে দূরের হাওরে।
কাল নিশি আইস বঁধু আমার বাসরে।।"

স্বগণের শত অনুরোধ উপরোধ

মাতা ও ভগিনী অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু শ্যাম রায়ের সেই এক গোঁ; "আমাকে ঐ ডোমের মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দাও।"

ভগ্নিরা বলিলেন, "রূপে গুণে কুলে শীলে সব বিষয়ে এক সেরা কন্যার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিব। ডোম কন্যার সঙ্গে বিয়ে! ছিঃ! একথা মুখে আনিও না—

"জাতি নাশ, ধরম নাশ, ভাইরে এ ত বড় দায়।
হীন ডোমের নারী ছুঁইলে জাতি যায়।।
পথ থুইয়া কেন ভাইরে গর্ত্তে দেও পারা।
জাতি সাপ হৈয়া কেন হৈতে যাও ঢোরা।।
পদ্ম ফুল হৈয়া কেন গোবরেতে আশা।
শুক পাখী হৈয়া কেন মুত্রে কর বাসা।।"

"তুমি শুক পাখী, আকাশের অবাধ অসীম সর্ব্বোচ্চ স্থানে তুমি উড়িয়া বেড়াইবে, মাটীর নিম্নে কুৎসিৎ পাখীর ন্যায় তুমি কেন বাসা করিবে।"

"মায়েতে বুঝায় বহিনে বুঝায়, বুঝান হৈল দায়।
সাচ্চা সাপে খাইল যারে কি করবে ওঝায়।।"

এইখানে কবি নিতাই চাঁদ উচ্চ সহজিয়াদের সুরে কতকগুলি কথা বলিয়াছেন।

"জাতি ধরম ভুয়া কথা নিতাই চাঁদ বলে।
বিষ অমৃত হয়, ওঝায় পাইলে।।
সুস্থান অস্থান নাই, সুজন কুজন।
ধূলা মাটি বেছে লও পীরিতি বড় ধন।।
আসল পীরিতি, নাহি জানে জরা মরা।
দুষমনে কাটিলে অঙ্গ পীরিতি লাগে জোড়া।।
নিতাই চাঁদ কয়, পীরিতি আসল যদি হয়।
হউক না ডোমের নারী তাতে কিবা ভয়।।"

ডোমের বাড়ী-ঘর ভাঙ্গা

চাঁদ রায় সমস্ত কথা শুনিলেন। ডোমের কন্যাকে তাঁহার পুত্র বিবাহ করিবে শুনিয়া শ্যাম রায়ের পিতা জ্বলন্ত আগুনের মত ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেনঃ—

"লোক লেঠেল ডাকি রায় কোন্ কাম করিল।
বাড়ী-ঘর ভাঙ্গি ডোমের সায়রে ভাসাল।।"

এদিকে ডোম কন্যা দেশান্তরী হইবে। শ্যাম রায় যাইতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু মেয়েটি তাঁহার হাত ধরিয়া মানা করিতে লাগিল, লক্ষ্মীটি তুমি ঘরে ফিরিয়া যাও, একবার যাইয়া মাকে মা বলিয়া ডাক ও বহিনদিগকে আদর কর, তাহাদের বুক জুড়াইবে। কত শত সুন্দরী কন্যা তোমার পায়ে পড়িয়া তোমার স্ত্রী হইতে চাহিবে। আমার অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা হইবে। তুমি আমার জন্য ভাবিও না। তোমার চিন্তায় আমার মৃত্যু হইলেও মঙ্গল, সেই মৃত্যুই আমার জীবন, তোমার সমস্ত বালাই মুছিয়া লইয়া আমি চলিয়া যাই, তুমি পায়ের ধূলির মত আমাকে ঝাড়িয়া ফেল। তুমি পিঁড়ির বদলে কেন সিংহাসন ছাড়িবে;রত্ন ফেলিয়া আঁচলে কেবল শুধু গেরো বাঁধিতেচাহিতেছ কেন? অমৃত বদলে কেন বিষ খাইতে চাহিতেছ। আমি তোমার জীবনপথের কাঁটা, আমার সঙ্গে বাস করিলে কখন্ তোমার কোন্ বিপদ হইবে ঠিকানা নাই। সোনার ঝুরি ছাড়িয়া ধুলা কুড়াইবে কেন? আমাকে লইয়া তুমি বিপদে পড়িবে—একথা তুমি বুঝিতেছ না।"

কিন্তু এত অনুনয় ব্যর্থ হইল—ডোম কন্যা মুখে যাহা বলে, তাহার প্রেমময়ী স্বর্ণমুর্ত্তি বিপরীত দিকে নীরবে তাহা আকর্ষণ করে। কুমারের কি সাধ্য সে আকর্ষণ রোধ করে?

*　　　*　　　*　　　*

আর এক দেশ, সে অসভ্য গাবরিয়াদের রাজ্য। তাহাদের আচার-ব্যবহার অতি কদর্য্য। রাজা সর্ব্বদাই সুন্দরী নারী খুঁজিয়া বেড়ায়, এ তাহার চোখের নেশা, আজ যাহাকে সুন্দরী দেখিয়া বিবাহ করিল কালই সে চোখের বলি হইল। তারপরে রাজা তাহাকে উচ্ছিষ্টের মত ফেলিয়া দেয়।

"টাটকা ফুলের কলি না হইতে বাসি।
আজ যে জয়ের রাণী কাল সেই দাসী।।"

সে দেশবাসীরা নিতান্ত অসভ্য। এক একজনের গাল ভরিয়া কড়া দাড়ি, এবং আট দশটা স্ত্রী। তাহারা রাক্ষসের ন্যায় দুর্দ্দান্ত ও নিষ্ঠুর।

শ্যাম রায় ডোম সাজিয়াছেন, নলখাগড়া ও সরু বাঁশ দিয়া বিজনী, কুলা সাজি তৈরী করেন;বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ান।

"ফালগুণ চৈতের রোদে অঙ্গ জ্বলি যায়।
কাঁদেরে ডোমের নারী করি হায় হায়।।
রাজার ছাওয়াল বঁধুরে ছিলে রাজার বেটা।
মুই অভাগিনীর লাগি হইল এতেক লেঠা।।
আর কারে বা দোষী আমি নিজে কর্ম্ম দোষী।
রাজার ছাওয়াল বঁধু হৈল বনবাসী।।"

ডোমের মেয়ে বলে—

"গাবরিয়া জাতির দয়া ধর্ম্ম নাই।
এই দেশ ছাড়ি চল বঁধু ভিন্ন দেশে যাই।।"

খবরিয়া সংবাদ দিল—"মহারাজ তোমার মুলুকে এক ডোমের মেয়ে আসিয়াছে, তাহার লাবণ্য চাঁদের মত, তোমার রাণীরা তাহার দাসী হইবারও যোগ্যা নহে—তোমার গাবরিয়া মুলুকে এরকম সুন্দরী কেহ চোখে দেখে নাই।"

"এরে শুন্যা গাবর রাজা কোন কাম করিল।
ডোমনীরে লইয়া তবে নগরে আসিল।।
হুকুম করিল রাজা ডোমেরে দাও শূলে।
রায়রে বান্ধিয়া তারা লইল হাতে গলে।।"

শ্যামরায় এইভাবে শূলের উপর মৃত্যু দণ্ডের জন্য বন্দী হইলেন। রাজার নিভৃত কক্ষে ডোম কন্যাকে আনা হইল। সে যেন একখানি অগ্নি প্রতিমা, সে রাজাকে গ্রাহ্য না করি বলিতে লাগিল ঃ—

"গাবর রাজ! আপনার একি ব্যবহার? আপনি কি জোর করিয়া রমণীর মন অধিকার করিতে চান? নারীর যৌবন শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখা যায় না, জোর করিয়াও তাহার মন পাওয়া যায় না। আপনার সঙ্গে পরিচয়ই হয় নাই, এর মধ্যেই ভালবাসার দাবী!"

"গাছ না রোপিয়া আগে ফল খাইতে আশ।
না বঞ্চিলাম ঘরে তোমার দুই চারি মাস।।
ফল না পাকিতে আগে কোথা পাবে রস।
বলে কি করিতে চাও অবলারে বশ?
ক্ষুধা লাগিলে ভাত না জুড়াইয়া খাও।
আগে তো পীরিতি কর পাছে সুখ পাও।"

রমণী উত্তেজিত সুরে উপসংহারে বলিলঃ—

"ধাঙ্গর গাবর জাতি তাহাতে বর্ব্বর।
একদিন না করিয়াছ ভাল নারীর ঘর।।
প্রেম পীরিতের কিছু নাহি জান ভাও।
পুষ্প বাটিয়া খাইলে মধু কোথা পাও।।"

কত রমণী এই বর্ব্বর রাজা জোর করিয়া আনিয়াছে, কিন্তু এমন রূপসী, এমন নির্ভীক ও এমন সত্যভাষিণী নারী সে দেখে নাই। যদিও সে অনেক গালি মন্দ খাইল, তথাপি রাজার বরং ভালই লাগিল।

"বিয়া করিবে রাজা মন স্থির কৈল।
ডোমনীর কথায় রাজা ডোমেরে ছাড়িল।।"

শ্যাম রায় অব্যাহতি পাইলেন।

বহুদিন ধরিয়া বিবাহের উৎসব বাদ্যভাণ্ড চলিল; নারী-পুরুষেরা একত্র হইয়া দরবারে তাহাদের অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গীসহ নৃত করিতে লাগিল।

"মইষের চামড়া দিয়া বানাইয়াছে ঢাক।
নারীগুলা নাচে যেন কুমারের চাক।।
মইষের শিং দিয়া বানাইয়াছে শিঙ্গা।
ডউয়ার ছাল খাইয়া ঠোঁট করিছে রাঙ্গা।।"

এদিকে গাবর রাজার পাটরাণী ভয় খাইয়া গিয়াছে, এরূপ সুন্দরী কন্যা—এ ত দুইদিনে আমার স্থান দখল করিয়া লইবে। কিন্তু নিজের মনের ভাব গোপন করিয়া সে ডোম কন্যাকে বলিলঃ—

"ভিন দেশী সুন্দর কন্যা বলি যে তোমায়।
গোঁয়ার সোয়ামীর গুণ কহা নাহি যায়।।
ভাত জুড়াইয়া গেলে নাক চুল কাটে।
একটু করিলে দোষ, বেচে নিয়া হাটে।।
পানে যদি চুন কমে—চুল দেয় ছিঁড়ি।
খোলা পিঠেতে মারে দোহাতিয়া বাড়ী।।
শুনিলে গুণের কথা গায়ে আসে জ্বর।
তুমি কি করিবে কন্যা এমন গোঁয়ারের ঘর।।"

ডোমের মেয়ে এত দুঃখের মধ্যেও রাণীর অভিসন্ধি বুঝিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারিল না, "আষাঢ়ের মেঘ যেমন রোদে যায় গলি"; তাহার এত দুঃখ হাসিতে ভাসিয়া গেল, সে বলিল, "তাহা যাহাই বল, এস দুইজনে ভাগ করিয়া রাজত্ব করি,—

"দুই সতীনে বৈসা হেথা সুখে বাস করি।
পাইয়াছি রাজত্ব পাট অল্পে কেন ছাড়ি।।"

এই উত্তরে রাণীর মুখ শুকাইয়া গেল। চোখের অশ্রু কিছুতেই বারণ মানে না। রাণী যাহা বলিয়াছিল—তাহা সত্য কথা—আসলে সে নিজের অধিকার শত কষ্ট সহিয়াও ছাড়িতে পারে না।

"এত দুঃখ পাইয়া তবু ছাড়তে না জুয়ায়।
মড়ার কীবা যেমন মড়াতে লুকায়।।"

ডোম কন্যা তাহার ভয় দেখিয়া ব্যথিত হইল। সে বলিল, "সত্য বলিতেছি, আমি এমন গোঁয়ার গোবিন্দের ঘর করিতে চাহি না। তুমিই রাজার পাটরাণী হইয়া থাক; দেখ, আমার যে কন্যার সজ্জা রাজা বিবাহের জন্য আনিয়াছে, সেই অষ্ট অলঙ্কার ও সুন্দর 'পবন-বাহার' শাড়ী পরিয়া তুমি নূতন বধূ সাজিয়া বসিয়া থাক। আমাকে একটা দাসীর বেশ পরাইয়া পলাইবার পথ দেখাইয়া দেও। কিন্তু আমার এই গুপ্ত পলায়নের কথা যেন কেউ জানিতে না পারে। চারিদিকে গণ্ডগোল, বাদ্য-ভাণ্ড,—ইহার মধ্যে আমার গতিবিধির দিকে কাহারও লক্ষ্য থাকিবে না।"

"ছুমে ধুমে গোলমালে যাই পলাইয়া।
গাবর রাজারে তুমি ফির‍্যা কর বিয়া।।"

শ্যাম রায়ের বড় ভাই বাড়ীতে আসিয়া কনিষ্ঠের এই দুর্দ্দশার কথা শুনিলেন। তাঁহার পিতার এই দুর্ব্ব্যবহারের কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। অশ্বারোহণে তখনই গাবরের দেশে রওনা হইলেন।

"ছয় শত লাঠিয়াল সঙ্গেতে করিয়া।
দুরন্ত গাবরের দেশে মিলিল আসিয়া।।
গাবরের বাড়ী ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলায়।
বাড়ী-ঘর ভাঙ্গি তবে সায়রে ভাসায়।।
দাড়িতে বাঁধিয়া দাড়ি কোপে মুণ্ড কাটে।

পলাইতে না পায় পথ গাবরেরা কাঁদে।।
ধরিয়া গাবর রাজায় শূলেতে চড়ায়।
গাবরের লোহে নদী রাঙ্গা হৈয়া যায়।।"

একজন গাবরের হস্ত-নিক্ষিপ্ত বিষাক্ত বাণ হঠাৎ শ্যামরায়ের মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ করিল, মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া কুমার নৈরাশ্যপূর্ণ স্বরে বলিলেন—

"আমি সংসারের সুখ ছাড়িয়া চলিলাম,"—

"নিদান কালে না দেখিলাম তোমার চাঁদ মুখ।"

"আর ঘরের কোণে আমার বিছানা তুমি পাতিয়া দিবে না, বিদেশে যাওয়ার কথা শুনিলে আর্ত্ত হইয়া আমার পদতলে পড়িয়া মানা করিবে না। তোমার মুখের হাসি আর দেখিতে পাইলাম না। আর-জন্মে যদি আমি বৃক্ষ হইয়া জন্ম লই, তবে তুমি লতা হইয়া আমায় বেড়িয়া থাকিও। দুইজনে নিরালা আমরা মনের কথা কহিব। আমি যদি পক্ষী হই, তবে তোমাকে যেন পক্ষিণীরূপে পাই।"

"পক্ষী যদি হই কন্যা হইও পক্ষিণী।
উড়িয়া ঘুরিয়া কহিতাম দুঃখের কাহিনী।
নদী যদি হই লো কন্যা তুমি হইও পানী।।
শুয়া যদি হই লো কন্যা তুমি হইও শাড়ী।
ভ্রমর যদি হই লো কন্যা হইও ভ্রমরী।।
দুঃখের মনুষ্য জন্ম আর নাহি চাই।
জীবন মরণে কন্যা তোরে যেন পাই।।"

ডোম কন্যা হাহাকার করিয়া শ্যামরায়ের মৃত দেহ কোলে করিয়া বসিল, সে শোকে উন্মত্ত—আর্দ্রকণ্ঠে বলিলঃ—

"কেমনে ভুলিবে কন্যা তোমার পীরিত।"
"গলায় পুষ্পের মালা না হইল বাসি।
একবার না দেখিলাম তোমার মুখের হাসি।।

মা-বাপ রাজ্য-পাট পায় না ঠেলিয়া।
বনবাসী হৈলা বঁধু আমার লাগিয়া।।
সুন্দর রাজার পুত্র আমি তো ডোমনী।
হেলায় হারালাম রত্ন আমি অভাগিনী।।
দারুণ গাবরিয়া বঁধুরে বধিল পরাণ।
এই বিষ খাইয়া আমি ত্যজিব পরাণ।।

আলোচনা

এই পালাটি শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে মৈমনসিংহ গুপ্ত-বৃন্দাবনবাসী কমলদাস গায়কের মুখে শুনিয়া সংগ্রহ করেন। কমলদাস ছাড়া আরো দুই তিনটি গায়কের কথা তিনি আমাকে লিখিয়া জানান, তাঁহারা এই গানের সামান্য অংশ জানিতেন। কমলদাস একটি একতারা মাত্র সম্বল হইয়া পল্লীতে পল্লীতে তাঁহার অপূর্ব্ব সংগ্রহ হইতে গানগুলি গাহিয়া ফিরিতেন, তাঁহার স্মৃতি পালা গানের বিরাট রত্নাকর। যে বিধাতা ভ্রমরকে গুঞ্জন করিতে শিখাইয়াছিলেন, ও কোকিলের কণ্ঠে পঞ্চম স্বর দিয়াছিলেন, সেই বিধাতার বরে কমলদাস বাবাজির কণ্ঠের স্বর তিনি মধু হইতে মধুর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

ধোপার মেয়ে, শ্যাম রায়, মহুয়া প্রভৃতি কয়েকটি পল্লী সঙ্গীতের ভাব ও ভাষাগত একটা সাদৃশ্য আছে, ইহারা সাহিত্যের একটা বিশেষ যুগের লক্ষণ বহন করে। সহজিয়ারা প্রেমকে ভাব রাজ্যের যে উচ্চ গ্রামে লইয়া গিয়াছিলেন, এই তিনটি গানেই তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় আছে। এই তিনটি গানের নায়কেরা সকলেই বড় ঘরের লোক, কিন্তু তাঁহারা নিম্ন শ্রেণীর মেয়েদের প্রেমের ফাঁদে পড়িয়াছিলেন; এই ভালবাসার জন্য এমন ত্যাগ বা দুঃখ, এমন বিপদ নাই, যাহা ইঁহারা অম্লান বদনে সহ্য না করিয়াছেন। বিশাল সম্পত্তি, আত্মীয়গণের আন্তরিক স্নেহের আকর্ষণ ও পার্থিব সমস্ত সুখস্বাচ্ছন্দ্য উপেক্ষা করিয়া ইঁহারা বিপদের সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। এই প্রেমের প্রতি তরঙ্গে মনোবেদনার যে উচ্চাঙ্গের ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে, তাহা ইহলোকের নহে, সুর-লোকের। ডোমনী ও আঁধা বঁধুর নায়িকা উভয়েই পরস্ত্রী, কিন্তু এই গান দুইটির সুর এত উচ্চ গ্রামের যে তাহাদের কলঙ্কের কথা একবারও

শ্যাম রায়

"ছয় শত লাঠিয়াল সঙ্গেতে করিয়া
দুরন্ত গাবরের দেশে মিলিল আসিয়া।"

পৃষ্ঠা ৪১০
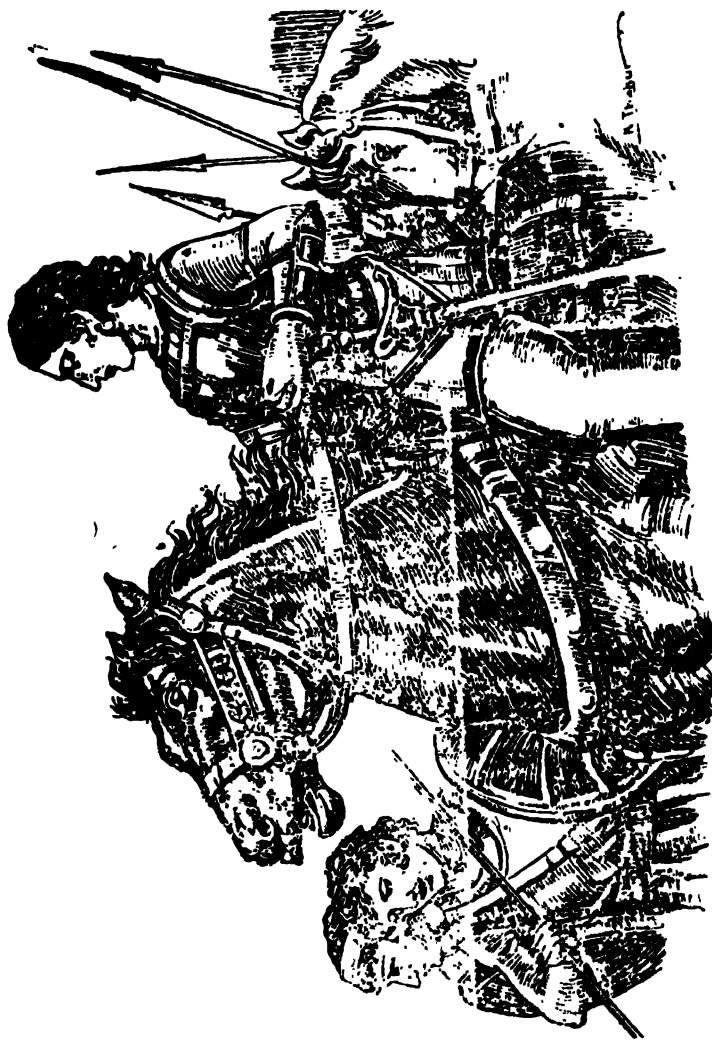
মনে হয় না, মনে হয় যেন তাহারা প্রভাতের সদ্যবিকশিত পদ্ম বা গঙ্গাজলের ন্যায় পবিত্র। তাহাদের স্বামীর দিকটা আড়াল করিয়া যে দিকটার উপর কবিরা জোর দিয়াছেন, তাহা একবারে স্বর্গীয় আলোকে উদ্ভাসিত। তাহারা তেত্রিশ কোটী দেব দেবীর মন্দিরের উপর পরদা টানিয়া শুধু কন্দর্পের মঠের জন্য অর্ঘ্য সাজাইয়াছেন। তাহাদের সেই পূজায় "কাম গন্ধ নাহি তায়।"

এই গাথাটিতে কবি বাংলার প্রকৃতি হইতেই তাঁহার সমস্ত কবিত্ব সম্পদ আহরণ করিয়াছেন, সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের কোন ঋণ তিনি গ্রহণ করেন নাই। নিজের গৃহে যাহার এক বিশাল ভাণ্ডার আছে সে অপরের কাছে মাথা হেঁট করিয়া ঋণ চাহিতে যাইবে কেন? যত উৎপ্রেক্ষা ও উপমা তাহা স্বীয় ক্ষেত্রজ পুষ্প, লতা ও তরুর নিকট হইতে দুই হাত পাতিয়া গ্রহণ করিয়া শিরোধার্য্য করিয়াছেন। এই কাব্যে যতগুলি প্রতিমা গঠিত হইয়াছে, তাহার খড়, কাঠ ও বর্ণ তিনি বাংলার সবুজ আরণ্য শোভা হইতে গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।